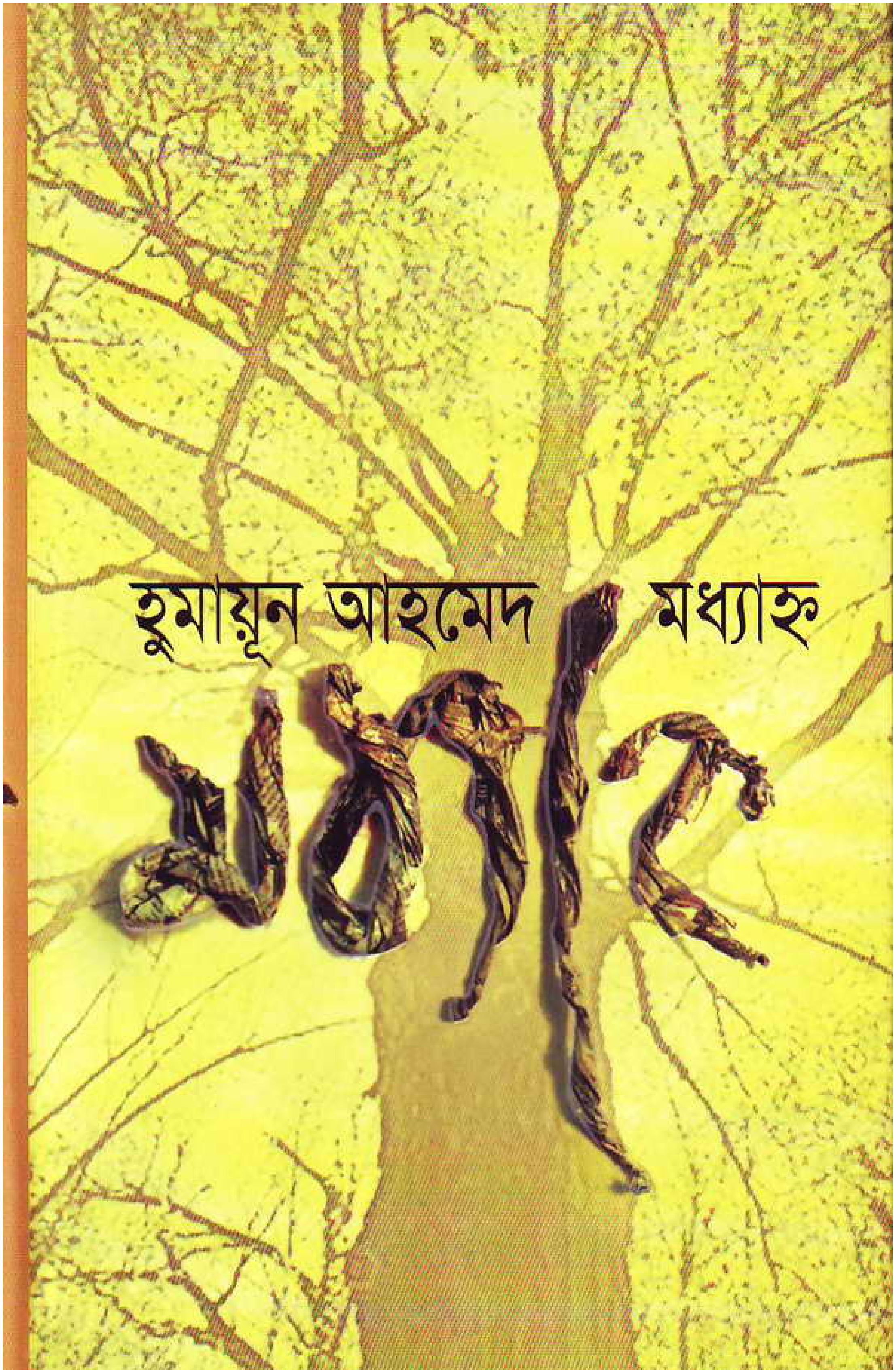
হুমায়ূন আহমেদ
মধ্যাহ্ন

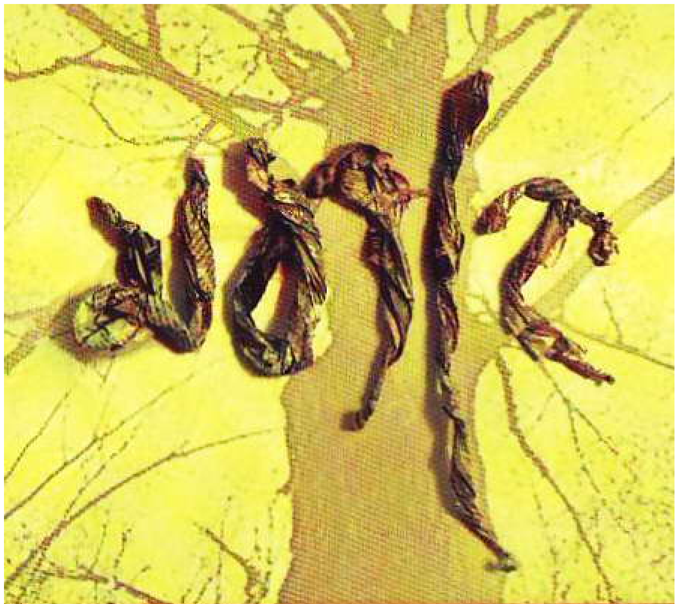

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়

নিঠুর বন্ধুরে
বলেছিলে আমার হবে
মন দিয়াছি এই ভেবে
সাক্ষী কেউ ছিলো না সেই সময়
সাক্ষী শুধু চন্দ্রতারা
একদিন তুমি পড়বে ধরা
ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়

পাষাণ বন্ধুরে
দুঃখ দিয়া হিয়ার ভিতর
একদিনও না লইলে খবর
এই কি তোমার প্রেমের পরিচয় ?
মিছামিছি আশা দিয়া
কেনইবা প্রেম শিখাইয়া
দূরে থাকা উচিত কি আর হয়

নিঠুর বন্ধুরে
বিচ্ছেদের বাজারে গিয়া
তোমার প্রেম বিকি দিয়া
করবো না প্রেম আর যদি কেউ কয়
উকিলের হয়েছে জানা
কেবলই চোরের কারখানা
চোরে চোরে বেওয়াই আলা হয়।

—উকিল মুনসি

মেহের আফরোজ শাওন

পরম করুণাময় ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ উপহার তাকে দিয়েছেন।
তার কোলভর্তি নিষাদ নামের কোমল জোছনা।
আমার মতো অভাজন তাকে কী দিতে পারে?
আমি দিলাম মধ্যাহ্ন। তার কোলে জোছনা, মাথার উপর মধ্যাহ্ন। খারাপ কী?

ভূমিকা

আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা তার নিজের লেখালেখির একটা নাম দিয়েছে— 'আবজাব'। সে যা-ই লেখে তা-ই নাকি আবজাব! আমি আমার লেখার আলাদা কোনো নাম দিতে পারলে খুশি হতাম। 'যেমন খুশি সাজো'র মতো 'যেমন খুশি লেখা'। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সে-রকমই। আমি লিখি নিজের খুশিতে। আমার লেখায় সমাজ, রাজনীতি, কাল, মহান বোধ (!) এইসব অতি প্রয়োজনীয় (?) বিষয়গুলি এসেছে কি আসে নি তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। ইদানীং মনে হয়— আমার কোনো সমস্যা হয়েছে। হয়তোবা ব্রেনের কোথাও শর্ট সার্কিট হয়েছে। যে-কোনো লেখায় হাত দিলেই মনে হয়— চেষ্টা করে দেখি সময়টাকে ধরা যায় কি-না। মধ্যাহ্নেও একই ব্যাপার হয়েছে। ১৯০৫ সনে কাহিনী শুরু করে এগুতে চেষ্টা করেছি। পাঠকরা চমকে উঠবেন না। আমি ইতিহাসের বই লিখছি না। গল্পকার হিসেবে গল্পই বলছি। তারপরেও ...

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর

হরিচরণ সাহা তাঁর পাকাবাড়ির পেছনে পুকুরঘাটে বসে আছেন।

তাঁর বয়স পঞ্চাশ। শরীর শক্ত। গড়পড়তা মানুষের তুলনায় বেশ লম্বা বলেই হাঁটার সময় কিংবা বসে থাকার সময় ঝুঁকে বসেন। তাঁকে তখন ধনুকের মতো দেখায়। তাঁর মাথাভর্তি ধবধবে শাদা চুল। হঠাৎ হঠাৎ তিনি চুলে কলপ দেন, তখন তাঁকে যুবাপুরুষের মতো দেখায়। তাঁর পরনে শান্তিপুরী ধুতি। গরমের কারণে ধুতি লুঙ্গির মতো পরেছেন। খালি গা। তাঁর গাত্রবর্ণ শ্যামলা। আজ কোনো এক বিচিত্র কারণে তাঁকে ফর্সা দেখাচ্ছে।

সকাল দশটার মতো বাজে। এই সময়ে হরিচরণ সোহাগগঞ্জ বাজারে তাঁর পাটের আড়তে বসেন। বাজারে তাঁর তিনটা ঘর আছে। পাটের আড়তের ঘর তুলনামূলকভাবে ছোট। এই ঘরের গদিতে বসতেই তাঁর ভালো লাগে। এখান থেকে নদীর একটা অংশ দেখা যায়। নদীর নাম বড়গাঙ। বর্ষায় এই নদী কানায় কানায় পূর্ণ থাকে। বড় বড় লঞ্চ নিয়মিত আনাগোনা করে। তারা কারণে অকারণে 'ভোঁ' বাজায়। সেই শব্দ শুনতেও তাঁর ভালো লাগে। আজ বাজারে যাচ্ছেন না, কারণ তাঁর মন সামান্য বিক্ষিপ্ত। পুকুরঘাটে কিছুক্ষণ বসে থাকলে মন শান্ত হবে— এই আশায় তিনি বসে আছেন। ঘাট বাঁধানো। তিনি নিজেই গৌরীপুর থেকে কারিগর এনে ঘাট বাঁধিয়েছেন। কারিগরের কাজ তাঁর পছন্দ হয়েছে। ঘাটের ধাপ সে যথেষ্ট পরিমাণে চওড়া করেছে। ভাদ্রমাসের গরমে অতিষ্ঠ হলে তিনি এই ঘাটে এসে শুয়ে থাকেন। ঠাণ্ডা পাথরের স্পর্শ বড় ভালো লাগে। পাথরের গা থেকে এক ধরনের গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগে। পাথরের কোনো গন্ধ থাকে না, কিন্তু এই গন্ধ কীভাবে আসে ? বিষয়টা নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে চিন্তাও করেন।

এখন আষাঢ় মাসের শুরু। গতরাতে বিরামহীন বৃষ্টি পড়েছে বলে আজ আবহাওয়া শীতল। আষাঢ় মাসের কড়া রোদ অবশ্যি আছে। সেই রোদ তাঁকে স্পর্শ করছে না। ঘাটের সঙ্গে লাগোয়া বাদাম গাছ তাকে ছায়া দিয়ে আছে। এই গাছের পাতা কাঠগোলাপের পাতার মতো ছায়াদায়িনী।

হরিচরণের মনের বিক্ষিপ্ত ভাব কমল না, বরং বাড়ল। এই সঙ্গে তাঁর সামান্য শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। শ্বাসকষ্টের উপসর্গ কিছুদিন হলো শুরু হয়েছে। মন-মেজাজ ঠিক না থাকলেই শ্বাসকষ্ট হয়। ঘুমের অসুবিধা হলে শ্বাসকষ্ট হয়। কালরাতে তাঁর ঘুমের কোনো অসুবিধা হয় নি। সারারাত টিনের চালে বৃষ্টি পড়েছে। শীত শীত ভাব ছিল। তিনি পাতলা সুজনি দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখে সুখনিদ্রায় গেছেন। তবে ঘুমের কোনো এক পর্যায়ে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটাই তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হবার একমাত্র কারণ।

স্বপ্নে তিনি চার-পাঁচ বছর বয়সি একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুরছেন। শিশুর মাথায় সোনার মুকুট। তার গাত্রবর্ণ ঘন নীল। স্বপ্নে তাঁর কাছে মনে হলো, শিশুটি তাঁরই সন্তান। আবার এও মনে হলো, এই শিশু শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর নিজের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে না— স্বপ্নে এটা মনে হলো না। কোলের শিশুটি একসময় বলল, ব্যথা। তিনি বললেন, কোথায় ব্যথা ? সে তার হাত দেখাল। হাতটা কনুইয়ের কাছে কাটা, সেখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তের রঙও নীল। তিনি রক্ত বন্ধ করার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন ঘুম ভাঙল। তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। হরিচরণের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। প্রথম যৌবনে একটা মেয়ে হয়েছিল। তিন বছর বয়সে মেয়েটা দিঘিতে ডুবে মারা যায়। পুরোহিতের কী এক বিধানে মেয়েটাকে দাহ করা হয় নি। মুসলমানদের মতো কবর দেয়া হয়েছে। যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সেখানে তিনি একটা শিউলি গাছ লাগিয়েছিলেন। সেই গাছ আজ এক মহীরুহ। এই অঞ্চলে এত বড় শিউলি গাছ আছে বলে তিনি জানেন না। তাঁর মেয়ের নামও ছিল শিউলি। এই গাছ বৎসরের পর বৎসর হলুদ বোঁটার শাদা ফুল ফুটিয়েই যাচ্ছে।

প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন কোনো সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি আরেকটি বিবাহ করেন। সেই ঘরেও কোনো সন্তান হয় নি। হরিচরণের দুই স্ত্রীই গত হয়েছেন। তাঁর বিশাল পাকাবাড়ি এখন শূন্য। পাকাবাড়িতে তিনি এখন বাসও করেন না। পাকাবাড়ির দক্ষিণে টিনের দোচালা বানিয়েছেন। টিনের ঘর রাতে দ্রুত শীতল হয়, ঘুমাতে আরাম। বর্ষায় টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হয়। সেই শব্দ তাঁর কানে আরাম দেয়।

অম্বিকা ভট্টাচার্যকে আসতে দেখা যাচ্ছে। হরিচরণ স্বপ্ন বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে চান বলে খবর দিয়েছেন। অম্বিকা ভট্টাচার্য এই অঞ্চলের একমাত্র ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র জানেন। পূজাপাঠ করেন। তাঁর বয়স হরিচরণের চেয়ে কম হলেও তিনি বুড়িয়ে গেছেন। শরীর থলথলে হয়েছে। হাঁটেন কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর

দিয়ে। তাঁর বাড়ি হরিচরণের বাড়ি থেকে খুব দূরে না, দশ-বারো মিনিটের পথ। এই পথ পাড়ি দিয়েই তিনি ক্লান্ত। ঘাটের পাশে তাঁর জন্যে রাখা কাঠের চেয়ারে বসতে বসতে তিনি বললেন, আগে জল খাওয়াও, তারপর কথা।

জলের সঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন দিব ?

অবশ্যই। মিষ্টান্ন বিনা জলপান নিষেধ, জানো না ? সামান্য গুড় হলেও মুখে দিতে হয়। তবে ফল নাস্তি। জলপানের পরে ফল খাওয়া যাবে না।

অম্বিকা ভট্টাচার্য মুখ গম্ভীর করে হরিচরণের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনলেন। কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, স্বপ্নটা ভালো না।

হরিচরণ বললেন, ভালো না কেন ?

অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, উঁচু বংশের কেউ যদি দেবদেবী কোলে নেয়া দেখে, তাহলে তার জন্যে উত্তম। সৌভাগ্য এবং রাজানুগ্রহ। নিম্নবংশীয় কেউ দেখলে তার জন্যে দুর্ভাগ্য। সে হবে অপমানিত। রাজরোষের শিকার। তার ভাগ্যে অর্থনাশের যোগও আছে।

বলেন কী!

শাস্ত্রমতে ব্যাখ্যা করলাম। তোমার পছন্দ না হলেও কিছু করার নাই। যাহা সত্য তাহা সত্য। তাছাড়া তুমি দেবগাত্রে রক্তপাত দেখেছ, এর অর্থ আরো খারাপ।

কী খারাপ ?

রক্তপাত হয় এমন কোনো রোগ-ব্যাধি তোমার হতে পারে। যেমন ধর, যক্ষ্মা। শান্তি সস্ত্যয়নের ব্যবস্থা কর। বিপদনাশিনী পূজার ব্যবস্থা কর। অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি কী অপরাধ করলাম ?

অম্বিকা বললেন, দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে ঘুরেছ, এটাই অপরাধ। অপরাধ দুই প্রকার। জ্ঞান অপরাধ, অজ্ঞান অপরাধ। তুমি করেছ অজ্ঞান অপরাধ।

ও আচ্ছা।

অম্বিকা ভট্টাচার্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, পূজা কবে করতে চাও আমাকে জানাবে। যত শীঘ্র হয় তত ভালো। আগামী বুধবার ভালো দিন আছে। চাঁদের নবমী।

হরিচরণ বললেন, পূজা বুধবারেই করবেন। খরচপাতি যেরকম বলবেন সেরকম করব।

ভালো। ঐদিন তুমি উপবাস করবে। নিরম্বু উপবাস। জলপানও করবে না। সন্ধ্যাবেলা পূজা হবে। পূজার পর উপবাস ভঙ্গ করবে।

হরিচরণ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

বেলা বেড়েছে। সকালে আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। এখন মেঘ করতে শুরু করছে। দিঘির পানি এতক্ষণ নীল ছিল, এখন কালচে দেখাচ্ছে। বড় কোনো মাছ ঘাই দিল। হরিচরণ কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ আছে। হরিচরণের বর্শি বাইবার শখ আছে। অনেকদিন বর্শি নিয়ে বসা হয় না। আজ কি বসবেন ? মুকুন্দ ঘরেই আছে। তাকে বললেই সে নিমিষের মধ্যে চাড় ফেলার ব্যবস্থা করবে। পিঁপড়ার ডিম এনে দিবে। পিঁপড়ার ডিম বড় মাছের ভালো আধার। হরিচরণের মনে হলো, হুইল বর্শি নিয়ে বসলেই স্বপ্নটা মাথা থেকে দূর হবে। স্বপ্ন নিয়ে এত অস্থির হবার কিছু নাই। স্বপ্ন অস্থির মস্তিষ্কের ফসল। অস্থিরমতিরাই স্বপ্ন দেখে। আলস্য অস্থিরতা তৈরি করে। বর্শি বাওয়াও এক ধরনের আলস্য, তারপরেও দৃষ্টি কাজে ব্যস্ত থাকে। ফাৎনার দিকে তাকিয়ে থাকাও এক ধরনের কাজ। মুকুন্দকে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। চার-পাঁচ বছর বয়সি একটা ছেলে পেয়ারা বাগানে একা হাঁটাহাঁটি করছে। ছেলেটা তাঁর দিকে পেছন ফিরে আছে বলে তিনি তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছেন না।

ছেলেটার গাত্রবর্ণ গৌর। খালি গা। পরনে লালরঙের হাফপ্যান্ট। ঘন সবুজের ভেতর তার লালপ্যান্ট ঝকমক করছে। তিনি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকেই উঁচু গলায় মুকুন্দকে ডাকলেন। ছেলেটা চট করে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। কী সুন্দর চেহারা! বড় বড় চোখ। চোখভর্তি মায়া। খাড়া নাক। চোখের ঘন পল্লব এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি হাত ইশারায় ছেলেটাকে ডাকলেন। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পায়ে পায়ে আসতে লাগল। তবে পাশে এসে দাঁড়াল না। একটু দূরে জামগাছের নিচে থমকে দাঁড়াল।

মুকুন্দ তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি মুকুন্দকে বললেন, বর্শি বাইব, ব্যবস্থা কর।

মুকুন্দ বলল, জে আজ্ঞে।

এই ছেলেটা কে ?

সুলেমানের পুলা।

মুসলমান ?

জে আজ্ঞে।

সুলেমানটা কে?

কাঠমিস্ত্রি। আপনের ঘরের দরজা সারাই করল।

ছেলেটা তো দেখতে রাজপুত্রের মতো!

ছেলে হইছে মায়ের মতো। মায়ের রূপ দেখার মতো। বেশি রূপ হইলে যা হয়। জিনে ধরা। জংলায় মংলায় একলা ঘুরে। গীত গায়। আমরার বাগানে মেলা দিন আসছে।

আমি তো দেখি নাই।

জিনে ধরা মেয়ে। চউক্ষের পলকে সইরা যায়। দেখবেন ক্যামনে।

ঠিক আছে তুমি যাও। পিঁপড়ার ডিম আর কী কী লাগে ব্যবস্থা কর। পুকুরে চাড় ফেল। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, মাছ আধার খাবে না। বৃষ্টি হলেই মাছ আধার খাওয়া বন্ধ করে। কী কারণ কে জানে।

মুকুন্দ দ্রুত চলে গেল। হরিচরণ আবার তাকালেন ছেলেটার দিকে। মাটি থেকে কী যেন কুড়িয়ে মুখে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে কালোজাম। কিন্তু জাম এখনো পাকে নি। গাছের নিচে পাকা জাম পড়ে থাকার কথা না। হরিচরণ এইবার গলা উঁচিয়ে ছেলেটাকে ডাকলেন, খোকা, এদিকে আস।

ছেলেটা ছোট ছোট পা ফেলে আসছে। দূর থেকে তাকে যতটা সুন্দর মনে হচ্ছিল এখন তার চেয়েও সুন্দর লাগছে। তার কপালের একপাশে কাজলের ফোঁটা। তার মা নজর না লাগার ব্যবস্থা করেছেন। ঠিকই করেছেন। নজর লাগার মতোই ছেলে। বয়স কত হবে?

কী নাম তোমার?

ছেলে জবাব দিল না।

নাম বলবে না?

সে না-সূচক মাথা নাড়ল।

কী খাচ্ছ?

ছেলে হা করে তার মুখ দেখাল। মুখের ভেতর জামের লাল একটা বিচি। তিনি বললেন, সন্দেশ খাবে?

ছেলেটা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তিনি ডাকলেন, মুকুন্দ! মুকুন্দ!

মুকুন্দ আশেপাশে নেই। সে পিঁপড়ার ডিমের সন্ধানে চলে গেছে। পাকা বাড়িতে বৃদ্ধা মায়ালতা থাকেন। হরিচরণের দূরসম্পর্কের বিধবা জেঠি। তিনি কানে শোনেন না। শুনলেও ঘর থেকে বের হবেন না। রান্নার জন্যে একজন

ঠাকুর আছে। সে বাজারে গেছে মাছের সন্ধানে। হরিচরণ বললেন, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক। কোথাও যাবে না। আমি সন্দেশ নিয়ে আসছি।

ছেলেটা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। হরিচরণের প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে ছেলেটাকে কোলে নিতে। কোলে নেবার জন্যে সময়টা ভালো। আশেপাশে কেউ নেই। কেউ দেখে ফেলবে না। তিনি এক মুসলমান কাঠমিস্ত্রির ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন— এই দৃশ্য হাস্যকর। ধর্মেও নিশ্চয়ই বাধা আছে। যবনপুত্র অস্পৃশ্য হবার কথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্রের নিচে যবনের অবস্থান।

হরিচরণ সন্দেশ এবং এক গ্লাস পানি হাতে ফিরলেন। ছেলেটা যেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা সেখানে নেই। জামতলাতেও নেই। পেয়ারা বাগানেও নেই। দিঘির পানিতে ডুবে যায় নি তো ? তাঁর বুক ধ্বক করে উঠল। তিনি দিঘির দিকে তাকালেন। দিঘির জল শান্ত। সবুজ শ্যাওলার যে চাদর দিঘি জুড়ে ছড়িয়ে আছে সে চাদরে কোনো ভাঙচুর নেই।

ছেলেটার নাম জানা থাকলে তাকে নাম ধরে ডাকা যেত। তিনি নাম জানেন না। এই কাজটা ভুল হয়েছে। দু'টা পিঁপড়া যখন মুখোমুখি হয় তখন তারা কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করে। বেশিরভাগ সময়ই মানুষরা এই কাজ করে না। একজন আরেকজনকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তিনি পেয়ারা বাগানের দিকে গেলেন। পেয়ারা বাগানের পরই ঘন বেতঝোপ। ছেলেটা বেতঝোপের ওপাশে যায় নি তো ?

সেখানেও তাকে পাওয়া গেল না। আকাশের মেঘ ঘন হয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। হরিচরণ ঘাটের কাছে ফিরে গেলেন। তাঁর হাতে সন্দেশ। সন্দেশ থেকে অতি মিষ্টি গন্ধ আসছে। দারুচিনির গন্ধ না-কি ? সন্দেশে গরম মসল্লা দেয়া নিষেধ। দেবীর ভোগে সন্দেশ দেয়া হয়। সেই সন্দেশ বিশুদ্ধ হতে হয়। এলাচ দারুচিনি দিয়ে বিশুদ্ধতা নষ্ট করা যায় না। তাহলে গন্ধটা কিসের ? দুধের গন্ধ ? ঘন দুধের কি আলাদা গন্ধ আছে ?

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আষাঢ় মাসের বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ভিজিয়ে দেবে। দৌড়ে ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। তিনি বৃষ্টিতে ভিজছেন। এই বয়সে বৃষ্টিতে ভেজার ফল শুভ হবে না। তারপরেও তিনি ঘাট ছাড়তে পারলেন না। তাঁর কাছে মনে হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন ছেলেটা ভিজতে ভিজতে আসছে।

মুকুন্দ কলাপাতার ঠোঙ্গায় পিঁপড়ার ডিম নিয়ে এসেছে। সে অবাক হয়ে বলল, বিষ্টিত ভিজেন ? অসুখ বাধাইবেন। ঘরে যান।

হরিচরণ বললেন, যাব একটু পরে। তুমি সন্দেশ দু'টা ঐ ছেলেটারে দিয়া আস।

কোন ছেলে?

কাঠমিস্ত্রির ছেলে। আজ আর বর্শি নিয়ে বসব না।

মুকুন্দ অনিচ্ছার সঙ্গে যাচ্ছে। ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। তার এক হাতে পিঁপড়ার ডিম অন্য হাতে সন্দেশ। মাছ ও মানুষের খাদ্য। হরিচরণ হঠাৎ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন, ডিমগুলির জন্যে তাঁর খারাপ লাগছে। এই ডিম থেকে আর কোনোদিন পিঁপড়ার জন্ম হবে না। তারা পৃথিবীর অতি আশ্চর্য রূপ-রস-গন্ধের কিছুই জানবে না। বড়ই আফসোসের কথা। তিনি কি মুকুন্দকে বলবেন ডিমগুলি যেখান থেকে এনেছে সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে? হয়তো এখনো সময় আছে। জায়গামতো পৌঁছে দিলে কিছু ডিম থেকে পিঁপড়া জন্মাবে।

মুকুন্দ অনেকদূর চলে গেছে, এখন ডাকলে সে শুনতে পাবে না। তবু তিনি ডাকলেন, মুকুন্দ! মুকুন্দ!

মুকুন্দ শুনতে পেল না। কিন্তু কেউ একজন হাসল। হরিচরণ চমকে হাসির শব্দ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য, লাল প্যান্ট পরা ছেলেটা। সে দিঘির অন্যপ্রান্তে। পাড় বেয়ে পানির দিকে নামছে। বৃষ্টির পানিতে দিঘির পাড় পিচ্ছিল হয়ে আছে। ছেলেটা কি একটা দুর্ঘটনা ঘটাবে? পা পিছলে পানিতে পড়ে যাবে? তিনি ডাকলেন, এই, এই— উঠে আস। উঠে আস বললাম। এই ছেলে, এই!

ছেলেটা তাঁকে দেখল। কিন্তু তার দৃষ্টি দিঘির সবুজ পানিতে। তার হাতে কাদামাখা পেয়ারা। সে পেয়ারা পানিতে ধুবে। তিনি উঁচু গলায় আবারো ডাকলেন, এই ছেলে— এই। তখনি ঝপ করে শব্দ হলো। কিছুক্ষণ ছেলেটির হাত পানির উপর দেখা গেল। তারপরেই সেই হাত তলিয়ে গেল। হরিচরণ পুকুরে ঝাঁপ দিলেন।

হরিচরণ কীভাবে দিঘির অন্যপ্রান্তে পৌঁছলেন, কীভাবে ছেলেটাকে পানি থেকে তুললেন তা তিনি জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন— পানি থেকে তোলার পর দেখা গেল, ছেলেটার ডানহাত অনেকখানি কেটেছে। সেখান থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে এইভাবেই রক্ত পড়ছিল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ও বাবু! বেঁচে আছিস তো! বলেই পুকুরপাড়ে জ্ঞান হারালেন।

তাঁর জ্ঞান ফিরল নিজের খাটে গভীর রাতে। তাঁর চারপাশে মানুষজন ভিড় করেছে। নেত্রকোনা সদর থেকে এলএমএফ ডাক্তার সতীশ বাবু এসেছেন।

তিনি বুকে স্টেথিসকোপ ধরে আছেন। পাশের ঘর থেকে বৃদ্ধা মায়ালতার কান্না শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধা কারণে অকারণে কাঁদে। হরিচরণ বললেন, ছেলেটা কি বেঁচে আছে?

মুকুন্দ বলল, বেঁচে আছে।

ছেলেটার নাম কী?

জহির।

জহির তাহলে বেঁচে গেছে?

জে আজ্ঞে।

হরিচরণ বললেন, ঠাকুরঘরের তালা খোল। ঘরে বাতি দাও। ঠাকুরঘরে যাব।

মুকুন্দ বিনীতভাবে বলল, সকালে যান। এখন শুয়ে থাকেন। আপনার শরীর অত্যধিক খারাপ।

ঠাকুরঘরের তালা খোল।

গভীর রাতে ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হলো। প্রদীপ জ্বালানো হলো। ছোট্ট ঘর। শ্বেতপাথরের জলচৌকিতে কষ্টিপাথরের রাধা-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বাঁশি ধরে আছেন। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে লীলাময় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রী রাধিকা।

হরিচরণ পদ্মাসন হয়ে বসলেন। মুকুন্দকে বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে আস, আমি একটু দেখব।

ঠাকুরঘরে নিয়ে আসব? কী বলেন এইসব!

হ্যাঁ, ঠাকুরঘরে নিয়ে আস। সে আমার কোলে বসবে।

মুসলমান ছেলে তো!

হোক মুসলমান ছেলে।

জহিরের মা জহিরকে কোলে নিয়ে এসেছে। সে তার সবুজ শাড়ি দিয়ে ছেলেকে ঢেকে রেখেছে। তার চোখে উদ্বেগ। বাড়িতে এত লোকজন দেখে হকচকিয়ে গেছে। হরিচরণ উঠানের জলচৌকিতে বসেছেন। তাঁর নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। শরীর ঘামছে। তিনি জহিরের মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাগো! আপনার ছেলে কি ভালো আছে?

জহিরের মা জবাব না দিয়ে ছেলেকে আরো ভালো করে শাড়ি দিয়ে ঢাকল। হরিচরণ বললেন, আমার এখানে ডাক্তার আছে। ছেলেকে দেন, ডাক্তার দেখুক।

আমার ছেলে ভালো আছে।

হরিচরণ মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনেও মুগ্ধ হলেন। কী সুরেলা কণ্ঠ! ঈশ্বর যার প্রতি করুণা করেন সর্ব বিষয়েই করেন। মেয়েটি খালি পায়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। হরিচরণের মনে হলো, মেয়েটির পায়ের কারণেই উঠান ঝলমল করছে। এত রূপবতী কেউ কি এর আগে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে?

মাগো! আপনার ছেলেকে আমার কোলে দেন। আপনার ছেলে কোলে নিয়ে আমি একটা প্রার্থনা করব।

হরিচরণ ঠাকুরঘরে বসে আছেন। তাঁর কোলে জহির। জহির ঘুমাচ্ছে। শান্তির ঘুম। হরিচরণ হাতজোড় করে বললেন, হে পরম পিতা। হে দয়াময়। আজ রাতে আমি তোমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করতে চাই। আমি আমার এক জীবনে যা উপার্জন করেছি, সবই জনহিতকর কার্যে দান করব। আমি যেন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি এইটুকু শুধু তুমি দেখবে। আমি পৃথিবীতে নগ্ন অবস্থায় এসেছিলাম, পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বিদায় নিব।

হরিচরণের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

পরদিন সকালেই একটি মুসলমান ছেলেকে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করানোর অপরাধে হরিচরণকে সমাজচ্যুত করা হলো। সোনাদিয়ার জমিদার শশাংক পালের বৈঠকখানায় সমাজপতিদের বৈঠক বসল। বৈঠকের প্রধান বক্তা ন্যায়রত্ন রামনিধি চট্টোপাধ্যায়। তিনি শাস্ত্র ভালো জানেন। তাঁকে আনা হয়েছে শ্যামগঞ্জ থেকে। শশাংক পাল ঘোড়া পাঠিয়ে আনিয়েছেন। ধর্মবিষয়ক অনাচার তিনি নিতেই পারেন না। ন্যায়রত্ন রামনিধি চট্টোপাধ্যায় কঠিন কঠিন কথা বললেন। মহাভারতের কিছু কাহিনীও বললেন যার সঙ্গে হরিচরণের সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই। সুশোভনার গর্ভে পরিক্ষীতের তিন পুত্র— শল, দল এবং বলের গল্প। শল রাজা হয়েছেন, তিনি ব্রাহ্মণ বামদেবের কাছ থেকে দুই ঘোড়া ধার হিসেবে নিয়ে এসেছেন হরিণ শিকারের জন্যে। হরিণ শিকার হলো কিন্তু রাজা শল দুই ঘোড়া ফেরত পাঠালেন না। বামদেব যখন ঘোড়া ফেরত চাইলেন, তখন রাজা শল বললেন, আপনার ঘোড়ার প্রয়োজন কী? বেদই তো আপনার বাহন।

গল্প শেষ করে ন্যায়রত্ন কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে চোখ খুলে বললেন, হরিচরণের সর্বনিম্ন শাস্তি সমাজচ্যুতি।

অম্বিকা ভট্টাচার্য ক্ষীণস্বরে প্রায়শ্চিত্যের কথা বলে ধমক খেলেন।

ন্যায়রত্ন বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি পূজারি বামুন শাস্ত্র জানো না বলে প্রায়শ্চিত্যের কথা বললা। ঠাকুরঘর যে অপবিত্র করেছে তার আবার প্রায়শ্চিত্য কী?

অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, ঠিক ঠিক। এই বিষয়টা মাথায় ছিল না।

ন্যায়রত্ন রামনিধি বললেন,

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥

অম্বিকা ভট্টাচার্য আবারো বললেন, ঠিক ঠিক।

ন্যায়রত্ন রামনিধি বললেন, ব্যাখ্যা করব?

অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, আমি প্রয়োজন দেখি না। বিধান শুধু বলে দেন।

ন্যায়রত্ন রামনিধি বললেন, বিধান আগে একবার বলেছি। আরেকবার বলি। বিধান হলো, হরিচরণ সমাজচ্যুত। হরিচরণের সঙ্গে যারা বাস করে তারাও সমাজচ্যুত। তবে তাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্যের সুযোগ আছে। তারা টাটকা গোবর ভক্ষণ করে এবং সাধ্যমতো দান করে শুদ্ধ হতে পারে। অন্যথায় তাদের সবার জন্য ধোপা-নাপিত বন্ধ। সামাজিক আচার বন্ধ।

হরিচরণ হতাশ চোখে তাকিয়ে আছেন। হরিচরণের পেছনে হাতজোড় করে মুকন্দ দাঁড়িয়ে আছে। সে সামান্য কাঁপছে। তার চোখ ভেজা। মুকন্দের শব্দ করে কাঁদার ইচ্ছা। সে ভয়ে কাঁদতে পারছে না। ন্যায়রত্ন বললেন, হরিচরণ, তুমি কিছু বলতে চাও?

হরিচরণ না-সূচক মাথা নাড়লেন।

অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, হরিচরণের ঘরে রাধা-কৃষ্ণ আছে। ঠাকুর পূজা হয়। এর কী বিধান?

ন্যায়রত্ন বললেন, মূর্তি সরিয়ে নিতে হবে। গাভী যদি থাকে গাভী নিয়ে নিতে হবে। সে গাভী সেবা করতে পারবে না।

হরিচরণ বললেন, অন্য জাতের মানুষও গাভী পালন করে। আমার জাত গিয়েছে, আমি গাভী পালন করতে পারব না কেন?

শশাংক পাল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, ভালো যুক্তি। অতি উত্তম যুক্তি।

ন্যায়রত্ন বললেন, ধর্ম যুক্তিতে চলে না। ধর্ম চলে বিশ্বাসে। ধর্মের সপ্ত বাহনের এক বাহন বিশ্বাস।

শশাংক পাল বললেন, এইটাও ভালো যুক্তি।

ন্যায়রত্ন বললেন, ধর্ম থেকে যে পতিত তার স্থান পাতালের রসাতলে। পাতালের সাত স্তর, যেমন— অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। রসাতল হলো পাতালের ষষ্ঠ তল। এই তলে যে পতিত, তার গতি নাই।

হরিচরণ বললেন, পাতালের সপ্তম তলে কার স্থান?

মাতৃহন্তার স্থান। যাই হোক, তোমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় আমি যাব না। আমার বিধান আমি দিলাম। তুমি ধনবান ব্যক্তি। প্রয়োজনে কাশি থেকে নতুন বিধান নিয়া আসতে পার।

হরিচরণ বললেন, আমি কোনো বিধান আনব না। আপনার বিধান শিরোধার্য।

শশাংক পাল হুঁকোয় লম্বা টান দিয়ে বললেন, যাগযজ্ঞ করে কিছু করা যায় না? সপ্তাহব্যাপী যাগযজ্ঞ, নাম সংকীর্তন। হরিচরণ বিত্তবান। সে পারবে।

ন্যায়রত্ন কঠিন গলায় বললেন, না। এই বিষয়ে বাক্যালাপে সময় নষ্ট করা অর্থহীন।

শশাংক পাল বললেন, এটাও ঠিক কথা। তুচ্ছ বিষয়ে সময় হরণ।

হরিচরণ জাতিচ্যুত হলেন সকালে। দুপুরের মধ্যে তাঁর ঘর জনশূন্য হয়ে গেল। মুকন্দ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় হলো। তাকে তিনি দুটো দুধের গাই দিয়ে দিলেন। রান্নাবান্নার জন্যে যে মৈথিলি ঠাকুর ছিল, সে চুলা ভেঙে চলে গেল। নিয়ম রক্ষা করল। পতিতজনের ঘরের চুলা ভেঙে দেয়া নিয়ম। যে-কোনো একটা ঘরের চালাও তুলে ফেলতে হয়। আত্মীয়স্বজনরা সেই চালা মাড়িয়ে চলে যাবে। হরিচরণের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই বলে চালা ভাঙা হলো না।

বৃদ্ধা মায়ালতাকে সন্ধ্যার মধ্যে তিনি নৌকায় কাশি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মায়ালতা সঙ্গে করে কষ্টিপাথরের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি নিয়ে গেলেন। বিদায়ের সময় হরিচরণ জেঠিমা'কে শেষ প্রণাম করতে গেলেন। মায়ালতা আঁৎকে উঠে বললেন, খবরদার পায়ে হাত দিবি না। তুই ডুবছস, আমারে ডুবাইস না। মায়ালতার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে হরিচরণের বিশাল বাড়ি হঠাৎ খালি হয়ে গেল।

সন্ধ্যা মিলাতে না মিলাতেই বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস। হরিচরণ পাকা দালানের একপাশে বেতের ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বৃষ্টি

দেখছেন। তামাক খেতে ইচ্ছা করছে, তামাক সাজাবার কেউ নেই। তামাক নিজেকেই সাজাতে হবে। ঘর অন্ধকার। সন্ধ্যার বাতি জ্বালানো প্রয়োজন। কোথায় হারিকেন কোথায় কেরোসিন তিনি কিছুই জানেন না।

বাড়ির পেছনে ছপছপ শব্দ হচ্ছে। ভূত-প্রেত কি-না কে বলবে! ভূত-প্রেতরা শূন্যবাড়ির দখল নিয়ে নেয়— এমন জনশ্রুতি আছে। হাসনাহেনার ঝোপের কাছে সরসর শব্দ হচ্ছে। সাপ বের হয়েছে না-কি? শূন্যবাড়িতে ভূত প্রেতের সঙ্গে সাপও ঢোকে। বাড়ি পুরোপুরি জনশূন্য হলে আসে বাদুড়। তারা মহানন্দে বাড়ির কড়ি বর্গা ধরে মাথা ঝুলিয়ে দুলতে থাকে। যে বাড়িতে সাপ ও বাদুর সহবাস করে সেই বাড়ির মেঝে ফুঁড়ে অশ্বত্থ গাছের চারা বের হয়। বাড়িও তখন হয় পতিত।

মানুষের যেমন প্রাণ আছে, বসতবাড়িরও আছে। পতিতবাড়ি হলো প্রাণশূন্য বাড়ি।

ঢং করে কাঁসার পাত্র রাখার শব্দ হলো। হরিচরণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন। চোখ মেলে চমৎকৃত হলেন। জহিরের মা ঘোমটা দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিতে সে পুরোপুরি ভিজে গেছে। সে এখনো দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টিতেই। বৃষ্টিতে ভিজে মনে হয় মজা পাচ্ছে। জুলেখা কাঁসার থালাভর্তি করে খাবার এনেছে। চিড়া, নারিকেল কোড়া, এক গ্লাস দুধ এবং দুটা কলা। হরিচরণ বললেন, মাগো আজ আমি কিছু খাব না। উপাস দিব।

জুলেখা স্পষ্ট গলায় বলল, আপনি না খেলে আমিও খাব না। আমি এইখানে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়ায়ে থাকব।

হরিচরণ হাত বাড়িয়ে দুধের গ্লাস নিলেন।

জুলেখা বলল, ঘর অন্ধকার। বাতি দিতে হবে। হারিকেন কোন ঘরে?

হরিচরণ বললেন, কিছুই তো জানি না।

আপনার সঙ্গে কি কেউ নাই?

না।

আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সব কাজকর্ম কইরা দিব।

প্রয়োজন নাই। তুমি মেয়েমানুষ— এখানে যদি আসো, লোকে নানান কথা বলবে।

আপনি আমারে মা ডেকেছেন। মা ছেলের কাছে আসবে, এতে দোষ নাই।

তোমার ছেলে কোথায়?

ছেলে বাপের সাথে বিরামদি হাটে গেছে। রবারের জুতা কিনবে।

জুলেখা অন্ধকার ঘরে হারিকেন খুঁজছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘর যাচ্ছে। এমনভাবে যাচ্ছে যেন এটা তার নিজের বাড়িঘর। মেয়েটা আবার গুনগুন করে গানও করছে—

কে বা রান্ধে
কে বা বাড়ে
কে বা বসে খায়।
কাহার সঙ্গে শুইয়া থাকলে
কে বা নিদ্রা যায়?

মনায় রান্ধে
তনায় বাড়ে
আতস বসে খায়
সাধুর সঙ্গে শুইয়া থাকলে
সুখে নিদ্রা যায়।।

কী মিষ্টি মেয়েটার গলা! যেন সোনালি বর্ণের কাঁচা মধু ঝরে ঝরে পড়ছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। শত শত জোনাকি বের হয়েছে। ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। শিউলি গাছ জোনাকিতে ঢেকে গেছে। তারা একসঙ্গে জ্বলছে, একসঙ্গে নিভছে। কী মধুর দৃশ্য! হরিচরণের হঠাৎ তার মেয়ের কথা মনে পড়ল। মেয়েটা বেঁচে থাকলে কত বড় হতো? সে দেখতে কেমন হতো? চেহারা মনে পড়ছে না। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল ছিল এটা মনে পড়ছে। কোঁকড়া চুল অলক্ষণ। কারণ দেবী অলক্ষীর মাথায় চুল ছিল কোঁকড়া। তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে অনেকবার বলেছেন— শৈশবের কোঁকড়া চুল বয়সকালে থাকে না। মেয়েটা জীবিত থাকলে এতদিনে নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে যেত। বাবার দুঃসংবাদ শুনে সে কি ছুটে আসত? না-কি তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে আটকে দিত? শাস্ত্র বিধান কী বলে? পতিত পিতার সন্তানরাও কি পতিত?

বাবা! আমি যাই?

হরিচরণ চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তাঁর মনে ভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। মনে হয়েছিল শিউলি কথা বলছে।

দাঁড়িয়ে আছে জুলেখা। তার মুখ হাসি হাসি। সে হারিকেন খুঁজে পেয়েছে। তিনটা ঘরে হারিকেন জ্বলছে। শুধু বারান্দায় আলো দেয়া হয় নি। হরিচরণ বললেন, গান কোথায় শিখেছ মা ?

জুলেখা লজ্জিত গলায় বলল, বাপজানের কাছে। আমার বাপজান বাউল। উনি মালজোড়া গান করেন।

মালজোড়া গান কী ?

প্রশ্ন-উত্তর। এক বাউল প্রশ্ন করে আরেকজন উত্তর দেয়। মালজোড়া গানে আমার বাপজানের সাথে কেউ পারত না।

উনি কি মারা গেছেন ?

জে না। বাড়ি থাইকা পালায়া কোথায় জানি গেছে, আর আসে নাই। দশ বছর হইছে। মনে হয় বিয়াশাদি কইরা নয়া সংসার পাতছে।

জুলেখা খিলখিল করে হাসছে যেন বাবার নতুন সংসার পাতা আনন্দময় কোনো ঘটনা।

হরিচরণ বললেন, মাগো! তোমার কণ্ঠস্বর অতি মনোহর। একদিন এসে আমারে গান শুনাবে।

জুলেখা নিচু হয়ে হরিচরণকে কদমবুসি করল।

সময় ১৯০৫। তখন ময়মনসিংহ জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খাজা সলিমুল্লাহ (ঢাকার নবাব)। ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের অধীন। ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তখন লর্ড কার্জন। তিনি বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী আসাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী নিয়ে হবে পূর্ববঙ্গ। ঢাকা হবে রাজধানী, চট্টগ্রাম বিকল্প রাজধানী। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ ফুঁসে উঠে। বাংলা ভাগ করা যাবে না।

ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হবে— এটিও হিন্দুসমাজ নিতে পারছিল না। পূর্ব বাংলা চাষার দেশ, তারা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী করবে ?

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তখন বাড়ছে। সেই বিরোধ মেটাবার জন্যে অনেকেই এগিয়ে আসছেন। সেই অনেকের মধ্যে একজন হলেন ঠাকুরবাড়ির এক কবি, নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান করলেন। সবাই সবার হাতে রাখি বেঁধে দেবে। কারো মধ্যে কোনো হিংসা-দ্বেষ থাকবে না।

রাশিয়ায় তখন জারতন্ত্র। শেষ জার নিকোলাই আছেন ক্ষমতায়। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। লেনিন জার্মানিতে। তিনি তখনো রাশিয়ায় পৌঁছেন নি। ম্যাক্সিম গোর্কি নামের এক মহান লেখক একটা উপন্যাসে হাত দিয়েছেন। উপন্যাসের নাম 'মা'।

সেইসময়ে ইউরোপের অবস্থাটা একটু দেখি। সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে বাইশ বছর বয়সি এক পেটেন্ট অফিসের কেরানি পদার্থবিদ্যার উপর তিন পাতার এক প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন— Annals of Physics-এ। আলো সম্পর্কে তার নিজের চিন্তাধারা প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে। প্রবন্ধটি পড়ার পর জার্নালের সম্পাদক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কস প্ল্যাংক মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারছেন পদার্থবিদ্যার এতদিনকার সব চিন্তাভাবনার অবসান হতে যাচ্ছে। আসছে নতুন চিন্তা। শুদ্ধতম চিন্তা। বাইশ বছর বয়সি পেটেন্ট ক্লার্কের নাম আলবার্ট আইনস্টাইন।

গ্রামের নাম বান্ধবপুর। পাশের গ্রাম সোনাদিয়া। উত্তরে গারো পাহাড়। পরিষ্কার কুয়াশামুক্ত দিনে উত্তরের দিগন্তরেখায় নীল গারো পাহাড় ঝলমল করে। দু'গ্রামের মাঝখানে মাধাই খাল। এই খাল বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে নদী। মাধাই খাল সোহাগগঞ্জ বাজারে এসে পড়েছে বড়গাঙে। বড়গাঙের অবস্থা বর্ষাকালে ভয়াবহ। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না এমন। লঞ্চ-স্টিমার যাতায়াত করে। সোহাগগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ হয়ে কোলকাতা।

বান্ধবপুর অতি জঙ্গলা জায়গা। প্রতিটি বসতবাড়ির চারপাশে ঘন বন। এমন ঘন যে দিনমানে সূর্যের আলো ঢোকে না। শিয়াল বাঘডাশারা মনের আনন্দে ঘোরে। মুরগি চুরিতে এরা বিরাট ওস্তাদ। হঠাৎ হঠাৎ বাঘ দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এইসব বাঘের নাম 'আসামি বাঘ'। এরা বর্ষার পানির তোড়ে আসামের জঙ্গল থেকে নেমে এসে জঙ্গলে স্থায়ী হয়। গৃহস্থের গরু-ছাগল খেয়ে ফেলে।

আসামি বাঘের সন্ধান পাওয়া গেলে নিস্তরঙ্গ বান্ধবপুরে হৈচৈ শুরু হয়। সোনাদিয়া জমিদার বাড়িতে খবর চলে যায়। জমিদার বাবু শশাংক পাল হাতির পিঠে চড়ে মাধাই খাল পার হয়ে বান্ধবপুর উপস্থিত হন। তাঁর হাতে দোনলা উইনস্টন বন্দুক। বাঘমারার অনেক কায়দাকানুন করা হয়। জঙ্গল ঘেরাও দেয়া হয়। ঢাকঢোল বাজানো হয়। বাবু শশাংক পাল হাতির পিঠে থেকেই আকাশের দিকে কয়েকবার ফাঁকা গুলি করেন। বাঘ মারা পড়ে না। অন্য কোনো জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। শশাংক পাল হাতির পিঠে করে ফিরে যান। তাঁকে বড়ই আনন্দিত মনে হয়।

বান্ধবপুর পুরোপুরি হিন্দু গ্রাম। সন্ধ্যায় পুরো অঞ্চলে একসঙ্গে উলুধ্বনি উঠে। শাঁখ বাজানো হয়। প্রতিটি সম্পন্ন বাড়িতে নিত্যপূজা হয়। দু'টা কালীমন্দির আছে। একটার নাম বটকালি মন্দির। গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে বটগাছের সঙ্গে লাগানো। বিশাল বটবৃক্ষ এক মন্দিরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে গাছটাকেও মন্দিরের অংশ মনে হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে আয়োজন করে বটকালি মন্দিরে কালীপূজা হয়। পূজার শেষে পাঠা বলি।

বান্ধবপুরে অল্প কয়েকঘর মাত্র মুসলমান। এদের জমিজমা নেই বললেই হয়। বাবুদের বাড়িতে জন খাটে। অনেকেই বাজারে কুলির কাজ করে। কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে মালামাল আনা-নেয়া করে। জুম্মাবারে মাথায় টুপি পরে জুম্মাঘরে উপস্থিত হয়। দোয়াকালাম এরা কিছুই জানে না। জানার আগ্রহ বা উপায়ও নেই। তবে শুক্রবারে গম্ভীর মুখে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টা তাদের মাথায় ঢুকে আছে। তারা মাওলানা সাহেবের খুতবা পাঠ অতি আগ্রহের সঙ্গে শোনে। নামাজ শেষে শিন্নির ব্যবস্থা থাকলে অতি আদবের সঙ্গে কলাপাতায় শিন্নি নেয়। বিসমিল্লাহ্ বলে মুখে দেয়।

বান্ধবপুরে জুম্মাঘর শাল্লার দশআনি জমিদার নেয়ামত হোসেনের বানিয়ে দেয়া। জুম্মাঘরের মাওলানার জন্যে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিও তিনি ঠিক করেছেন। মাওলানার নাম ইদরিস। বাড়ি ফরিদপুরে। মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিতে তার ভালোই চলে যায়। মুসলমান গৃহস্থ বাড়ি থেকে তাকে ধান দেয়া হয়। যে-কোনো ভালো রান্না হলে তাকে আগে পাঠানো হয়। বিয়েশাদি হলে মাওলানার জন্যে বিশেষ বরাদ্দ থাকে— তবন (লুঙ্গি), পাঞ্জাবি, টুপি, ছাতা।

মাওলানা ইদরিসের সর্বমোট নয়টা ছাতা বর্তমানে আছে। প্রায়ই ভাবেন বুধবার হাঁটে গিয়ে একটা ভালো ছাতা রেখে বাকিগুলি বিক্রি করে আসবেন। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না। লোকজন তাকে ভালোবেসে ছাতা দিয়েছে, সেই ছাতা কীভাবে বিক্রি করবেন! ইদরিস মাওলানার বয়স ত্রিশ। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। সাধারণের চেয়ে লম্বা। মাথায় সবসময় পাগড়ি পরেন বলে আরো লম্বা লাগে। নিজের ঘরে তিনি লুঙ্গি-গেঞ্জি পরলেও বাইরে লেবাসের পরিবর্তন হয়। চোস্ত পায়জামা, ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি, চোখে সুরমা, পাগড়ি এবং দাড়িতে সামান্য আতর। দাড়িতে আতর দেয়া সুন্নত। নবিজি দাড়িতে আতর দিতেন।

জুম্মাঘরের বারান্দায় রাখা বেঞ্চে মাওলানা ইদরিস বসে আছেন। তার সামনে কাঠমিস্ত্রি সুলেমান ছেলেকে নিয়ে বসা। ছেলে বসে থাকতে পারছে না। ছটফট করছে। সুলেমান এক হাতে ছেলেকে শক্ত করে ধরে আছে।

মাওলানা ইদরিস বললেন, ছেলের নাম কী?

সুলেমান বলল, জহির।

জহিরের সাথে আর কিছু নাই?

সুলেমান বলল, জে আজ্ঞে, না।

মাওলানা বললেন, আজ্ঞে বলতেছ কেন? কথায় কথায় জে আজ্ঞে বলা হিন্দুয়ানি। হিন্দুয়ানি দূর করা লাগবে। বলো জে-না।

সুলেমান বলল, জে-না।

মাওলানা বললেন, ছেলের নাম রেখেছ জহির। এটা তো হবে না। জহির আল্লাহপাকের ৯৯ নামের এক নাম। এর অর্থ জাহির হওয়া। আল যাহিরু। নাম বদলাতে হবে। এখন থেকে নাম আব্দুল জহির। এর অর্থ জহিরের গোলাম। অর্থাৎ আল্লাহপাকের গোলাম। বুঝেছ ?

জি বুঝেছি। এখন ছেলেকে একটা তাবিজ দিয়া দেন। অতি দুষ্ট ছেলে। বনে জঙ্গলে ঘুরে। হরিবাবুর দিঘিতে মরতে বসেছিল। হরিবাবু ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। ছেলেরে বাঁচালেন। উনার জন্যে ছেলের জীবন রক্ষা হয়েছে।

মাওলানা ইদরিস বিরক্ত হয়ে বললেন, হরিবাবু তোমার ছেলেকে বাঁচানোর কে ? তাকে বাঁচিয়েছেন আল্লাহপাক। মানুষের জীবনের মালিক উনি ভিন্ন কেউ না। বুঝেছ ? হায়াত, মউত, রেজেক, ধনদৌলত এবং বিবাহ এই পাঁচটা বিষয় আল্লাহপাক নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। এই বিষয় মনে রাখবা।

সুলেমান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মাওলানা বললেন, তাবিজ লিখে রাখব, একসময় এসে নিয়ে যাবে।

জে আজ্ঞে।

আবার জে আজ্ঞে ?

অভ্যাস হয়ে গেছে, কী করব ?

অভ্যাস বদলাতে হবে। ধুতি পরা ছাড়তে হবে। ধুতি হিন্দুর পোশাক। মুসলমানের লেবাস হবে নবিজির লেবাস।

সুলেমান বিড়বিড় করে বলল, এখন আমি যদি পাগড়ি পরে ঘুরি, লোকে কী বলবে ?

মাওলানা বললেন, তোমাকে তো পাগড়ি পরতে বলতেছি না। ধুতি পরতে নিষেধ করতেছি। আর যদি পরতেই হয় লুঙ্গির মতো পরবা। এতে দোষ খানিকটা কাটা যায়।

ছেলের মায়ের জন্যে কি একটা তাবিজ দিবেন ?

তার কী সমস্যা ?

জঙ্গলে ঘুরে। নিজের মনে গীত গায়।

নামাজ রোজা কি করে ?

রোজা করে। নামাজের ঠিক নাই।

নামাজ ছাড়া রোজা আর নৌকা ছাড়া মাঝি একই বিষয়। তারে নামাজ পড়তে বলবা।

জি বলব। সুন্দরী মেয়েছেলে, তার উপরে জিনের নজর পড়ছে কি-না এইটা নিয়া আমি চিন্তিত।

জিনের নজর পড়া বিচিত্র না। তাবিজ লেইখা দিব, চিন্তা করবা না।

সুলেমান উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় বেঞ্চে একটা একআনি রাখল। এমনভাবে রাখল যেন মাওলানার চোখে না পড়ে। মাওলানা সাহেবকে দেখিয়ে নজরানা দেয়া বেয়াদবি, আবার কোনো নজরানা না দিয়ে চলে আসাও বেয়াদবি।

মাওলানা ইদরিস সুলেমান চলে যাওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তার ডানপাশে জুম্মাঘর। নিজের একটা জায়গা। অতি আপন। তাকালেই শান্তি শান্তি লাগে। জুম্মাঘরের অবস্থা ভালো না। টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। একটা দরজা উঁইপোকা পুরোপুরি খেয়ে ফেলেছে। বাঁশের দরমা দিয়ে ভাঙা দরজা বন্ধ করতে হয়। মিম্বার ভেঙে গেছে। খুতবা আগে মিম্বারে দাঁড়িয়ে পড়তেন, এখন মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়েন। অথচ রসুলে করিম মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করতেন। মুসুল্লিদের অজুর ব্যবস্থা নাই। মসজিদের পাশে ডোবার মতো আছে, ডোবায় পাট পচানো হয়, সেখানে অজু করা সম্ভব না। সবচে' ভালো হতো একটা চাপকলের ব্যবস্থা করলে। কে ব্যবস্থা করবে? মাওলানা ইদরিস দশআনির জমিদার নেয়ামত হোসেনের কাছে গিয়েছিলেন। নেয়ামত হোসেন রাগী গলায় বললেন, মসজিদ করে দিয়েছি, বাকি দেখভাল আপনারা করবেন। চাঁদা তুলে করবেন। আমি টাকার গাছ লাগাই নাই। প্রয়োজন হলেই গাছ ঝাড়া দিব আর টুপটুপাইয়া টাকা পড়বে। চান্দা তুলেন, চান্দা।

চাঁদা দেয়ার কোনো মানুষ নাই— এটা বলার আগেই নেয়ামত হোসেন উঠে পড়লেন। সন্ধ্যার পর তিনি বেশিক্ষণ বাইরের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন না। সম্প্রতি তিনি লখনৌ থেকে পেয়ারীবালা নামের এক বাইজি এনেছেন। সন্ধ্যা থেকে নিশি রাত পর্যন্ত তার সঙ্গে সময় কাটান। এটা নিয়ে কেউ কিছু মনে করে না। জমিদার শ্রেণীর মানুষদের বিলাস ত্রুটির মধ্যে পড়ে না। তারা আমোদ ফূর্তি করবে না তো কে করবে?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মাওলানা ইদরিস বদনায় রাখা পানি দিয়ে অজু করে আযান দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন কেউ আসে কি-না। কেউ এলো না। তিনি মোমবাতি জ্বালিয়ে একাই নামাজ পড়লেন। সালাম ফেরাবার সময় বাতাসে মোমবাতি নিভে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তার বুক ধ্বক করে উঠল। নির্জন মসজিদে জিন নামাজ পড়তে আসে। ইমাম নামাজ পড়াতে ভুল করলে তারা বড় বিরক্ত হয়। চড়থাপ্পড় মারে।

জিনের চেয়েও বেশি ভয় ইবলিশ শয়তানকে। মসজিদের আশেপাশেই এদের চলাচল বেশি। মুসল্লিরা নামাজ শেষ করে বাড়ি যাওয়ার পথে তারা পিছু নেয়। ভয় দেখায়, ক্ষতি করতে চেষ্টা করে।

তিনি কয়েকবার ইবলিশ শয়তানের হাতে পড়েছেন। প্রতিবারই আয়াতুল কুরসি পড়ে উদ্ধার পেয়েছেন। সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত মাসে। এশার নামাজ শেষ করে হারিকেন হাতে বাড়ি ফিরছেন। ফকফকা চাঁদের আলো। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠতে যাবেন, হঠাৎ তার চারদিকে ঢিল পড়তে লাগল। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার ডানদিকে বিশাল বিশাল শিমুল গাছ। বাতাস নেই কিছু নেই, হঠাৎ শুধু একটা শিমুল গাছের ডাল নড়তে লাগল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে একমনে আয়াতুল কুরসি পড়তে শুরু করলেন। আয়াতুল কুরসি একবার শেষ করেন, দু'হাতে শব্দ করে তালি দেন। আবার পড়েন আবার তালি দেন। আয়াতুল কুরসির মরতবা হলো, এই দোয়া পড়ে হাততালি দিলে যতদূর হাততালির শব্দ যায় ততদূর পর্যন্ত খারাপ জিন থাকতে পারে না। আয়াতুল কুরসির এত বড় ফজিলতের কারণ, এই আয়াতে আল্লাহপাকের এমন সব গুণের বর্ণনা আছে যা মানুষের বোধের অগম্য।

তিনবার আয়াতুল কুরসি পাঠ করে মাওলানা চোখ মেললেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। শিমুল গাছের পাতা নড়ছে না। কটু একটা গন্ধ চারদিকে ছড়ানো। নাক জ্বালা করে এমন গন্ধ।

মাগরেবের নামাজ থেকে এশার নামাজের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান অল্প। ঘণ্টাখানিক। এই এক ঘণ্টার জন্যে বাড়ি যাওয়া অর্থহীন। মাওলানা মসজিদেই থাকেন। তার ভয় ভয় লাগে। বনের মাঝখানে মসজিদ। সন্ধ্যার পর থেকে বনের ভেতর নানান ধরনের শব্দ উঠে। কোনোটা পাখির শব্দ, কোনোটা জন্তু জানোয়ারের, আবার কিছু কিছু শব্দ আছে সম্পূর্ণ অন্যরকম। হুম হুম করে এক ধরনের শব্দ মাঝে মাঝে আসে। এই শব্দের সঙ্গে কোনো শব্দের মিল নেই। শব্দ শুনলেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ভয় কাটানোর জন্যে মাওলানা কোরান পাঠ করেন। তিনি ইদানীং শুরু করেছেন কোরান মজিদ মুখস্থ করা। একটা বয়সের পর মুখস্থশক্তি কমে যায়। একই জিনিস বারবার পড়ার পরেও মনে থাকে না। এই সমস্যা তার হচ্ছে। তিনি হাল ছাড়ছেন না। কিছুই বলা যায় না, আল্লাহপাক অনুগ্রহ করতেও পারেন। দেখা যাবে তিনি কোরানে হাফেজ হয়েছেন। সহজ ব্যাপার না। আল্লাহর কথা শরীরে ধারণ করা বিরাট বিষয়। সাধারণ মানুষের শরীর কবর দেয়ার পর পঁচে গলে যায়। কোরানে হাফেজের শরীর পঁচে না।

মাওলানা এশার নামাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে হাতির গলার ঘণ্টার আওয়াজ পেলেন। সোনাদিয়ার জমিদার শশাংক পালের হাতির গলার রূপার ঘণ্টা। অতি মধুর আওয়াজ। তিনি শুনেছেন সোনাদিয়ার জমিদার আরেকটা হাতি কিনেছেন। মাদি হাতি। এখন তিনি দুই হাতি পাশাপাশি নিয়ে চলেন। মাদি হাতিটা থাকে সামনে, পুরুষটা পিছনে। এরা যখন থেমে থাকে তখন না-কি পুরুষ এবং মেয়ে হাতি শুঁড় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চয়ই খুব মধুর দৃশ্য। তিনি এখনো দেখেন নি। একবার সোনাদিয়ায় যাবেন। দেখে আসবেন।

হাতি নিয়ে কোরান মজিদে একটা সূরা আছে। সূরা ফিল। মাওলানা মনে মনে সূরা আবৃত্তি করে তার বঙ্গানুবাদ করলেন। তাঁর ভালো লাগল।

> আলাম তারা কাইফা ফা'আ'লা রাব্বুকা বিআছহবিল ফীল।
> হস্তিবাহিনীর সাথে তোমার প্রভু কীরূপ আচরণ করলেন
> তাহা কি তুমি লক্ষ কর নাই?
>
> আলাম ইয়াজআ'ল কাইদাহুম ফী-তাদলীল।
> তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন নাই?

জঙ্গলের পথ ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠেই মাওলানা শশাংক পালের দেখা পেলেন। হাতির পিঠে শশাংক পাল বসে আছেন। হাতির গায়ের রঙ অন্ধকারে মিশে গেছে। মাওলানা ইদরিসের মনে হলো, জমিদার শশাংক পাল শূন্যের উপর বসে আছেন।

মাওলানা ইদরিস বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আদাব। বিধর্মীকে আসসালামু আলায়কুম বলা নিষেধ। তাদের বেলায় আদাব। আদাব শব্দের অর্থ আছে কি-না তিনি জানেন না।

শশাংক পাল বললেন, কে?

মাওলানা বললেন, জনাব আমার নাম ইদরিস। আমি জুম্মাঘরের ইমাম।

আমার অঞ্চলে গরু কাটা নিষেধ এটা জানো তো?

জি জনাব জানি।

নিষেধ জেনেও অনেকে গরু কাটে। গভীর জঙ্গলের ভেতর এই কাজ করে মাংস ভাগাভাগি করে। এরকম সংবাদ যদি পাও আমাকে জানাবে। আমি ব্যবস্থা নিব। ভালো কথা, হরিচরণ মুসলমান হয়েছে এরকম একটা খবর পেয়েছি। খবরটা কি সত্য?

সত্য না, জনাব।

আচ্ছা, ঠিক আছে। পথ ছাড়, আমি যাব।

মাওলানা পথ ছেড়ে রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আরো দূরে সরে গেলেন।

শশাংক পাল হাতি নিয়ে হরিচরণের বাড়িতে এসেছেন। হাতি দু'টাই সঙ্গে এনেছেন। শশাংক পালের সঙ্গে তাঁর এস্টেটের দুই ম্যানেজার এসেছেন। একজন হুঁকোবরদার এসেছে। পান বান্দেস একজন এসেছে। তার কাজ নানান মসলা দিয়ে পান বানানো। শশাংক পালের তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে। অন্যের হুঁকোয় তিনি তামাক খান না।

শশাংক পালের বয়স চল্লিশ। শরীরের উপর নানান অত্যাচারের কারণে বয়স অনেক বেশি দেখায়। চেহারায় বালকভাব আছে, তবে চোখ জ্যোতিহীন। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে হাতকাঁপা রোগ হয়েছে। গাছের পাতা কাঁপার মতো হাতের আঙুল প্রায়ই থরথর করে কাঁপে। শশাংক পাল এই কারণেই শীত-গ্রীষ্ম সবসময় মখমলের চাদরে শরীর ঢেকে রাখেন।

হরিচরণ জমিদার বাবুকে অতি যত্নে বৈঠকখানায় বসিয়েছেন। তাকে তামাক দেয়া হয়েছে। একজন পাখাবরদার পেছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছে। এত বড় জমিদার হঠাৎ তার বাড়িতে কেন এই কারণ হরিচরণ ধরতে পারছেন না। একটা অনুমান তিনি অবশ্যি করছেন— ব্রিটিশরাজকে খাজনা দেবার তারিখ এসে গেছে। শশাংক পাল হয়তো খাজনার পুরো টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। খাজনা জমা দেবার সময়ই শুধু জমিদাররা ধনবানদের খাতির করেন।

হরিচরণ!

জে আজ্ঞে।

নতুন হাতি খরিদ করেছি। গৌরীপুরের মহারাজার কাছ থেকে কিনলাম। তিনি কিছুতেই বিক্রি করবেন না। মহারাজা বললেন, আমি কি হাতি বেচাকেনার ব্যবসা করি ? তোমার হাতি পছন্দ হয়েছে নিয়ে যাও, কিছু দিতে হবে না। আমি বললাম, ঐটা হবে না। নগদ আট হাজার টাকা উনার খাজাঞ্চির কাছে জমা দিয়ে হাতি নিয়ে চলে এসেছি। ভালো করেছি না ?

হরিচরণ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হাতির নাম রেখেছি বং। পুরুষটার নাম চং, মাদিটার নাম বং। দুইজনে মিলে বংচং। হা হা হা। ভালো করেছি না ?

জে আজ্ঞে, ভালো।

শশাংক পাল গলা নামিয়ে বললেন, এখন মূল কথায় আসি। হঠাৎ হাতি কেনার কারণে আমি কিঞ্চিৎ অর্থসংকটে পড়েছি। আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে খাজনা পৌছতে হবে। পাঁচ হাজার টাকার সমস্যা। টাকাটা দিতে পারবে ?

হরিচরণ মুখ খোলার আগেই শশাংক পাল বললেন, আমি জিনিস বন্ধক রেখে টাকা নিব। বং থাকবে তোমার কাছে বন্ধক। একটা বন্ধকনামা তৈরি করে এনেছি। স্ট্যাম্পে পাকা দলিল। আমি বিশেষ বিপদে পড়েছি। বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

হরিচরণ বললেন, আপনি নিজে এসেছেন এই যথেষ্ট। বন্ধকনামা লাগবে না। হাতিও রেখে যেতে হবে না।

শশাংক পাল বললেন, এই কাজ আমি করি না। বন্ধকনামায় আমি দস্তখত করি নাই। টিপসই দিয়েছি। ইদানীং দস্তখত করতে পারি না। হাতকাঁপা রোগ হয়েছে, শুনেছ বোধহয়। জনসমক্ষে বিরাট লজ্জায় পড়ি বিধায় চাদরের নিচে হাত লুকিয়ে রাখি। এখন বলো টাকাটা কি দিতে পারবে ?

হরিচরণ বললেন, এত টাকা আমি সঙ্গে রাখি না। সকালে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসব।

শশাংক পাল আরো কিছুক্ষণ থাকলেন। শরবত খেলেন, পান খেলেন। কিছুক্ষণ গল্প করলেন।

উড়াউড়া শুনতে পেলাম তোমাকে না-কি সমাজচ্যুত করেছে। কথাটা কি সত্যি ?

হরিচরণ একবার ভাবলেন বলেন, সমাজচ্যুতির ঘটনা আপনার বাড়িতেই ঘটেছে। আপনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। তারপর মনে হলো এই মানুষকে পুরনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই। তিনি কিছুই মনে রাখতে পারেন না।

শশাংক পাল বললেন, তুমি না-কি সবার সামনে এক মুসলমান ছেলেকে চাটাচাটি করেছ ? গালে চুমা দিয়েছ ?

হরিচরণ জবাব দিলেন না।

শশাংক পাল গলা নামিয়ে বললেন, আবার কার কাছে যেন শুনলাম সেই মেয়ের মা রাইত নিশুথে তোমার ঘরে আসে। তুমি একা থাক, রাইত নিশুথে তোমার ঘরে মেয়েছেলে আসা তো ভালো কথা না। সমাজ থেকে পতিত হবে।

হরিচরণ বললেন, পতিত তো আছিই। নতুন করে কী হবো ? তা ছাড়া রাইত নিশুথে আমার কাছে কেউ আসে না। ঐ মেয়ে আমারে বাবা ডাকে। আমি তাকে কন্যাসম দেখি।

শশাংক পাল মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, নিজের কন্যা ছাড়া আর কেউ কন্যাসম না। এইটা খেয়াল রাখবা।

আচ্ছা রাখব।

তোমার বাড়িতে তো কোনো লোকজন দেখলাম না। সবাই কি তোমাকে ত্যাগ করেছে?

করেছে। করাই স্বাভাবিক। আমার জাত নাই। সমাজ নাই।

শশাংক পাল বললেন, এইসব নিয়ে চিন্তা করবে না। যার টাকা আছে সে সমাজ কিনবে। আর আমি তো আছি। বামুন পণ্ডিতকে ডেকে ধমক দিয়ে দিব, নিমিষে সে অন্য বিধান দিবে। হা হা হা।

প্রচণ্ড শব্দে শশাংক পাল হাসছেন। অথচ এই হাসি প্রাণহীন। মনে হচ্ছে কোনো একটা যন্ত্রের ভেতর থেকে শব্দ আসছে।

হরি!

জে আজ্ঞে।

তোমার এখানে যদি মদ্যপান করি তোমার কি অসুবিধা আছে?

কোনো অসুবিধা নাই।

কলিকাতা থেকে ভালো রাম আনিয়েছিলাম। খাবে একটু?

আমি মদ্যপান করি না।

ভালো। খুব ভালো। মদ্য সর্বগুণনাশিনী। আমার দিকে তাকায়ে দেখ— আমার হয়েছে হাতকাঁপা রোগ। এই সঙ্গে স্মৃতিভ্রংশ রোগ। কিছু মনে থাকে না।

মদ্যপান ছেড়ে দেন।

কেন ছাড়ব? পৃথিবীতে আমরা এসেছি ভোগের জন্যে। ভোগ নিবৃত্তি না হলে বারবার জন্মাতে হবে। আবার জন্মানোর ইচ্ছা নাই। এই জন্যেই ঠিক করেছি, এই জীবনেই সমস্ত ভোগের নিষ্পত্তি করব।

শশাংক পালের জন্যে মদ্যপানের আয়োজন তার লোকজন অতি দ্রুত করে ফেলল। মেঝেতে কার্পেট বিছানো হলো। তাকিয়া এবং কোলবালিশ নামানো হলো। গ্লাস নামল, বোতল নামল। ধুপদানে 'অগরু' পোড়ানো হলো। হুঁকোয় মেশকাত আম্বুরী তামাক ভরা হলো।

শশাংক পাল তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গ্লাস হাতে নিতে নিতে বললেন, বরফ ছাড়া এইসব জিনিস খেয়ে কোনো মজা নাই। বরফকলের সন্ধানে আছি।

কলিকাতায় সাহেবপাড়ায় বরফকল পাওয়া যায়। কেরোসিনে চলে। অত্যধিক দাম। তারপরেও সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিনব। ভালো করেছি না ?

কথায় কথায় 'ভালো করেছি না' বলা শশাংক পালের মুদ্রাদোষ। প্রশ্নটা তিনি করেন, তবে জবাবের জন্যে অপেক্ষা করেন না। তিনি নিশ্চিত যা করেছেন, ভালোই করেছেন।

হরি!

যে আজ্ঞে।

মহাভারতের যযাতির কথা মনে আছে ? তার জীবনটাই ছিল ভোগের। বৃদ্ধ হয়ে গেলে ভোগের তৃষ্ণা মেটে না। তখন সে তিনপুত্রকে ডেকে বলল, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের যৌবন আমাকে দিয়ে আমার জরা গ্রহণ করবে। আমি আরো ভোগ করতে চাই। কেউ রাজি হয় না। একজন রাজি হলো। সেই একজনের নামটা কি তোমার মনে আছে, হরি ?

সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রাজি হলো। তার নাম পুরু।

ঐটা ছিল গর্ধব। গর্ধবটা রাজি হয়েছে। হা হা হা। মহা গর্ধব। হা হা হা।

হাসতে হাসতে শশাংক পালের হেঁচকি উঠে গেল। হেঁচকি থামানোর জন্যে পানি খেতে হলো। মাথায় পানি দিতে হলো। তবু হেঁচকি থামে না। হেঁচকি দিতে দিতেই তিনি হাতিতে উঠে চলে গেলেন। মাদি হাতি লোহার শিকলে বাঁধা থাকল জামগাছের সঙ্গে। হাতির সঙ্গে আছে হাতির সহিস। সহিস মুসলমান, নাম কালু মিয়া। ছোটখাটো মানুষ। অতি বিনয়ী। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না।

হরিচরণ বললেন, এত বড় হাতি আর তুমি ছোটখাটো মানুষ। তোমার কথা কি মানে ?

কালু মিয়া বলল, জে কর্তা, মানে। আমি তার চোখের সামনে থাকলেই সে ঠাণ্ডা থাকে। চোখের আড়াল হলেই অস্থির হয়।

এত বড় জন্তু বশ করলে কীভাবে ?

আদর দিয়ে। সব পশু আদর বুঝে। মানুষের চেয়ে বেশি বুঝে।

মানুষ কম বুঝে ?

জে কর্তা।

মানুষ কম বুঝে কেন ?

মানুষরে আদর করলে মানুষ ভাবে আদরের পেছনে স্বার্থ আছে। পশু স্বার্থ বুঝে না।

কালু মিয়া! আমি যদি হাতিটাকে আদর করি সে বুঝবে ?

অবশ্যই বুঝবে। হাতির অনেক বুদ্ধি। আর হাতি আদরের কাঙ্গাল।

হরিচরণ হাতির গায়ে হাত রাখলেন। হাতি মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখল। হরিচরণ বললেন, কেমন আছিস গো বেটি ?

হাতি শুঁড় ঝাঁকালো।

হরিচরণ বললেন, তুই আমার বাড়ির অতিথি। তুই কী খেতে চাস বল।

কালু মিয়া বলল, কর্তা, আপনের প্রত্যেকটা কথাই হে বুঝছে। জবান নাই বইলা উত্তর দিতেছে না।

হরিচরণ বললেন, তোমার হাতি কী খেতে সবচে' পছন্দ করে বলো। আমি তাই খাওয়াব।

এক ধামা আলুচাল দেন। এক ছড়ি কলা দেন, আর নারকেল দেন। আপনি নিজের হাতে তারে খাওয়াটা দিবেন, বাকি জীবন সে আপনারে ভুলবে না।

হরিচরণ নিজের হাতে হাতিকে খাবার খাওয়ালেন। কালু মিয়া বলল, কর্তা, আপনার আদর হে বেবাকটাই বুঝছে।

তুমি জানলে কীভাবে ?

দেহেন না একটু পর পর শুঁড় দিয়া আপনেরে ধাক্কা দিতাছে। এইটা তার খেলা। পছন্দের মানুষের সাথে এই খেলা সে খেলে।

অল্প কয়েক ঘণ্টায় হাতিটার উপর তার অস্বাভাবিক মায়া পড়ে গেল। তৃতীয় দিনে সেই মায়া যখন অনেক গুণ বেড়েছে, তখনি হাতি ফেরত নেবার জন্যে শশাংক পালের দুই ম্যানেজার উপস্থিত। তারা টাকা নিয়ে আসে নি, এসেছে খালি হাতে।

তাদের কাছেই হরিচরণ জানলেন যে, হাতি বন্ধক রেখে টাকা নেবার কোনো ঘটনা ঘটে নি। বন্ধকনামায় যে টিপসই আছে সেটা শশাংক পালের না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন বন্ধকনামা নিয়ে কোর্টে যেতে পারেন।

হরিচরণ বললেন, হাতি নিয়ে যাও।

কালু মিয়ার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। সে হরিচণের পা ছুঁয়ে বিদায় নিল।

হরিচরণ তাকে রুপার একটা টাকা দিয়ে বললেন, তোমার স্বভাব আচার-আচরণ আমার পছন্দ হয়েছে। হাতির সঙ্গে থাক বলেই হাতির স্বভাব তোমার মধ্যে এসেছে। হাতি উত্তম প্রাণী। তুমিও উত্তম।

শশাংক পাল হাতি ফিরিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি হরিচরণের উপর নানাবিধ নির্যাতনের চেষ্টা করলেন। সমাজচ্যুতির বিষয়টা পাকাপাকি করলেন। তাঁর ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে গেল। সোহাগগঞ্জে পাটের গদিতে আগুন লেগে সব পুড়ে গেল। কিছু বিশ্বাসী কর্মচারী তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। হরিচরণ দমলেন না। নাপিত বন্ধ হওয়ার কারণে তিনি চুল-দাড়ি কাটা বন্ধ করলেন। তার মাথাভর্তি চুল-দাড়ি গজাল। চেহারা ঋষি ঋষি হয়ে গেল।

মানুষ এমন প্রাণী যে দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। হরিচরণ একা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকালে গদিতে বসেন। ব্যবসার কাজকর্ম দেখেন। গদির হিন্দু কর্মচারীদের জাতের সমস্যা হয় নি। তারা আগের মতোই আছে। তাদের দুপুরের খাবার সময় হলেই কিছু সমস্যা হয়। তখন হরিচরণকে গদিঘর থেকে চলে আসতে হয়। তিনি নিজের বাড়িতে রান্না করতে বসেন। ভাত, আলু সেদ্ধ, ঘি। কোনো কোনো দিন ডিম। খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ির আশেপাশে হাঁটতে বের হন। দেখাশোনার কেউ না থাকায় বাড়ির চারদিকে ঘন জঙ্গল হয়েছে। ঘাস এবং কচুবনে বাড়ি প্রায় ঢাকা পড়ার মতো অবস্থা। কোনো একদিন মনে হয় বাড়ি পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যাবে। সেটাও মন্দ কী! বনের ভেতর হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে চমকে যাবার মতো ঘটনাও ঘটে। ঘটনাগুলো নিয়ে তার ভাবতে ভালো লাগে। একবার হিজল গাছের গোড়ায় কয়েকটা সাপের ডিম দেখলেন। আকাশী নীল রঙের ডিম। মাঝে মাঝে হলুদ ছোপ। দেখে মনে হয়, রঙ-তুলি দিয়ে কেউ ডিমগুলো এঁকেছে। সাপের মতো ভয়ঙ্কর একটা প্রাণীর ডিম এত সুন্দর কেন এই বিষয় নিয়ে ভেবে ভেবে অনেক সময় পার করলেন। কোলকাতায় চিঠি পাঠালেন সাপের উপর বই বুকপোস্টে পাঠানোর জন্যে।

বই পড়ার অভ্যাস তার ছিল না। এই অভ্যাস ভালোমতোই হলো। বেশির ভাগই ধর্মের বই, সাধুদের জীবনকাহিনী। পাশাপাশি ইতিহাসের বই। সন্ধ্যার পর তার প্রধান কাজ— হারিকেন জ্বালিয়ে বই পড়া। সুর করে কাশীদাসীর মহাভারত পড়তেও তার ভালো লাগে। তার মনে হয় রামায়ণ পাঠের সময় দেহধারী না এমন অনেকেই চারপাশে জড়ো হয়। তারা নিঃশব্দে মন দিয়ে পাঠ শোনে—

হেতায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে ধীরে কহিলেন অৰ্জ্জুনে চাহিয়া।।
শুন ভাই ধনঞ্জয়, না বুঝি কারণ।
ভীমের বিলম্ব কেন হয় এতক্ষণ।।
শীঘ্রগতি বৃকোদরে কর অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কারো সনে করিতেছে রণ।।

জহির ছেলেটা প্রায়ই আসে। তার প্রধান ঝোঁক পুকুরের পানি। হরিচরণ তাকে সাঁতার শেখালেন। এই কাজটা করেও খুব আনন্দ পেলেন।

নিঃসঙ্গ জীবনে বনে-জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে জহিরের সঙ্গে গল্প করা তাঁর জন্যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা। ছেলেটা অতিরিক্ত বুদ্ধিমান। বড় হলে তার এই বুদ্ধি থাকবে কি-না এটা নিয়েও হরিচরণ চিন্তা করেন। ছেলেটার সঙ্গে জ্ঞানের কথা বলতেও হরিচরণের ভালো লাগে। কারণ এই ছেলে কথাগুলো বুঝতে পারে।

জহির!

হুঁ।

মানুষের যেমন জীবন আছে গাছেরও আছে— এটা জানো?

জানি।

কীভাবে জানো?

আপনি বলেছেন।

মানুষের সঙ্গে গাছের অনেক প্রভেদ আছে। প্রভেদ হলো অমিল। অমিলগুলো কি জানো?

না।

ভেবে ভেবে বলো। চিন্তা করে বলো।

গাছ কথা বলতে পারে না।

হয়েছে। আর কী?

গাছ হাঁটতে পারে না।

হয়েছে। আর কী?

জানি না।

চিন্তা করে বলো। কখনো হুট করে 'জানি না' বলবে না। চিন্তা করো।

ছেলেটা গম্ভীর ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করে। দেখতে এত ভালো লাগে! আচ্ছা জন্মান্তর কি আছে? এমন কি হতে পারে তাঁর মৃত কন্যা মুসলমান ঘরে পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়েছে? তার মেয়ের মাথায় চুল ছিল কোঁকড়ানো। এই ছেলেরও তাই। আগের জন্মে মেয়েটা পানিতে ডুবে মরেছিল। এই জন্মেও একটা ঘটনা ঘটেছে, তবে এই জন্মে সে রক্ষা পেয়েছে।

মাঝে মাঝে হাটের দিন যখন সুলেমান হাটে যায়, জুলেখা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসে। তার হাতে থাকে শলার ঝাড়ু। ছেলের হাতেও থাকে ঝাড়ু। দু'জনে

বিপুল উৎসাহে বাড়িঘর ঝাঁট দিতে থাকে। ঘর পরিষ্কার পর্ব শেষ হলে জুলেখা খিচুড়ি রাঁধতে বসে। হরিচরণ তখন পাশেই থাকেন। রান্না দেখেন। রান্নার সময় জুলেখা নানান গল্প করে।

জগতের সবচে' সহজ রান্ধন খিচুড়ি। হাতের কাছে যা আছে সব হাঁড়িতে দিয়া জ্বাল। একটু নুন, দুই একটা কাঁচামরিচ। ব্যস।

ছেলে প্রশ্ন করে, জগতের সবচে' কঠিন রান্ধন কী?

ভাত। ঝরঝরা নরম ভাত রান্ধা বড়ই কঠিন। একটু জ্বাল বেশি হইলে ভাত গলগলা। জ্বাল কম ভাত শক্ত চাউল।

কোনো কোনো দিন জুলেখা তার বাবার গল্প শুরু করে। কবে কোনদিন তার বাপজান কবিগানের প্রশ্নোত্তরে বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন—তার গল্প। এই সময় জুলেখার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। হরিচরণের মনে হয়, মেয়েটার মুখ থেকে আলো বের হচ্ছে।

বুঝলেন বাবা! জাঙ্গির আলী, সেও বিরাট নামি মালজোড়ার গায়েন, আমার বাপজানরে কঠিন একখান সোয়াল করল— মাটি ক্যামনে সৃষ্টি হইল?

বাপজান সঙ্গে সঙ্গে বলল, (জুলেখা এই অংশে গান শুরু করল)

ওরে গুনধন!
প্রশ্নের কী বিবরণ! সভার মাঝে করিব বর্ণন।
ধৈর্য ধরে শুনো ওরে শ্রোতাবন্ধুগণ।
দুই দিনে হয় মাটির জনম
চারদিনে আল্লাহ সব করিলেন সৃজন।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি, হঠাৎ হঠাৎ অম্বিকাচরণ উপস্থিত হন। তিনি প্রতিবারই সমাজ থেকে পতিত হবার পর উদ্ধারের একেকটা উপায় নিয়ে আসেন। পুকুরঘাটে বসে গলা উঁচিয়ে ডাকেন— হরি! আছো? খোঁজ নিতে আসলাম। আছো কেমন?

ভালো আছি।

তোমার উপর কাজটা অন্যায্য হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়েছি, একটা সোনার চামচে গোবর নিয়া চামচের হাতলে তিনবার দাঁতে কামড় দিলেই শরীর শুদ্ধ হয়। তারপর সেই চামচ কোনো এক সৎ ব্রাহ্মণকে দান করে দিতে হয়। কাশির এক পণ্ডিতের বিধান।

কেমন পণ্ডিত?

বিরাট পণ্ডিত। চার-পাঁচটা ন্যায়রত্ন রামনিধি পানিতে গুলে খেয়ে ফেলতে পারে। তোমার শরীর শুদ্ধির ব্যবস্থা কি করব ?

যাক আরো কিছু দিন। তাছাড়া আপনি শরীর শুদ্ধি করলে তো হবে না। কেউ মানবে না। কাশির পণ্ডিতদের লাগবে।

তাও কথা। একটা কাজ করি, কোনো শুভদিন দেখে দু'জনে কাশি চলে যাই। তোমার তো অর্থের অভাব নাই। আমারে খরচ দিয়া নিয়া গেলা। পুণ্যধাম কাশি কোনোদিন দেখি নাই। দেখার শখ আছে।

নিয়ে যাব আপনাকে। কথা দিলাম। আমি উদ্ধার পাই বা না পাই— আপনার শখ মেটাব।

অম্বিকাচরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, হরিচরণের জন্যে তার সত্যি খারাপ লাগে।

হরিচরণের জন্যে আরেকজন মানুষের খুবই খারাপ লাগে, তার নাম ধনু শেখ। সে লঞ্চঘাটের টিকেট বাবু। মাঝে মাঝে টুকটাক ব্যবসা করে। কোলকাতা থেকে এক ড্রাম লাল কেরোসিন নিয়ে এসে বান্ধবপুরে বিক্রি করে। লঞ্চে পাঠিয়ে দেয় শুকনা মরিচ। এতে বাড়তি আয় যা হয় তা সে ব্যয় করে নতুন বিয়ে করা স্ত্রীর পেছনে। পাউডার, স্নো, শাড়ি, রুপার গয়না। লঞ্চঘাটের কাছেই টিনের এক চালায় তার সংসার। স্ত্রীর নাম কমলা। ধনু শেখ স্ত্রীর খুবই ভক্ত। তার একমাত্র স্বপ্ন একদিন সে একটা লঞ্চ কিনবে। সেই লঞ্চ নারায়ণগঞ্জ সোহাগগঞ্জ চলাচল করবে। লঞ্চের নাম এমএল কমলা। এমএল হলো মোটর লঞ্চ। সেই লঞ্চে কমলা নামের যে-কোনো যাত্রী যদি উঠে সে যাবে ফ্রি। তার টিকেট লাগবে না।

হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ লঞ্চের টিকেট কাটতে এলেই ধনু শেখ কোনো না কোনো প্রসঙ্গ তুলে হরিচরণের জাত নষ্টের কথা তুলবে।

বাবু, আপনে বলেন— মনে করেন সুন্দর একটা কুত্তার বাচ্চা রাস্তায় হাঁটতেছে। আপনে 'আয় তু তু' বললেন, সে লাফ দিয়া আপনের কোলে উঠল। আপনের জাইত কিন্তু গেল না। মুসলমানের এক বাচ্চা কোলে নিছেন— জাইত গেল। এখন মীমাংসা দেন— মুসলমানের বাচ্চা কি কুত্তার চাইতে অধম ?

যে সব বাবুদের এ ধরনের প্রশ্ন করা হয় তারা বিব্রত হন না। বিরক্ত হন। কেউ কেউ বলেন, তুমি টিকেট বাবু। তুমি টিকেট বেচবা। এত কথা কী ?

জাইত জিনিসটা কী বুঝায় বলেন। শরীরের কোন জায়গায় এই জিনিস থাকে, ক্যামনে যায় ? জিনিসটা কি ধুয়াশা ?

তুমি বড়ই বেয়াদব। তোমার মালিকের কাছে বিচার দিব। চাকরি চইল্যা যাবে। না খায়া মরবা।

মরলে মরব। তয় জাইতের মীমাংসা কইরা দিয়া মরব।

তুমি জাইতের মীমাংসা করার কে? জাইতের তুমি কী বুঝ?

আমি না বুঝলেও আপনেরা তো বোঝেন। আপনেরা মীমাংসা দেন।

বেয়াদবির কারণেই ধনু শেখের টিকেট বাবুর চাকরি চলে গেল। লঞ্চ কোম্পানির মালিক নিবারণ চক্রবর্তী তাকে ধর্মপাশা অফিসে ডেকে পাঠালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, ধনু, উঁইপোকা চেন?

ধনু শেখ ভীত গলায় বলল, চিনি।

উঁইপোকার পাখা কেন উঠে জানো?

উড়াল দিবার জন্যে।

না। উঁইপোকার পাখা উঠে মরিবার তরে। তুমি উঁইপোকা ছাড়া কিছু না। তোমার পাখা উঠেছে। তুমি সবেরে জাইত পাইত শিখাইতেছ?

ধনু শেখ বলল, কর্তা ভুল হইছে।

ভুল স্বীকার পাইলে কানে ধর। কানে ধইরা একশ'বার উঠবোস কর।

ধনু দেরি করল না। কানে ধরে উঠবোস শুরু করল। সে ধরেই নিয়েছিল চাকরি চলে যাবে। কানে ধরে উঠবোসের মতো অল্প শাস্তিতে পার পেয়ে যাচ্ছে দেখে সে আনন্দ। তার হাঁটুতে ব্যথা, উঠবোস করতে কষ্ট হচ্ছে। এই কষ্ট কোনো কষ্টই না।

নিবারণ চক্রবর্তী খাতা দেখছিলেন। খাতা থেকে মাথা তুলে বললেন, একশ'বার কি হইছে?

জে কর্তা হইছে।

এখন বিদায় হও। তোমার চাকরি শেষ। লঞ্চঘাটায় নতুন টিকেট বাবু যাবে। আইজ দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়বা। নতুন টিকেট বাবু পরিবার নিয়া উঠবে।

আমার চাকরি শেষ?

এতক্ষণ কী বললাম?

ধনু শেখ বলল, চাকরি যদি শেষই করবেন কান ধইরা উঠবোস করাইলেন কী জন্যে?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন, আগেই যদি বলতাম চাকরি শেষ তাহলে কি কানে ধরে উঠবোস করতা ? এই জন্যে আগে বলি নাই।

ধনু শেখ বলল, এইটা আপনের ভালো বিবেচনা।

তোমার ছয়দিনের বেতন পাওনা আছে। নতুন টিকেট বাবুর কাছে থাইকা নিয়া নিবা। তার নাম পরিমল। যাও, এখন বিদায়। জটিল হিসাবের মধ্যে আছি।

ধনু শেখ অতি দ্রুত গভীর জলে পড়ে গেল। স্ত্রীকে নিয়ে উঠার কোনো জায়গা নেই। নিজের খরুচে স্বভাবের কারণে সঞ্চয়ও নেই।

সে কিছুদিন বাজে মালের দোকান চালাবার চেষ্টা করল। স্ত্রীর জায়গা হলো নৌকায়। ছইওয়ালা নৌকার দু'পাশ শাড়ি দিয়ে ঘিরে তার ভেতরে সংসার।

ধনু শেখের দোকান চলল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ তার দোকান থেকে কিছু কেনে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, মুসলমানওরাও না। রাতে নৌকায় ঘুমাতে গিয়ে ধনু শেখ হতাশ গলায় বলে, বউ কী করি বলো তো।

নতুন কোনো ব্যবসা দেখবেন ?

কী ব্যবসা ?

ঘোড়াতে কইরা ধর্মপাশা থাইকা মাল আনবেন।

এই ব্যবসা করব না বউ। যারা ঘোড়ার মাল টানাটানি করে তারার স্বভাব হয় ঘোড়ার মতো। ঘোড়া হওয়ার ইচ্ছা নাই।

নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে গিয়া তার পায়ে উপুড় হইয়া পইড়া দেখবেন। পুরান চাকরি যদি ফেরত পান।

ধনু শেখ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, লাভ নাই। উনার নতুন টিকেট বাবু কাজ ভালো জানে। তার জায়গায় আমারে দিবে না।

এখন উপায় ?

তাই ভাবতেছি।

অতিদ্রুত অবস্থা এমন পর্যায়ে গেল যে চাল ডাল কেনার টাকায় টান পড়ল। এর মধ্যে আরেক বিপদ কমলা গর্ভবতী। তার সারাক্ষণ ভুখ লাগে। এটা সেটা খেতে ইচ্ছা করে। একদিন অর্ধেকটা মিষ্টি কুমড়া কাচা খেয়ে ফেলল।

ধনু শেখ বলল, বৌ, তোমারে তোমার মায়ের কাছে পাঠায়া দেই ?

কমলা বলল, আপনেরে এতবড় বিপদে ফেইলা আমি বেহেশতেও যাব না। তাছাড়া আমার মা'র নিজেরই খাওন জুটে না। আমার কাছে স্বর্ণের একটা চেইন আছে। এইটা বিক্রি করেন।

ধনু শেখ স্বর্ণের চেইন বিক্রি করতে পারল না। বাজারের একমাত্র স্বর্ণকারের দোকানের মালিক শ্রীধর বলল, এর মধ্যে সোনা বলতে কিছু নাই। সবই ক্ষয়া গেছে।

ধনু শেখ বলল, কর্তা! না খায়া আছি। স্ত্রীর সন্তান হবে।

শ্রী ধর বলল, তোমার সাথে বাণিজ্য করব না। তুমি জাত নিয়া অন্দ মন্দ কথা বলো। তোমার সাথে বাণিজ্য করলে শ্রী গণেশ বেজার হবেন। দোকান লাটে উঠব। আমিও তোমার মতো না খায়া থাকব।

বন্দক রাইখা কিছু দেন।

বন্দক রাখতে হয় ভগবানের নামে, তোমার আবার ভগবান কী?

ধনু শেখ বলল, তাও তো কথা।

ভাদ্র মাসের একদিন ধনু শেখকে সত্যি সত্যি উপাসে যেতে হলো। সারাদিনে দুই মুঠ চিড়া ছাড়া খাওয়ার নেই। তাও ভালো কমলা খেতে পেরেছে। চাল যা ছিল তাতে একজনের মতো ভাত হয়েছে। ফ্যান ভাতে লবণ ছিটিয়ে কমলা এত আগ্রহ করে খেল যে ধনু শেখের চোখে পানি এসে গেল। সে গম্ভীর গলায় বলল, বউ, একটা জটিল সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

কমলা আগ্রহ নিয়ে বলল, কী সিদ্ধান্ত?

ডাকাতি করব। ডাকাতি বিনা পথ নাই।

কমলা হাসতে শুরু করেই হাসি বন্ধ করে ফেলল। ধনু শেখের মুখ গম্ভীর। চোখ জ্বল জ্বল করছে।

ডাকাতি করবেন?

হুঁ।

ডাকাইতের দল থাকে। আপনের দল কই?

দল লাগে না।

কমলা বলল, আমার সন্তানের কসম দিয়া একটা কথা বলি।

ধনু শেখ কিছু বলল না।

আপনি সত্যই ডাকাতি করবেন?

হুঁ।

এই সময় ঘাট থেকে কেউ একজন ডাকল, এটা কি ধনু শেখের নাও?

ধনু নৌকা থেকে বের হয়ে দেখে হরিচরণ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ধনু বলল, বাবু আদাব।

আদাব। তোমার সঙ্গে গল্প করার জন্যে আসছি। নায়ে উঠি ?

উঠেন। আমার সাথে কী গফ করবেন ? আমি একজন ছল্লু। জুতার শুকতলি।

হরিচরণ নৌকায় উঠলেন। ধনু শেখ পাটাতনে গামছা বিছিয়ে দিল। হরিচরণ বসতে বসতে বললেন, কুকুরের বাচ্চা এবং মানুষের বাচ্চা নিয়া তুমি যে এক মীমাংসা দিয়েছ, মীমাংসাটা আমার মনে লেগেছে।

মীমাংসার উত্তর কি আপনের কাছে আছে ?

আছে।

বলেন শুনি।

হরিচরণ বললেন, মানুষের তুলনা মানুষের সাথে হবে। অন্য কোনো প্রাণীর সঙ্গে হবে না। একটা মন্দ মানুষের সঙ্গে অন্য একটা মন্দ মানুষের বিবেচনা হবে। কোনো মন্দ প্রাণীর সঙ্গে হবে না। বুঝেছ ?

বোঝার চেষ্টা নিতেছি।

হরিচরণ বললেন, আরো একটা কথা আছে।

বলেন শুনি।

মানুষের তুলনায় পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী তুচ্ছের তুচ্ছের তুচ্ছ। ধুলিকনার চেয়েও তুচ্ছ। ধুলিকনা গায়ে তুললেও কিছু না, গা থেকে ফেলে দিলেও কিছু না।

ধনু বলল, আপনি জ্ঞানী মানুষ। জ্ঞানী মানুষের জ্ঞানী কথা। আমি তুচ্ছ, তুচ্ছের কথাও তুচ্ছ।

শুনেছি তুমি দুদর্শায় পড়েছ। তোমার চাকরি চলে গেছে। আমার কাছ থেকে সাহায্য নিবে ?

ধনু বলল, কী সাহায্য করবেন ?

কী ধরনের সাহায্য তুমি চাও ?

ধনু বিরক্ত গলায় বলল, পারলে একটা লঞ্চ কিন্যা দেন। সোহাগগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ রুটে চলবে। লঞ্চের নাম এমএল কমলা।

কমলা কে ?

আমার পরিবারের নাম।

হরিচরণ বললেন, আমি তোমাকে লঞ্চ কিনে দিব। তুমি লঞ্চ ব্যবসার সঙ্গে অনেকদিন ছিলে। এই ব্যবসা তুমি জানো। তোমার বুদ্ধি আছে। চিন্তাশক্তি আছে। তুমি পারবে। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। না বুঝে কিছু করি না।

হতভম্ব ধনু শেখ বলল, সত্যি লঞ্চ কিনে দিবেন ?

হ্যাঁ।

লা ইলাহা ইল্লালাহু। এইগুলা কী বলেন ?

পর্দার আড়াল থেকে কমলা মুখ বের করেছে। সে মনের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। হরিচরণ বললেন, মা, ভালো আছো ?

কমলা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার মুখে কথা আটকে গেছে।

ধনু শেখ বলল, আমার কেমন জানি লাগতেছে। শরীর দিয়া গরম ভাপ বাইর হইতেছে। আপনে কিছু মনে নিবেন না। আমি নদীতে একটা ঝাঁপ দিব।

ধনু শেখ ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে গেল।

জমিদার বাবু শশাংক পাল পরের বছরের সদর জমা দিতে পারলেন না। তাঁর জমিদারি বসতবাটিসহ নিলামে উঠল। হরিচরণ সাহা নগদ অর্থে সেই জমিদারি কিনে নিলেন।

এক সন্ধ্যায় দু'টা হাতি নিয়ে কালু মিয়া হরিচরণের বাড়িতে উপস্থিত হলো। হরিচরণ বললেন, কালু, ভালো আছ ?

কালু মিয়া বলল, কর্তা, আপনে আপনের বেটির কাছে গিয়া দাঁড়ান। দেখেন আপনের বেটি আপনেরে মনে রেখেছে।

হরিচরণ হাতির পাশে দাঁড়াতেই হাতি তার ঘাড়ে শুঁড় তুলে দিল। হরিচরণের চোখ ভিজে উঠল।

এই অঞ্চলের প্রথম স্কুল (পরে কলেজ) হলো জমিদার বাবু শশাংক পালের বসত বাড়ি। হরিচরণের নাম হলো ঋষি হরিচরণ। তিনি তার জীবনযাত্রা পদ্ধতিও সম্পূর্ণ বদলে ফেললেন। একবেলা স্বপাক নিরামিষ আহার। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত পূজার ঘরে চোখ বন্ধ করে আসন। বিলাস তাঁর জীবনে আগেও ছিল না, এখন আরো কমল। তবে নতুন ধরনের একটা বিলাস যুক্ত হলো। তিনি হাতির পিঠে চড়ে সপ্তাহে একদিন মনার হাওর পর্যন্ত বেড়াতে যাওয়া শুরু করলেন।

হাতি হেলতে দুলতে তাকে নিয়ে যায়। মনার হাওরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। ঘণ্টাখানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে আসে।

জমিদারি কেনার কিছুদিনের মধ্যে ন্যায়রত্ন রামনিধি হরিচরণের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি হরিচরণকে বললেন, আপনার জন্যে সুসংবাদ আছে। বিরাট সুসংবাদ। আমি গয়াতে বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম। দিকপাল এক বেদান্তকারের কাছ থেকে বিধান নিয়ে এসেছি।

হরিচরণ বললেন, কী বিধান ? আমি আবার জাতে উঠতে পারব ?

পারবেন। তার জন্যে সাতজন সৎ ব্রাহ্মণকে সাতটা স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। সাতটা বৃষ উৎসর্গ করতে হবে এবং পূণ্যধাম কাশিতে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করতে হবে। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি হতে হবে স্বর্ণের।

হরিচরণ বললেন, আমার জাতে উঠার কোনো ইচ্ছা নাই।

ন্যায়রত্ন বললেন, কী বলেন এইসব ? আপনার তো মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে!

হরিচরণ বললেন, তা খানিকটা হয়েছে। আপনি এখন গাত্রোত্থান করলে ভালো হয়। আমার কাজকর্ম আছে।

হরিচরণ এই সময় সামান্য লেখালেখিও শুরু করলেন। দিনপঞ্জি জাতীয় লেখা।

অদ্য চৌবিংশতম আষাঢ় ১৩১৩ বঙ্গাব্দ
ইংরেজি ১৯০৮ সোমবার

> গৃহদেবতায় নিবেদনমিদং। কিছুদিন যাবৎ ঈশ্বরের স্বরূপ অনুসন্ধান করিতেছি। ইহা বৃথা অনুসন্ধান। অতীতে কেউ এই অনুসন্ধানে ফল লাভ করেন নাই। আমিও করিব না। তাঁহার বিষয়ে যতই অনুসন্ধান করিব ততই অন্ধকারের গভীর তলে নিমজ্জিত হইব। মানবের কাছে তাঁহার এক রূপ। মানব তাঁহাকে মানবের মতোই চিন্তা করিবে। তাঁহার মধ্যে মানবিক গুণ এবং দোষ আরোপ করিবে। আবার পশু তাহাকে পশুরূপেই চিন্তা করিবে। বৃক্ষরাজী চিন্তা করিবে বৃক্ষরূপে। এটা আমাদের চিন্তার দৈন্য, অন্য কিছু নয়।

হরিচরণ যখন এই রচনা লিখছেন তখন ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়,
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা
বহিতে পারি এমন যেন হয়।

বর্মাফেরত এক যুবা পুরুষ কোলকাতার কাছেই বাজে-শিবপুরে বাসা নিয়েছেন। তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসটির বিষয়ে তাঁর বিরাট অস্বস্তি। উপন্যাসটি নিম্নমানের হয়েছে। তিনি ঠিক করলেন এই উপন্যাস প্রকাশ করবেন না। তিনি পাণ্ডুলিপি তালাবদ্ধ করে ফেলে রাখলেন। উপন্যাসের নাম 'দেবদাস'।

সেই বৎসরই (১৭ মে) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করলেন।

সেই বৎসরের জুন মাসের দুই তারিখে কোলকাতার কাছেই মানিকতলায় ইংরেজ সরকার একটা বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার করেন। অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। অরবিন্দের গ্রেফতারের খবরে পুরো বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।

কমরেড মোজাফফর আহমেদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আমার জীবন ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'-তে লিখলেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ থেকে আন্দোলনকারীরা প্রেরণা লাভ করিতেন। এই পুস্তকখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূলমন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গান। তাতে আছে—
>
> বাহুতে তুমি মা শক্তি
> হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
> তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
> ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধরিণী...
>
> স্বদেশ বন্দনার নামে আন্দোলনকারীরা মুসলিম বিদ্বেষমূলক এই 'বন্দে মাতরম' গানকে জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে চালু করে। একেশ্বরবাদী কোনো মুসলিম কি করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারত ? এই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনোদিন বুঝতে পারেন নি।

ধনু শেখের লঞ্চটি একতলা। কাঠের বডি। যাত্রী ধারণক্ষমতা পঞ্চাশ। লঞ্চ চলাচল শুরু করেছে ধর্মপাশা সোহাগগঞ্জ রুটে। লঞ্চের নাম 'এমএল বাহাদুর'। 'কমলা' নামই ঠিক ছিল, এর মধ্যে কমলার এক পুত্রসন্তান হওয়ায় নাম বদলেছে। ছেলের নাম বাহাদুর। তার নামে লঞ্চের নাম। মেয়েছেলের নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া ঠিক না। এতে দোষ লাগে। আয় উন্নতি হয় না।

মাওলানা ইদরিস দোয়া পড়ে লঞ্চে বখশে দিয়েছেন। কালিবাড়ির পুরোহিত এবং অম্বিকা ভট্টাচার্যও জবাফুল, গঙ্গাজল দিয়ে লঞ্চ শোধন করে দিলেন। সারেঙের ঘরে গণেশ মূর্তি বসানো হয়েছে। যাকে বলে আটঘাট বেঁধে নামা। নিজের লঞ্চ নিয়ে ধনু শেখ গেল ধর্মপাশায়। প্রাক্তন মুনিব নিবারণ চক্রবর্তীর আশীর্বাদ নিতে। উনাকে লঞ্চটা দেখানোর শখও আছে। নিবারণ চক্রবর্তী বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি লঞ্চ কোম্পানি খুলেছ ?

ধনু বলল, জে কর্তা। একটাই এখন লঞ্চ— নাম দিয়েছি বাহাদুর। দোতলা একটা স্টিল বডি কিনার শখ আছে, যদি আপনের আশীর্বাদ পাই।

এত টাকা পাইলা কই ? চুরি-ডাকাতি করছ নাকি ?

ডাকাতি করার ইচ্ছাই ছিল, হঠাৎ একজন কিছু টেকা দিল।

সেই একজনটা কে ?

জমিদার হরিচরণ বাবু।

কাছাখোলা জমিদার ? কাছা খুইলা চলাফেরা করে। খড়ম পইরা জমিদারি দেখতে যায়। সে শুনছি দুনিয়ার টাকা উড়াইতেছে। তোমারে হঠাৎ টাকা দিল কেন ? তার মতলবটা কী ?

ক্যামনে বলব। কেউ কানে ধইরা উঠবোস করায়, কেউ লঞ্চ কিন্যা দেয়— কারণ বোঝা মুশকিল। দুনিয়া বড় জটিল।

ঠিক কইরা বলো তো, তুমি আমার আশীর্বাদ নিতে আসছ, নাকি অন্যকিছু ?

অন্যকিছুই না।

হরিচরণ কি আমার পিছে লাগছে ? তার সাথে তো আমার কোনো বিবাদ নাই। আমার ব্যবসা। তার জমিদারি।

উনার কথা মনেও আনবেন না। সাধু মানুষরে টানাটানি করা ঠিক না। উনি বিরাট সাধু।

আমারে উপদেশ দিবা না। কচুগাছের পাতা বড় হইলেই সে বটগাছ হয় না। কচুগাছ কচুগাছই থাকে।

অবশ্যই থাকে। খাঁটি কথা বলেছেন। এজাজত দেন, বিদায় হই।

ধনু শেখ হাসিমুখে বের হলো। নিজের লঞ্চে করে সোহাগগঞ্জ ফিরল। সারেং-এর ঘরে বাতাস খেতে খেতে ফেরা। এর মজাই অন্যরকম।

প্রথম মাসের লাভের অর্ধেক সে দিতে গেল জমিদার হরিচরণকে। হরিচরণ বললেন, আমি তো তোমার সঙ্গে লঞ্চের ব্যবসায় নামি নাই।

ধনু শেখ বলল, তাহলে টাকা দিয়েছেন কী জন্যে ?

তোমাকে সাহায্য করার জন্যে। বিরাট বিপদে পড়েছিলা। নিরন্ন দিন কাটাইতেছিলা। আমার কারণেই বিপদে পড়লা, তাই সামান্য সাহায্য।

টাকা ফেরত দেয়া লাগবে না ?

অন্যভাবে ফেরত দিবা। ডিসিট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় মনিহারদির পুলটা ভাঙা। ভালো কাঠের পুল বানায়া দিবা।

পুল আপনে বানান।

আমার বানানো পুলে হিন্দুরা কেউ উঠবে না।

না উঠলে না উঠবে। আপনের কী ?

হরিচরণ চুপ করে রইলেন। ধনু শেখ তীব্রগলায় বলল, পুলে উঠবে না এইটা একটা কথা কইলেন ? এরারে আমি থাপড়ায়া পুলে তুলব। আমার নাম ধনু।

হরিচরণ বললেন, ধনু নামের মানুষজন কি থাপড়াইতে ওস্তাদ ?

ধনু জিব কাটল। মুরুব্বি মানুষের সামনে বেআদবি কথা বলা হয়েছে। তাকে আরো সাবধান হতে হবে। সে এখন বিশিষ্টজন। বিশিষ্টজনরা কথাবার্তা বলবে সাবধানে। হিসাব করে। একটা কথার আগে দশটা হিসাব।

বান্ধবপুরের আরেক বিশিষ্টজন মনিশংকর দেওয়ান। থাকেন কোলকাতায়। কাপড়ের ব্যবসা করেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামে ফিরেন। বিরাট আয়োজনে

দুর্গাপূজা হয়। প্রতিবছরই তিনি পূজা উপলক্ষে কিছু না কিছু মজার আয়োজন করেন। কখনো যাত্রা, কখনো ঘেটু গান, ম্যাজিক শো, সাহেববাড়ির বাজনা। শোনা যাচ্ছে, এ বছর তিনি বাইজি নাচাবেন। দেবী দুর্গার সঙ্গে পূজা গ্রহণের জন্যে কার্তিকও আসেন। কার্তিক আবার বারবনিতাদের গান-বাজনার ভক্ত। তাঁর অবসর সময় কাটে স্বর্গের নটিদের নৃত্যগীতাদি শুনে। দেবী দুর্গার সঙ্গে মায়ের বাড়ি বেড়াতে এসে নিরামিষ সময় কাটানো তাঁর পছন্দ না। পূজার উদ্যোক্তারা তাঁর আনন্দ বিনোদনের ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা নেন।

দুর্গাপূজার শুরুতে হরিচরণের কাছে এসে উপস্থিত হলেন শশী ভট্টাচার্য। থলেথলে পূজারি বামুন না। মোটামুটি ফিটফাট যুবা পুরুষ। বালক বালক চেহারা, মাথাভর্তি চুল। হালকা পাতলা শরীর। গায়ের বর্ণ গৌর। গায়ে হলুদ রঙের আলপাকার কোট। পায়ে চকচকে বার্নিশ করা জুতা। থিয়েটারের নায়কের পার্ট তাকে যে-কোনো সময় দেয়া যায়।

শশী ভট্টাচার্য বললেন, আমি ব্রাহ্মণ বিধায় আপনাকে প্রণাম করতে পারছি না। আপনি প্রণম্য ব্যক্তি।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনার পরিচয়?

আমার নাম শশী ভট্টাচার্য। পিতা এককড়ি ভট্টাচার্য, মাতার নাম যশোদা। তাঁরা বিত্তবান মানুষ। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। তাঁরা সম্প্রতি আমাকে ত্যাগ করেছেন বিধায় আমি দেশে বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এক দু'দিন থেকে চলে যাব যদি অনুমতি দেন।

আমি অনুমতি দেবার কে?

আপনার আশ্রয়ে থাকব বলেই অনুমতি প্রয়োজন। গাছতলায় তো থাকতে পারি না। মাথার উপর চাল প্রয়োজন।

হরিচরণ বললেন, আমি জাতিচ্যুত মানুষ। একজন ব্রাহ্মণ সন্তান আমার সঙ্গে থাকতে পারেন না।

শশী ভট্টাচার্য বললেন, সেটাও কথা।

হরিচরণ বললেন, আমি অন্যকোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দেই?

তাহলে খুবই ভালো হয়। আমি নির্জনে থাকতে পছন্দ করি। জলের কাছাকাছি হলে ভালো হয়। কলিকাতায় আমাদের বসতবাড়ি গঙ্গার উপরে। জল দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে।

হরিচরণ বললেন, মাধাই খালের কাছে আমার টিনের ছোট্ট ঘর আছে, সেখানে থাকতে পারেন। একজন পাচকের ব্যবস্থা করে দিব।

শশী ভট্টাচার্য বললেন, পাচক ফাচক লাগবে না। আমি নিজেই রাঁধব। ভালো কথা, আমি অন্যের সাহায্য বা ভিক্ষা গ্রহণ করি না। এই যে কয়েকদিন থাকব তার বিনিময়ে আপনার জন্যে কী করতে পারি ?

হরিচরণ বললেন, কিছুই করার প্রয়োজন নেই। আপনি অতিথি। অতিথি হলেন নারায়ণ।

সব অতিথি নারায়ণ না। কিছু অতিথি বিভীষণ। যাই হোক, আমি কর্মী মানুষ। আপনার হয়ে কাজকর্ম করে দিতে আমার কোনোই অসুবিধা নেই। শুনেছি আপনি জমিদারি কিনেছেন। আমি জমিদারির কাগজপত্র দেখে দিতে পারি। খাজনা আদায় বিলি ব্যবস্থা এইসবও করতে পারি।

আপনার পিতার কি জমিদারি আছে ?

ছিল। এখন নাই। এখন তাঁরা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। তাঁরা থাকেন ধর্মকর্ম নিয়ে, আমি থাকি বাদ্যবাজনা নিয়ে। এই নিয়েই তাঁদের সঙ্গে আমার বিরোধ।

আপনি বাদ্যবাজনা করেন ?

হুঁ, ব্যাঞ্জো বাজাই।

আপনার ঐ বাক্সে কি কলের গান ?

ঠিক ধরেছেন। কলের গান। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির পঞ্চাশটার মতো থাল আমার কাছে আছে।

যন্ত্রটার নাম শুনেছি, কোনোদিন দেখি নাই।

আপনার কি বাদ্যবাজনার শখ আছে ?

হরিচরণ বললেন, শখ নাই।

জমিদার মানুষদের শখ থাকে। আপনে কেমন জমিদার ?

হরিচরণ হাসিমুখে বললেন, আমি খারাপ জমিদার।

আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। আশা করি আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় শুভ হবে।

বাবা-মা ছেড়ে চলে আসা এই আলাভোলা ছেলেটাকে হরিচরণের অত্যন্ত পছন্দ হলো। তাঁর বারবারই মনে হলো, এই ছেলেটা যদি এখানে স্থায়ী হয়ে যেত! একটা স্কুল শুরু করা তাঁর অনেকদিনের বাসনা। ছেলেটাকে দিয়ে স্কুলের কাজ ধরা যায়। জমিদারি কাজেও মনে হয় এই ছেলে দক্ষ হবে। সমস্যা একটাই, কিছু মানুষ থাকে কলমিশাকধর্মী। শিকড়বিহীন। কলমিশাক জলে ভাসে বলে শিকড় বসাতে পারে না। জলের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এই ছেলেটাও মনে হচ্ছে জলেভাসা।

শশী ভট্টাচার্য নিজেকে কর্মী মানুষ বলে পরিচয় দিয়েছিল। বাস্তবেও সেরকম দেখা গেল। অতি অল্প সময়ে হরিচরণের টিনের ঘর ভেঙে মাধাই খালের আরো কাছে নিয়ে গেল। এত কাছে যে বাড়ির বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসলে পা খালের পানি স্পর্শ করে। ঝোপঝাড় কেটে নয়াবসতি। কাঠের কাজ করে দিচ্ছে মিস্ত্রি সুলেমান। করাত দিয়ে কাঠ কাটতে কাটতে সে অবাক হয়ে নতুন মানুষটাকে দেখছে। নতুন মানুষটা হাত-পা নেড়ে বিড়বিড় করে কী বলে এটা তার জানার শখ। তার ধারণা যাত্রা থিয়েটারের কোন পার্ট।

শশী ভট্টাচার্য হাত-পা নেড়ে যা করে তার নাম কবিতা আবৃত্তি। গানবাজনা ছাড়াও তার কবিতা লেখার বাতিক আছে। তার লেখা কবিতা 'উপসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সুলেমান কাজ বন্ধ করে হা করে তাকিয়ে আছে। শশী ভট্টাচার্য একটা জবাগাছের দিকে তর্জনী উঠিয়ে বলছে—

সেই তুমি মুক্ত আজি   জয়ধ্বনি উঠে বাজি
অমরাবতীর সভাতলে,
ছন্দে ছন্দে কানপাতি   উর্বশী নাচিছে মাতি
মহেন্দ্রের লুব্ধ আঁখিজলে।

পূজার ঢাকের বাদ্য বাজতে শুরু করেছে।

তাক দুমাদুম তাক দুমাদুম শব্দে বান্ধবপুর মুখরিত। আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে মুসলমানদের মধ্যেও। ছেলেপুলেরা মহানন্দে পূজাবাড়ির উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কিছু মনে করছে না। বয়স্ক মুসলমানরা আসছে। আজ তাদেরও কেউ কিছু বলছে না।

গারোদের ধুতি পরা মনিশংকর বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যেককেই আলাদা করে বলছেন, শেখের পো'রা প্রাসাদ না নিয়া কেউ যাবে না। সইন্ধ্যাকালে বাইজি নাচ হবে। দলে-বলে আসবা। মেয়েছেলেদের জন্যে চিকের পর্দার ব্যবস্থা আছে।

পূজা নিয়ে জুলেখার সংসারে বিরাট অশান্তি শুরু হলো। জুলেখা স্বামীর কাছে বায়না ধরেছে পূজা উপলক্ষে তাকে নতুন লাল শাড়ি দিতে হবে। সুলেমান বিস্মিত হয়ে বলেছে, তোমারে শাড়ি দিব কেন ? তুমি কি হিন্দু ?

জুলেখা বলল, ঈদেও শাড়ি দেন নাই।

পয়সার অভাবে দিতে পারি নাই।

এখন তো পয়সা হইছে। নয়া বাবুর কাম করেছেন। এখন দেন।

সুলেমান মহাবিরক্ত হয়ে বলেছে, পূজার সময় শাড়ি দেয়া ইসলামধর্মে নিষেধ আছে। বিরাট পাপ হয়। যে শাড়ি দিবে সে যেমন পুলসেরাত পার হইতে পারবে না, যে শাড়ি পরবে সেও পারবে না।

আপনেরে বলছে কে?

বলাবলির কিছু নাই। সবাই জানে। প্রয়োজনবোধে জুম্মাঘরের ইমাম সাবরে জিগাইতে পার।

আমার একটা মাত্র শাড়ি। ভিজা শাড়ি শরীরে শুকাইতে হয়।

সুলেমান দরাজ গলায় বলল, পূজার ঝামেলা শেষ হোক, একটা শাড়ি কিন্যা দেব।

লাল শাড়ি।

সন্তান হওনের পর লাল শাড়ি পরা নিষেধ। জিন-ভূতের নজর থাকে লাল শাড়ির দিকে। তারপরেও দেখি বিবেচনা করে।

জুলেখার লাল শাড়ির শখ অদ্ভুত উপায়ে মিটে গেল। মনিশংকর বাবু পূজা উপলক্ষে বিতরণের জন্যে একগাদা শাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। পূজার দ্বিতীয় দিনে তিনি ঝাঁকাভর্তি শাড়ি নিয়ে বিতরণে বের হলেন। হিন্দু মুসলমান বিবেচনায় না এনে সবাইকে শাড়ি দিতে লাগলেন। জুলেখার বাড়ির সামনে যখন এসে দাঁড়ালেন তখন দুপুর। জুলেখা পুকুরে গোসল সেরে ভেজা শাড়িতে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। সুলেমান বাড়িতে নেই। তার ছেলেও বাড়িতে নেই। মনিশংকরকে দেখে গায়ে লেপ্টে থাকা ভেজা শাড়ির জন্যে তার লজ্জার সীমা রইল না। তার ইচ্ছা করল আবার ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে পড়তে।

মনিশংকর বললেন, মাগো, আমি আপনার পুত্র। পুত্রের কাছে মাতার লজ্জার কিছু নাই। দেবী দুর্গা আপনার জন্যে সামান্য উপহার পাঠিয়েছেন। গ্রহণ করলে ধন্য হবো।

জুলেখা বলল, কে পাঠায়েছেন?

আমার মাধ্যমে দেবী দুর্গা পাঠিয়েছেন।

আমি মুসলমান।

জানি। মাগো, পছন্দ করে একটা শাড়ি নেন।

জুলেখা কাঁপা কাঁপা হাতে একটা শাড়ি নিল। তার কাছে মনে হলো সে তার জীবনে এত সুন্দর শাড়ি দেখে নি। জবাফুলের মতো লালশাড়ি। আঁচলে সোনালি ফুল। ফুলগুলি থেকে সোনালি আভা যেন ঠিকরে পড়ছে। শাড়ি নিয়ে সুলেমান কোনো ঝামেলা করল না। পূজার পরে তাকে শাড়ি কিনে দিতে হবে না এই স্বস্তিই কাজ করল।

হরিচরণের বাড়িতে মনিশংকর উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর হাত ধরে আছে পুত্র শিবশংকর। ছেলেটা বাবার ন্যাওটা। বাবাকে ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারে না। পূজাবাড়ির হৈচৈ ফেলে সে বাবার হাত ধরে ঘুরছে।

হরিচরণ ব্যস্ত হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াতেই মনিশংকর বললেন, আমার বাড়িতে মা এসেছেন। আপনি নাই কেন ?

হরিচরণ বললেন, আমি কীভাবে যাব ? আমি পতিতজন।

মনিশংকর বললেন, মা'র কাছে কেউ পতিত না। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

পূজামণ্ডপে আমি উপস্থিত হলে অন্যরা আপনাকে ত্যাগ করবে।

অন্যরা ত্যাগ করলে করবে। মা আমাকে ত্যাগ করবে না। আপনি যদি আমার সঙ্গে না যান আমি কিন্তু আপনার উঠানে উপবাস করব।

দীর্ঘদিন পর হরিচরণের চোখে পানি এসে গেল। মনিশংকর ছেলেকে বললেন, যাও কাকাকে প্রণাম কর।

হরিচরণ আঁৎকে উঠে বললেন, না। না।

মনিশংকর বললেন, আপনি অতি পূণ্যবান ব্যক্তি। আপনাকে প্রণাম না করলে কাকে করবে!

মূল মণ্ডপের বাইরে উঠানে হাঁটুগেড়ে জোড় হস্তে হরিচরণ বসেছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। ঘন্টা এবং ঢাকের আওয়াজ কানে আসছে। নাকে আসছে ধূপের গন্ধ। তাঁর উচিত দেবী দুর্গার বন্দনা করা। তিনি একমনে বলছেন, কৃষ্ণ কোথায় ? আমার কৃষ্ণ! কৃষ্ণ।

এইসময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মোটামুটি অপরিচিত লোকজনের মধ্যে পরিচিত একজনকে দেখে দৌড়ে এসে তাঁর কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জহির। হরিচরণ অনেকদিন আগে দেখা স্বপ্নে ফিরে গেলেন। তাঁর মনে হলো, সত্যি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার কোলে। জ্ঞান হারিয়ে উঠানে পড়ে গেলেন। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। পূজারি ঠাকুর ঘোষণা করলেন, ধর্মচ্যুত মানুষ দেবীর

কাছাকাছি আসায় এই বিপত্তি। দেবী বিরক্তি হয়েছেন। দেবীর বিরক্তি দূর করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। আলাদা পূজাপাঠ লাগবে।

হরিচরণ দুর্বল শরীরে শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখতে এসেছেন শশী ভট্টাচার্য। ডাক্তার কবিরাজের মতো গম্ভীর ভঙ্গিতে নাড়ি ধরে থেকে বলেছে, আপনার কি মৃগী আছে ? হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মৃগীর লক্ষণ।

আমার মৃগী নাই।

নাই, হতে কতক্ষণ ? সাবধানে থাকবেন। একডোজ ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমিয়ে থাকুন। ওষুধের কারণে সুনিদ্রা হবে। ক্লান্তি দূর হবে।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি ডাক্তারি কর না-কি ?

শশী ভট্টাচার্য বললেন, আমি শখের চিকিৎসক। বায়োকেমিক চিকিৎসা করি। বায়োকেমিক চিকিৎসা বিষয়ে কি আপনি কিছু জানেন ?

না।

আমাদের বায়োকেমিক শাস্ত্রে ওষুধের সংখ্যা মাত্র বারো। বারোটা ওষুধে সর্বরোগের উপশম। লক্ষণ বিচার করে ঠিকমতো ওষুধ দিতে পারলেই হলো।

শশী ভট্টাচার্য মনে হয় বান্ধবপুরে স্থায়ী হয়ে গেছেন। বান্ধবপুরে প্রাইমারি স্কুল চালু হয়েছে। তিনি তার শিক্ষক। ছাত্রসংখ্যা তিন। তাঁর প্রধান কাজ ছাত্র সংগ্রহ করা। অপ্রধান কাজ হরিচরণের জমিদারির হিসাব-নিকাশ দেখা।

শশী ভট্টাচার্যের বর্তমান পরিচয়— পাগলা মাস্টার।

যে মাস্টার কালো একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ছেলেপুলে দেখলে পেছন থেকে এসে ঘাড় চেপে ধরে বলে— তোর বাবার কাছে আমাকে নিয়ে যা। তোকে স্কুলে ভর্তি করাব। পেট এত মোটা কেন ? পেটভর্তি কৃমি গজগজ করছে। হা কর— ওষুধ খাবি।

রোগী পালাতে চেষ্টা করে। ঝেড়ে দৌড় দেয়। পেছনে পেছনে দৌড়ান শশী মাস্টার।

একদিন রোগীর পেছনে ছুটতে শশী মাস্টার শশাংক পালের সামনে পড়ে গেল। শশাংক পাল বললেন, আপনার পরিচয় ?

শশী মাস্টার বললেন, আমার বর্তমান পরিচয় আমি একজন দৌড়বিদ। রোগী ধরার জন্যে দৌড়াচ্ছি।

ও আচ্ছা! আপনি পাগলা মাস্টার। আপনার কথা শুনেছি। আমার নাম শশাংক পাল। জমিদারি ছিল। হাতিতে চড়ে ঘুরতাম। এখন হাঁটাহাঁটি করি।

শশী মাস্টার বললেন, হাঁটাহাঁটি করা শরীরের জন্যে ভালো। ভিক্ষুক শ্রেণীর যারা সারাদিন হাঁটার মধ্যে, তারা রোগমুক্ত।

শশাংক পাল বললেন, আমি বর্তমানে ভিক্ষুক শ্রেণীতেই পড়ি, তবে রোগমুক্ত না। নানান রোগ শরীরে স্থায়ী হয়েছে। ভালো কথা, আপনি কি মদ্যপান করেন ?

না।

শশাংক পাল বললেন, মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে ভালো হতো। আপনার সঙ্গে মদ্যপান করতাম। একা মধ্যপান করা বড়ই কষ্টের।

শশী মাস্টার বললেন, আপনি বোতল নিয়ে আমার এখানে চলে আসবেন। আপনি বোতল নামাবেন আমি ব্যাঞ্জো বাজাব। কলের গানের গানও শুনতে পারেন। আমার একটা কলের গানও আছে।

আপনার কলের গানের কথা শুনেছি। কলের গানের গান আমি পছন্দ করি না। যে গানে গায়ককে দেখা যায় না সেই গান মূল্যহীন। আপনার চামড়ার বাক্সে কি ওষুধ ? লিভারের ব্যথার কোনো ওষুধ যদি থাকে দিন। খেয়ে দেখি। আমি আবার ওষুধ খেতে খুব পছন্দ করি। যে-কোনো ওষুধ আগ্রহ করে খাই।

বৈশাখ মাসের এক রাতের কথা। আকাশে নবমীর চাঁদ উঠেছে। শশী মাস্টারের টিনের চালে চাঁদের আলো পড়েছে। টিনের চাল ঝলমল করছে। বনভূমির ঝাঁকড়া সব গাছ মাথায় জোছনা মেখে দুলছে। সৃষ্টি হয়েছে অলৌকিক এক পরিবেশ। শশী মাস্টার কলের গান ছেড়ে জোছনা দেখতে ঘরের বার হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। জামঘাছের নিচে টুকটুকে লালশাড়ি পরে এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে।

শশী ভট্টাচার্যের হঠাৎ মনে হলো, এ কোনো মানবী না। নিশ্চয়ই স্বর্গের উর্বশীদের কেউ। কিংবা দেবী স্বরস্বতী স্বয়ং মর্তভূমে নেমে এসেছেন। শশী ভট্টাচার্য বললেন, কে ?

তরুণী চমকে উঠল। কিন্তু জবাব দিল না। ছুটে পালিয়েও গেল না।

শশী ভট্টাচার্য বললেন, আপনি কে ? এখানে কী করেন ?

তরুণী নিচু গলায় বলল, গান শুনি।

আপনি কি এই অঞ্চলের ?

তরুণী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশী ভট্টাচার্য বললেন, কলের গানে গান হচ্ছে। চোঙের ভেতর দিয়ে গান আসে। একটা যন্ত্র। হাত দিয়ে দম দিতে হয়। আপনি কি যন্ত্রটা দেখবেন ?

না।

আপনি কি প্রথম গান শুনতে এসেছেন ? নাকি আগেও এসেছেন ?

আগেও আসছি।

তরুণী চারটা আঙুল দেখাল।

শশী মাস্টার বললেন, গান শুনতে ভালো লাগছে ?

হুঁ।

আরেকটা থাল দিব!

থাল কী ?

গোল থালের মতো জিনিস। যেখানে গান বাঁধা থাকে।

তরুণী বলল, গান কি দই যে বাঁধা থাকব ?

একটা থাল এনে আপনাকে দেখাই ? থালটা যন্ত্রের ভেতর দিয়ে হ্যান্ডল চাপলেই থাল থেকে গান হয়।

তরুণী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশী মাস্টার বললেন, আপনার নাম কী ?

নাম বলব না।

বলতে না চাইলে বলবেন না। আপনি দাঁড়ান, আমি থাল এনে দেখাচ্ছি।

তরুণী বলল, আচ্ছা।

শশী মাস্টার রেকর্ড নিয়ে এসে তরুণীকে দেখতে পেলেন না। জামগাছের নিচে কেউ নেই। আশেপাশেও নেই। কোনো এক বিচিত্র কারণে তার সারারাত ঘুম হলো না। তিনি গভীররাতে ডায়েরি খুলে লিখলেন—

> I saw an Indian lady at the dead of night. Her captivating beauty was all engulfing. For a moment I lost all my senses, I felt like bowing down at her feet.

শ্রাবণ মাস। হাওরে পানি এসেছে। নদীনালা ফুলে ফেঁপে উঠছে। ধনু শেখ তাঁর একতলা লঞ্চ বিক্রি করে দোতলা লঞ্চ কিনেছেন। এই লঞ্চের প্রধান বিশেষত্ব তার হর্ন। ঘাটে ভিড়েই এমন বিকট শব্দে 'ভোঁ' দেয় যে বাজারের লোকজন চমকে উঠে। লঞ্চের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হিন্দু মুসলিমের আলাদা আসন। হিন্দুরা দোতলায়। মুসলমানরা একতলায়। কোনো মুসলমান দোতলায় উঠতে পারবে

না। দোতলায় ভাতের হোটেল আছে। ব্রাহ্মণ বাবুর্চির হাতে হোটেল। ছয় আনায় অতি উত্তম ব্যবস্থা। পেটচুক্তি ভাত। সবজি, ডাল, ছোট মাছের চচ্চড়ি। খাওয়ার শেষে একবাটি মিষ্টি দই।

মুসলমানদের জন্যে আলাদা হোটেল নেই। যারা খেতে চায় দোতলার খাবার নিচে চলে আসে। তবে মুসলমানরা সাধারণত কিছু খায় না। তাদের এত পয়সাকড়ি নেই।

দোতলা লঞ্চ চালুর দিনও ধনু শেখ গেল নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে। তাঁর আশীর্বাদ নিতে।

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন, দোতলা লঞ্চ কিনেছ খবর পাইছি। অল্পদিনে ভালো দেখাইলা।

ধনু শেখ বিনীত গলায় বলল, আপনার আশীর্বাদ। আপনার আশীর্বাদ বিনা এই কাজ সম্ভব ছিল না।

লঞ্চের নাম নাকি দিছ— জয় মা কালী সার্ভিস?

জে কর্তা।

তুমি মুসলমান হইয়া লঞ্চের নাম দিলা জয় মা কালী?

ধনু শেখ বলল, বাতাস বুইজ্যা পাল তুলছি। হিন্দু যাত্রী বেশি। সেই কারণে হিন্দু নাম।

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন, মুসলমান যাত্রী যদি বেশি হওয়া শুরু করে তখন কি নাম পাল্টাইবা?

ধনু শেখ হাসিমুখে বললেন, অবশ্যই। তখন নাম হইব 'মা ফাতেমা সার্ভিস'।

মা ফাতেমাটা কে?

আমাদের নবিজির কন্যা।

ভালো। ভালো। খুব ভালো।

আমার অনেক দিনের ইচ্ছা আপনেরে লঞ্চ করে সোহাগগঞ্জ বাজারে নিয়া যাব। একটু ইজ্জত করব।

নিবারণ চক্রবর্তী বিরক্ত গলায় বললেন, ইজ্জত আমার যথেষ্টই আছে। তোমার ইজ্জতের প্রয়োজন নাই।

ধনু শেখ বলল, অবশ্যই অবশ্যই।

এই ঘটনার দু'দিন পরই নিবারণ চক্রবর্তীর দোতলা লঞ্চ সোহাগগঞ্জে অচল হয়ে পড়ে গেল। ইঞ্জিনে যে ডিজেল দেয়া হয়েছিল সেখানে নাকি পানি মেশানো ছিল। ডিজেল কেনা হয়েছিল ধনু শেখের দোকান থেকে। সে ডিজেল এবং কেরোসিনের ডিলারশিপ পেয়েছে। তার কাছ থেকে ডিজেল না কিনে উপায় নেই।

শশী মাস্টার ভোরবেলা ঘর ছেড়ে বের হন। মাধাই খালে একঘণ্টা সাঁতার কাটেন। ভেজা কাপড়েই যান স্কুলে। ভেজা কাপড় গায়ে শুকালে স্বাস্থ্য ভালো থাকে এই যুক্তিতে ভেজা কাপড় গায়ে শুকান। স্কুলের ছাত্র পড়ানো শেষ করে, জমিদারির কাগজপত্র নিয়ে বসেন। দুপুরে হরিচরণের সঙ্গে ফলাহার করেন। হরিচরণের সঙ্গে টুকটাক কিছু কথাবার্তা হয়। সবই ধর্মবিষয়ক। ঈশ্বরের স্বরূপ কী ? উপনিষদ বলছে— জগত মায়া। মায়ার অর্থ কী ? জগৎ যদি মায়া হয় তাহলে কি প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতাও মায়া ? শশী মাস্টারের নিজের বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বরাবরই সন্ধ্যা হয়। নিত্যদিনের এই রুটিনে একদিন ব্যতিক্রম হলো। হঠাৎ জ্বর এসে যাওয়ায় স্কুল ছুটি দিয়ে বাড়ি ফিরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি তাঁর ঘরে। কলের গানের সামনে বসে আছে। পেতলের চোঙের ভেতর চোখ রেখে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। শশী মাস্টারকে দেখে তরুণী ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শশী মাস্টার নিজের বিস্ময় গোপন রেখে বললেন, ঐ রাতে আপনাকে দেখাবার জন্যে থাল এনে দেখি আপনি নাই। চলে গেলেন কেন ?

তরুণী জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল।

শশী মাস্টার বললেন, কলের গান কীভাবে বাজে দেখাব ?

তরুণী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশী মাস্টার বললেন, আপনি কি আমার বাড়িতে এর আগেও ঢুকেছেন।

তরুণী হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে তিনটা আঙুল উচিয়ে দেখাল। সে তিনবার ঢুকেছে।

কলের গান দেখার জন্যে ?

হুঁ।

আপনার নাম জানতে পারি ? আজ কি আপনি আপনার নামটা বলবেন ?

জুলেখা।

মুসলমান ?

হুঁ।

গান খুব পছন্দ করেন ?

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আপনি নিজে একটা বাজনা বাজান আমি দেখছি। বেঞ্জো।

হ্যাঁ, ব্যাঞ্জো।

আপনার বাজনা ভালো না। তাল কাটে।

আপনি কি গান গাইতে পারেন ?

হুঁ।

আমি কি আপনার একটা গান শুনতে পারি ?

না। কলের গানটা বাজান। আমি দেখি।

শশী মাস্টার কলের গান চালু করলেন। মীরার ভজন হচ্ছে। শশী মাস্টার অবাক হয়ে লক্ষ করলেন— গান শুনতে শুনতে এই অস্বাভাবিক রূপবতী মেয়েটি চোখের পানি ফেলছে।

শশী মাস্টার বললেন, কলের গানটা আপনি নিয়ে যান। আমি আপনাকে দিলাম। উপহার।

জুলেখা বলল, আপনার জিনিস আমি নিব কী জন্যে ? আপনে আমার কে ?

আরেকটা থাল দিব ? অন্য গান।

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

সেই রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে শশী মাস্টার ডায়েরি লিখতে বসলেন— What a shame! I am deeply in love with the muslim lady— মুনিগণ ধ্যান ভেঙে দেয় পয়ে তপস্যার ফল।

অনেক রাতে শশী মাস্টার একটি কবিতাও লিখলেন—

এক জোড়া কালো আঁখি এত মূল্য তারি!
নিতান্ত পাগল ছাড়া কে করে প্রত্যয় ?
জগতের যত রত্ন লাজে মানে হারি—
বিনিময়ে দিতে পারি, যা কিছু সঞ্চয়!

অনেকদিন পর হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি 'ইসলামি গান' শিরোনামে রূপবতী জুলেখার একটি রেকর্ড প্রকাশ করে। সেখানে তার নাম লেখা হয় চান বিবি। গানের প্রথম কলি— 'কে যাবি কে যাবি বল সোনার মদিনায়।' সেই গল্প যথাসময়ে বলা হবে। এই ফাঁকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাটা বলে নেই। সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং রানী মেরী বেড়াতে এসেছেন ভারতবর্ষে (ডিসেম্বর, ১৯১১)। তাঁদের সম্মানে দিল্লিতে এক মহা দরবার অনুষ্ঠিত হলো। সেই দরবারে সম্রাট হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করলেন। মুসলমানরা মর্মাহত। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ইংরেজের প্রিয়পাত্র হয়েও তিনি বঙ্গভঙ্গের কঠিন সমালোচনা করলেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন আইনজীবী মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহম্মদ আলি, মাওলানা জাফর আলি খান। রাজনীতির আসরে এই সময় যুক্ত হয়েছেন বরিশালের চাখার থেকে আসা এক তরুণ। তাঁর নাম এ কে ফজলুল হক।

কার্তিক মাসের শেষ।

উত্তরের গারো পাহাড় থেকে শীতের হিমেল হাওয়া উড়ে আসতে শুরু করেছে। এবারের লক্ষণ ভালো না। মনে হয় ভালো শীত পড়বে। দু'বছর পরপর হাড় কাঁপানো শীত পড়ে। গত দু'বছর তেমন শীত পড়ে নি।

হরিচরণ চাদর গায়ে পুকুরপাড়ে এসে বসেছেন। তাঁর মন বেশ খারাপ। তিনি খবর পেয়েছেন ধনু শেখের দোতলা লঞ্চে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভেদবমি করতে করতে একজন মারা গেছে। বান্ধবপুরে কলেরা এসে ঢুকেছে। গ্রামের পর গ্রাম শূন্য করে দেয়া এই ব্যাধির কাছে মানুষ অসহায়। তিনি মনে মনে বললেন, দয়া কর দয়াময়। যেন দেবী ওলাউঠা লঞ্চে করে বান্ধবপুর না নামেন। তাঁর প্রার্থনার সময় বিস্ময়কর এক ঘটনা ঘটল। তাঁর দিঘিতে একজোড়া শীতের হাঁস নামল। শীতের পাখি নামে হাওরে, মনে হচ্ছে এই প্রথম কোনো দিঘিতে নামল। দিঘিও এমন কিছু বড় দিঘি না। এরা কি মনের ভুলে নেমে পড়েছে? নাকি কোনো কারণে দলছুট হয়েছে? দলছুট হবার সম্ভাবনাই বেশি।

দু'টি হাঁসের একটি পানিতে স্থির হয়ে আছে। অন্যটি একটু পরপর ডুব দিচ্ছে। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত, ঘটনা কী?

হরিচরণ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। দু'টা পাখিই ঘাটের কাছে। ভয় পেয়ে ওদের উড়ে যাওয়া উচিত, তা গেল না। সম্ভবত এরা মানুষ দেখে অভ্যস্ত না। মানুষ যে বিপদজনক প্রাণী এই তথ্য এখনো জানে না। হরিচরণ বললেন, তোদের সমস্যা কী রে? একটা হাঁস তাঁর দিকে তাকাল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এ ক্লান্ত। রোগা শরীর। দুই থেকে আড়াই মাস এরা থাকবে। মোটাতাজা হয়ে দেশে ফিরে যাবে। একটা পাখি তার একজীবনে কতবার আসা যাওয়া করে এই তথ্য কি কেউ জানে? হরিচরণ ঠিক করে ফেললেন গদিতে পৌঁছেই পাখিবিষয়ক কোনো বইপত্র পাওয়া যায় কি-না জানতে চেয়ে কোলকাতায় চিঠি

লিখবেন। 'মানব বুক হাইস' নামে একটা বইয়ের দোকানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। তাঁর প্রয়োজনীয় বইপত্র এরাই পাঠায়।

জুলেখা বাটিভর্তি খেজুরের রস নিয়ে এসেছে। নিজেদের গাছের রস। সে জ্বাল দিয়ে ঘন করেছে। অপূর্ব ঘ্রাণ ছেড়েছে। খেজুরের রস খেজুরপাতা দিয়ে জ্বাল না দিলে ভালো ঘ্রাণ হয় না। জুলেখা খেজুরপাতা দিয়েই রস জ্বাল দিয়েছে।

জুলেখা লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, আপনার জন্যে খেজুরের রস আনছি।

ভালো করেছ। রস ভালো হয়েছে। সুঘ্রাণ ছেড়েছে। তাকিয়ে দেখ দিঘিতে দু'টা হাঁস নেমেছে।

ও আল্লা। কী আচানক! আরো কি নামবে ?

নামতে পারে। সব পশুপাখি নিজেদের ভেতর যোগাযোগ রাখে। এই দু'টা পাখি হয়তো অন্যদের খবর দিবে। আমি ঠিক করেছি আজ আর গদিতে যাব না। ঘাটে বসে থাকব। দেখি আরো পাখি নামে কি-না।

জুলেখা মুখে আঁচল চাপা দিতে দিতে বলল, বাবা, আপনি আজব মানুষ।

হরিচরণ বললেন, আমরা সবাই আজব মানুষ। তুমি আজব, তোমার ছেলে আজব, তোমার স্বামী আজব। ঈশ্বর নিজে আজব, সেই কারণে তিনি আজব জিনিস তৈরি করতে পছন্দ করেন। রসের বাটিটা দাও, এক চুমুকে খেয়ে ফেলি।

জুলেখা বিস্মিত হয়ে বলল, এতটা রস একসঙ্গে খাবেন ?

কোনো অসুবিধা নাই, দুপুরে ভাত খাব না।

হরিচরণ তৃপ্তি করে বাটিভর্তি ঘন খেজুরের রস শেষ করলেন। পুকুরের পানিতে ঠোঁট ধুতে ধুতে বললেন, মা, তুমি নানান সময়ে নানান ভাবে আমার সেবা করছ। তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই। কী পেলে তুমি খুশি হবে ?

জুলেখা জবাব দিল না। যদিও তার ইচ্ছা করছে বলে, আমাকে একটা কলের গান কিনে দেন। এই যন্ত্রটার জন্যে আমি আমার জীবন দিয়ে দিতে রাজি। কী অদ্ভুত জিনিস! পিতলের এক চোঙ। চোঙের ভেতর দিয়ে আসে কী সুন্দর গান। একটা গান ইচ্ছা করলে দশবার শোনা যাবে। সুরে ভুল হবে না। তালে ভুল হবে না। বাজনায় ভুল হবে না। কী আজব যন্ত্র! ইশ সে যদি তার বাপজানকে যন্ত্রটা দেখাতে পারত!

হরিচরণ বললেন, তোমার মনের মধ্যে কিছু আছে, বলে ফেল।

জুলেখা বলল, মনের মধ্যে কিছু নাই।

বলতে বলতে সে হরিচরণের পাশে বসল। হরিচরণ বললেন, এই হাঁসের একটা নাম আছে, সেটা জানো ?

জুলেখা বলল, না।

এর নাম 'দেশান্তরী পাখি'। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়, এই জন্যেই দেশান্তরী।

জুলেখার মনে হলো— কী সুন্দর নাম! দেশান্তরী। পাখিদের মতো দেশান্তরী মানুষও তো আছে যাদের কাজ এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া। তার নিজের বাবাও তো দেশান্তরী। জুলেখার ইচ্ছা করছে দেশান্তরী দিয়ে একটা গান লেখে। প্রথম লাইন—

দেশান্তরী বান্ধই গো, কোন দেশেতে যাও ?

পরের লাইনটা মাথায় আসছে না। সে যদি লেখাপড়া জানত এই লাইনটা লিখে রাখত। লেখাপড়া শেখা খুব কি জটিল ? সে কোরান মজিদ পাঠ করতে পারে। লিখতে পারে না।

হরিচরণ বললেন, জুলেখা, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও ? বলতে চাইলে বলো।

জুলেখা মাথা নিচু করে বলল, আমি বাংলা লেখা বাংলা পড়া শিখতে চাই।

হরিচরণ বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকা তরুণীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি নিজে তোমাকে শেখাব। তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাখবে। মুসলমানদের মধ্যে এই বিষয়টা দেখেছি। তারা স্ত্রীদের লেখাপড়া পছন্দ করে না।

জুলেখা বলল, স্ত্রী লেখাপড়া শিখলে স্বামীর হায়াত কমে, এইজন্যে পছন্দ করে না।

এইসব তো ভুল কথা।

সবাই জানে ভুল কথা, তারপরও ভুল কথাই মানে।

তুমি সুলেমানকে আমার কাছে পাঠাবা, আমি তারে বুঝায়া বলব।

সে দেশে নাই। মৈমনসিং গেছে কামে। ফিরতে একমাস লাগব। আমি কি এর মধ্যে শিখতে পারব না ?

হরিচরণ কিছুক্ষণ জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, অবশ্যই পারবা। বলো— অ।

জুলেখা বলল, অ।

এখন বলো, আ।

জুলেখা বলল, আ।

এক টুকরা কয়লা আন। আমি অক্ষর দুইটা লিখব। আজ সন্ধ্যায় তোমার জন্যে বাল্যশিক্ষা কিনে আনব।

জুলেখা এক টুকরো কয়লা এনেছে। শ্বেতপাথরে সেই কয়লার দাগ বসছে না। হরিচরণ উঠে দাঁড়ালেন। ঘাটে বসে থাকার পরিকল্পনা তিনি বাদ দিয়েছেন। তিনি বাজারে যাবেন। মেয়েটার জন্যে স্লেট পেন্সিল কিনবেন। বাল্যশিক্ষা কিনবেন।

হরিচরণ ঘাট থেকে যাবার কিছুক্ষণ পরই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। দিঘিতে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস নামতে শুরু করল। দেখতে দেখতে দিঘি হাঁসে পূর্ণ হলো। অদ্ভুত দৃশ্য। যেন দিঘিতে হাঁসের সর পড়েছে। সেই সর উঠানামা করছে। হাঁসদের কারণে দিঘি থেকে হোঁ হোঁ হোঁ জাতীয় গম্ভীর ধ্বনি উঠছে।

একই সময় বাবু মনিশংকরের বাড়ি থেকে অসময়ে শাঁখের শব্দ হতে লাগল। মনিশংকরের এক জেঠির ভেদ বমি শুরু হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে দেবী ওলাউঠার দয়া। দেবীকে দূর করার জন্যেই শঙ্খধ্বনি। অদ্ভুত শব্দ আসছে শঙ্খ থেকেও। ভোঁ ভোঁ ভোঁ। যেন দূর থেকে লঞ্চ ভোঁ দিচ্ছে। শঙ্খের শব্দের সঙ্গে হাঁসের শব্দ মিলে একাকার হয়ে গেল।

সুলেমানের স্ত্রী জুলেখা আয়োজন করে পায়ে আলতা দিচ্ছে। সে বসেছে বেতের মোড়ায়। তার পা জলচৌকিতে রাখা। পাটকাঠির মাথা কলমের নিচের মতো কেটে তুলি বানানো হয়েছে। জহির মুগ্ধ চোখে মা'র পায়ের শিল্পকর্ম দেখছে। একটু দূরে ছোট ধামাভর্তি মুড়ি এবং খেজুর গুড় নিয়ে বসেছে সুলেমান। সে তিন দিন হলো ফিরেছে। স্ত্রীর জন্যে কচুয়া রঙের একটা শাড়ি এনেছে। এই বিষয়ে স্ত্রীর কোনো উৎসাহ নেই দেখে আহত হয়েছে। জুলেখা সেই শাড়ির ভাজ এখনো খুলে নি। নতুন শাড়ি পেয়ে কদমবুসি করা প্রয়োজন, তাও করে নি। তার পুত্র জহির মুড়ি খাওয়া বাদ দিয়ে মায়ের সাজ দেখছে, এতেও সুলেমান মহা বিরক্ত। আজ জুম্মাবার। জুম্মাবারে এত সাজসজ্জা কী ?

সুলেমান জহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ পুলা, মুড়ি খাইয়া যা।

জহির মা'র দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই গম্ভীর গলায় বলল, না।

জুলেখা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, পাও আলতা দিতে ইচ্ছা করে ?

জহির সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার ছোট্ট পা জলচৌকিতে তুলে দিল। জুলেখা ছেলের পায়ে লাল টুকটুকে একটা মাছ এঁকে দিল। জহিরের মুখভর্তি হাসি।

রাগে সুলেমানের শরীর জ্বলে যাচ্ছে। ছেলেকে নিয়ে সে জুম্মার নামাজ পড়তে যাবে, এর মধ্যে পায়ে আলতা! তার উচিত ছেলের গালে শক্ত করে একটা চড় দেয়া। এটা সে করতে পারছে না। জহিরের শরীর ভালো না। কালরাতেও জ্বর ছিল। এখনো হয়তো আছে।

সুলেমান বলল, সক্কালবেলা আলতা নিয়া বসলা। কাজটা উচিত হয়েছে ?

জুলেখা বলল, সক্কালে আলতা দেওয়া যাবে না এমন কথা কি হাদিস কোরানে আছে ?

এইটা কেমন কথা ? তোমার উপরে কি জিন ভূতের আছর হইছে ? জিন ভূতের আছর হইলে মেয়েছেলে স্বামীর মুখের উপরে ফড়ফড় করে। জঙ্গলায় ঘুরে। সময় অসময়ে গীত ধরে।

জুলেখা জবাব না দিয়ে ছেলের অন্যপায়ে আরেকটা মাছ আঁকছে। সুলেমান বলল, পুরুষ মাইনষের পাও আলতা দিতাছ ?

জুলেখা বলল, জহির পুলাপান। পুলাপানের পায়ে আলতা দিলে দোষ হয় না।

এই কথা কোন বুজুর্গ আলেম তোমারে বলেছে ?

জুলেখা জবাব দিল না। স্বামীর বেশিরভাগ প্রশ্নেরই সে জবাব দেয় না।

সুলেমান বলল, জহিররে নিয়া জুম্মার নামাজ পড়তে যাব। তখন যদি পাও রঙ থাকে—

জুলেখা ফিক করে হেসে ফেলল।

সুলেমান বলল, হাসলা যে ? কী কারণে হাসলা ?

জুলেখা বলল, কী কারণে হাসছি আপনেরে বলব না।

জুলেখা হাসছে কারণ সে তার স্বামীকে ভালো ফাঁকি দিয়েছে। তাকে না জানিয়ে লেখাপড়া শিখে ফেলেছে। যে-কোনো লেখা সে এখন পড়তে পারে।

সুলেমান বলল, তুই অবশ্যি বলবি।

তুই তোকারি কইরেন না।

সুলেমান কঠিন গলায় বলল, আগে বল তুই হাসলি কী জন্যে ? হাসির কথা কী হইছে ?

জুলেখা কিছুই বলল না, নিজের মনে পায়ে আলতা দিতে লাগল। সুলেমান মুড়ি খাওয়া বন্ধ করে উঠে এলো। প্রথমে ভেবেছিল স্ত্রীর গালে কষে থাপ্পড় দিবে। বেয়াদব স্ত্রীকে শাসন করার অধিকার সব স্বামীর আছে। মাওলানা সাহেব

বলেছেন আল্লাহপাক পুরুষ মানুষরে এই অধিকার দিয়েছেন। কারণ পুরুষের অবস্থান নারীর উপরে। তবে শাসনের সময় খেয়াল রাখতে হবে স্ত্রীর মুখমণ্ডলে যেন মারের চিহ্ন না থাকে। সুলেমান থাপ্পড় উঠিয়ে এগিয়ে এলেও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। থাপ্পড় দেবার বদলে আলতার শিশি উঠানে ছুড়ে ফেলে দিল।

জুলেখার একপায়ে আলতা দেয়া হয়েছে। অন্য পা খালি। আবার কবে আলতা কেনা হবে, কবে পায়ে দেয়া হবে কে জানে! বেদেবহর নৌকা করে এখনো আসে নি। তারা চলে এলে সমস্যা নেই। গাইন বেটিরা ঝুড়ি ভর্তি করে কাচের চুড়ি, আলতা, গন্ধতেল নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরবে। বাহারি জিনিস বেচবে। একইসঙ্গে কাইক্যা মাছের কাটা দিয়ে শরীরের বদ রক্ত দূর করবে। গাইন বেটিদের কাছ থেকে শখের জিনিসপত্র কেনার জন্যে এবং বদ রক্ত বের করার জন্যে সব মেয়েই টাকা-পয়সা জমিয়ে রাখে। জুলেখারও জমা টাকা আছে।

সুলেমান বলল, ঝিম ধইরা বইসা থাকবা না। ছেলের পাওয়ের আলতা ঘইসা তোল। আইজ জুম্মাবার। নামাজে যাব। ছেলেরে ঘাটে নিয়ে যাও। রিঠা গাছের পাতা দিয়া ডলা দাও।

জুলেখা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ছেলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলের দুই পায়ে দুই মাছ। কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে মাছ দু'টা! এই সুন্দর দুটা মাছ তুলে ফেলতে হবে ? কাজটা বড়ই কঠিন। সুন্দর নষ্ট করা যায় না। সুন্দর নষ্ট করলে পাপ হয়। এই কথা তার বাপজান তাকে বলেছিলেন।

পুকুরঘাটে পা ডুবিয়ে জহির বসেছে। জুলেখা তার সামনে। জুলেখার হাতে গায়ে মাখা গন্ধ সাবান। এই সাবান গত বছর গাইনবেটিদের কাছ থেকে কেনা, গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা। সুলেমান এত দামের সাবান দেখতে পেলে রাগবে।

জহির বলল, মা গীত কর।

কোন গীত ?

পাও ধুয়ানি গীত।

জুলেখা সঙ্গে সঙ্গে গাইল—

সোনার পায়ে সোনার মাছ
ঝিলমিল ঝিলমিল করে
এই মাছেরে দিয়ে আসব
দক্ষিণ সায়রে।

গানের কথাগুলি জুলেখা এখনই তৈরি করল। তার এত ভালো লাগল। তার বাপজানের গুণ কি তার মধ্যে আছে? কোনোদিন কি সে তার বাপজানের মতো মুখে মুখে গান বাঁধতে পারবে?

মাওলানা ইদরিস খুতবা পাঠ শেষ করলেন। মুসুল্লিদের দিকে তাকালেন। মাত্র নয়জন। তাঁর হিসেবে আরো বেশি হবার কথা। কাঠমিস্ত্রি সুলেমান তার পুত্রকে নিয়ে এসেছে। এটা ভালো। সুলেমান সবসময় আসে না। মাঝেমধ্যে একা আসে, ছেলেকে আনে না। শিশুদের শুরু থেকেই ধর্মকর্মে আগ্রহী করা পিতা-মাতার কর্তব্য। যে পিতা-মাতা এই কর্তব্যে অবহেলা করবেন রোজ হাশরে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির বিধান আছে।

মাওলানা বললেন, আপনাদের জন্য সামান্য শিন্নির ব্যবস্থা আছে।

মাওলানা শিন্নির হাঁড়ি এবং চামচ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুসুল্লিরা কলাপাতা হাতে নিলেন। নবিজি মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন। নবিজির পছন্দের জিনিস করা তাঁর উম্মতের জন্যে সোয়াবের কাজ।

শিন্নি মাওলানা নিজেই তাঁর বাড়িতে প্রস্তুত করেছেন। দুধ, আলোচাল, গুড়, সঙ্গে কিছু কিশমিশ এবং তেজপাতা। খাঁটি দুধ। দীর্ঘসময় জ্বাল হয়ে অপূর্ব স্বাদু বস্তু তৈরি হয়েছে। সবাই আগ্রহ করে খাচ্ছে। মাওলানা দ্বিতীয়বার শিন্নি দিতে দিতে বললেন, আল্লাহ্‌পাক আমার উপর বড় একটা দয়া করেছেন বলেই এই শিন্নির ব্যবস্থা। আপনারা আমার জন্যে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোয়া করবেন। সবাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। কেউ জানতে চাইল না— বড় দয়াটা কী?

মাওলানা নিজেই খোলাসা করলেন। তিনি কোরান মজিদ পুরোটা মুখস্থ করেছেন। এখন তাঁকে কোনো আলেম হাফেজের কাছে যেতে হবে। তাঁকে কোরানমজিদ মুখস্থ শোনাতে হবে। হাফেজ সাহেব যদি বলেন ঠিক আছে, তাহলে নামের শুরুতে তিনি হাফেজ টাইটেল ব্যবহার করবেন। তাঁর টাইটেল হবে হাফেজ মাওলানা ইদরিস।

জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষাই তখন অপূর্ণ থাকবে— নবিজির মাজার জেয়ারত। হজ্ব তাঁর জন্যে ফরজ না। তিনি বিত্তহীন সামান্য মাওলানা। হজে তাঁর না গেলেও হবে, কিন্তু নবিজির মাজার জেয়ারত করা তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। তিনি নবিজির মাজারের কাছে যাবেন, দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে বলবেন, হে জগতের আলো, পেয়ারা নবি! আসসালামু আলায়কুম। আমি আল্লাহ্‌পাকের

নাদান বান্দা গুনাগার ইদরিস। যে পাক কোরান আপনার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছে সেই পাক কোরান আমি মুখস্ত করেছি। আমার দিলের একটা খায়েশ আপনেরে কোরান মজিদ আবৃত্তি করে শোনাব। যদি অনুমতি দেন।

জুমার নামাজ শেষ করে মাওলানা নিজের ঘরে ফিরেছেন। আজকের দিনটি স্মরণে যেন থাকে এইজন্যে বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা লিচুগাছের চারা লাগালেন। গাছ বড় হবে। একসময় ফল আসবে। নবিজি গাছ রোপণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। একবার এক হত্যাঅপরাধীর মৃত্যুদণ্ড রদ করে গাছ রোপণের দণ্ড দিয়েছিলেন। তার শাস্তি হয়েছিল সে একশ' খেজুর গাছ লাগাবে এবং প্রতিটি গাছকে সেবাযত্নে ফলবতী করবে।

এই অঞ্চলে লিচুগাছ নেই। হিন্দুবাড়িতেও নেই, মুসলমান বাড়িতেও নেই। লোকজ বিশ্বাস— বসতবাড়ির আশেপাশে লিচুগাছ লাগানো যাবে না। লিচুগাছ মানুষকে নির্বংশ করে।

মাওলানার চালাঘরটা সুন্দর। উঠানে একটা পাতা পড়ে নেই। দু'বেলা এই উঠান মাওলানা নিজে ঝাট দেন। সপ্তাহে একদিন গোবর-মাটির মিশ্রণ লেপে দেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর ইসলাম ধর্মে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

লিচুগাছ লাগানোর পরপরই মাওলানা অনুভব করলেন তাঁর জ্বর আসছে। শরীর কেমন যেন করছে। গা গুলাচ্ছে। বমি আসছে। আজকের দিনের অতিরিক্ত উত্তেজনায় কি এমন হচ্ছে ? মাওলানা ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। দীর্ঘ কয়েক বছর পর আজ প্রথম তাঁর আসরের নামাজ কাজা হলো। মাগরেবের নামাজ কাজা হলো। বমি করে তিনি ঘর নষ্ট করলেন, নিজের পায়জামা-পাঞ্জাবি নষ্ট করলেন।

একজন কোরানে হাফেজ অপবিত্র থাকতে পারেন না। তাঁকে সবসময় অজুর মধ্যে থাকতে হবে। কারণ তাঁর শরীরে পবিত্র কোরান মজিদ। তিনি জ্বর গায়েই গোসল করলেন। ধোয়া পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলেন।

সুলেমানের বাড়ি অন্ধকার। সন্ধ্যার পরপর বাড়িতে আলো দিতে হয়। সন্ধ্যায় আলো না দিলে বসতবাড়িতে ভূত-প্রেত ঢোকে। খারাপ বাতাস কপাটের পেছনে স্থায়ী হয়ে যায়। সুলেমানের স্ত্রী জুলেখা বাড়ির পেছনের উঠানের জলচৌকিতে বসে আছে। তার হাতের কাছে কুপি, সে এখনো কুপি ধরায় নি। সন্ধ্যা থেকে কাঁদছিল, এখন কান্না বন্ধ। গালে পানির দাগ বসে গেছে। আজ

তাকে কঠিন শাস্তির ভেতর দিয়ে যেতে হবে তা সে জানে। শাস্তি কী হবে জানে না বলেই অশান্তি।

আজ সে অপরাধও করেছে গুরুতর। দুপুরে যখন ঘরে কেউ ছিল না (সুলেমান গেছে হাটে। তার পুত্র গেছে হরিচরণের বাড়িতে হাতি দেখতে।) তখন সে বাড়ির পেছনের পুকুরে গোসল করতে গেল। পুকুর ঠিক না, বড়সড় ডোবা। বর্ষায় পানি হয়। সুলেমান কাঠের কয়েকটা গুড়ি ফেলে ঘাটের মতো করে দিয়েছে। ডোবার চারদিকেই ঘন জঙ্গল। আব্রু রক্ষার আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। জুলেখা গোসল করতে ঘাটে গেল। পানিতে নামল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে। গায়ে কোনো কাপড় ছাড়া পানিতে ভেসে থাকার অন্যরকম আনন্দ। কেউ তো আর দেখছে না।

জুলেখা অতি রূপবতীদের একজন। আজ তাকে আরো সুন্দর লাগছে। শঙ্খের মতো শাদা গা থেকে অলো ঠিকরে আসছে। খাড়া নাক আজ অনেক তীক্ষ্ণ লাগছে। বড় বড় চোখ। ছায়াদায়িনী দীর্ঘ পল্লব যেন আরো গাঢ় হয়েছে। পান না খেয়েও ঠোঁট লাল। মাথার চুল ঈষৎ পিঙ্গল। সেই চুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত।

বাড়ির সীমানার বাইরে যাওয়া জুলেখার নিষেধ। বাপের দেশে নাইয়র যাওয়াও নিষেধ। বিয়ের পর সে একবার মাত্র তিনদিনের জন্যে বাপের দেশে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। যেতে হয়েছে বোরকা পরে। সুলেমান কঠিন নিষেধ করে দিয়েছিল, পুরুষ আত্মীয়ের সামনেও বোরকার মুখ খোলা যাবে না। বাবা এবং ভাইদের সামনে খোলা যেত। জুলেখার বাবা কোথায় কেউ জানে না। ভাই যারা তারা সৎ মায়ের গর্ভের, কাজেই বোরকার মুখ খোলার প্রয়োজন পড়ছে না।

হাট থেকে সুলেমান ফেরে সন্ধ্যায়। সেদিন কোনো কারণে বা ইচ্ছা করেই সে হাটে না গিয়ে দুপুরের দিকে বাড়ি ফিরল। বসত বাড়ির সদর দরজা দিয়ে সাড়াশব্দ করে না ঢুকে ঢুকল বাড়ির পেছন দিয়ে। চুপি চুপি ঘাটলার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কী দেখছে সে! জুলেখা সাঁতার কাটছে। চোখ বন্ধ করে চিৎ সাঁতার দিচ্ছে। তার নগ্ন শরীরের পুরোটাই পানির উপর ভাসছে। গুনগুন শব্দও আসছে। গান করছে না-কি! সুলেমান চাপা গর্জন করল— এই বান্দি! তুই করস কী?

মুহূর্তের মধ্যে জুলেখা পানিতে ডুব দিল। মানবী জলকন্যা না, দীর্ঘ সময় সে জলে ডুবে থাকতে পারে না। জুলেখাকে ভেসে উঠতে হলো। সে অতি দ্রুত গায়ে কাপড় জড়াল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে সে তাকাল সুলেমানের দিকে।

সুলেমান বলল, কারে শরীর দেখানোর জন্যে নেংটা হইছস ?

জুলেখা বলল, কাউরে দেখানোর জন্যে না।

সুলেমান বলল, মিথ্যা বইল্যা আইজ পার পাবি না। অবশ্যই কেউ আছে। তারে খবর দেয়া আছে। সে জংলার কোনো চিপায় আছে। তার নাম বল।

এমন কেউ নাই।

মুরগি যেমন জবেহ করে তোর গলা সেই মতো কাটব। নাম বল। তুই তো কারণে অকারণে ঐ হিন্দুর বাড়িতে বইসা থাকস। তার ঘর ঠিক করস। উঠান ঝাড় দেস। তার সাথে তোর কী ?

উনারে আমি বাবা ডেকেছি। উনার বিষয়ে কিছু বলবেন না।

মালাউন হইছে তোর বাবা ? আমারে বাবা শিখাস ?

জুলেখা চুপ করে গেল। রাগে উন্মাদ একজন মানুষের সঙ্গে যুক্তি তর্ক করা অর্থহীন। সুলেমান দা হাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘাটে বসে রইল। দু'জন মুখোমুখি বসা। জহির এখনো ফিরে নি। এটা ভালো। হরিবাবুর বাড়িতে আরো কিছুক্ষণ থাকুক। হাতি দেখবে। খেলবে। রাতে তাকে নিয়ে আসবে। সবচে' ভালো হয় রাতে ছেলে ঐ বাড়িতে যদি থেকে যায়। এখানে কী ঘটনা ঘটবে কিছুই বলা যায় না।, খুন খারাবিও হয়ে যেতে পারে। পুলাপানদের এইসব দেখা ঠিক না।

সুলেমান ফিরল বিছুটি পাতার বড় একটা ঝাড় হাতে নিয়ে। তার মুখভঙ্গি শান্ত। রাগের প্রথম ঝড় পার হয়েছে। প্রথম ঝড়ের পর দ্বিতীয় ঝড় আসতে কিছু সময় নেয়। সুলেমান কুপি জ্বালিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, নেংটা হইতে তোর মজা লাগে। এখন নেংটা হ।

জুলেখা বলল, না।

সুলেমান বলল, কোনো কথা না। যা করতে বললাম করবি। শাড়ি খোল।

না।

আবার বলে না! এক্ষণ খুলবি। তোর নেংটা হওনের স্বাদ জন্মের মতো মিটায়ে দিব। শাড়ি খোল।

জুলেখা শাড়ি খুলল। সুলেমান বিছুটি পাতার বাড়ি শুরু করল। দু'হাতে মুখ ঢেকে জুলেখা পশুর মতো গোঙাতে শুরু করল। তার শরীর ফুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। জায়গায় জায়গায় কেটে রক্ত বের হচ্ছে। ফর্সা শরীর হয়েছে ঘন লাল। বিষাক্ত বিছুটি পাতার জ্বলুনিতে জায়গায় জায়গায় চামড়া জমে গেছে। জুলেখার মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। দু'টা চোখই টকটকে লাল।

সুলেমান বিছুটি পাতার ঝাড় ফেলে দিয়ে বলল, শাস্তি শেষ, এখন শাড়ি পর।

জুলেখা পশুর মতো গোঙাতে গোঙাতে বলল, শাড়ি পরব না। এই বাড়িতে আমি যতদিন থাকব নেংটা থাকব।

সুলেমান বলল, কী বললি ?

জুলেখা বলল, কী বলেছি আপনি শুনেছেন। আমি বাকি জীবন এই বাড়িতে নেংটা ঘুরাফেরা করব।

সুলেমান বলল, জহিররে আনতে যাইতেছি। কাপড় পর। ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা কইরা দেখ— আমার জায়গায় অন্য কোনো পুরুষ হইলে শাস্তি আরো বেশি হইত।

সুলেমান ছেলেকে নিয়ে রাত ন'টার দিকে ফিরল। দরজায় খিল দেয়া। অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কানোর পর খিল খুলল। জুলেখা কাপড় পরে নি। সে সম্পূর্ণ নগ্ন। এক হাতে কেরোসিনের কুপি নিয়ে সে স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। যেন কিছুই হয় নি।

সুলেমান স্ত্রীর হাত থেকে কুপি নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। এমন দৃশ্য ছেলের দেখা ঠিক না। জহির কাঁদতে শুরু করল।

সুলেমান চাপা গলায় বলল, তুই নেংটা থাকবি ?

হুঁ।

তোরে তো জিনে ধরেছে।

ধরলে ধরেছে।

আমার ঘরে তোর জায়গা নাই।

না থাকলে চইল্যা যাব।

তোরে তালাক দিলাম। তালাক। তালাক। তালাক। এখন ঘর থাইকা যাবি। নেংটা অবস্থায় যাবি।

জুলেখা স্বাভাবিক গলায় বলল, আচ্ছা।

মাওলানা ইদরিসের জ্বর আরো বেড়েছে। শরীর এবং হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। আরেকবার বমি আসছে। দ্বিতীয়বার বিছানা নষ্ট করা কোনো কাজের কথা না। তিনি অনেক কষ্টে হারিকেন হাতে দরজা খুলে বারান্দায় এসে খুঁটি ধরে বসলেন। শরীর উল্টে বমি আসছে, তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। মনে হচ্ছে তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন এবং আজ রাত্রিতেই তাঁর মৃত্যু হবে।

শরীরের এই অবস্থায় তাঁর মনে হলো, অতি রূপবতী এক নগ্ন তরুণী উঠানের কাঁঠাল গাছের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শয়তান তাকে ধান্ধা দেখাতে শুরু করেছে। মৃত্যুর সময় তিনি যাতে আল্লাহখোদার নাম নিতে না পারেন শয়তান সেই ব্যবস্থা করেছে। পরীর মতো এক মেয়ের রূপ ধরে এসেছে।

মাওলানা ইদরিস বললেন, হে আল্লাহপাক, তুমি আমাকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা কর। তিনি আয়াতুল কুরসি পাঠ শুরু করলেন। তাঁর দৃষ্টি কাঁঠাল গাছের দিকে। মেয়েটা এখনো আছে। মাওলানা ভীত গলায় বললেন, তুই কে?

নগ্ন মেয়ে কাঁঠাল গাছের আড়ালে চলে গেল।

মাওলানা বললেন, ইবলিশ দূর হ। তোকে আল্লাহর দোহাই লাগে তুই দূর হ। দূর হ কইলাম।

মেয়েটা দূর হলো না। কাঁঠাল গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। মাওলানা জ্ঞান হারালেন।

গভীর রাতে তার জ্ঞান ফিরল। তিনি বারান্দাতেই শুয়ে আছেন। তবে তাঁর গায়ে চাদর। মাথার নিচে বালিশ। তারচেয়ে আশ্চর্য কথা, শয়তানরূপী মেয়েটা আছে। হারিকেন হাতে তাঁর পাশেই গুটিসুটি মেরে বসে আছে। তার গায়ে বিছানার চাদর জড়ানো।

মাওলানা ভীত গলায় বললেন, তুমি কে?

মেয়েটা জবাব দিল না। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

মাওলানা দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না। কী সুন্দরই না মেয়েটার মুখ! বেহেশতের হুরদের যে বর্ণনা আছে এই মেয়ে সে-রকম। মাওলানা আবারো বললেন, তুমি কে?

মেয়েটা বলল, আমি জুলেখা।

মাওলানা বিড়বিড় করে বললেন, জুলেখা। জুলেখা। জুলেখা। কোরান মজিদে জুলেখার কথা উল্লেখ না থাকলেও তাঁর স্বামী নবি ইউসুফের কথা অনেকবার বলা হয়েছে।

মেয়েটা বলল, আপনের কলেরা হয়েছে।

মাওলানা বললেন, জুলেখা, পানি খাব।

জুলেখা বলল, কলেরা রোগীরে পানি দেওয়া যায় না। পানি খাইলে রোগ বাড়ে।

মাওলানা বললেন, পানি খাব। জুলেখা পানি খাব।

জুলেখা ঘরে ঢুকে গেল। মাওলানার মনে হলো, শয়তান তাকে নিয়ে যে খেলা দেখাচ্ছিল সেই খেলার অবসান হয়েছে। মেয়েটা ফিরবে না।

মেয়েটা কিন্তু ফিরল। হাতে কাঁসার গ্লাস নিয়ে ফিরল। মাওলানা আবার বমি করতে শুরু করলেন। জুলেখা তাঁকে এসে ধরল। মাওলানা বললেন, তুমি কে গো ?

জুলেখা জবাব দিল না।

বাজারের দিক থেকে কাঁসার ঘণ্টা বাজার শব্দ শুরু হয়েছে। খুব হৈচৈ হচ্ছে। কেউ একজন মারা গেছে কলেরায়। ঘণ্টা বাজিয়ে ওলাউঠা দেবীকে দূরে সরানোর চেষ্টা। দেবী একবার যখন এসেছেন এত সহজে যাবেন না। তিনি এসেছেন মায়ের বাড়ির দেশে।

ওলাউঠা দেবী কোনো সহজ দেবী না। বড়ই কঠিন দেবী। তিনি যখন দেখা দেন অঞ্চলের পর অঞ্চল শেষ করে দেন। শীতলা দেবীর মতো তিনি তাঁর চেহারা দেখান না। তিনি ঘোমটায় মুখ আড়াল করে হাঁটেন। হৈচৈ পছন্দ করেন না। ধূপ ধোনার গন্ধ পছন্দ করেন না। তাঁর সবচেয়ে অপছন্দ নদী। শীতলা দেবী যেমন অনায়াসে নদীর পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলে যান, তিনি তা পারেন না। তাঁকে খেয়ামাঝির সাহায্য নিয়ে নদী পারাপার করতে হয়।

ওলাদেবীর হাত থেকে বান্ধবপুরের হিন্দুদের রক্ষার জন্যে বটকালীর মন্দিরে কালীপূজা দেয়া হয়েছে। পাঁঠা বলি হয়েছে। মাটির হাড়িতে পশুর রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই রক্ত দিয়ে সবাই ভক্তিভরে কপালে ফোটা দিয়েছে। কপালে যতক্ষণ এই রক্ত থাকবে ততক্ষণ ওলাউঠা দেবী কাছে ভিড়বে না। তিনি পূজার পশুর রক্ত পছন্দ করেন না। মন্ত্রপূত একটা কালো ছাগলের গলা সামান্য কেটে ছেড়া দেয়া হলো। যন্ত্রণাকাতর এই পশু যেদিকে যাবে তার পেছনে পেছনে যাবেন ওলাদেবী। ছাগল যদি ভিন্ন গ্রামে গিয়ে মরে যায় দেবীকে সেখানেই থাকতে হবে। এই ছাগলটা প্রথমে ছুটে গ্রাম সীমানার বাইরে গিয়েও কী মনে করে আবার ফিরে এলো। মারা গেল বাজারের মাঝখানে।

ওলাদেবীকে দূর করার জন্যে মুসলমানরাও কম চেষ্টা চালাল না। তারা গায়ে আতর মেখে ধূপকাঠি হাতে বের হলো। ওলাদেবী তাড়ানোর মুসলমানী মন্ত্র একটু ভিন্ন। দলের প্রধান বলেন—

বলা দূর যাওরে
আলী জুলফিকার
এই গেরাম ছাড়িয়া যাও
দোহাই আল্লাহর।

দলের প্রধানের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র বাকি সবাই বুক থাপড়ে জিগির ধরে—

হক নাম, পাক নাম
নাম আল্লাহর হু।
আল্লাহর নূরে নবী পয়দা
হু আল্লাহ হু।।

হরিচরণ খুব চেষ্টা করলেন ভয়াবহ এই দুর্যোগে কিছু করার জন্যে। কোনো হিন্দুবাড়িতে তিনি ঢুকতে পারলেন না। এই সময়েও জাত অজাত কাজ করতে লাগল। ওলাদেবী কিন্তু জাতভেদ করলেন না। তিনি শূদ্রের ঘরে যেমন উপস্থিত হলেন, ব্রাহ্মণের ঘরেও গেলেন। দেখা গেল তাঁর কাছে সবই সমান। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল শশী মাস্টার। যেখানেই রোগী সেখানেই তিনি। অতি আদরে রোগীর শুশ্রূষা করছেন। ডাবের পানি খাওয়াচ্ছেন। কোলে করে রোগীকে ঘর থেকে বের করছেন, আবার উঠান থেকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।

রোগের প্রকোপ সবচে' বেশি জেলেপল্লীতে। শশী মাস্টার সেখানে উপস্থিত হতেই একজন জোড়হস্ত হয়ে বলল, বাবু আমার নমশূদ্র। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের এখানে ঢুকবেন না।

শশী মাস্টার বললেন, কিছুদিনের জন্যে আমিও নমশূদ্র। এখন ঠিক আছে?

ওলাদেবীকে আটকানোর জন্যে প্রথম খেয়া পারাপার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বান্ধবপুরের মুরুব্বিরা পরে চিন্তাভাবনা করে ঠিক করল, খেয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্তটা ভুল। তাদের উচিত ওলাদেবীকে নদী পার করে দেয়া। দেবীর বিদায় মানেই রাহুমুক্তি। খেয়া বন্ধ করে দেবীকে আটকে রাখার অর্থ বিপদ মাথায় নেয়া।

দেবী দিনে চলাফেরা করেন না। উনার হাঁটাচলা সূর্য ডোবার পর। বড়গাঙে সন্ধ্যার পর খেয়া চলাচলের ব্যবস্থা নেয়া হলো। খেয়া পারাপার করবে শেখ মর্দ। অতি সাহসী মানুষ। তাকে বলে দেয়া হলো, ঘোমটায় মুখ ঢাকা কেউ যদি উঠে তাকে পার করতে হবে। তার সঙ্গে কোনো কথা বলা চলবে না। পারানি চাওয়া যাবে না। দেবী যেন নৌকায় উঠেন সেই ব্যবস্থাও করা হলো। বান্ধবপুরে সন্ধ্যার পর থেকে কাঁসার ঘণ্টা বাজে, ঢোল খোল করতাল বাজে। মশাল হাতে লোকজন ছোটাছুটি করে।

এমন অবস্থায় রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ঘোমটায় মুখ ঢেকে কেউ একজন শেখ মর্দর নৌকার পাশে এসে দাঁড়াল। অসীম সাহসী শেখ মর্দর বুক কেঁপে উঠল। সে কোনো কথা না বলে নৌকা ছাড়ল।

আকাশে মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘোমটা পরা তরুণী দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকিয়ে আছে। তরুণীর নাম জুলেখা। একসময় সে অস্ফুট স্বরে বলল, কী সৌন্দর্য গো! কী সৌন্দর্য!

ঠিক একই সময় জুলেখার বয়সি একটা মেয়েও জাহাজে করে আটলান্টিক পার হচ্ছিল। সে একা একা জাহাজের ডেকে বসেছিল। সেও মহাসাগরের শোভা দেখে জুলেখার মতোই মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল— কী সুন্দর! কী সুন্দর!

মেয়েটি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মাদাম ক্যুরি। তিনি রেডিও অ্যাকটিভিটি আবিষ্কার করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ট্রাস্টের আমন্ত্রণে বেড়াতে যাচ্ছেন আমেরিকায়।

আমাদের জুলেখার সেই বৎসর স্থান হলো কেন্দুয়ার বিখ্যাত নিষিদ্ধ পল্লীতে। স্থানীয় ভাষায় যার নাম 'রঙিলা নটিবাড়ি'।

Encyclopedia Britanica'র প্রাচীন সংস্করণে কেন্দুয়ার উল্লেখ ছিল। সেখানে লেখা ছিল Kendua a place for dancing girls. আনন্দদায়িনী নর্তকীদের মিলনমেলা।

রঙিলা নটিবাড়ি সোহাগগঞ্জ বাজারের শেষ মাথায়। মাছের আড়ত পার হয়েও আট-দশ মিনিট হাঁটতে হয়। রাস্তার দু'পাশে আপনাতে গজিয়ে ওঠা বেশকিছু শিমুলগাছ। যে-কেউ দেখে ভাববে কোনো এক বৃক্ষপ্রেমী চিন্তাভাবনা করে শিমুলের সারি লাগিয়েছেন। চৈত্রমাসে শিমুলের টকটকে লাল ফুল ফোটে। দেখতে ভালো লাগে। মনে হয় চৈত্রের তীব্র উত্তাপে গাছের মাথায় আগুন লেগে গেছে।

মূল বাড়ি কাঠের। উপরে টিন। মূল বাড়ি ঘিরে এক রুমের বেশ কিছু ছোট ছোট ঘর। কাঠের মূল বাড়িটা দর্শনীয়। উচ্চতায় প্রায় দোতলা বাড়ির সমান। দরজা এবং পাল্লায় ফুল লতাপাতা আঁকা। টিনের চৌচালাতেও নকশা কাটা। লখনৌ-এর বাইজি আংগুরি অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে মূল বাড়ি তৈরি করে। এই বাড়িতে তার একটা কন্যাসন্তান হয়। তার নাম বেদানা। তিন বছর বয়সে বেদানা পানিতে ডুবে মারা যায়। বেদানার মৃত্যুর পর আংগুরির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। কেউ বলে আংগুরিও মেয়ের মতো পানিতে ডুবে গেছে। আবার কারো কারো মতে আংগুরি দেশান্তরী হয়েছে।

'দেশান্তরী' শব্দটা এলাকার মানুষের অতি প্রিয়। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলেই স্বামীরা বলে, দেশান্তরী হবো, আসাম চলে যাব। দেশান্তরী হয়ে আসাম চলে যাবার বাসনার কারণ— আসাম খুব দূরের দেশ না। বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতের অঞ্চল। সেখানেই আছে কামরূপ কামাক্ষ্যা। জাদুবিদ্যার দেশ। কামরূপ কামাক্ষ্যার অতি রূপবতী নারীরা পুরুষদের বশ করে চিরদিনের জন্যে রেখে দিতে পছন্দ করে। দেশান্তরী হয়ে আসাম চলে গেলে ফেরা হয় না সেই কারণেই।

জুলেখা রঙিলা নটিবাড়িতে আনন্দে আছে। জায়গাটা তার পছন্দ হয়েছে। অনেক উঁচু, প্রায় টিলার মতো। বর্ষাকালে সোহাগগঞ্জ বাজারের অনেকটা ডুবে যায়। রঙিলা বাড়ি শুধু ভেসে থাকে। দূর থেকে দেখা যায় পানির উপর নকশা কাটা কাঠের একটা বাড়ি ভাসছে। বাড়ির চারদিকে টিনের ছোট ছোট ঘরের চাল থেকে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করে। সন্ধ্যাবেলা হারমোনিয়াম

এবং সারেঙ্গির শব্দ ভেসে আসে। বড়ই রহস্যময় লাগে। বর্ষাকালে এই রহস্যময় জায়গায় লোকজনকে আসতে হয় নৌকায়। বেশিরভাগ খদ্দের ভাটি অঞ্চলের পয়সাওয়ালা শৌখিনদার। হাওরের মাছ বিক্রির কাঁচা টাকা নিয়ে এরা আসে। কোমরে টাকার থলি বাঁধা থাকে। একটু নড়াচড়া করলেই ঝনঝন শব্দ হয়। নটি মেয়েদের কাচা রূপার টাকা নজরানা দেয়া দস্তুর। ময়লা কাগুজে নোটে শৌখিনদারি প্রকাশ পায় না। রঙিলা বাড়ির ঘাটে যখন নৌকা ভিড়ে তখন তারা চারদিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসে। তাদের বড়ই অস্থির মনে হয়। পরিচিত কেউ দেখে ফেলল কি-না এই চিন্তাতেই তারা অস্থির।

অতিরিক্ত পয়সাওয়ালা শরিফ আদমিদের মধ্যে অস্থিরতা থাকে না। তারা বজরা নিয়ে আসে। বজরা থেকে নামে না। তাদের সঙ্গে মাহফিল করতে রঙিলা বাড়ির মেয়েদের বজরায় যেতে হয়। তবে তারা হিসেবি। টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে সাবধানি। হিসাব ছাড়া খরচ করে ভাটি অঞ্চলের বেকুবরা। এরা সব টাকা শেষ করে নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরে যায়। তখনও তাদের মধ্যে হাসি থাকে। সেই হাসি অন্যরকম। যেন তারা একটা কাজের কাজ করেছে।

জুলেখা রঙিলা বাড়িতে ভর্তি হয়ে নতুন নাম নিয়েছে চান বিবি। নতুন নাম নেয়াই দস্তুর। অতীত পেছনে ফেলে আসতে হবে। যা গেছে তা গেছে। অতীত নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এও এক ধরনের সংসার। প্রতিরাতে স্বামী বদলের সংসার। এটাই মন্দ কী?

চান বিবি একটা টিনের ঘর পেয়েছে। ঘরটা তার বড়ই পছন্দের। সামনেই বড়গাঙ। ঘরের বারান্দায় বসে থাকলে বড়গাঙ ছাড়িয়ে দৃষ্টি অনেক দূরে চলে যায়। তখন খুব উদাস লাগে। ঘরের সামনেই বিশাল এক কামরাঙা গাছ। এই গাছে সারা বছরই কামরাঙা হয়। ভয়ঙ্কর টক, কাক দেশান্তরী জাতের কামরাঙা (কাক দেশান্তরী : যে টক ফল খেলে কাক দেশান্তরে পালিয়ে যায়)। এই গাছটাও চান বিবির পছন্দ। গাছের নিচে বসলে চিড়ল চিড়ল পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে গায়ে পড়ে। এত ভালো লাগে। চান বিবি ঠিক করেছে, তার যদি কিছু টাকা-পয়সা হয় তাহলে সে কামরাঙা গাছের তলাটা নিজ খরচে বাঁধিয়ে দেবে। বাঁধানো ঘাটে শীতলপাটি বিছানো থাকবে। শীতলপাটির উপরে পরিষ্কার ফুলতোলা বালিশ। কখনো সে বালিশে শুয়ে আকাশ দেখবে। আবার কখনো গাছে হেলান দিয়ে অতি দূরের গ্রামের সীমানা দেখবে।

চান বিবির ফুট ফরমাস খাটার জন্যে তাকে সাত-আট বছরের একটা মেয়ে দেয়া হয়েছে। মেয়েটার নাম হাছুন। চান বিবি হাছুনকে নিজের মেয়ের মতো যত্ন করে। মাথায় তেল দিয়ে চুল বেঁধে দেয়। সপ্তাহে একদিন জলেভাসা সাবান

দিয়ে তার গা ডলে দেয়। হাছুন চান বিবিকে মা ডাকে। সারাদিনই সে ঘর পরিষ্কার করে। সন্ধ্যাবেলা কার্তিকের মূর্তিতে প্রদীপ জ্বেলে দেয়। ধূপদানে ধূপ জ্বালে। রঙিলা বাড়ির প্রতিটি ঘরেই কার্তিকের মূর্তি আছে। কার্তিক পতিতাদের দেবতা। পতিতা হিন্দু হোক মুসলমান হোক, তার ঘরে কার্তিকের মূর্তি থাকবেই।

রঙিলা বাড়ির মালেকাইন হিন্দুস্থানি। নাম সরজুবালা। এই হিন্দুস্থানি মালেকাইনকেও চান বিবির পছন্দ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। গায়ের রঙ পাকা ডালিমের মতো। সন্ধ্যাবেলা তিনি যখন চোখে কাজল দিয়ে সারেঙ্গি নিয়ে বসেন তখন তাকে দেখলে চান বিবির অদ্ভুত লাগে। তার কাছে মনে হয় এই মহিলা পৃথিবীর কেউ না। অন্য কোনো জগতের। তার গানের গলাও চমৎকার। মীরার ভজন গাওয়ার সময় সরজুবালার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ে। এই দৃশ্য দেখেও চান বিবি মুগ্ধ।

রঙিলা বাড়িতে প্রথম ঢোকার পর মালেকাইন তাকে সামনে বসিয়ে গায়ে হাত রেখে যে কথাগুলি বলেন, সে কথাগুলি চান বিবির মনে গেঁথে আছে। তিনি কথা বলেন বাংলা এবং হিন্দুস্থানি মিশিয়ে। সেই কথাও চান বিবির গানের মতো লাগে।

শোন জুলেখা, তুমি রূপ নিয়ে দুনিয়াতে আসছ। গরিব ঘরের মেয়ে। এইটাই তোমার পাপ। যে নিজেই পাপ তার কপালে পাপ ছাড়া আর কী থাকবে ? সে তো পাপের বাড়িতেই ঢুকবে। এই বাড়িতে পাপ কাটার ব্যবস্থা কিন্তু আছে। যে পুরুষ তোমার কাছে আসবে, সে যদি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয় তাহলে তোমার কিছু পাপ কাটা যাবে। কারণ মানুষ ভগবান। মানুষকে তুষ্ট করা ভগবানকে তুষ্ট করা একই জিনিস।

তোমার রূপ আছে। সেই রূপ ধরে রাখতে হয়। রূপ ধরে রাখার নিয়মকানুন আছে। আমি তোমাকে শেখাব। তোমার যদি গানের গলা থাকে আমি তোমাকে গান শেখাব। নাচ শেখাব। যদি তোমার কপালে থাকে, তুমি বহু টাকা উপার্জন করবে। যারা তোমার কাছে আসবে, তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে যদি আশনাই হয় তাকে বিবাহ করতে পার। আমার কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়া খাদ্যের মধ্যে নিরামিষ খাবে। নিরামিষ শরীর ঠিক রাখবে। শরীরই আমাদের সম্পদ— এটা মাথায় রাখবে।

ড্যান্স মাস্টার তোমাকে নাচ শেখাবে। শরীরের ভেতরে যদি নাচ থাকে তাহলে নাচ শিখতে পারবে। যদি না থাকে, তাহলে শিখতে পারবে না। তারপরেও ড্যান্স মাস্টার তোমাকে নাচ শেখাবে। নাচ করলে শরীর ঠিক

থাকবে। ঠিকমতো নাচ করলে মন ঠিক থাকে। সেবাদাসীরা মন্দিরে দেবতার সামনে নাচ করে শরীর এবং মন দু'টাই ঠিক রাখে।

আমাদের এই বাড়িটাও মন্দির। যেসব পুরুষ এই বাড়িতে আনন্দের খোঁজে আসে তারা দেবতা।

কখনো নিলাজ হবে না। পুরুষমানুষ নটি বেটির কাছেও লজ্জা আশা করে। কোনো যক্ষ্মারোগীকে ঘরে নিবে না। যত টাকাই সে দিক তাকে ঘরে নেয়া যাবে না। যক্ষ্মারোগী চেনার উপায় আছে। আমি তোমাকে শিখায়ে দেব। তোমার স্বামী, স্বামীর দিকের আত্মীয় কাউকে ঘরে নিবে না। স্বামীকে কোনো অবস্থাতেই না। খদ্দেরদের কারো কারো স্ত্রীরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাদের সঙ্গে কখনো কোনো অবস্থায় দেখা করবে না। খদ্দের আমাদের দেবতা। খদ্দেরের স্ত্রীরা উপদেবতা। উপদেবতারা ভয়ঙ্কর। তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়।

যদি কখনো মনে কর এই জায়গা, এই জীবন তোমার পছন্দ না, তুমি চলে যেতে চাও, তাহলে চলে যাবে। কেউ তোমাকে আটকাবে না। আমি জেলখানা খুলে বসি নাই। দুঃখী মানুষের জন্যে আনন্দ-ফুর্তির ব্যবস্থা করেছি। মানুষকে আনন্দ দেয়ার মধ্যে পুণ্য আছে। তুমি নিজেও আনন্দে থাকার চেষ্টা করবে।

চান বিবি আনন্দে থাকার চেষ্টা ছাড়াই আনন্দে আছে। নতুন জীবনের শুরুতে প্রথম পুরুষটিকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। ভাটি অঞ্চলের বোকাসোকা চেহারার একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। ফর্সা, লম্বা। চোখেমুখে দিশাহারা ভাব। সে খুব ভয়ে ভয়ে বিছানায় পেতে রাখা শীতলপাটিতে বসল। পকেট থেকে ফুলতোলা ময়লা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। বিড়বিড় করে বলল, পানি খাব।

চান বিবি ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে পানি এনে দিল। লোকটা এক চুমুক পানি খেয়েই গ্লাস নামিয়ে রাখতে রাখতে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, খুবই গরম।

চান বিবি বলল, বাতাস করব?

না, বাতাস লাগবে না।

দরজার আড়ালে হাছুন উকিঝুঁকি দিচ্ছিল। চান বিবি তাকে ইশারা করতেই সে তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস শুরু করল। লোকটি বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার মেয়ে?

চান বিবি বলল, আমার মেয়ে না। তবে মেয়ের মতোই। আমাকে আপনি আপনি বলতেছেন কী কারণে? আমি বয়সে আপনার ছোট।

লোকটি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই।

চান বিবি বলল, চলে যাবেন ? কিছুক্ষণ জিরান। বাতাস খান। শরীর ঠাণ্ডা করেন। মন ঠাণ্ডা করেন। আসেন, গল্প করি।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বসল। আবার পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। তবে এবার রুমালটা পকেটে ঢুকাল না। হাতে নিয়ে বসে রইল। চান বিবি বলল, রুমালে সুন্দর ফুলের কাজ। কে করেছে ? আপনার স্ত্রী ?

হুঁ।

আপনার ছেলেমেয়ে আছে ?

দুই মেয়ে।

তারা দেখতে সুন্দর ?

হুঁ।

আপনার স্ত্রীর চেহারা কেমন ? সুন্দর ?

হুঁ।

আমার চেয়েও সুন্দর ?

না।

আপনি কি কিছু খাবেন ? শরবত বানায়ে দিব ?

না।

ঘরে মিষ্টি আছে। মিষ্টি দিব ? বেগমগঞ্জের লাড্ডু।

না।

আপনার স্ত্রীর নাম কী ? বলতে না চাইলে বলতে হবে না। বলতে ইচ্ছা করলে বলেন।

তার নাম বলব না।

মেয়ে দু'টার নাম কী ? বলতে না চাইলে বলতে হবে না। বলতে ইচ্ছা করলে বলেন।

বড় মেয়ের নাম শরিফা। ছোট মেয়ের নাম তুলা।

তুলা নাম রেখেছেন কেন ? জন্মের সময় খুব হালকা ছিল ?

হুঁ। সাত মাসে হয়েছে। বাঁচার আশা ছিল না। হালিমা তাকে শিমুল তুলার বস্তায় ভরে বাঁচায়ে রেখেছিল। এখন তুলার স্বাস্থ্য খুবই ভালো। সারাদিন মারামারি করে। কামড় দেয়া শিখেছে। কামড় দিয়ে রক্ত বের করে দেয়।

আপনার স্ত্রীর নাম হালিমা ?

হুঁ।

নাম বলে ফেলেছেন, এখন কি আপনার খারাপ লাগছে ?

লোকটা চুপ করে রইল। প্রসঙ্গ পাল্টে জুলেখা বলল, আপনার মেয়ে তুলা আপনাকে কামড়ায় ?

অনেকবার। আমার সারা গায়ে তার কামড়ের দাগ। সে শুধু তার মা'রে কামড়ায় না।

চান বিবি বলল, আপনার মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গেল। কয়েকবার ঢোক গিলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে কালো কাপড়ের ছোট্ট থলি বের করে পাশে রাখতে রাখতে বলল, এখানে দশটা রুপার টাকা আছে। টাকার পরিমাণ কি ঠিক আছে ?

চান বিবি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। লোকটা উঠে দাঁড়াল। চান বিবি বলল, চলে যাবেন ?

হুঁ।

বিশ্রাম করেন। রাতটা থাকেন, সকালে যান।

না।

তাহলে আরেকদিন আসেন। সেদিন টাকা ছাড়াই আসেন।

আমি আর আসব না।

আমার উপর কোনো কারণে কি আপনি নারাজ হয়েছেন ?

না। তুমি ভালো মেয়ে।

আপনার স্ত্রীর চেয়েও কি ভালো ?

লোকটার চেহারা সামান্যক্ষণের জন্যে কঠিন হয়ে গেল। চান বিবি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। কঠিন মুখভঙ্গি সহজ হলো। লোকটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না।

রুপার টাকার থলেটা চান বিবি সরজুবালার কাছে পাঠিয়ে দিল। এটাই নিয়ম। সরজুবালা সেখান থেকে নিজের অংশ রেখে ফেরত পাঠাবেন। চান বিবির পুরো টাকাই সরজুবালা ফেরত পাঠালেন। প্রথম রোজগারে ভাগ বসালেন না। চান বিবি প্রথম রোজগারের টাকায় তার ছেলে জহিরের জন্যে জামা, জুতা কিনল। বান্ধবপুর জুম্মা মসজিদের ইমাম সাহেবের জন্যে একটা তুর্কি ফেজ টুপি কিনল। শশী মাস্টারের জন্যে কিনল নকশি করা সিলেটের শীতলপাটি। জিনিসগুলি হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ কাঁদল।

ভদ্রঘরের একটি মেয়ের স্থান হয়েছে রঙিলা বাড়িতে— এই ঘটনা বান্ধবপুরে কোনো আলোড়ন তুলল না। অনেক দিন এই বিষয়টা কেউ জানলও না। সুলেমান সবাইকে বলল, স্ত্রীকে সে তালাক দিয়েছে। স্ত্রী চলে গেছে তার বাপ-

ভাইয়ের কাছে। মুসলমান সমাজে স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং স্ত্রীর বাপ-ভাইয়ের কাছে চলে যাওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এক স্ত্রী চলে যাবে অন্য স্ত্রী আসবে। স্ত্রী একা আসবে না, সঙ্গে দাসী নিয়ে আসবে। স্ত্রীর গর্ভে যেমন সন্তান হবে, দাসীর গর্ভেও হবে। স্ত্রীর গর্ভের সন্তানরা সম্পত্তির ভাগ পাবে। বান্দির গর্ভের সন্তানরা পাবে না। তারা কামলা খাটবে। তাদের বিয়েশাদি হবে তাদের মতোই বান্দি বংশের লোকজনদের সঙ্গে। সহজ হিসাব।

তখনকার ব্যবস্থায় রঙিলা বাড়ি এমন কিছু খারাপ জায়গা না। পুরুষ মানুষদের আমোদ-ফুর্তির অধিকার আছে। তারা খাটাখাটনি করে অর্থ উপার্জন করে। সেই অর্থের খানিকটা যদি নিজের আনন্দের জন্যে ব্যয় করে, তাতে ক্ষতি কী? পুরুষ মানুষ দিনরাত স্ত্রীর আঁচলে বাঁধা থাকলে ধরতে হবে সে পুরুষ মানুষই না। তার কোনো সমস্যা আছে। ক্ষমতাবান পুরুষদের হতে হবে শৌখিনদার। তারা বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার করবে। রঙিলা বাড়িতে যাবে। কিছুদিনের জন্যে বাড়িতে ঘাটুগানের ছেলে নিয়ে আসবে। ঘাটুগানের এইসব ছেলে নৃত্যবিদ্যা এবং সঙ্গীতে পারদর্শী। শৌখিনদার পুরুষের নানান আবদার (!) এরা মিটাবে। এইসব কর্মকাণ্ডে স্ত্রীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কিছু নাই। ঘাটুছেলেরা তাদের সতিন না। এরা কিছুদিনের জন্যে এসেছে। সতিনের মতো চিরস্থায়ী সত্ত্ব নিয়ে আসে নি।

বান্ধবপুর সেই সময় অতি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। রমরমা পাটের ব্যবসা। লবণের ব্যবসা। মাছের ব্যবসা। নতুন লঞ্চঘাট হয়েছে। দিনরাত লঞ্চের ভোঁ শোনা যায়। বরফকল বসেছে। প্যাটরায় বরফ ভর্তি হয়ে দৈত্যকৃতির মাছ চলে যায় নারায়ণগঞ্জ, কোলকাতায়। জলমহাল নিয়ে মারামারি খুনাখুনি হয়। সাহেব পুলিশ অফিসার হাতিতে করে তদন্তে আসেন। তদন্ত শেষে পাখি শিকার করেন। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে রঙিলা উৎসব হয়। নর্তকীরা নাচ-গান করে। ঘাটছেলেরা বুকে নারিকেলের মালা বেঁধে ঠোঁটে রঙ দিয়ে অশ্লীল ভঙ্গিমায় অতি নোংরা গান ধরে। সাহেবরা ঘনঘন মাথা নেড়ে বলেন, Not bad, Not bad at all.

এই বিপুল কর্মকাণ্ডে আমাদের জুলেখা অতি নগণ্য একজন। আপাতত তার কথা থাকুক। আমরা চলে যাই হরিচরণের স্কুলে। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা নয়। নয়জনের মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান। তার নাম জহির। এই ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হবে। অতিরিক্ত ভালো। স্মরণশক্তি অসাধারণ। একবার কিছু পড়লেই তার মনে থাকে। শশী মাস্টার তার এই ছাত্রটিকে কোনো এক বিচিত্র কারণে সহ্য করতে পারেন না।

ব্রিটিশ সরকার সে সময়ে একটি বৃত্তি চালু করেছিলেন। সমগ্র ভারতে ক্লাস টু'র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই বৃত্তি দেয়া হতো। মাসিক দু'টাকা হারে এক বৎসরের জন্যে বৃত্তি। সুলেমানের ছেলে জহির এই বৃত্তি পেয়ে সবাইকে চমকে দিল। জেলা শিক্ষা অফিসার আলহাজ রমিজউদ্দিন সাহেব বৃত্তির খবর নিয়ে বান্ধবপুরে উপস্থিত হলেন। জহিরের মাথায় হাত রেখে চোখ বন্ধ করে দোয়া করলেন। তারপর জহিরকে কাছে টেনে গলা নামিয়ে বললেন, তোমার মা নাকি তোমাদের সঙ্গে থাকে না। এটা কি সত্য ?

জহির বলল, সত্য।

সে থাকে কোথায় ?

জহির চুপ করে রইল। জবাব দিল না।

কোথায় থাকে জানো না ?

জহির এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। আলহাজ রমিজউদ্দিন গলা আরো খাদে নামিয়ে বললেন, লোকমুখে শুনলাম তোমার মা রঙিলা নটিবাড়িতে থাকে, এটা কি সত্য ?

সত্য।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। যা হয় সবই আল্লাহ্ পাকের হুকুমেই হয়। উনার হুকুম বিনা কিছু হয় না। তুমি নিজের মতো লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। তোমার মা কোথায় থাকে কী সমাচার তা নিয়া মাথা ঘামাবে না। ঠিক আছে ?

হুঁ।

হুঁ না, বলো জি আচ্ছা, জনাব। এইসব সহি আদব। শুধু লেখাপড়া শিখলে হবে না। আদবও শিখতে হবে। বলো, জি আচ্ছা, জনাব।

জি আচ্ছা, জনাব।

আলহাজ্ব রমিজউদ্দিন জহিরকে একটা ফাউন্টেনপেন উপহার হিসেবে দিয়ে গেলেন। ফাউন্টেনপেনের নাম রাইটার।

শশী মাস্টারের কাছে জুলেখার শীতলপাটি পৌঁছেছে। যে নিয়ে এসেছে তার নাম সামছু সদাগর। মিশাখালি বাজারে তার পাটের আড়ত। শশী মাস্টার বললেন, পাটি কে দিয়েছে ?

সামছু সদাগর বললেন, রঙিলা নটিবাড়ির এক নটি দিয়েছে। রাখলে রাখেন, না রাখলে ফেলে দেন। নটির নাম চান বিবি।

চান বিবি নামে কাউকে আমি চিনি না।

আপনি মাস্টার মানুষ। আপনার না চেনাই ভালো। তার আরেক নাম জুলেখা।

জুলেখা ?

সামছু সদাগর বললেন, এখন কি চিনেছেন ?

হ্যাঁ চিনেছি।

পরিচয় ছিল আপনার সাথে ?

ছিল।

চাইপা যান। কাউরে কবেন না। মাস্টার সাব, উঠি ?

শশী মাস্টার সারা দুপুর ঝিম ধরে বসে রইলেন। সন্ধ্যার পর কলের গান ছেড়ে জামগাছের নিচে গভীর রাত পর্যন্ত বসে রইলেন।

মাওলানা ইদরিসের কাছে জুলেখার পাঠানো তুর্কি টুপি পৌঁছেছে। সামছু সদাগরই নিয়ে গেছে।

মাওলানা বললেন, আপনারে তো চিনলাম না।

সামছু সদাগর বললেন, আমারে চেনার প্রয়োজন নাই। আপনার কাছে একটা জিনিস পৌঁছায়ে দেওয়ার কথা। দিলাম।

জিনিসটা দিয়েছে কে ?

চান বিবি দিয়েছে।

চান বিবিকে তো চিনি না!

সামছু সদাগর উদাস গলায় বললেন, এখন তারে না চেনাই ভালো। সময়ে চেনা সময়ে না-চেনা বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ। আপনি বুদ্ধিমান।

মাওলানা ইদরিস বললেন, একজন এত সুন্দর একটা টুপি পাঠায়েছে, তারে চিনব না— এটা কেমন কথা ?

সামছু বলল, চিনতে হইলে রঙিলা নটি বাড়িতে যান। ঐ মেয়ে রঙিলা বাড়ির নটি।

মাওলানা হতভম্ব গলায় বললেন, এইটা কী কথা ?

সত্য কথা। নটি বেটি আপনারে টুপি পাঠায়েছে। বড়ই সৌন্দর্য মেয়ে। বেহেশতের হুর বরাবর সুন্দর। তার টুপি আপনি মাথায় দিয়ে জুম্মার নামাজ পড়বেন, না গাঙের পানিতে ফেলবেন— এটা আপনার বিবেচনা। আমি উঠলাম।

তুর্কি ফেজ টুপিটা টিনের ট্রাঙ্কের উপর রাখা। টুপিটা কোত্থেকে এসেছে মাওলানা এখন বুঝতে পারছেন। এই টুপি মাথায় দেয়ার প্রশ্নই আসে না। গাঙের পানিতে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। টুপির মতো পবিত্র একটি বস্তু পানিতে ফেলে দেওয়া কি ঠিক ? এই বিষয়ে হাদিস কোরানের পরিষ্কার ব্যাখ্যা কী তাও তিনি জানেন না। কাউকে যে জিজ্ঞেস করবেন তাও সম্ভব হচ্ছে না। হাদিস কোরান জানা লোক আশেপাশে কেউ নেই। তাঁর খুবই ইচ্ছা দেওবন্দ মাদ্রাসায় যাওয়া। তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন আছে। তিনি হাতির ছবিআঁকা একটা দু'নম্বরি খাতায় প্রশ্নগুলি লিখে রেখেছেন। যেমন, রোজার সময় ধূমপান করলে কি রোজা ভাঙে ? চিংড়ি মাছ খাওয়া মকরুহ। কাঁকড়া খাওয়াও কি মকরুহ ? মাওলানা টুপি বিষয়ক একটি প্রশ্ন খাতায় লিখলেন।

> কোনো ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) যদি অসৎপথে উপার্জন করা অর্থের বিনিময়ে কাউকে টুপি, তসবিহ্ কিংবা জায়নামাজ দেয় তখন সেই টুপি, তসবিহ্, জায়নামাজ ব্যবহার করা কি জায়েজ আছে ?

টুপিটা ঘরে আসার পর থেকে মাওলানা ভালো সমস্যায় আছেন। প্রায়ই রাতে জুলেখাকে স্বপ্নে দেখছেন। স্বপ্নের ধরন দেখে তিনি নিশ্চিত স্বপ্নগুলি ইবলিশ শয়তান দেখাচ্ছে। একটি স্বপ্নে তিনি দেখলেন জুলেখা তার স্ত্রী (নাউজুবিল্লাহ)। সে তাঁর বাড়িতেই থাকে। ঘরদুয়ার ঠিকঠাক রাখে। রান্না করে। রাতে সব কাজকর্ম শেষ করে বানানো পান হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘুমাতে আসে (নাউজুবিল্লাহ)।

এরচেয়েও খারাপ স্বপ্ন একবার দেখলেন। এমন স্বপ্ন যা কাউকে বলা যাবে না। তাঁর অত্যন্ত মনখারাপ হলো। ইবলিশ শয়তান কোনো এক জটিল খেলা শুরু করেছে, এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাঁর মতো নাদান মানুষ কীভাবে শয়তানের হাত থেকে বাঁচবেন ? তাঁর কতটুকুই বা ক্ষমতা ? হযরত আদমের মতো মানুষ শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারেন নাই। এমনকি একবার আমাদের নবিজিকেও শয়তান ধোঁকা দিয়েছিল। নবিজির মুখ দিয়ে ওহি হিসেবে মিথ্যা আয়াত বলিয়েছিল।*

গভীর রাতে ইবলিশ শয়তান কিংবা তার সাঙ্গপাঙ্গ যে তাঁর বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করে, গাছের ডাল নড়ায়, এটা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন। বাতাস নেই কিছু নেই, গাছের ডাল নড়ছে। একবার রাতে তসবি পড়ছিলেন, হঠাৎ পেছনের জানালা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল। আবার খুলল। আরেক রাতে

* Satanic Verses

তাহাজ্জুতের নামাজ পড়বেন, অজু করার জন্যে বারান্দায় রাখা জলচৌকিতে বসেছেন। অজুর দোয়া পড়ে শেষ করলেন। দোয়ার অর্থ—

নাপাকি দূর করিবার, নামাজ শুদ্ধভাবে পড়িবার এবং আল্লাহ
তা'লার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আমি অজু করিতেছি।

অজুর দোয়া শেষ করামাত্র তাঁর মনে হলো কেউ একজন তার ঘাড়ে ফু দিয়েছে। গরম বাতাস। তিনি প্রচণ্ড ভয় পেলেও পেছন ফিরে তাকালেন না। অজু শেষ করলেন। তখন্ কেউ একজন পেছন থেকে হেসে উঠল। মেয়ে মানুষের গলা। তিনি চমকে পেছনে ফিরলেন, কাউকে দেখলেন না, তবে তাঁর হাতের ধাক্কা লেগে পিতলের বদনা জলচৌকি থেকে নিচে পড়ে গেল। বদনা উঠাতে গিয়ে দেখেন বদনার ভেতর একটা ইঁদুরের বাচ্চা মরে পড়ে আছে। ইবলিশ শয়তান অজু নষ্ট করার জন্যে একটা ইঁদুরের বাচ্চা বদনার পানিতে রেখে দিয়েছিল।

এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা বাড়িতে ফিরে রান্না বসিয়েছেন। চালডালের খিচুড়ি। এক চামচ ঘি দিয়েছেন, সুন্দর গন্ধ ছেড়েছে। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কাছে মনে হলো শুকনা পাতায় খসখস শব্দে কেউ একজন আসছে। মাওলানা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শয়তানার উপদ্রব আবার শুরু হয়েছে। মাওলানা আয়াতুল কুরসি পাঠ করে হাততালি দিলেন। তখন মনে হলো উঠানে কে একজন কাশছে। মাওলানা ভীত গলায় বললেন, কে কে ?

আমি।

আমি কে ? আমি কে ?

মাওলানা হারিকেন হাতে বের হয়ে এলেন। চাদর গায়ে হরিচরণ দাঁড়িয়ে আছেন। একহাতে বেতের একটা লাঠি। অন্য হাতে হারিকেন। সঙ্গে আর কেউ নেই।

কেমন আছেন মাওলানা সাহেব ?

জি জনাব, ভালো। আপনি এত রাতে!

রাত তো বেশি হয় নাই। আপনি কি আমাকে দেখে ভয় পেয়েছেন ?

মাওলানা বললেন, সামান্য ভয় পেয়েছি। আমার কাছে কোনো কারণে কি এসেছেন ?

হরিচরণ বললেন, ছোট্ট একটা কারণ আছে। শুনেছি আপনি পুরো কোরান শরীফ মুখস্থ করেছেন, এটা কি সত্য ?

মাওলানা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। লজ্জিত গলায় বললেন, হাফেজ টাইটেল এখনো পাই নাই। কোনো বড় মাদ্রাসায় গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। যেমন ধরেন দেওবন্দ মাদ্রাসা।

পরীক্ষা দিতে যান না কেন ?

খরচপাতি আছে। আমি দরিদ্র মানুষ। অর্থের সংস্থান নাই।

হরিচরণ বললেন, আমি খরচ দিলে কি যাবেন ?

মাওলানা চুপ করে রইলেন। হরিচরণ বললেন, আপনাদের ধর্মে কি আছে যে অমুসলমানের সাহায্য নেয়া যাবে না ?

এরকম কিছু নাই।

তাহলে আমার সাহায্য নিন। দেওবন্দ থেকে ঘুরে আসুন।

জি আচ্ছা। বহুত শুকরিয়া।

হরিচরণ সামান্য ইতস্তত করে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ কি করতে পারি ?

মাওলানা বললেন, অবশ্যই।

আপনার মুখস্থবিদ্যার একটা নমুনা কি আমাকে শোনাবেন ?

মাওলানা বললেন, অবশ্যই। অজু করে আসি।

অজু করতে হবে ?

জি। নাপাক অবস্থায় কোরান মজিদ আবৃত্তি করা ঠিক না।

হরিচরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। মাওলানা ইদরিস জায়নামাজে বসে কোরান আবৃত্তি করছেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

একসময় কোরান পাঠ শেষ হলো। মাওলানা বললেন, খিচুড়ি পাক করেছি। আপনি কি আমার সঙ্গে খানা খাবেন ?

অমুসলিমকে খানা খাওয়াতে আপনাদের কোনো সমস্যা নাই ?

জি-না। সমস্যা কী জন্যে থাকবে ?

আপনাদের ধর্মের এই জিনিসটা ভালো। আমি আগ্রহের সঙ্গেই খানা খাব। একজনের জন্যে রেঁধেছেন। দুইজনের কি হবে ?

বেশি করে রেঁধেছি। যেটা বাঁচে সেটা দিয়ে সকালে নাশতা করি।

হরিচরণ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, আরাম করে খেয়েছি। ধন্যবাদ।

মাওলানা বললেন, ধন্যবাদ কেন ? আপনার তো আজ রাতে আমার এখানেই খাওয়ার কথা। সব আগে থেকে ঠিক করা।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, কে ঠিক করেছে ?

আল্লাহপাক ঠিক করেছেন। মানুষ পশুপাখি সবার রিজিক আল্লাহপাক নিজে ঠিক করে রাখেন। কে কবে কোথায় খানা খাবে সেটা তার জন্মের সময়ই ঠিক করা।

উঠানের কাঁঠালগাছের ডাল নাড়ছে। টিনের চালে শব্দ হচ্ছে। মাওলানা দুঃখিত গলায় বললেন, একটা শয়তান কিছুদিন ধরে বড়ই ত্যক্ত করছে।

হরিচরণ বললেন, কী বলছেন এইসব ?

হরিচরণের কথা শেষ হবার আগেই বিকট শব্দে জানালার পাল্লা বন্ধ হলো। হরিচরণ চমকে উঠলেন। মাওলানা বললেন, চলুন আপনাকে বাড়িতে দিয়ে আসি। একা যেতে পারবেন না। ভয় পাবেন।

হরিচরণ উঠে দাঁড়ালেন।

মাওলানা হারিকেন হাতে আগে আগে যাচ্ছেন। পেছনে পেছনে হরিচরণ। তিনি বেশ ভয় পাচ্ছেন।

হরিচরণ বললেন, আপনি একা বাস করেন, ভয় পান না ?

পাই। তবে দোয়াকালাম আছে। দোয়াকালাম পাঠ করি।

আপনার একা একা থাকা ঠিক না। একটা বিবাহ করেন।

জি, বিবাহ করব। আমাদের ধর্মে সংসার করার নির্দেশ আছে।

কন্যা কি ঠিক করেছেন ?

জি-না। আল্লাহপাক ব্যবস্থা করে দিবেন। যথাসময়ে শুভ কার্য সমাধা হবে। রিজিকের মতো বিবাহ উনার নির্দেশে হয়।

হরিচরণ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সেই অর্থে সব কিছুই তাঁর নির্দেশে হওয়ার কথা।

মাওলানা বললেন, পাঁচটা বিষয় আলাদা করে বলা আছে— হায়াত, মউত, বিবাহ, রিজিক এবং দৌলত।

হরিচরণ বললেন, আপনাকে আর আসতে হবে না। এখন যেতে পারব। এক কাজ করলে কেমন হয়— এখন আমি আপনাকে এগিয়ে দেই। তারপর আবার আপনি আসবেন। এই করতে করতে রাত কাবার।

মাওলানা হাসছেন। হাসির স্বরগ্রাম বেশ উঁচু। তিনি জানেন এইভাবে উচ্চস্বরে হাসা ঠিক না। নবিয়ে করিম উচ্চস্বরে হাসতেন না। সমস্যা হলো, মানুষের নিজের উপর সবসময় দখল থাকে না।

হরিচরণ বাড়িতে ঢুকলেন। দিঘির বাঁধানো ঘাটে বসে রইলেন। মাওলানার বাড়িতে ভয় ভয় লাগছিল। এখানে লাগছে না। যদিও এই জায়গাটাও নির্জন এবং জঙ্গুলে। দিঘির চারদিকের ঘাস মানুষ সমান উঁচু হয়েছে। মাঝে মাঝে ঝুপড়ি ভাটগাছ। ভাটফুল গন্ধবিহীন হলেও রাতে হালকা নেশা ধরানো গন্ধ ছাড়ে। পাকাবাড়ির সামনে কামিনী ফুলের ঝাড়। কামিনী ফুলের সুবাসও রাতেই পাওয়া যায়। পূজায় ব্যবহারের জন্যে রক্তজবার বেশ কিছু গাছ নানান দিকে লাগানো আছে। জবাফুল গন্ধবিহীন কিন্তু হরিচরণের মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি জবা ফুলের গন্ধও পান। এটা একধরনের ভ্রান্তি। তিনি জানেন, মানুষকে সারাজীবনই নানান ভ্রান্তির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। হরিচরণের মা গোলাপদাসির ক্ষেত্রে এরকম হয়েছিল। শেষ বয়সে তাঁর কাছে মনে হয়েছিল, দিঘিটা গঙ্গার অংশ।

গঙ্গায় তর্পনের ভঙ্গিতে তিনি দিঘিতে প্রায়ই এটা সেটা দিতেন। ফুল, মিষ্টি, দেবতার ভোগ। শেষের দিকে পিতলের হাঁড়ি বাসন, সোনাদানা ফেলতে লাগলেন। হরিচরণের ধারণা, দিঘির জল সেঁচে ফেললে অনেক জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। বিশাল দিঘির জল সিঞ্চন সহজ ব্যাপার না। তারপরেও একবার চেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

হরিচরণ গায়ের চাদর বিছিয়ে শ্বেতপাথরের ঘাটে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁর সুনিদ্রা হলো।

বান্ধবপুরের বর্তমান আলোচনার বিষয় মাওলানা ইদরিসের বাড়িতে হরিচরণ গো-মাংস খেয়েছেন। বিষয়টা নিয়ে হৈচৈ শুরু করেছেন অম্বিকা ভট্টাচার্য। বিভিন্ন দিকে নানা দেনদরবার করছেন। হরিচরণ আগেই জাতিচ্যুত হয়েছেন। গো-মাংস ভক্ষণজনিত গুরুতর অপরাধে নতুন করে কিছু হবার কথা না। তারপরেও অম্বিকা ভট্টাচার্য যথেষ্ট ঘোঁট পাকিয়ে ফেলেছেন। হরিচরণ এবং মাওলানা ইদরিস দুজনেই গুরুতর অপরাধ করেছে। একজন গো-মাংস খেয়েছে, আরেকজন ধর্ম নষ্ট করার জন্যে খাইয়েছে। এই দুজনকেই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

বান্ধবপুরের সীমান্তে জাগ্রত বটগাছের নিচে যে বটকালি মন্দির সেই মন্দিরের মূর্তি মাথা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। অম্বিকা ভট্টাচার্য নিশ্চিত, এই ভয়াবহ অন্যায় কার্যের পেছনেও আছে মাওলানা ইদরিস। কারণ কয়েক দিনই তাকে এই রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখা গেছে। তাছাড়া মা কালী স্বপ্নে দেখা দিয়ে ইশারায় তাকে বলেছেন, মূর্তি যে ভেঙেছে তার মুখভর্তি দাড়ি।

শাল্লার দশআনি মুসলমান জমিদার নেয়ামত হোসেন মাওলানা ইদরিসকে ডেকে বলেছেন, আপনি কী শুরু করেছেন! গো-মাংস রেঁধে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন।

ইদরিস বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, গো-মাংস কোথায় পাব বলেন ? বান্ধবপুরে গরু জবেহ হয় না।

কথা কম বলেন। লম্বা দাড়ির মানুষ কথা বেশি বলে। আপনার দাড়ি লম্বা। জলে বাস করলে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না। বাস করেন হিন্দু অঞ্চলে। হিন্দুরা এখানে কুমির। কিছু বুঝেছেন ?

জি, বুঝেছি।

কিছুই বুঝেন নাই। আপনি হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাধাতে চান— এটা এখন পরিষ্কার। কোন সাহসে আপনি কালীমূর্তি ভাঙলেন ?

জনাব এই কাজ আমি করি নাই।

আপনি না করলেও আপনার নির্দেশে হয়েছে। এই বিষয়ে আমার কাছে খবর আছে। রঙিলা বাড়িতেও আপনি কয়েকবার গিয়েছেন। চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে গিয়েছেন। এই বিষয়েও আমার কাছে খবর আছে।

মাওলানার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি পাঞ্জাবির আস্তিনে ঘনঘন চোখ মুছছেন। তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই দৃশ্য নেয়ামত হোসেনকে মোটেই স্পর্শ করল না। তিনি কঠিন গলায় বললেন, আপনার মাসিক বৃত্তি আজ থেকে আমার স্টেট আর দিবে না। আপনি অন্য কোথাও চলে যান। আপনার কারণে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে, এটা বুঝেছেন ?

জি, জনাব।

নানান জায়গায় হিন্দু মুসলিম হাঙ্গামা হুজ্জত হচ্ছে। আমি আমার অঞ্চলে এটা হতে দেব না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে আমাকে পত্র দিয়েছেন।

জনাব, আমার কাঁধের দুই ফেরেশতা কেরামন কাতেমিন সাক্ষী, আমি কিছুই করি নাই।

আপনি দুই ফেরেশতাকে সাক্ষী মেনেছেন। খুবই ভালো কথা। এরা কোর্টে উকিলের জেরার জবাব দিবে না। এটা বোঝার মতো বুদ্ধি কি আপনার আছে ? আমার তো মনে হয় নাই। আচ্ছা এখন বিদায় হন, অনেক কথা বলে ফেলেছি।

মসজিদের কাজ কি তাহলে আর করব না ?

না। তবে যদি সব অপরাধ স্বীকার করে সবার কাছে ক্ষমা চান, তাহলে বিবেচনা করে দেখব।

যে অপরাধ করি নাই সেই অপরাধ কীভাবে স্বীকার করব ?

আপনি বুরবাক। এখন বিদায় হন। বুরবাকের সাথে কথা বলতে নাই। বুরবাকের সঙ্গে কথা বললে আয়ুক্ষয় হয়।

অনেকদিন এই অঞ্চলে আছি, একটা মায়া পড়ে গেছে।

আপনার অন্তরভর্তি মায়া। এত মায়া নিয়া এক জায়গায় থাকা ঠিক না। বিভিন্ন জায়গায় যান। মায়া দিতে থাকেন। মায়ার চাষ করেন।

মাওলানা চলে এলেন। বাড়িতে না গিয়ে মসজিদের দিকে রওনা হলেন। আজ সারাদিন এবাদত বন্দেগি করবেন। তাঁর ধারণা, নিজের অজান্তে তিনি কোনো একটা অপরাধ করেছেন বলেই আল্লাহপাক তাঁকে এই শাস্তি দিচ্ছেন। শরীরকে শুদ্ধ রাখার জন্যে কয়েকটা নফল রোজা রাখতে হবে। রোজা শরীর শুদ্ধ রাখার মহৌষধ। শরীর শুদ্ধ হলেই মন শুদ্ধ হবে। নেয়ামত হোসেনের কথা শুনে মন অশান্তও হয়েছে। মনকে শান্ত করতে হবে। রিজিক নিয়ে তিনি বেশি চিন্তা করছেন আল্লাহপাকের উপর ভরসা করছেন না,— এটা একটা নাফরমানি। তিনি যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাই হবে। তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে। এর নাম ঈমান।

মসজিদের বারান্দায় সুলেমানের ছেলেটা বসে আছে। তার চোখেমুখে দিশাহারা ভাব। দূর থেকে দেখেই মনে হচ্ছে, সে বড় কোনো সমস্যায় পড়েছে।

মাওলানা বললেন, তোর কী হয়েছে ?

ছেলে জবাব দিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে বসে রইল। তার চোখমুখ কঠিন।

মাওলানা বললেন, আমারে কিছু বলবি ?

জহির উঠে চলে গেল। ছেলেটা অল্প সময়ে কয়েকটা বেআদবি করে ফেলেছে। মুরুব্বি মানুষকে দেখেও সালাম দেয় নাই। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেছে। মাওলানার উচিত রাগ করা, তিনি রাগ করতে পারছেন না। মানসিক কষ্টের সময় মানুষ ভুলভ্রান্তি করে। সেই ভুলভ্রান্তি ক্ষমার চোখে দেখতে হয়। সুলেমান দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। সেই কারণেই হয়তো ছেলেটা কষ্টে আছে।

মাগরেব এবং এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা বাড়ি ফিরে গেলেন। সঙ্গে টর্চ ছিল না, তাতে সমস্যা হলো না। ফকফকা চান্নি। জঙ্গলের মাথার উপর বিশাল চাঁদ। পূর্ণিমার রাতে জিন ভূত থাকে না। ওদের কর্মকাণ্ড অমাবশ্যায়। চাঁদের হিসাবে তাদের চলাচল। তারপরেও মাওলানা আয়াতুল কুরসি পড়তে পড়তে এগুচ্ছেন। বেতঝোপের পাশে তাঁর গা ছমছম করতে লাগল। এই

জায়গাটা সবচে' খারাপ। এখান থেকে নদীর পাড়ের শ্মশানঘাট দেখা যায়। শ্মশানঘাটে প্রতিদিনই একটা দুটা মরা পোড়ানো হয়। মাংসপোড়া গন্ধ এবং কাঠকয়লার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকে, শরীর গুলায়। আজও মরা পোড়ানো হচ্ছে। তবে মরা পোড়ানোর গন্ধ আসছে না। উত্তুরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। গন্ধ ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণে।

মাওলানা বাড়ি ফিরে অবাক হলেন। উঠানে জহির বসে আছে। তার সঙ্গে টিনের ট্রাংক। সে বসে আছে ট্রাংকের উপর। তার গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। টিনের ট্রাংকটা নতুন। চাঁদের আলোতে ট্রাংক ঝলমল করছে। মাওলানা বললেন, তোর ঘটনা কী ?

জহির অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আইজ থাইক্যা আপনার লগে থাকব।

মাওলানা বললেন, তুই যে এইখানে তোর বাপ জানে ?

জহির হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া হইছে ?

জহির জবাব দিল না।

মাওলানা বললেন, আয় খাওয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করি। বেগুন পুড়া, ডাইল ভাত চলব ?

হুঁ।

ঘরে ডিমের সালুন আছে। ডিমের সালুন খাইতে চাস ?

হুঁ।

মাওলানা রাঁধতে বসলেন। জহির তার সামনে বসে আছে। তার বসে থাকার ভঙ্গিতেই মনে হচ্ছে সে ক্ষুধায় কাতর। রান্না শেষ না হওয়া পর্যন্ত গল্পগুজব করে ছেলেটাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

নতুন মা'র নাম কী ?

হালিমা।

বড়ই ভালো নাম। নেক নাম। বিবি হালিমার নাম শুনছস ?

না।

কস কিরে পুলা ? বিবি হালিমা নবিজির দুধমা। হারিস হইল উনার দুধ পিতা। স্মরণে রাখিস।

হুঁ।

তোর নতুন মা তোরে কষ্ট দেয় না-কি রে ?

না।

মারধোর করে ?

না।

তাইলে তুই আমার কাছে থাকতে আসছস, ঘটনা কী ?

জহির জবাব দিল না। মাওলানা বললেন, আমার এই বাড়ি খারাপ। জিনের আনাগোনা। আপনাআপনি জানালা বন্ধ হয়, জানালা খুলে। গাছের ডাল নড়ে। তুই ভয়ে মইরা যাবি।

জহির মাথা নিচু করে হাসছে।

মাওলানা অবাক হয়ে বললেন, হাসছ কেন ?

জহির বলল, আপনের বাড়িত বান্দর আছে। বান্দরে ত্যক্ত করে।

তুই জানস ক্যামনে ?

আমি দেখছি। বান্দরে জানালা টানাটানি করে। দুইটা বান্দর।

মাওলানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বাড়িতে জিন ভূতের এত সহজ ব্যাখ্যা তাঁর মাথায় আসে নি।

পুলা, তোর বুদ্ধি তো ভালো।

জহির মাথা নিচু করে হাসল।

হাত-মুখ ধুইয়া আয়। খানা হইছে।

জহির অতি দ্রুত খাচ্ছে। মাওলানা খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে আছেন। ক্ষুধার্ত একটি শিশু আগ্রহ করে খাচ্ছে, এরচে' সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে কি আছে ?

হরিচরণের বাড়িতেও একজন খেতে বসেছেন। তিনিও খুব আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছেন। তাঁর নাম শশাংক পাল। এই অঞ্চলের প্রাক্তন জমিদার। আজ তাঁর হতদৈন্য দশা। গায়ের কাশ্মীরি শালটা অবশ্যি দামি। শালের নিচে রুপার থালা দু'টো দামি। তিনি এসেছেন থালা দু'টা হরিচরণকে দিয়ে কিছু টাকা নিতে। খুব বেশি না, পঞ্চাশটা রুপার টাকা। হরিচরণ থালা রাখেন নি, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন।

শশাংক পাল বললেন, তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়েছি। হাতি গর্তে পড়লে সবাই খারাপ ব্যবহার করে, তুমি তা করো নি। মানুষ হিসেবে তুমি উত্তম।

হরিচরণ বললেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ক্ষুধার্ত। আপনি কি আমার এখানে খানা খাবেন ?

শশাংক পাল বললেন, খাব। পোলাও খেতে ইচ্ছা করছে। পোলাও খাব। মুরগির মাংস খাব। ঝাল দিয়ে রাঁধতে বলো। ইদানীং ঝাল ছাড়া মুখে কিছু রুচে না। শরীর পুরোপুরি গেছে। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। একদিক দিয়ে ভালো। খাওয়া জুটে না।

কলিকাতা চলে যান না কেন ? শুনেছি সেখানে আপনার বড় বড় আত্মীয়স্বজন আছে।

ঠিকই শুনেছ। যাই না, ওদের মুখ দেখাব কীভাবে ?

আপনার যে অবস্থা, এত কিছু ভাবেন কেন ?

তাও ঠিক। মুরগির মাংসের সঙ্গে ডিমের ভুনা করতে বলো। বেশি করে পিঁয়াজ দিতে বলবে। যখন কষা কষা হবে তখন চায়ের চামচে আধা চামচ চিনি দিবে। ত্রিপুরার মহারাজার পূণ্যার সময় একবার উনার নিমন্ত্রণে ত্রিপুরা গিয়েছি। নীরমহলে দুইরাত থেকেছিলাম। তখন ডিমের এই রান্না খেয়েছি।

আপনার যখন ভালো কিছু খেতে ইচ্ছা করে আমাকে জানাবেন, আমি ব্যবস্থা করব।

বললেই তো ব্যবস্থা করতে পারবে না। ময়ূরের মাংস খেতে ইচ্ছা করে। গৌরীপুরের মহারাজার বাড়িতে খেয়েছিলাম। তিনি ময়ূর আনিয়েছিলেন রাজস্থান থেকে। বাবুর্চিও রাজস্থান থেকে এসেছিল। ময়ূরের মাংস খেয়ে এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে বাবুর্চিকে বিশটা রুপার টাকা দিয়েছিলাম।

ময়ূরের মাংস খওয়াতে পারব না।

পারবা না জানি। কী আর করা। ঘটনা শুনেছ ?

কী ঘটনা ?

মসজিদের যে মাওলানা তার পাছায় লাথি দিয়ে তাকে অঞ্চল ছাড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

কে করেছেন ?

তারই স্বজাতি। শাল্লার জমিদার। মাওলানা ধরা খেয়েছে তার স্বজাতির কাছে।

আপনি মনে হয় খুশি।

শশাংক পাল হাই তুলতে তুলতে বললেন, অবশ্যই আমি খুশি। কাউকে বিপদে পড়তে দেখলে আমার খুশি লাগে।

হরিচরণ বললেন, মাওলানা ভালো মানুষ। আমি তাকে বিপদে পড়তে দেব না।

শশাংক পাল বললেন, একমাত্র তুমিই এখন তাকে রক্ষা করতে পারবে। তোমার ক্ষমতা আছে। এই দুনিয়ায় ক্ষমতাই সব। জমিদারি কেমন চলছে?

ভালো। আপনার পুরনো কর্মচারীরাই কাজকর্ম দেখছে। তাদের সঙ্গে আছে শশী মাস্টার।

শশী মাস্টার নাকি পাগল?

ভাবের মধ্যে থাকে, তবে পাগল না।

ভাবের পাগল কিন্তু বড় পাগল, এটা খেয়াল রাখবা।

আচ্ছা খেয়াল রাখব।

খাওয়া শেষ করে শশাংক পাল হরিচরণের বৈঠকখানাতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর হাঁপানির টান উঠেছে। এই অবস্থায় হেঁটে কোথাও যাওয়া সম্ভব না।

শশাংক পাল আধশোয়া হয়ে পালংকে বসে আছেন। তাঁর মুখভর্তি পান। ঠোঁট বেয়ে পানের রস গড়াচ্ছে। এদিকে তাঁর খেয়াল নেই। হরিচরণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

শশাংক পাল বললেন, তুমি কি জোড়াসাঁকোর রবি ঠাকুরের নাম শুনেছ?

শুনেছি।

গান লেখে, গান গায়। তার গান জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শুনেছি, মধুর গলা।

তার কথা হঠাৎ উঠল কেন?

উনি বিরাট পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কার। তার অবস্থা দেখ। আর আমার অবস্থা দেখ। গান-কবিতা আমিও লিখতাম। ট্রাংকভর্তি লেখা ছিল। সবই নিয়তি।

সময় ১৯১৩ সন। ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবেন এই বিষয়ে সবাই যখন নিশ্চিত তখন হঠাৎ নোবেল কমিটি মত পাল্টালেন। বাংলাভাষী এক কবিকে এই পুরস্কার দিয়ে দিলেন।

মোহনগঞ্জের বরান্তর গ্রামের মসজিদের ইমাম আব্দুল হক আকন্দ এসেছেন বান্ধবপুরে। যেহেতু ইমাম মানুষ, লোকজনের কাছে তাঁর পরিচয় মুনসি। মুনসি সাহেবের ডাকনাম উকিল। বাবা-মা'র আশা ছিল এই ছেলে বড় হয়ে উকিল হবে। সেই থেকে তাঁর পরিচয় উকিল মুনসি। বড়ই আশ্চর্যের কথা, মুনসি মানুষ হয়েও তিনি গানবাজনা করেন। লোকজন তাঁর গানবাজনা খুব যে মন্দ চোখে দেখে তা-না। তখনকার মুসলিম সমাজে উগ্রতা ছিল না। মসজিদের ইমাম সাহেব ঢোল বাজিয়ে গান করছেন, বিষয়টাতে অন্যায় কেউ খুঁজে পায় নি। বরং তাঁর গান লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

মাওলানা ইদরিস উকিল মুনসির আগমনের খবর পেয়ে নদীর ঘাটে গেছেন। আদর করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসবেন। উকিল মুনসি বরান্তর মসজিদের ইমাম। তিনি নিজেও ইমাম। একজন ইমাম থাকবেন আরেকজন ইমামের কাছে। এইটাই সহবত।

বড়গাঙের বাজারের ঘাটে উকিল মুনসির নৌকা বাঁধা। নৌকার দুই সবুজ শাড়ি দিয়ে ঘেরটোপ দেয়া। তার ভেতর বসে আছেন 'লাবুসের মা'।

তিনি লাবুস নামের কারো মা না। তাঁর নামই লাবুসের মা। তিনি উকিল মুনসির স্ত্রী। জনশ্রুতি— লাবুসের মায়ের মতো রূপবতী কন্যা অতীতে কখনো জন্মায় নি। ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

লাবুসের মা'র জন্ম ভাটি অঞ্চলের জালালপুরে। একবার মাত্র এই মেয়েকে চোখের দেখা দেখে উকিল মুনসি আধাপাগল হয়ে যান। প্রথম গান লেখেন—

ধনু নদীর পশ্চিম পাড়ে
সোনার জালালপুর
সেইখানে বসত করে
লাবুসের মা
উকিলের মনচোর।

মাওলানা ইদরিস নদীর পাড়ে গিয়ে দেখেন, উকিল মুনসির নৌকা ঘিরে অনেক নৌকা। নৌকাভর্তি মানুষ। পাড়েও লোকজন দাঁড়িয়ে আছে।

উকিল মুনসি গান ধরেছেন—

আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে
পুবালি বাতাসে
বাদাম দেইখ্যা চায়া থাকি
আমার নি কেউ আসে রে।।

যেদিন হতে নতুন পানি
আসল বাড়ির ঘাটে
অভাগিনীর মনে কত
শত কথা উঠে রে।।

কত আসে কত যায়
নায় নাইয়রির নৌকা
মায়ে ঝিয়ে ভইনে ভইনে
হইতেছে যে দেখা রে।।

আমি যে ছিলাম ভাই রে
বাপের গলায় ফাঁস
আমারে যে দিয়া গেল
সীতা বনবাস রে ।।

আমারে নিল না নাইয়র
পানি থাকতে তাজা
দিনের পথ আধলে যাইতাম
রাস্তা হইত সোজা রে ।।

ভাগ্য যাহার ভালো নাইয়র
যাইবে আষাঢ় মাসে
উকিলের হইবে নাইয়র
কার্তিক মাসের শেষে রে ।।*

*উকিল মুনসির এই গান একশ' বছর পর জনৈক চলচ্চিত্রকার তাঁর ছবি 'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ ব্যবহার করেন।

মাওলানা ইদরিসের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। এত সুন্দর গান! এমন গলা! মাওলানা চোখের সামনে আষাঢ় মাসে নাইয়রিদের নৌকার পাল দেখতে পাচ্ছেন। তিনি কয়েকবার গাঢ় স্বরে বললেন, আহা রে! আহা রে!

উকিল মুনসি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাওলানা ইদরিসের সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে রাজি হলেন। উকিল মুনসি মুখভর্তি পান নিয়ে বললেন, আমি কিন্তু তাহাজ্জুদের নামাজের শেষে গানবাজনা করি। অসুবিধা হবে ?

মাওলানা বললেন, আমার বাড়ি জঙ্গলের ভেতরে। কেউ শুনবে না।

উকিল মুনসি বললেন, আমি তো গান করি সবেরে শুনানোর জন্যে। কেউ না শুনলে ফায়দা কী ?

আমি শুনব। আমাদের ভাবি সাব শুনবেন।

উকিল মুনসি বললেন, সেটাও খারাপ না। অধিকে শোনার চেয়ে মন দিয়া যদি অল্পে শুনে সেটা ভালো। আপনার ভাবি সাব বিরাট রাঁধুনি। সে সবচে' ভালো রাঁধে রিঠা মাছ। রিঠা মাছ জোগাড় করেন।

যেভাবে পারি জোগাড় করব।

আপনার ভাবি সাবের রূপ বেহেশতের হুর বরাবর। তাকে দেখলে বেহেশতের হুর কেমন হবে এই বিষয়ে আন্দাজ পাবেন। আমি তাকে বলব, সে যেন আপনার সামনে পর্দা না করে। নবিজির স্ত্রীদের জন্যে পর্দা বাধ্যতামূলক। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের স্ত্রীদের জন্যে পর্দা বাধ্যতামূলক না।

ইদরিসের বাড়িতে পা দিয়ে উকিল মুনসি মুগ্ধ গলায় গান ধরলেন—

আমি না বুঝিয়া কার ঘরে আসিলাম
কারে করলাম আমার নাওয়ের সাথি।

উকিল মুনসির স্ত্রী তাঁর পেছনেই ঘোমটা পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উকিল মুনসি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘোমটা খুইলা দেখ— কী সুন্দর বাড়ি! কী সুন্দর জংলা! আহারে কী সৌন্দর্য! আমি স্বপ্নে দেখেছি বেহেশত এই রকম হবে। প্রত্যেকের জন্য থাকবে বেহেশতি জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কাঠের বাড়ি। বাড়ির পাশে পানির নহর। গাছে গাছে মনোহর পাখপাখালি।

মাওলানা ইদরিস রিঠা মাছের সন্ধানে মাছবাজারে গেলেন। আজ হাটবার। বাজারে প্রচুর মাছ থাকার কথা। রিঠা মাছ পাওয়া গেল না, তবে বড় বড় বাছা মাছ পাওয়া গেল। এই অঞ্চলের বাছা মাছ বিখ্যাত। মাছের বাজারে দেখা হলো হরিচরণের সঙ্গে। তিনি মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তবে নিয়ম করে হাটের দিন তিনি মাছবাজারে আসেন। তাজা বড় বড় মাছ দেখতে তাঁর ভালো লাগে। জমিদার মানুষ, পাইক বরকন্দাজ নিয়ে চলাফেলা করার কথা। তিনি

চলাফেরা করেন একা। চামড়ার এক জোড়া চটি, ধুতি হাঁটু পর্যন্ত তোলা। গায়ে ঘিয়া রঙের চাদর।

হরিচরণ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, শুনলাম বিখ্যাত গাতক বাউল সাধক উকিল মুনসি আপনার বাড়িতে এসেছেন?

ইদরিস বললেন, জি এসেছেন।

কয়েক দিন কি থাকবেন?

বলেছেন তো থাকবেন। তবে এঁরা ভাবের মানুষ। হুট করে যদি বলেন চলে যাব, তাহলে চলে যাবেন।

উনার স্বকণ্ঠে গান শোনার বাসনা ছিল। বিখ্যাত বিচ্ছেদি গান। সম্ভব কি হবে? নিমন্ত্রণ করলে আমার বাড়িতে কি উনি যাবেন? হাতির পিঠে করে উনাকে নিয়ে যেতাম।

বলে দেখব। নিরহঙ্কারী মানুষ। বললেই রাজি হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি উনার জন্যে একটা মাছ কিনে দেই। কী মাছ উনার পছন্দ জানেন?

রিঠা মাছ পছন্দ। আজ বাজারে রিঠা মাছ উঠে নাই।

হরিচরণ বললেন, রিঠা মাছের ব্যবস্থা আমি করব। আজ আমার পছন্দের মাছ নিয়ে যান।

হরিচরণ বাজারের সবচে' বড় রুই মাছটা কিনলেন। প্রকাণ্ড লাল মুখের জ্যান্ত রুই। জীবনের আনন্দে ছটফট করছে। এমন এক মাছ যাকে দেখতেও আনন্দ।

ইদরিস বললেন, এত বড় মাছ কে খাবে? মাছ কুটাও তো মুশকিল।

কোনো মুশকিল না। মাছ কুটার লোক আমি পাঠাব। মাছ কুটে দিয়ে আসবে। আস্ত মাছ দেখে উকিল মুনসি সাহেব হয়তো খুশি হবেন। বড় মাছ দেখে খুশি হয় না এমন মানুষ কম। আপনি নিয়ে যান।

উকিল মুনসি মাছ দেখে মুগ্ধ। তিনি নিজেই মাছ কুটতে বসলেন।

ইদরিস বললেন, আপনার জন্যে মাছটা হরিচরণ বাবু পাঠিয়েছেন। অতি বিশিষ্ট মানুষ। লোকে তাঁর নাম দিয়েছে ঋষি হরিচরণ।

উকিল মুনসি বললেন, মানুষের মুখে জয়, মানুষের মুখে ক্ষয়। অনেক মানুষ যাকে জয় বলে, তার অবশ্যই জয়। এত বড় মাছ উনি পাঠিয়েছেন। তাঁকে দাওয়াত দেন। তাঁর সঙ্গে খাই।

উনি মাছ-মাংস খান না। নিরামিষ আহার করেন।

ভালো, খুবই ভালো।

উনার খুব ইচ্ছা স্বকণ্ঠে আপনার বিচ্ছেদি গান শুনেন। আপনি রাজি হলে আপনার জন্যে হাতি পাঠায়ে দিবেন।

উনার হাতি আছে না-কি ?

জি আছে। শশাংক পালের সাত আনি জমিদারি খরিদ করেছেন।

সইন্ধ্যাকালে উনারে হাতি পাঠাইতে বলেন। লাবুসের মা'রে নিয়া হাতির পিঠে চড়ব। এই বলেই উকিল মুনসি গান ধরলেন— মাছ কুটতে কুটতে গান। বারান্দায় ঘোমটা দেয়া লাবুসের মা হাসছেন। স্বামীর আনন্দ দেখে উনি আনন্দিত।

উকিল মুনসি হাতির পিঠে
লইড়া চইরা বসে।
সেই হাতি কদম ফেলে
লিলুয়া বাতাসে
ঘোমটা পরা লাবুসের মা
ঘোমটার ফাঁকে চায়
তাহারে পাগল করছে
উকিলের মায়ায়॥

লাবুসের মা'র সঙ্গে মাওলানা ইদরিসের কথাবার্তা হলো। মাওলানা কখনোই সরাসরি তাকালেন না। যে-কোনো তরুণীর দিকে দৃষ্টি ফেলা অপরাধ। অথচ লাবুসের মা'র মধ্যে কোনো সঙ্কোচ নেই। যেন মাওলানা তাঁর অনেক দিনের চেনা।

লাবুসের মা বললেন, আমার সাথে ধর্মের ভইন পাতাইবেন। ও মাওলানা, আমার দিকে চায়া কথা বলেন। ভাই ভইনের দিকে তাকাইতে পারে।

আপন ভাই ভইনের দিকে তাকাতে পারে।

আপন ভাবলেই আপন। আপন ভাইব্যা আমার সঙ্গে কথা বলেন।

কী কথা বলব ?

বয়স হইছে, শাদি করেন না কেন ? আপনে মাওলানা মানুষ, শাদি যে ফরজ এইটা জানেন না ?

জানি।

কইন্যা দেখব ? আমার সন্ধানে ভালো পাত্রী আছে। ওমা, মাওলানা দেখি লইজ্যা পায়। নাক-মুখ হইছে লাল।

উকিল মুনসি এসেছেন হরিচরণের বাড়িতে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মাওলানা ইদরিস আসেন নি।

লাবুসের মা স্বামীর সঙ্গে এলেও হরিচরণের বাড়িতে ঢুকে আলাদা হয়ে পড়েছেন। পুরুষদের গানের আসরে তিনি কখনো থাকেন না। লাবুসের মা হরিচরণের বাড়িঘর ঘুরে ঘুরে দেখছেন। বাগান দেখছেন। দিঘি দেখছেন।

হরিচরণ দামি কার্পেটে উকিল মুনসিকে বসতে দিয়েছেন। রুপার পানদানিতে পান দেয়া হয়েছে। হুঁকো প্রস্তুত। আম্বরী তামাকের সুগন্ধ বাতাসে। হুঁকোর নল হাতে অপেক্ষা করছে জহির। সে মাওলানার বাড়ি ছেড়ে হরিচরণের বাড়িতে চলে এসেছে। কোথাও থিতু হতে পারছে না।

উকিল মুনসি বললেন, এই ছেলে কে?

হরিচরণ বললেন, এর নাম জহির। আমার এখানে থাকে।

মুসলমান ছেলে?

জি।

অতি লাবণ্যময় চেহারা। সে কি ঘাটুগানের ছেলে?

হরিচরণ বললেন, না। সে আমার পুত্রসম।

উকিল মুনসি বললেন, গোস্তাকি মাপ হয়। আমি খারাপ কিছু ভেবেছিলেম। বড় মানুষদের এইসব দোষ থাকে। আমি কিশোর বয়সে ঘাটুর দলে ছিলাম। গানবাজনা সেখানে শিখেছি। শৌখিনদার মানুষ ঘাটুছেলে কীভাবে ব্যবহার করে আমি জানি। যাই হোক, আপনি কি গান শুনবেন?

বিচ্ছেদের গান শুনতে আমার আগ্রহ, তবে আপনি আপনার পছন্দের গান করেন।

উকিল মুনসি বললেন, আমারও পছন্দ বিচ্ছেদের গান। কী জন্যে জানেন?

হরিচরণ বললেন, জানি না কী জন্যে?

উকিল মুনসি বললেন, আল্লাহ বা ভগবান যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক, তিনি থাকেন বিচ্ছেদে।

সুন্দর কথা!

উকিল মুনসি ঢোলে বাড়ি দিয়ে গান ধরলেন। তিনি এক পায়ে নূপুর পরেছেন। গানের সঙ্গে নূপুর বাজছে। নূপুরের শব্দ করুণ রস তৈরি করে না, কিন্তু এখন করল। হরিচরণের চোখ ছলছল করতে লাগল।

উকিল মুনসি গাইছেন—

সোনা বন্ধুয়া রে।
এত দুঃখু দিলি তুই আমারে
তোর কারণে লোকের নিন্দন, করেছি অঙ্গের বসন রে।
কুমারিয়ার ঘটিবাটি, কুমার করে পরিপাটি
মাটি দিয়া লেপ দেয় উপরে।
ভিতরে আগুন দিয়া, কুমার থাকে লুকাইয়া
তেমনি দশা করলি তুই আমারে।

উকিল মুনসি গান শেষ করলেন। হরিচরণ চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আরেকটা গান।

উকিল মুনসি বললেন, নিজের গান না। আমার শিষ্যের লেখা একটা গান করি। তার সমস্ত গানই কাটা বিচ্ছেদ। গান শুনলে কলিজা কাইটা যায়— এই জন্যেই এর নাম কাটা বিচ্ছেদ। শিষ্যের কাছে পরাজিত হওয়ায় আনন্দ আছে। আনন্দের জন্যে গানটা করব।

অবশ্যই করবেন।

আমার শিষ্যের নাম সিরাজ আলি। তার বাড়ি আটপাড়া।

উকিল মুনসি গান ধরলেন—

সোনা বন্ধুরে
অপরাধী হইলেও আমি তোর
আমি তোর পিরিতের মরা
দেখলি না এক নজর।
অপরাধী হইলেও আমি তোর।

অনেক রাতে গানবাজনা শেষ হলো। হরিচরণ বিনীত ভঙ্গিতে হাতজোড় করে বললেন, আপনার কোনো সেবা করতে পারি? এই সৌভাগ্য কি আমার হবে?

সেবা করতে চান?

চাই। অন্তর থেকে চাই।

আমি আপনাদের অঞ্চলে ঘুরতে আসি নাই। বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছি। যে উদ্দেশ্যে এসেছি মাওলানা ইদরিস তার কিছু করতে পারবে না। সে কঠিন মাওলানা।

হরিচরণ বললেন, কী উদ্দেশ্য বলেন। আমি ব্যবস্থা করব।

উকিল মুনসি বললেন, আমি শুনেছি আপনাদের রঙিলা বাড়িতে এক রঙিলা মেয়ে আছে, যার রূপ দেখে বেহেশতের হুররা লজ্জা পায়। তাকে এক নজর দেখব। সে কী লাবুসের মায়ের চেয়ে সুন্দর কি-না তার পরীক্ষা হওয়া দরকার। শুনেছি তার কণ্ঠ কোকিল পক্ষীর কণ্ঠের চেয়েও মধুর। সে না-কি উকিল মুনসির গান ছাড়া অন্য গান করে না। তার কণ্ঠে আমার একটা গান শুনব।

হরিচরণ বললেন, ব্যবস্থা করে দেব। এই মেয়ের কথা কার কাছে শুনেছেন?

অনেকের কাছেই শুনেছি। মানুষের গুণ বাতাসের আগে যায়।

আর দোষ? দোষ কীভাবে যায়?

দোষ চলে না জনাব। দোষ থাকে নিজের অঞ্চলে। দোষের পা নাই। সে ছুটতে পারে না।

উঠানে হাতি প্রস্তুত। উকিল মুনসি স্ত্রীকে নিয়ে হাতিতে ফিরবেন। ঘোমটা পরা লাবুসের মা হরিচরণের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, আপনি দরিদ্র এক বাউলকে যে সম্মান করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহপাক আপনাকে আরো সম্মান দেবেন।

হরিচরণ বললেন, মাগো, আমি সম্মানের কাঙাল না। তারপরেও আপনার সুন্দর কথায় খুশি হয়েছি।

আপনি আমাকে মা ডাকলেন। সব মেয়েকেই কি আপনি মা ডাকেন?

হরিচরণ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। লাবুসের মা বললেন, আমি আপনার দিঘির ঘাটলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে দেখি শিউলি গাছের নিচে অল্পবয়সি বাচ্চা একটা মেয়ে হাঁটাহাঁটি করতেছে। গোল মুখ, কোঁকড়ানো চুল। মেয়েটা কে?

হতভম্ব হরিচরণ কোনো জবাব দিলেন না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। লাবুসের মা বললেন, আপনার কোনো কন্যা কি অল্পবয়সে মারা গিয়েছিল?

হরিচরণ বললেন, হ্যাঁ।

লাবুসের মা হতাশ গলায় বললেন, আমি মৃত মানুষজন মাঝে মাঝে দেখতে পারি। কেন যে পারি নিজেও জানি না।

লাবুসের মা হাতির দিকে রওনা হলেন।

জুলেখার ঘরে অতিথি এসেছে। আলাভোলা চেহারা, গায়ে চাদর। পরনে লুঙ্গি। রঙিলা বাড়িতে লুঙ্গি পরে কেউ আসে না। বাবু সেজে আসে। কানের লতিতে আতর দেয়।

অতিথি বললেন, আপনার নাম কী ?

জুলেখা বলল, সবার প্রথম প্রশ্ন আপনার নাম ? নামের কি প্রয়োজন ? আমার নাম ফুলবিবি হলেও যা চানবিবি হলেও তা, আবার জুলেখা হলেও ক্ষতি নাই। মনে করেন আমার নাম জুলেখা। পান খাবেন ? ভালো জর্দা আছে। ময়মনসিংহের সাধুবাবা জর্দা।

পান খাব।

জুলেখা পানদান এবং পিক ফেলার পিকদান পাশে এনে রাখল। পিকদান পিতলের। কিছুদিন হলো কিনেছে। রোজ তেঁতুল দিয়ে মাজা হয় বলে ঝকঝক করে। জুলেখার কাছে মনে হয় 'সন্নের' পিকদান।

অতিথি বললেন, জুলেখা, শুনেছি তোমার কণ্ঠস্বর মধুর। আমি দূরদেশ থেকে এসেছি তোমার গান শুনতে। বাদ্যবাজনার প্রয়োজন নাই। খালি গলায় গান করবে, আমি শুনব।

জুলেখা পান সাজতে সাজতে বলল, আমার গানের কথা শুনেছেন। রূপের কথা শুনেন নাই ?

রূপের কথাও শুনেছি। স্বীকার পাইলাম তোমার রূপ আছে। শোনা কথা বেশির ভাগ সময় মিলে না। তোমার বেলায় মিলেছে।

জুলেখা অতিথিকে এক খিলি পান দিয়ে নিজে এক খিলি পান মুখে নিল। তার পানে খয়ের বেশি করে দেয়া, যাতে কিছুক্ষণের মধ্যে ঠোঁট টকটকে লাল হয়ে যায়। সে পান চাবাতে চাবাতে বলল, কী গান শুনবেন ?

তুমি উকিল মুনসির গান ভালো জানো বলে শুনেছি। তাঁর একটা গান শোনাও।

তাঁর গান আইজ গাব না। অন্য গান শুনেন।

তাঁর গান গাবা না কেন ?

যেদিন আমার মন ভালো থাকে না, সেইদিন উনার গান করি। আইজ আমার মন ভালো।

আমি তোমার কাছে উকিল মুনসির গান শুনতে আসছি। অন্য গান না।

টাকা কত এনেছেন ?

বিশটা রুপার টাকা এনেছি। চলবে ?

হ্যাঁ, চলবে।

জুলেখা পিকদানে চাবানো পান ফেলে ঠোঁট মুছেই গান ধরল—

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়
নিঠুর বন্ধুরে
বিচ্ছেদের বাজারে গিয়া
তোমার প্রেম বিকি দিয়া
করব না প্রেম আর যদি কেউ কয়।

জুলেখার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। চোখের কাজল পানিতে ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। তার ফর্সা মুখে তৈরি হচ্ছে কালো রেখার আঁকিবুকি।

গান শেষ করে জুলেখা বলল, আরো কি গাইব ?

অতিথি বললেন, বিশটা রুপার টাকায় যে কয়টা হয় সেই কয়টা গান শোনাও।

জুলেখা বলল, উকিল মুনসির একটা গানের দাম এক কলসি সোনার মোহর।

অতিথির ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসির আভাস দেখা গেল। তিনি দ্রুত সেই হাসি মুছে ফেলে বললেন, তোমার ঘরে ঢোল তবলা কিছু থাকলে আমারে দাও, গানের সাথে তাল দেই। তাল বিনা গান গাইতে তোমার অসুবিধা হইতেছে। আচ্ছা থাক, লাগবে না।

অতিথি পিকদান কাছে টেনে নিলেন। হাতের বাড়িতে পিকদান থেকে সুন্দর ধাতব শব্দ হলো।

জুলেখা হাসিমুখে বলল, আপনি তো বিরাট উনসুনি লোক (উনসুনি : সূক্ষ্ম কলাকৌশলে ওস্তাদ ব্যক্তি)। উকিল মুনসির গান পিয়ার করেন ?

হুঁ।

জুলেখা দ্বিতীয় গান ধরল—

রজনী প্রভাত হলো ডাকে কোকিলা
কার কুঞ্জে ভুলিয়া ভুলিয়া...

অতিথি বললেন, ভুলিয়া ভুলিয়া হবে না। হবে ভুলিয়া রহিলা।

রজনী প্রভাত হলো ডাকে কোকিলা
কার কুঞ্জে ভুলিয়া রহিলা।

জুলেখা বলল, আপনার পরিচয় কী ?

অতিথি বললেন, আমার নাম উকিল মুনসি।

ঘরে যেন বজ্রাঘাত হলো। কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে হিন্দুদের প্রণামের ভঙ্গিতে জুলেখা উকিল মুনসির পায়ে মাথা রাখল। তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। চাপা ফোঁপানির শব্দ আসছে।

উকিল মুনসি বললেন, তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আমি তোমাকে দোয়া দিলাম।

জুলেখা বলল, কী দোয়া দিলেন ?

সব কিছু তোমাকে ছেড়ে গেলেও গান কোনোদিন ছেড়ে যাবে না। পা থেকে মাথা সরাও, আমি এখন উঠব। ঘাটে নাও নিয়া আমি আসছি। নাও-এ আমার স্ত্রী অপেক্ষা করতেছেন। আমাকে বেশিক্ষণ না দেখলে তিনি অস্থির বোধ করেন।

জুলেখা বলল, আমার মাথা সরাব না। আপনার যদি যেতে হয় পাও দিয়া আমার মাথায় লাথ দিবেন। মাথা সরবে। তারপর আপনি যাবেন।

উকিল মুনসি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। মেয়েটা এখন ঘোরের মধ্যে আছে। তাকে উঠে বসানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঘোরের মধ্যে যে আছে তার ঘোর ভাঙানো কঠিন। ঘোরের বিষয়টা তিনি জানেন।

জুলেখা!

জি।

আরো কয়েকটা গান করো শুনি।

জুলেখা উঠে বসতে বসতে বলল, আমি সারারাত গান করব। অল্প নাচ শিখেছি, যদি বলেন নাচ দেখাব।

নাচের প্রয়োজন নাই। গান করো। ঘাটুগান জানো ? ঘাটুগানের সুর অতি মনোহর।

আপনার সামনে আমি আপনার গান করব। অন্য কোনো গান না। জুলেখা গানে টান দিল।

লাবুসের মা নৌকায় অপেক্ষা করছেন। তিনি একা না। নৌকার দু'জন মাঝি ছাড়াও জহির নামের ছেলেটা সঙ্গে আছে। এই ছেলের চেহারা দেবদূতের মতো। অতি রূপবতীদের যেমন বিপদ, অতি রূপবান বালকের তেমন বিপদ। ছেলেটির জন্যে তিনি মমতা বোধ করছেন। লাবুসের মা'র হাতে তসবি। তিনি তসবি টানতে টানতে নিচু গলায় ছেলেটির সঙ্গে গল্প করছেন।

বাংলা পড়তে শিখেছ ?

জি।

আলহামদুলিল্লাহ। হাতের লেখা সুন্দর আছে ?

হাতের লেখা সুন্দর।

আলহামদুলিল্লাহ। পিতামাতা জীবিত ?

হুঁ।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। তোমার উপরে আল্লাহপাকের খাস রহমত আছে।

জহির স্পষ্ট গলায় বলল, রহমত নাই।

লাবুসের মা'র হাতের তসবি থেমে গেল। তিনি চমকে তাকালেন। পুতুলের মতো ছেলেটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তিনি বললেন, কেউ যদি বলে আমার উপরে আল্লাহর রহমত নাই, তাহলে সে নাফরমানি করে। এই কাজ আর করবা না। বলো, আল্লাহপাক আমাকে ক্ষমা করো।

বলব না।

লাবুসের মা বড়ই অবাক হলেন। ছেলেকে দেখে মনে হয় নরমসরম কিন্তু কথাবার্তায় কাঠিন্য আছে। বাঁশ নুয়ে পড়ে। এই ছেলে কঞ্চির মতো সোজা। লাবুসের মা বললেন, তুমি অন্যদিকে তাকায়ে আছ কেন ? আমার দিকে তাকাও। আসো আমরা গল্প করি।

জহির ফিরে তাকাল। লাবুসের মা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করলেন, ছেলেটার চোখ ভেজা। তিনি বললেন, আমার নাম লাবুসের মা। আমার যখন দুই বছর বয়স তখন থাইকা আমি লাবুসের মা। অথচ আমার কোনো সন্তানাদি নাই। কোনোদিন হইব তারো ঠিক নাই। তারপরও সবার মুখে লাবুসের মা। মজা না ?

জহির হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মাথা নাড়ার ফাঁকে চট করে চোখের পানি মুছে নিল।

তোমাকে এখন যদি আমি লাবুস নাম দেই, কেমন হয় ?

জহির ফিক করে হেসে ফেলল। লাবুসের মা বললেন, আইজ থাইকা তোমার নাম লাবুস। ওই পুলা, লাবুস!

জহির হাসি চাপতে চাপতে বলল, জি।

জি কিরে পুলা ? আমি লাবুসের মা। তুই আমারে মা ডাকবি না ? বল জি মা।

লইজ্যা লাগে।

মা'র কাছে পুলার কী লইজ্যা ? ও লাবুইচ্যা!

কী মা ?

তুই যাবি আমার লগে ?

যাব।

সত্যি যাবি ?

হুঁ যাব।

বল—

উপরে আল্লা নিচে মাটি
যে কসম কাটছি সেই কসম খাঁটি।

জহির বলল—

উপরে আল্লা নিচে মাটি
যে কসম কাটছি সেই কসম খাঁটি।

উকিল মুনসি যে রাতে জহিরকে নিয়ে রওনা হলেন, সেই রাতে বান্ধবপুরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। জহিরের বাবা সুলেমান তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিল। এই স্ত্রীর নাম হালিমা। সে মোটাসোটা অল্পবুদ্ধির হাসি-খুশি মেয়ে। তার জীবনের একটাই শখ— সারাদিন পান চিবানো। পান খাওয়ার মতো অতি তুচ্ছ ঘটনাই তালাকের কারণ। সুলেমান বলেছিল— তুই কি ঘোড়া ? সারাদিন জাবর কাটস ? পান খাইয়া আমার সংসার ডুবাইছস। আমারে পথের ফকির করছস।

সুলেমানের কথায় অতি বিস্মিত হয়ে হালিমা বলেছিল, পান তো আপনের পয়সায় খাই না। পান আর গুয়া আমার বাপের বাড়ি থাইক্যা আসে।

এই অপমানসূচক কথায় সুলেমানের মাথায় আগুন ধরে যায়। সে বলে, কী এত বড় কথা! বাপের বাড়ির খোঁটা ? যা, বাপের বাড়িত গিয়া পান খাইতে থাক, তোরে তালাক দিলাম। আইন তালাক, বাইন তালাক, গাইন তালাক। তিন তালাক। তুই তোর বান্দি বেটি নিয়া বিদায় হ।

তিন তালাকের পর আর এই বাড়িতে থাকা যায় না। যে কিছুক্ষণ আগেও স্বামী ছিল, তার মুখ দর্শনও করা যায় না। সে এখন পরপুরুষ। হালিমা কাঁদতে কাঁদতে শাড়ির আঁচলে লম্বা ঘোমটা দিয়ে বলল— হোসনার গর্ভ হয়েছে। সে কী করব ? (হোসনা, হালিমার দাসী। সে-সময় স্বামী কর্তৃক দাসীদের গর্ভসঞ্চার স্বীকৃত ছিল।)

সুলেমান বলল, সন্তান হোক। সন্তান হইলে সন্তান নিয়া আসব। হোসনা থাকবে তোর সাথে। সে তোর বান্দি। আমার না।

হালিমা কাঁদতে কাঁদতে দাসীকে নিয়ে নৌকায় উঠল।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা ঘটল ধনু শেখের বাড়িতে। ধনু শেখ তার বাড়িতে লাখের বাতি জ্বালালো। তখনকার নিয়মে নব্যধনীদের সঞ্চিত অর্থ এক লক্ষ অতিক্রম করলে সবাইকে তা জানানোর নিয়ম ছিল। এই জানান দেয়া হতো লাখের বাতি জ্বালিয়ে এবং বাড়িতে ঘাটুগানের আয়োজন করে। যে মানুষটি লাখের বাতি জ্বালিয়েছে, তাকে সমীহ করা দস্তুর ছিল।

ধনু শেখের বাড়ির উঠানে লম্বা বাঁশ টানিয়ে বাঁশের মাথায় হারিকেন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রচুর লোকজন এসেছে। তাদের জন্যে মিষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে। ঘাটুগান শুরু হয়েছে। এই গান সারারাত চলবে। সূর্য উঠার পর গান বন্ধ। তখন শিন্নির ব্যবস্থা। শিন্নি হচ্ছে খাসির মাংস এবং খিচুড়ি। লাখপতির উৎসবের জন্যে চারটা খাসি জবেহ হয়েছে।

ঘাটুগানের অধিকারী তিনটি ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। তিনজনই রূপবান। এরা মেয়েদের ফ্রক পরে মেয়ে সেজেছে। পায়ে নূপুর পরেছে। অধিকারীর ইশারায় গান শুরু হলো। একজন মঞ্চে এসে নারিকেলের মালার বুক চেপে ধরে গান ধরল—

আমার মধু যৌবন কে করিবে পান ?

দোহার এবং বাদ্যযন্ত্রীরা বিপুল উৎসাহে বাজনা বাজাতে বাজাতে দোহার ধরল—

কে করিবে পান গো ?
কে করিবে পান ?

ধনুর একমাত্র স্ত্রী কমলা, চিকের পর্দার আড়াল থেকে ঘাটু নাচ দেখছে। তার বুক কাঁপছে। কেন জানি মনে হচ্ছে এই ছেলেটাকে তার স্বামী রেখে দিবে। পালঙ্কে এখন সে আর তার স্বামী শুবে না। তাদের মাঝখানে ঘাটুছেলেটা শুয়ে থাকবে। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

ঘাটুছেলেটা যখন নাচছে তখন ঠিক তার বয়সি একজন আসানসোলের এক রুটির দোকানে লেটো নাচের কাহিনী এবং গান লিখছে। আশ্চর্য কাণ্ড! গানে সুরও দিচ্ছে। (ঘাটু এবং লেটো নাচের মধ্যে পার্থক্য তেমন নেই। লেখক)। তার বয়স এগারো। রুটির দোকানে তার মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। কিশোরের নাম কাজী নজরুল ইসলাম। ডাকনাম দুখু মিয়া। কারণ দুঃখে দুঃখেই তার জীবন কাটছে।

বান্ধবপুরের পশ্চিমে মাধাই খালের দু'পাশে পাঁচমিশালি গাছের ঘন জঙ্গল। বাঁশঝাড়, ডেউয়া, বেতঝোপ, ভূতের নিবাস ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছ। জায়গায় জায়গায় বুনো কাঁঠাল গাছ— যে গাছ কখনো ফল দেয় না। এমনই এক কাঁঠাল গাছের নিচে আজ ভোর রাতে একটা বকনা গরু জবাই হয়েছে। জবাই করেছেন মাওলানা ইদরিস। ধনু শেখের মানতের গরু। ধনু শেখকে গতবছর কলেরায় ধরেছিল। জীবন যায় যায় অবস্থায় তিনি মানত করেন— যদি এই দফায় প্রাণে বাঁচেন তাহলে গরু শিন্নি দেবেন।

গরুর শিন্নির কঠিন বিষয় জঙ্গলের ভেতর করতে হয়েছে। ধনু শেখ বাড়ির দু'জন কামলা এবং তার ছোটভাইকে নিয়ে এসেছেন। গরু জবাইয়ের সব চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। চামড়া হাড়গোড় গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে। শিন্নির মাংস সবাইকে ভাগ করে দেয়া নিয়ম। ধনু শেখ নিজে এই কাজটি করছেন। মুসলমান ঘর হিসাব করে করে মাংস ভাগ করছেন। পদ্মপাতায় মাংস পুঁটলি করা হচ্ছে। দিনের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি মাংস পৌছে যাবে।

মাওলানা ইদরিস একটু দূরে বসেছেন। তাঁকে সামান্য চিন্তিত মনে হচ্ছে। গোপনে গরু জবেহ করার খবর চাপা থাকবে তার এরকম মনে হচ্ছে না। সামনে মহাবিপদ।

ধনু শেখ বললেন, মাওলানা, আপনারে দুই ভাগ দেই ?

মাওলানা বললেন, প্রয়োজন নাই। এক ভাগ দিলেই চলবে। আমি একজন মোটে মানুষ।

ঘরে তেল আছে তো ? গরুর মাংসের সোয়াদ তেলে। অর্ধেক মাংস অর্ধেক তেল, যতটুকু মাংস ততটুক পেঁয়াজ। পেঁয়াজের অর্ধেক আদা। অল্প আঁচে দুপুরে বসাবেন সন্ধ্যারাতে নামাবেন— অমৃত।

ধনু শেখের এক কামলা বলল, অন্য মশলাপাতি লাগবে না ?

ধনু শেখ বললেন, মশলাপাতি থাকলে দিবা, না থাকলে দিবা না। ইলিশ মাছে যেমন মশলা লাগে না, গরুর মাংসেও লাগে না। একটু লবণের ছিটা, একটু কাঁচামরিচ, ইলিশ মাছের জন্যে এই যথেষ্ট। রুই মাছের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। পাকের নানান হিসাব।

রান্নাবান্নার গল্প শুনতে মাওলানার মোটেই ভালো লাগছিল না। ধনু শেখ এত আগ্রহ করে রান্নার গল্প করছে, কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলে তিনি বললেন, রুই মাছের হিসাবটা কী?

ধনু শেখ বললেন, রুই মাছ তরিবত করে রাঁধতে হয়। কথায় আছে—

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে
না জানি রাঁধুনী মোরে কেমন করে রাঁধে।

মাওলানা নিস্পৃহ গলায় বললেন, ও আচ্ছা।

ধনু শেখ বললেন, আপনি কি চিন্তাযুক্ত?

মাওলানা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

ধনু শেখ বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, কোনো চিন্তা করবেন না। কেউ কিচ্ছু জানবে না। আর জানলেও অসুবিধা নাই। ব্যবস্থা নেয়া আছে।

কী ব্যবস্থা?

সেটা আপনার না জানলেও চলবে। সবার সবকিছু জানতে নাই। আপনি মাওলানা মানুষ। হাদিস কোরান নিয়া থাকবেন। যার যে কর্ম সে সেই কর্ম নিয়া থাকবে।

ধনু শেখের চেহারা আনন্দে ঝলমল করছে। ছোটখাটো মানুষ। লাখের বাতি জ্বালাবার পর থেকে ছোটখাটো মানুষটাকেই বড় লাগছে। যেন মানুষটা এখন বিশেষ কেউ। তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না।

মাওলানা, দেশের খবর কিছু রাখেন?

দেশের কী খবর?

স্বরাজের খবর। স্বরাজ শুরু হইছে।

সেইটা কী?

স্বাধীন হওয়ার জন্যে মারামারি কাটাকাটি। হেন্দুরা এরে বোমা মারতেছে ওরে বোমা মারতেছে।

ক্ষুদিরামের কথা শুনেছি।

ধনু শেখ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বোকার দল স্বরাজ কইরা মরুক, আমরা এর মধ্যে নাই।

মাওলানা বললেন, আমরা নাই কেন?

ধনু শেখ গলা নামিয়ে বললেন, দেশ তো মুসলমানের। দিল্লির সিংহাসনে কি কোনো হেন্দু ছিল? ছিলাম আমরা। হেন্দুরা দেশ স্বাধীন কইরা দিব। আমরা গদিতে বসব। এরার চোখের সামনে গরু কাইট্টা খাব। হেন্দুরাও পেসাদ পাইব। হা হা হা।

জঙ্গল থেকে তারা বের হলো দুপুরের আগে আগে। ধনু শেখ পদ্মপাতায় মোড়া মাংসের ঝাঁকা এবং দলবল নিয়ে মাধাই খালে এসে নৌকায় উঠল। নৌকা সরাসরি ধনু শেখের বাড়ির পেছনে থামল। ধনু শেখ নিজ বাড়িতে ছেলের আকিকা উপলক্ষে দু'টা খাসি জবেহের ব্যবস্থা করেছেন। খাসি জবেহতে কোনো বাধা নেই। এই কাজ প্রকাশ্যে করা যায়।

ধনু শেখ খাসির মাংসের সঙ্গে সব মুসলমান বাড়িতে এক পোঁটলা গরুর মাংসও দিয়ে দিলেন। হতদরিদ্ররা যেন মাংস ঠিকমতো রাঁধতে পারে তার জন্যে তেলমসলা কেনা বাবদ একটা করে আধুলি পেল। বাড়িতে বাড়িতে মাংস রান্না হবে। গন্ধ ছড়াবে। কারোর কিছু বলার নেই। খাসির মাংস রান্না হচ্ছে।

এক পোঁটলা মাংস গেল অম্বিকা ভট্টাচার্যের কাছে। ধনু শেখ নিজেই নিয়ে গেলেন। অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ঠাকুর! আমার ছেলের আকিকার খাসির মাংস। আত্মীয় বান্ধবদের বাড়িতে এই মাংস বিলি করার বিধান আছে। এই মাংস আপনি কি গ্রহণ করবেন?

অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, খাসির মাংসে কোনো দোষ নাই। তবে মুসলমানের বাড়ির মাংস বিধায় শোধন করে নিতে হবে। শোধন করার খরচা যদি দাও মাংস নিতে পারি।

খরচা কত?

এক টাকার কমে হবে না। কর্পূর লাগবে। একশ' বছরের পুরনো ঘিতে কর্পূর দিতে হবে। সেই ঘি পুড়িয়ে তার ধোঁয়া মাংসের গায়ে লাগাতে হবে। বিরাট ঝামেলা।

ধনু শেখ এক টাকার জায়গায় দু'টাকা দিলেন। মাংস শোধন বাবদ এক টাকা। তেল এবং মশলাপাতি কেনা বাবদ এক টাকা।

ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্য পরিবারের সবাইকে নিয়ে আনন্দ করে সেই রাতে গরুর মাংস খেলেন।

ধনু শেখ যাবেন নটিবাড়িতে। সপ্তাহে একদিন (মঙ্গলবার) তিনি নটিবাড়িতে রাত্রিযাপন করেন। আজ মঙ্গলবার। চাদরে আতর মাখিয়ে পাম্পশু পায়ে রওনা হয়েছেন, পথে ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্যের বাড়িতে থামলেন। বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন, পুত্রের আকিকার মাংস ঠাকুর খেয়েছেন কি-না।

অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, সবাইকে নিয়ে খেয়েছি। তৃপ্তি করে খেয়েছি।

ধনু শেখ বললেন, শুনে খুশি হলাম। তবে ঠাকুর একটা বিষয়। মাংসটা গরুর। ভুলক্রমে খাসির মাংস ভেবে আপনাকে গরুর মাংস দিয়েছি। গোপনে একটা গরু জবেহ করেছিলাম। সেই গরুর মাংস।

হতভম্ব অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, কী বললা ?

ধনু শেখ বললেন, যা বলেছি সত্য বলেছি। তবে আপনার চিন্তার কিছু নাই। কেউ জানবে না।

অম্বিকা ভট্টাচার্য বিড়বিড় করে বললেন, কেউ জানুক বা না-জানুক, জাত তো চলে গেছে।

ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, জাত চলে গেলেও চুপ করে থাকেন। আপনার কন্যা আছে। তার বিবাহ দিতে হবে না ? ঠাকুর, যাই।

অম্বিকা ভট্টাচার্য ঘোর লাগা মানুষের গলায় বললেন, কোথায় যাও ?

ধনু শেখ বললেন, আজ মঙ্গলবার। নটিবাড়িতে যাই। মঙ্গলবার রাতটা আমি নটিবাড়িতে কাটাই। জানেন নিশ্চয়ই ?

অম্বিকা ভট্টাচার্য কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, এইটা তুমি কী করলা ?

ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, আপনাদের এমন কিছু কি আছে যা খেলে মুসলমানের জাত যাবে ? থাকলে দেন খাই। সমানে সমান হবে।

ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্যের সপরিবারে গো-মাংস ভক্ষণ কাহিনী তৃতীয় দিনের দিন প্রকাশিত হয়ে পড়ল। বিধান দেবার জন্যে শ্যামগঞ্জ থেকে ন্যায়রত্ন রামনিধি চলে এলেন। তিনি বললেন, গরু যদি অল্পবয়স্ক হয় তাহলে জাত যাবে না। প্রায়শ্চিত্ত করলেই হবে। কারণ পার্বতীর পিতা, শিবের শ্বশুর মহারাজা দক্ষ যে যজ্ঞ করেছিলেন সেখানে গোবৎস বধ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণরা গোবৎসের মাংস খেয়েছেন।

জানা গেল ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্য যে মাংস খেয়েছেন তা বয়স্ক গরুর মাংস।

ন্যায়রত্ন রামনিধি বললেন, এরও বিধান আছে। যে পরিমাণ গো-মাংস প্রত্যেকে খেয়েছে সেই পরিমাণ কাঁচা গোবর এক সপ্তাহ খাবে। তাতে শরীর শোধন হবে। শরীর শোধিত হবার পর গঙ্গায় একটা ডুব দিলে গো-মাংস ভক্ষণজনিত বিষ শরীর থেকে চলে যাবে।

ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্য শরীর শোধনের প্রাথমিক পরীক্ষায় ফেল করলেন। এক চামচ গোবর মুখে দিয়ে বমি করতে করতে মৃতপ্রায় হলেন। সপরিবারে মুসলমান হবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এক শুক্রবার জুমা নামাজের পর তিনি মাওলানা ইদরিসের কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেন। সবাই মুখে তিনবার বললেন—

লা ইলাহা ইল্লাললাহ।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই।

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

মুহাম্মদ তাঁর রসুল।

মাওলানা ইদরিস প্রত্যকের ডান কানে তিনবার করে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে ফুঁ দিয়ে দিলেন। ফুঁ'র পরপরই ডান হাতে কান বন্ধ করতে হলো। সূরা ইয়াসিন দীর্ঘ সময় কানের ভেতর থাকে।

হাজাম ধারালো বাঁশের কঞ্চি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়া মাত্র সে দলের পুরুষদের খতনা শুরু করল। তাদের চোখের জল এবং চাপা গোঙানির ভেতর দিয়ে ইসলামধর্মে দাখেলের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো। অম্বিকা ভট্টাচার্যের নাম হলো— মোহম্মদ সিরাজুল ইসলাম। সবাই ডাকা শুরু করল সিরাজ ঠাকুর। ঠাকুর থেকে মুসলমান হয়েছেন এই জন্যেই নামের শেষে ঠাকুর।

এই ঘটনার বিস্তৃত ব্যাখ্যার একটা কারণ আছে। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের মাতুল বংশের একটা শাখার পূর্বপুরুষ ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্য। বর্তমান পুরুষরা হিন্দুয়ানির সব ছেড়েছেন, ঠাকুর পদবি ছাড়েন নি। ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের এক নানার নাম আনিসুর রহমান ঠাকুর। তিনি কঠিন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তাঁর রাত কাটতো এবাদত বন্দেগি করে।

জুলেখার বাড়িতে আজ নতুন অতিথি। অতিথিকে জুলেখার চেনা চেনা লাগছে। ঠিক চিনতে পারছে না। তবে এই মানুষটাকে সে যে দেখেছে এই বিষয়ে সে নিশ্চিত।

অতিথি খাটে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছেন। এই খাট জুলেখা নতুন কিনেছে। ময়ূর খাট। ময়ূরের কাজ করা। অতিথি বলল, তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছি। তোমার নাম কী গো ?

জুলেখা বলল, পিতামাতা নাম রাখতে বিস্মরণ হয়েছেন। আপনে সুন্দর দেইখা নাম দেন।

অতিথি বলল, আমার সাথে 'মীমাংসায়' (ধাঁধায়) কথা বলবা না। আমি মীমাংসা পছন্দ করি না। তোমার নাম বলো, ধর্ম বলো।

জুলেখা বলল, আমার যেমন নাম নাই, ধর্মও নাই। আমার ঘরে যে আসে তার ধর্মই আমার ধর্ম।

নাম বলো। নাম না বললে উইঠ্যা চইলা যাব।

অতিথি উঠার ভঙ্গি করল। জুলেখা চুপ করে রইল। চলে যেতে চাইলে চলে যাবে। জুলেখা বাধা দিবে না। অতিথি বলল, তুমি সুন্দর ঠিক আছে, কিন্তু অতি বেয়াদব মেয়ে। সঙ্গে বন্দুক থাকলে গুল্লি করতাম। বেয়াদব মেয়ের একটাই শাস্তি— নাভি বরাবর গুল্লি।

জুলেখা এই কথায় অতিথিকে চিনল। ইনি এককালের জমিদার শশাংক পাল। হাতি নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতেন। বাঘের সন্ধান করতেন। জুলেখা বলল, আপনের মাথা সামান্য গরম হয়েছে। শরবত খাবেন ? শরবত খাইলে মাথা ঠাণ্ডা হবে।

তুমি তোমার নাম বলো। নাম বললে মাথা ঠাণ্ডা হবে।

আমার এক নাম জুলেখা। আরেক নাম চান বিবি।

কোনটা আসল ?

দুইটাই আসল।

মুসলমান ?

হুঁ।

কালো ব্যাগটা খোল। বোতল আছে। গেলাসে কইরা বোতলের জিনিস দেও। আইজ এই জিনিস বেশি কইরা খাইতে হবে। মন অত্যধিক খারাপ।

মন খারাপ কী জন্যে ?

আইজ অম্বিকা ভট্টাচার্য দলেবলে মুসলমান হইছে, খবর পাও নাই ?

জুলেখা বলল, তার গরু খাওনের ইচ্ছা হইছে সে মুসলমান হইছে। আপনের কী ? আপনে ফুর্তি করতে আইছেন ফুর্তি করেন। গান শুনবেন ?

গান জানো?

শিখতেছি।

শিখাশিখির গানের মধ্যে আমি নাই। সারাজীবন বড় বড় ওস্তাদের মাহফিলে গান শুনেছি। বড় বড় বাইজিদের নাচ গান শুনে সোনার মোহর দিয়েছি।

জুলেখা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, এখন তো আপনের হাতে সোনার মোহর নাই। আমার গান ছাড়া গতি কী?

শশাংক পালের ভুরু কুঁচকে গেল। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। এই মেয়ে কথার পিঠে কথা বলার বিদ্যায় ওস্তাদ। এর সঙ্গে সাবধানে কথা বলতে হবে।

জুলেখা গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে নিচু গলায় গান ধরল—

ও পক্ষী আমার চক্ষু খাইও না।
সর্বাঙ্গ খাইও পক্ষী
চক্ষু খাইও না।

শশাংক পালের মুগ্ধতার সীমা রইল না। মেয়ের যেমন কণ্ঠ তেমন গান। সে এক জায়গায় বসে বসে গান করছে না। ঘুরাফেরা করতে করতে গাইছে। কখনো কাছে আসছে, কখনো দূরে যাচ্ছে। গান গাইতে গাইতে সুপারি কাটছে। ছড়তার শব্দটাও তখন তালে হচ্ছে। শশাংক পালের মনে হলো, আগেকার দিন থাকলে অবশ্যই এই মেয়ের দিকে একটা বা দু'টা স্বর্ণমুদ্রা ছুড়ে দেয়া যেত।

অ্যাই মেয়ে, তোমার নাম যেন কী?

কমলা রানী।

একটু আগে বলেছ জুলেখা, এখন কমলা রানী বলতেছ কেন?

নাম তো আপনের মনে আছে, আবার জিজ্ঞাস করলেন কেন?

তামুক খাব। ব্যবস্থা কর। তামাক সঙ্গে আছে। হুঁকার নল ভালো করে ধুয়ে তারপর দিবা।

জুলেখা হাসল।

শশাংক পাল ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করল— আফসোস, সময়কালে তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

জুলেখা বলল, সময়কালে দেখা হইলে কী করতেন?

শশাংক পাল জবাব দিলেন না। গ্লাস শূন্য। তিনি গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন। জুলেখা গ্লাস ভর্তি করতে করতে বলল, আমার জন্যে টাকা পয়সা কী এনেছেন?

তুমি কত নাও ?

যে যা দেয় তাই নেই। আপনে জমিদার মানুষ, আপনে দিবেন আপনের সম্মান মতো।

আজ সেই রকম দিতে পারব না। কাল দিব।

আইজ কি খালি হাতে আসছেন ?

শশাংক জবাব দিলেন না। তিনি ঠিক খালি হাতে আসেন নি। রুপার একটা ফুলদানি নিয়ে এসেছেন। দামি জিনিস। এই মেয়ে কি তার কদর বুঝবে ?

আইজ খালি হাতে আসলেও ক্ষতি নাই। আইজ খালি হাতে আসছেন, কাইল ভরা হাতে আসবেন। জগতের এই নিয়ম। আইজ পূর্ণিমা কাইল অমাবস্যা। খানা খাবেন না ? খানা দেই।

খানা খাব ?

হাবিজাবি জিনিস বেশি খাইলে খানা খাইতে পারবেন না।

কী খাওয়াবে ?

আলোচালের ভাত। গাওয়া ঘি। বেগুন ভাজি আর মুগের ডাল। নিরামিষ খাওয়া। দিব ?

দাও।

আসেন হাত-মুখ ধুয়ায়ে দেই, তারপর খানা খান।

জুলেখা।

জি।

তুমি অতি ভালো মেয়ে।

আপনেও অতি ভালো মানুষ। আপনের হাত কাঁপতেছে কেন ?

আমার হাতকাঁপা রোগ হয়েছে।

চিকিৎসা কইরা হাত ঠিক করেন। হাতকাঁপা রোগ নিয়া গুল্লি করবেন ক্যামনে ?

জুলেখা খিলখিল করে হাসছে। মুগ্ধ চোখে শশাংক পাল তাকিয়ে আছেন।

জুলেখা!

জি।

তুমি কি আমাকে বিবাহ করবে ? এখন আমার কিছুই নাই, তারপরেও মরাহাতি লাখ টাকা বইলা কথা। তোমারে আমি আদর সোহাগে রাখব।

রাখবেন কই ?

কলিকাতা নিয়া চইল্যা যাব। মালিটোলায় আমার ঘর আছে। দোতলা ঘর।

জুলেখা বলল, যাব। কইলকাতা শহর দেখা হয় নাই। দেখার শখ আছে।

তোমারে সবকিছু দেখাব। বজরা ভাড়া করব। কালিঘাট থাইকা বজরা ছাড়ব। সমুদ্র বরাবর বজরা যাবে। তুমি আমি ছাদে বইসা থাকব। তুমি গান করবা, আমি শুনব।

জুলেখা বলল, বাহ্!

শশাংক পাল বললেন, যৌবনে আমি অনেক গান লিখেছি। ট্রাংকভর্তি ছিল লেখা। গানগুলা থাকলে সুবিধা হইত। তুমি গাইতে পারতা।

কোনোটা মনে নাই ?

উঁহু। মনে করার চেষ্টা নিতেছি। মনে পড়লেই তোমারে বলব। বৃদ্ধ বয়সের এক সমস্যা— কিছু মনে থাকে না।

শশাংক পালকে জুলেখা যত্ন করে খাওয়ালো। নিরামিষ শশাংক পাল খেতে পারেন না। আজ তৃপ্তি করেই খেলেন। খাওয়ার শেষে হাতে পান দিতে দিতে জুলেখা বলল, এখন বাড়ি যান।

শশাংক পাল বিস্মিত হয়ে বললেন, বাড়ি যাব কেন ? তোমার এখানে নিরামিষ খাওয়ার জন্যে আসি নাই। রাত্রি যাপন করতে আসছি।

জুলেখা বলল, আরেকদিন আসবেন। টাকা-পয়সা নিয়া আসবেন। রঙিলা বাড়ির মালেকাইন সরজুবালা, উনার কঠিন নিয়ম। উনি বলেছেন— তেল মাখার আগে কড়ি ফেলতে হবে।

তুমি তাকে আমার নাম বলো। নাম বললেই মন্ত্রের মতো কাজ হবে। তাকে বলো জমিদার শশাংক পাল এসেছেন। এটা তার বাড়ির জন্য একটা ইজ্জত।

সরজুবালা ঘুমায়ে পড়েছেন। একবার ঘুমায়া পড়লে তারে জাগানো যাবে না।

তোমার জন্যে আমি রুপার ফুলদানি এনেছি।

শশাংক পাল ব্যাগ খুলে ফুলদানি বের করলেন। জুলেখা হাই তুলতে তুলতে বলল, ফুলদানি এনেছেন ভালো করেছেন। পরেরবারে যখন আসবেন দেখবেন ফুলদানি ভর্তি ফুল। এখন বাড়িতে যান।

বাইরে বৃষ্টি পড়তেছে। বৃষ্টির মধ্যে আমি কই যাব ?

ছাতা দিতেছি। ছাতা মাথায় দিয়া চইলা যাবেন।

জুলেখা শোন। আমি রাতে যাব না। চারদিকে আমার শত্রু। রাতে বিরাতে আমার চলাচল নিষেধ।

জুলেখা হাসিমুখে বলল, ধানাই পানাই কইরা লাভ নাই। আপনার যাইতে হবে। বৃষ্টির মধ্যেই যাইতে হবে। আগে আপনাকে বলেছিলাম ছাতা দিব। ভুল বলেছিলাম। ছাতা দিতে পারব না। ঘরে ছাতা নাই। আপনি যাবেন ভিজতে ভিজতে।

হরিচরণ টিনের চালাঘরে খাটের উপর বসেছিলেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চালায় বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভালো লাগছে। রাত অনেক হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তিনি ঘুমুতে যাচ্ছেন না। চোখে প্রবল ঘুম নিয়ে জেগে থাকার আনন্দ আছে। তাঁর কোলের উপর লালসালু কাপড়ে বাঁধানো খাতা এবং ঝর্ণা কলম। সন্ধ্যায় খাতায় অনেক কিছু লিখেছেন। আরো লেখার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু আলসি লাগছে। বৃষ্টির শব্দ মানুষকে অলস করে দেয়। হরিচরণ খাতার পাতা উল্টালেন—

> অদ্য ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্যের ধর্মান্তরের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। তাঁহাকে ভূলুণ্ঠিত বিষাদ বৃক্ষের মতো মনে হইল। তাহার দীর্ঘ দেহ ছটফট করিতেছিল। এক পর্যায়ে তিনি 'জল জল' বলিয়া চিৎকার করিলেন, তখন আসরে উপস্থিত ধনু শেখ বলিল, জল কবেন না। এখন থাইকা পানি কবেন। অম্বিকা ভট্টাচার্য বিড়বিড় করিয়া বলিলেন, পানি। পানি।

হরিচরণকে লেখা বন্ধ করতে হলো। টিনের দরজা নাড়ার শব্দ হচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে। বাইরে দুর্যোগ। এই দুর্যোগে কে আসবে তার কাছে!

হরি, দরজা খোল। আমি শশাংক।

হরিচরণ দরজা খুলে বিস্মিত হলেন। শশাংক পাল কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ রক্তবর্ণ। শীতে থরথর করে কাঁপছেন।

হরি, বিশটা কাঁচা রুপার টাকা দিতে পার ? বায়না হিসেবে দাও।

কিসের বায়না ?

কলিকাতা শহরে আমার একটা দোতলা বাড়ি আছে। ঐ বাড়ি আমি লেখাপড়া করে তোমাকে দিয়ে দিব। ভগবান সাক্ষী, কথার অন্যথা হবে না।

হরিচরণ বললেন, আপনি ঘরে এসে বসুন। আপনাকে শুকনা কাপড় দেই। তোয়ালে দেই। মাথা মুছেন। আগুন করে দেই, আগুনের পাশে বসেন।

আমার এখনই যেতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন। তুমি বিশটা টাকা দাও। দিতে পারবা ? ঘরে টাকা আছে ?

আছে।

তাহলে আরেকটা কাজ করো। তোমার হাতিটা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ধার দাও। আমি হাতির পিঠে করে এক জায়গায় যাব।

কোথায় যাবেন ?

কোথায় যাব তোমার জানার প্রয়োজন নেই। অনেক দিন হাতির পিঠে চড়ি না। হাতির পিঠে চড়তে ইচ্ছা করতেছে।

হরিচরণ বললেন, আপনার শরীর ভালো না। দেখে মনে হয় জ্বর এসেছে। রাতটা আমার এখানে থাকেন। হাতিতে চড়ে সকালে যেখানে যাবার সেখানে যাবেন।

হরিচরণ! আমার এখনি যেতে হবে। আমি যেখানে যাব সেখানে দিনের আলোয় কেউ যায় না। ঠিক আছে, তোমারে খোলসা করে বলি। আমি যাব রঙিলা বাড়িতে। এখন বুঝেছ ?

হরিচরণ কিছু বললেন না। শশাংক পাল গলা নামিয়ে বললেন, মৃত্যুর পরে কিছু নেই। শরীর পুড়ায়ে ফেলবে। ছাই পড়ে থাকবে। ছাইয়ের ভোগের ক্ষমতা নেই। আনন্দ পাওয়ার ক্ষমতা নেই। দেহধারীর আছে। এখন বুঝেছ ? টাকা বের করো।

হরিচরণ টাকা বের করলেন।

কাগজে লেখো— কলিকাতা ১৮ ধর্মচরণ সড়কের বাড়ি মজু ভিলার ক্রয়ের বায়না বাবদ বিশ টাকা। আমি টিপসই দিতেছি।

টিপসই দিতে হবে না, আপনি টাকা নিয়ে যান।

হাতি বের করতে বলো। হাতির পিঠে হাওদা দিতে বলো।

গভীর রাতে হাতির পিঠে চড়ে শশাংক পাল রওনা হলেন। হাতির গলায় রুপার ঘণ্টা বাজতে লাগল— টুন টুন টুন।

পথ কর্দমাক্ত। হাতির চলতে অসুবিধা হচ্ছে। কাদায় পা ডেবে যাচ্ছে। তবে হাতি আপত্তি করছে না। বাজার পার হয়ে উত্তরের সরু পথের কাছে হাতি থমকে দাঁড়াল। শুঁড় দোলাতে লাগল। সে আগাবে কি আগাবে না এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

ধনু শেখ এই সময় বাজারের দোকান বন্ধ করে ফিরছে। তার মাথায় একজন ছাতি ধরে আছে। পেছনে আরেকজন, তার হাতে বাঁশের পাকা লাঠি। হাতি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। হাতির পিঠে বসে থাকা মানুষটাকে চেনা যাচ্ছে না। ধনু শেখের হাতে হারিকেন। সে হারিকেন উঁচু করে ধরে বলল, কে? হাতির পিঠে কে?

শশাংক পাল বললেন, নিজের পরিচয় আগে দাও। তুমি কে?

ধনু শেখ বলল, গোস্তাকি মাফ হয়। আপনাকে চিনতে পারি নাই। সালাম। হুজুর কই যান?

শশাংক পাল বললেন, বিষ্টি বাদলার দিনে আলাপ পরিচয় করতে ভালো লাগতেছে না। তুমি ধনু শেখ না?

জে।

খাসির মাংস বইলা তুমিই তো অম্বিকা ভট্টাচার্যকে গরু দিলা?

ভুলক্রমে দিয়েছি। আমি বিরাট অপরাধ করেছি।

ভুলক্রমে কর নাই। কাজটা তুমি করেছ সজ্ঞানে। আগের ক্ষমতা যদি থাকতো তোমারে আমি নেংটা কইরা গ্রাম চক্কর দেওয়াইতাম।

ধনু শেখ বলল, দশজন বললে এখনো আমি নেংটা হইয়া গ্রাম চক্কর দিতে পারি। কোনো অসুবিধা নাই।

তুমি অতি ধুরন্ধর।

কথা সত্য।

আমার একটা দোনলা বন্দুক আছে, খরিদ করতে চাও?

অবশ্যই চাই।

দোনলাটা নেত্রকোনা সদরে বন্ধক দেয়া আছে। বন্ধকি ছুটায়ে বিক্রি করতে রাজি আছি। আমার অর্থের প্রয়োজন।

ধনু শেখ বললেন, আমি আগামীকাল নিজে উপস্থিত হব।

হাতি নড়তে শুরু করেছে, সম্ভবত তার বিবেচনায় এখন যাওয়া যায়। বৃষ্টি কমে এসেছে। চারপাশে ঘন অন্ধকার। দূরে রঙিলা বাড়িতে আলো দেখা যায়।

ধনু শেখ দোটানায় পড়েছে। রঙিলা বাড়ির দিকে যাবে, না নিজ বাড়িতে যাবে? আজ মঙ্গলবার না, তারপরেও ঝড়বৃষ্টির রাতে গানবাজনা, আমোদ ফুর্তি ভালো লাগে। আজ সারাদিন নানান ঝামেলা গিয়েছে। ঝামেলার শেষ করতে হয় আমোদ দিয়ে। এইটাই নিয়ম।

ধনু শেখ নিয়মের ব্যতিক্রম করে বাড়ির দিকে রওনা হলো। বাড়িতেও আনন্দের ব্যবস্থা আছে। তারা নামের যে ঘাটুছেলেকে দুই মাসের চুক্তিতে রাখা হয়েছে সেই ছেলেটা ভালো। তার গানের গলাও ভালো। দুই মাসের চুক্তি শেষ হওয়ার পথে। ছেলের বাবা এসেছিল ছেলেকে নিয়ে যেতে। অনেক দেনদরবার করে তাকে ফেরানো হয়েছে। লোকটা বদের হাড্ডি। নতুন চুক্তিতে যাবে না। সে না-কি জমি কিনেছে। খেতের কাজে ছেলেকে দরকার। চাপ দিয়ে চুক্তির টাকার পরিমান বাড়াতে চায় এটা পরিষ্কার। ধনু শেখ চাপ খাওয়ার বস্তু না।

বাড়িতে পৌছে ধনু শেখ গরম পানিতে গোসল করল। খাওয়া দাওয়া সেরে পালঙ্কে গা ছেড়ে দিল। ধনু শেখের স্ত্রী কমলা পানের বাটা নিয়ে এলো। পান মুখে দিতে দিতে ধনু শেখ জড়ানো গলায় বলল, তারাকে ডাক। গানবাজনা হোক।

কমলা বলল, সে তো নাই।

হতভম্ব ধনু শেখ বলল, নাই মানে কী?

চইলা গেছে।

কই চইলা গেছে?

তার দেশের বাড়িতে।

কখন গেছে?

সইন্ধ্যা কালে।

ধনু শেখ কঠিন গলায় বলল, মাগি তুই নিজেরে কী ভাবস? সইন্ধ্যা কালে গেছে, তুই আমারে খবর দিবি না? আমার বন্দুক নাই। বন্দুক থাকলে আইজ তরে গুলি কইরা মারতাম।

ধনু শেখ পালঙ্ক থেকে নামছে। চাদর গায়ে দিচ্ছে। কমলা ভীত গলায় বলল, আপনে যান কই?

ঐ বলদ পুলারে আনতে যাই। আইজ রাইতের মধ্যে যদি তারে না আনছি, ঘুংঘুর পরাইয়া না নাচাইছি তাইলে আমার নাম ধনু শেখ না। আমার নাম কুত্তা শেখ।

কমলা ক্ষীণস্বরে বলল, সকালে যান।

ধনু শেখ বলল, মাগি চুপ! আমি এখনই যাব। ঐ পুলারে আইন্যা মাওলানা ডাকায়া শাদি করব। সে-ই হইব তোর আসল সতিন।

পুরুষের সাথে পুরুষের বিবাহ হয়?

টাকা থাকলে সবই হয়।

ধনু শেখ দুর্যোগের রাতেই বের হয়ে গেল। পথে কালী মন্দির পড়ল। বাজারের কালী মন্দির। ধনু শেখ কালীমূর্তির মাথা ভেঙে ফেলল। গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার সময় কোনো মুসলমান যদি হিন্দু মন্দিরের কোনো ক্ষতি করে তাহলে বিনা ঝামেলায় কার্য সমাধা হয়। এই ছিল তখনকার লোকজ বিশ্বাস।

শশী মাস্টার মাছ মারার কনুই জাল নিয়ে বের হয়েছেন। জাল ফেলার কৌশল তাঁর এখনো রপ্ত হয় নি। জালের মুখ গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ার কথা। তা হচ্ছে না, জাল জড়িয়ে যাচ্ছে। শশী মাস্টারের জেদ চেপে গেছে, তিনি জাল ফেলেই যাচ্ছেন। পুরো কর্মকাণ্ড হচ্ছে শুকনায়, পানিতে না। শশী মাস্টারের কাজ আগ্রহ নিয়ে দেখছে সুলেমান। সে মাস্টারকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসে ফেঁসে গেছে। শুকনায় জাল ফেলার দৃশ্যে সে অভিভূত।

শশী মাস্টার বললেন, তুমি আমাকে কিছু বলতে এসেছ?

সুলেমান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশী মাস্টার বললেন, বলে ফেলো। কাজের সময় কেউ হা করে তাকিয়ে থাকলে ভালো লাগে না।

আপনার কাজ শেষ করেন, তারপর বলি। অপেক্ষা করি।

শশী মাস্টার জবাব দিলেন না। জাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জালের একটা অংশ হাতের কনুইয়ে জড়িয়ে রাখতে হয় বলেই এর নাম কনুই জাল। জাল ছুড়ে মারার সময় বিশেষ এক মুহূর্তে কনুই নামিয়ে দিতে হয়। সেই বিশেষ মুহূর্ত বের করা যাচ্ছে না বলেই বিপত্তি।

সুলেমান বলল, আমি দেখায়া দেই?

শশী মাস্টার বললেন, না। কৌশলটা আমি নিজে নিজে বের করব। তুমি কী বলতে এসেছ বলে চলে যাও। হা করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। কোনো উপদেশ বা পরামর্শের জন্যে এসে থাকলে 'নো'। আমি উপদেশ দেই না, পরামর্শও দেই না।

সুলেমান বলল, উপদেশ পরামর্শ না। আমি একটা আচানক জিনিস দেখছি। সেই বিষয়ে আপনারে বলতে চাই।

আমাকে বলে লাভ কী?

আপনি জ্ঞানী মানুষ। আচানক জিনিস ক্যান দেখলাম আপনি বলতে পারবেন। আমি একজন মানুষরে শূন্যে ভাসতে দেখছি।

শূন্যে ভাসতে দেখেছ ?

জে। মাটি থাইকা দুই তিন হাত উপরে সে ভাসতেছে।

শশী মাস্টার বললেন, গাঁজাটা কম খাবে, তাহলে আর এইসব জিনিস দেখবে না। গাঁজা মনে হয় অতিরিক্ত খাচ্ছ।

মাস্টার বাবু, আমি গাঁজা খাই না। অনুমতি দেন পুরা ঘটনাটা বলি। মন দিয়া শোনেন।

শশী মাস্টার অনিচ্ছায় রাজি হলেন। বিরক্তিতে তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল। অশিক্ষার কারণে এইসব ঘটছে। ভূত-প্রেত, শূন্যে ভাসাভাসি, সবকিছুর মূলে অশিক্ষা। শশী মাস্টার সুলেমানের পাশে এসে বসতে বসতে বললেন, ঘটনা বলো। তবে সংক্ষেপে বলবে। ডালপালা দিয়ে বলবে না। আমি বৃক্ষ পছন্দ করি, ডালপালা পছন্দ করি না।

সুলেমানের ঘটনাটা এরকম— কয়েকদিন আগে সে গিয়েছে হরিচরণের বাড়িতে তার ছেলের সন্ধানে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মাগরেবের আজান হয় হয়ে গেছে কিংবা এখনি হবে। ছেলেকে সে খুঁজে পেল না। ফিরে আসছে, হঠাৎ চোখ পড়ল হরিচরণ বাবুর দিকে। তিনি পুকুরের শ্বেতপাথরের ঘাটে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। মনে হয় ঘুমাচ্ছেন। ভর সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে থাকা খুব খারাপ, এইজন্যে সে উনাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্যে ঘাটের কাছে গিয়ে থ' হয়ে গেল। কারণ হরিচরণ শূন্যের উপরে শুয়ে আছেন। শ্বেতপাথরের ঘাট তাঁর দুই তিন হাত নিচে। এই হলো ঘটনা।

শশী মাস্টার বললেন, তুমি কী করলে ? তাঁকে ডেকে তুললে ?

সুলেমান বলল, আমি কিছুই করলাম না। দৌড় দিয়া পালায়া আসলাম। হারিকেন জ্বালায়া পরে আরেকবার গেছি। দেখি উনিও লণ্ঠন জ্বালায়ে বই পড়তেছেন।

তাঁকে কি তুমি সন্ধ্যার ঘটনা বললে ?

জে না।

বললে না কেন ?

সাহসে কুলাইল না।

তুমি মদ, ভাং, গাঁজা, আফিম— এর কিছু খাও ?

একবার তো বলছি— না। আমি মুসলমান। আমাদের ধর্মে এইসব খাওয়া নিষেধ আছে।

কোনোদিন খাও নাই ?

একবার আফিং খাইছিলাম। পেটে বেদনা হইছিল। কবিরাজ চাচা বললেন, সরিষার দানা পরিমাণ আফিং দুধে দিয়া তিনদিন খাইতে। আমি দুইদিন খাইছি। দুইদিনেই আরাম হইছে।

হরিচরণ বাবু যে শুয়েছিলেন তাঁর গায়ে কি চাদর ছিল ?

জে না।

মাথার নিচে বালিশ ছিল ?

জে না।

তুমি যা দেখেছ তার নাম ধান্ধা।

ধান্ধা কেন দেখব ?

ধান্ধা দেখার জিনিস তাই দেখেছ। দুনিয়ায় অনেকেই ধান্ধা দেখে। মরুভূমিতে দেখে মরীচিকা। চারদিকে ধুধু বালি— এর মধ্যে দেখে টলটলা পানি।

সুলেমান বলল, পানি দেখা আর মানুষ শূন্যে ভাসতে দেখা তো এক না।

শশী মাস্টার বললেন, জিনিস একই। তোমার মাথার কিছু দোষ আছে, এইজন্যে শূন্যে ভাসা মানুষ দেখেছ।

আরো একজন দেখেছে। তার মাথায়ও দোষ ?

সেই একজন কে ?

সুলেমান চাপা গলায় বলল, সে বিরাট পাপিষ্ঠ। তার নাম মুখে আনাও পাপ। একসময় আমার পরিবার ছিল, এখন নটিবাড়ির নটি। তার জন্যে আমার ইজ্জত গেছে। কাউরে মুখ দেখাইতে পারি না।

শশী মাস্টার অবাক হয়ে বললেন, তার নাম কি জুলেখা ?

হুঁ। এই নাম আমার সামনে নিয়েন না। সেই বান্দি প্রথম দেইখা আমারে বলছিল। সেও হরিবাবুরে একই জায়গা দেখেছে। উনি ঘুমের মধ্যে ছিলেন।

শশী মাস্টার বললেন, তোমার স্ত্রীও ধান্ধাই দেখেছে। তোমাকে বলার পর তোমার মন তৈরি ছিল ধান্ধা দেখতে। যথাসময়ে দেখেছ। এই ঘটনা কি তুমি আর কাউকে বলেছ ?

মাওলানা সাবরে বলেছি। মাওলানা ইদরিস।

উনি কী বলেছেন ?

উনি বলেছেন, দুষ্ট জিনের কাজ।

জিন শুধু শুধু উনাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখবে কেন ?

সেটা আমি ক্যামনে বলব ? জিনের সাথে তো আমার আলাপ পরিচয় নাই।

শশী মাস্টার বললেন, তুমি এই ঘটনা নিজের মধ্যে রাখবে। কাউরে বলে বেড়াবে না। বলাবলি করলে বিপদ হবে।

কী বিপদ ?

দেশের মানুষ অশিক্ষিত। কুসংস্কারে ডুবে আছে। ঘটনা জানাজানি হলে সবাই ভাববে হরিবাবু বিরাট আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুপুরুষ। ঝাড়ফুঁকের জন্যে দলে দলে লোক আসবে। কবচ দরকার, ঝাড়ফুঁক দরকার।

সুলেমান বলল, উনার কাছে তো আগে থাইকাই অনেকে যায়। ফুঁ নিতে যায়।

শশী মাস্টার অবাক হয়ে বললেন, কই আমি তো জানি না!

আপনে থাকেন আপনের মতো। জানবেন ক্যামনে ? মাস্টার বাবু, উঠি ? ঘটনা কাউরে বলতে না করছেন, বলব না।

মাধাই খাল যেখানে বড়গাঙে পড়েছে সেখানে বিশাল এক পারুল গাছ। ফুলগুলি জবার মতো দেখতে, রঙ নীল মেশানো হালকা শাদা। শীতের সময় গাছতলা ফুলে ফুলে ঢেকে থাকে। হরিচরণ গাছের নিচটা বাঁধিয়ে দিয়েছেন। শীতের সময় প্রায়ই তিনি বাঁধানো গাছতলায় এসে বসেন। পারুলের হালকা সুঘ্রাণে তাঁর নেশার মতো হয়। মাঝে মাঝে তিনি খাতাপত্র সঙ্গে নিয়ে যান। লেখালেখি করেন। কী মনে করে যেন একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছেন। গ্রন্থের নাম— 'দেবদেবী অভিধান'। গ্রন্থে দেবদেবীর ঠিকুজি কুলিজি লিখছেন। তাদের কর্মকাণ্ডও লিখছেন।

মাঘ মাসের শেষ।

প্রচণ্ড শীত ছিল। আজ হঠাৎ ধপ করে শীত নেমে গেছে। হরিচরণ পারুল গাছের নিচে আয়োজন করে বসেছেন। একটু দূরে কালু মিয়া হাতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। জায়গাটা মোটামুটি জনশূন্য। হরিচরণ লিখছেন—

দেবী লক্ষ্মী

> জগত তখনো সৃষ্ট হয় নাই। সনাতন কৃষ্ণের বাম অংশ হইতে এক অপরূপ নারীর সৃষ্টি হইল। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ এই নারী দ্বাদশ বর্ষিয়া বালিকার ন্যায়। মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ।

এই নারীই লক্ষ্মী। তিনি হরিকে স্বামীরূপে কামনা করিলেন। হরি নিজ স্বরূপকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। এক অংশের নাম চতুর্ভুজ নারায়ণ। অপর অংশ দ্বিভুজ কৃষ্ণ। চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে গ্রহণপূর্বক বৈকুণ্ঠে স্থায়ী সংসার গড়িলেন। দেবী লক্ষ্মী স্বর্গলক্ষ্মী হিসেবে অবস্থান করেন স্বর্গে, আবার একই সঙ্গে যোগমহিমায় গৃহলক্ষ্মী হিসেবে অবস্থান করেন মানুষের গৃহে গৃহে।

দেবী রাধা

সনাতন কৃষ্ণের ডান অংশ হইতে সৃষ্ট হইলেন অপরূপা রাধা। তিনিও লক্ষ্মীর ন্যায় হরিকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করিলেন। হরির যে অংশ দ্বিভুজ কৃষ্ণ সেই অংশ রাধাকে লীলাসঙ্গীনি হিসেবে গ্রহণ করিয়া গোলকবিহারী হইলেন।

হরিচরণের লেখায় বাধা পড়ল। জেলেপাড়ার মুকুন্দ তার ছেলেকে নিয়ে এসেছে। ছেলের প্রচণ্ড জ্বর। মুকুন্দ ভীতগলায় ডাকল, কর্তা!

হরিচরণ বললেন, তোর খবর কিরে মুকুন্দ ? আছিস কেমন ?

মুকুন্দ বলল, কর্তা আছি ভালা। পুলাটার বেজায় জ্বর। আপনের কাছে নিয়া আসছি।

আমার কাছে কেন ? সতীশ কবিরাজের কাছে নিয়া যা।

আপনে কপালে হাত দিলেই জ্বর কমবে। ডাক্তার-কবিরাজ লাগব না।

হরিচরণ বললেন, আমি কপালে হাত দিলে জ্বর কমবে কেন ?

মুকুন্দ বলল, ভগবান আপনেরে এই ক্ষমতা দিছে। কেন দিছে সেইটা উনার বিষয়। পুলাটার কপালে হাত দেন কর্তা। জ্বরে শইল পুইড়া যাইতেছে।

হরিচরণ মুকুন্দের জ্বরতপ্ত পুত্রের মাথায় হাত রেখে চোখ বন্ধ করে দীর্ঘসময় একমনে পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করলেন। এবং একসময় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন— মুকুন্দের পুত্রের কপালে ঘাম হচ্ছে, জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে। এই ঘটনা কেন ঘটছে তার কোনো ব্যাখ্যা তাঁর কাছে নেই। একটাই ব্যাখ্যা— জগত অতি রহস্যময়।

কর্তা!

বল মুকুন্দ।

পুলার জ্বর নাই। শইল পানির মতো ঠাণ্ডা।

হুঁ।

আইজ নাও নিয়া হাওরে মাছ ধরতে যাব। পরথম মাছ যেটা পাব সেটা আপনের জন্যে।

আমার জন্যে মাছ আনতে হবে না। আমি মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

আপনে মাছ খান না-খান আপনের জন্যে নিয়া আসব। আপনের নামে মানত করেছি মাছ একখান যে উঠব।

হরিচরণ লেখায় মন দিলেন। মুকুন্দের খেজুরে আলাপ ভালো লাগছে না। মুকুন্দ যাচ্ছে না। ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। পিতা-পুত্র মুগ্ধ হয়ে হরিচরণকে দেখছে।

হরিচরণ বললেন, বসে আছিস কেন চলে যা। ছেলেটার গায়ে রোদ লাগাচ্ছিস, আবার জ্বর আসবে।

মুকুন্দ তৃপ্তির গলায় বলল, আসলে আসব। আমরার কবিরাজ এইখানে বসা। কর্তা, আমার পুলা একটা হপন দেখছে। হপন শুনলে আপনে হাসতে হাসতে পেট ফাইট্টা মরবেন।

কী স্বপ্ন?

হপনে দেখছে হে হাতিতে চইড়া বিয়া করতে যাইতেছে। হা হা হা।

হরিচরণ মাহুত কালুকে ডেকে বললেন, মুকুন্দের ছেলেটাকে হাতিতে করে বাড়িতে দিয়ে আস।

মুকুন্দের মুখ হা হয়ে গেল।

আধমন ওজনের দর্শনীয় এক বোয়াল মাছ মুকুন্দ পৌছে দিয়েছে। সেই মাছ রান্না হচ্ছে। রান্না করছে হাতির মাহুত কালু মিয়া। বিশেষ বিশেষ রান্নায় সে পারদর্শী। বড় বোয়াল রান্না করা জটিল ব্যাপার। সামান্য নাড়াচাড়াতেই পেটি ভেঙে যেতে পারে। পেটি ভাঙা মানেই মাছ নষ্ট।

মাছ খাওয়ার দাওয়াত পেয়েছেন মাওলানা ইদরিস এবং শশী মাস্টার। শশী মাস্টার জানালেন যে, তিনি তাঁর জীবনে এত স্বাদু মাছ কখনো খান নি। বোয়ালের মতো নিম্নশ্রেণীর একটা মাছ যে এত স্বাদু হতে পারে এটা তাঁর কল্পনাতেও কখনো আসে নি। মাওলানা ইদরিস মাছ নিয়ে কিছু বললেন না, তবে খাওয়া শেষে হাত তুলে মোনাজাত করলেন— 'হে আল্লাহপাক! যে

বাড়িতে আমার জন্যে এত সুন্দর খাবার আয়োজন হয়েছে তার বাড়িতে যেন এরচেও অনেক সুন্দর আয়োজন প্রতিদিনই হয়।' এই মোনাজাত করতে গিয়ে মাওলানার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল।

শশী মাস্টার বললেন, মাওলানা সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার সেইভাবে পরিচয় হয় নাই। তবে সর্বজনের কাছে আপনার সুনাম শুনেছি। আপনি যে প্রার্থনা করলেন সেটা শুনেও ভালো লাগল। এ ধরনের প্রার্থনা আমি কাউকে করতে শুনি না।

মাওলানা ইদরিস বললেন, এই ধরনের দোয়া আমাদের নবি-এ-করিম সাল্লালাহ্ আলাহেস সালাম করতেন। তাঁকে দাওয়াত করে নানা আয়োজনে কেউ যখন খাওয়াত তখন তিনি এই দোয়াটা করতেন।

শশী মাস্টার বললেন, দোয়াটা খুব সুন্দর। কিন্তু আপনি এই দোয়া করতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন কেন, একটু জানতে পারি?

মাওলানা বললেন, জানতে পারেন। আজ আমার ঘরে কোনো খাবার ছিল না। মাঝে মাঝে এরকম হয়। টিন খুলে দেখি সামান্য চিড়া আছে। মনটা হলো খারাপ। আমি আল্লাহপাককে বললাম, ইয়া আল্লাহ, তোমার বান্দা কি আজ উপাস থাকবে? আল্লাহপাক সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। উনার রহমতের নমুনা দেখালেন। আল্লাহপাকের কাছে শুকুর গোজার করতে গিয়ে চোখে পানি এসেছে।

মাওলানার চোখে আবার পানি এসেছে। তিনি চোখ মুছলেন। মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকলেন শশী মাস্টার।

রাত ভালোই হয়েছে। হরিচরণের সঙ্গে শশী মাস্টার পুকুরঘাটে বসে আছেন। শীত পড়েছে। চারদিক অন্ধকার করে কুয়াশা পড়েছে। হরিচরণ বললেন, রাত হয়েছে, বাড়িতে যাবে না?

শশী মাস্টার বললেন, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে বসে আছি।

কিছু তো জিজ্ঞাস করছ না।

অস্বস্তির কারণে জিজ্ঞাস করতে পারছি না।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, অস্বস্তি কেন?

শশী মাস্টার বললেন, আপনি কিছু মনে করেন কি-না এই ভেবে অস্বস্তি। আমি চাই না, আমার কোনো কারণে আপনি মনে কষ্ট পান। আমি আপনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি।

কী জিজ্ঞাস করতে চাও জিজ্ঞাস কর।

আপনার বিষয়ে যে অনেক গুজব প্রচলিত এটা কি জানেন ? আপনি গায়ে হাত দিলে অসুখ সেরে যায়। এই ধরনের গুজব।

জানি।

এর কারণ কী ?

হরিচরণ বললেন, কারণ কী আমি জানি না। কারণ নিয়ে মাথাও ঘামাই না। এটাই কি তোমার কথা ?

না। মূল কথা না।

বলো, মূলটা শুনি।

শশী মাস্টার ইতস্তত করে বললেন, আপনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি, এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জুলেখা নামের একটি মেয়ে আপনাকে বাবা ডাকত। শুনেছি আপনিও তাকে স্নেহ করতেন।

ঠিকই শুনেছে।

সেই মেয়ে বেশ্যাবাড়িতে স্থান নিয়েছে। আপনার মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি কিছুই করলেন না। আপনি ইচ্ছা করলেই মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। কেন তা করলেন না এটাই আমার জিজ্ঞাসা। প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলে দিতে হবে না। আমি বুঝে নেব।

হরিচরণ বললেন, প্রশ্নের জবাব দিব। মেয়েটির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা তৈরি হয়েছিল বলে কিছু করি নাই। তাছাড়া মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনলেও লাভ কিছু হতো না। কে গ্রহণ করত এই মেয়েকে। সে পতিতজন। যেখানে সে বাস করছে এর বাইরে তার স্থান নাই। কোনো পুরুষ তাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করবে না। মেয়েটি অসাধারণ রূপবতী। অনেকেই হয়তো তাকে রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবে। তাতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি কি হবে ?

শশী মাস্টার চুপ করে রইল। হরিচরণ হঠাৎ শশী মাস্টারকে চমকে দিয়ে বললেন, তুমি মেয়েটিকে খুব পছন্দ কর, তাই না ?

শশী মাস্টার বললেন, আপনি কীভাবে জানেন ?

হরিচরণ বললেন, জুলেখার কথা থেকে অনুমান করেছি। তুমি তাকে কলের গান উপহার দিতে চেয়েছ। মোহের কাছে পরাজিত হওয়া ঠিক না। যাও, বাড়িতে যাও। বিশ্রাম কর।

শশী মাস্টার ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন।

হরিচরণ বললেন, পিতামাতার সঙ্গে কি কোনো যোগাযোগ হয়েছে ?

শশী মাস্টার না-সূচক মাথা নাড়লেন। হরিচরণ বললেন, যোগাযোগ করা উচিত। তাঁদের রাগ নিশ্চয়ই এতদিনে পড়ে গেছে। তাঁরা তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন।

শশী মাস্টার কিছু বললেন না। হরিচরণ বললেন, আমি কি তাঁদের কাছে একটা পত্র দিব ?

দিতে পারেন।

পত্র লিখে আমি তোমার হাতে দিব। পত্রটা মন দিয়ে পড়ে তুমি যদি মনে করো পাঠানো যায় তাহলে পাঠাবে।

আচ্ছা।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার মন পীড়িত। আমার কথায় যদি মন পীড়িত হয় তাহলে সেটা আমার জন্যে কষ্টের ব্যাপার। আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি।

শশী মাস্টার বললেন, আমি জানি।

হরিচরণ বললেন, পত্রটা আমি আজ রাতেই লিখে রাখব। পত্রলেখার জন্যে রাত্রি অতি উত্তম।

শশী মাস্টার বললেন, আমি যাই।

কালু মিয়াকে সঙ্গে দিয়ে দেই। এতটা পথ একা যাবে!

শশী মাস্টার বললেন, প্রয়োজন নাই।

ঘন কুয়াশায় শশী মাস্টার হাঁটছেন। উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরে সোজা চলে গেলেন বটকালি মন্দিরের কাছে। কিছুক্ষণ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বাজারের দিকে রওনা হলেন। শিমুলতলা থেকে রওনা হলেন হরিবাবুর কাঠের পুলের দিকে। কাঠের পুলের সেগুন কাঠের রেলিং যথেষ্ট চওড়া। পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যায়। শশী মাস্টার আগেও কয়েকবার এখানে এসে বসেছেন। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন পুলের উপর বসে কবিতা আবৃত্তি করা যায়।

শশী মাস্টার পুলের উপর পা ঝুলিয়ে বসলেন। চোখের সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় মাধাই খাল। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। শশী মাস্টারের প্রবল ইচ্ছা করছে ঝাঁপ দিয়ে খালে পড়তে। নিচে বাঁশের খুঁটি পোতা আছে কি-না ভেবে

ঝাঁপ দিতে পারছেন না। শশী মাস্টার কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন—

সূর্য গেল অস্তাচলে, দিগন্ত রেখায়
স্বর্ণ আভা রাখি—
বাবলার শাখা হতে নমি তারি পায়
কহিল জোনাকি

কে, মাস্টার বাবু না ? কী করেন ?

প্রশ্ন করেছে ধনু শেখ। তার চোখে রাজ্যের বিস্ময়। শশী মাস্টার বললেন, কিছুই করি না। জেগে বসে আছি।

নিশি রাইতে জাইগা থাকে দুই কিসিমের মানুষ, সাধু আর শয়তান। আপনি কোন কিসিমের ?

শশী মাস্টার জবাব দিলেন না। ধনু শেখ আগ্রহ নিয়ে বলল, আমি শয়তান। এই কারণেই নিশি রাইতে আমার চলাফেরা। রঙিলা বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলাম। পেটে উঠেছে বেদনা— ফিরত যাইতেছি। আমার বাড়িতে কি যাবেন ? বিলাতি শরাব ছিল, এক চুমুক দিতেন, শরীর গরম হইত। আপনাদের ধর্মে তো শরাব নিষেধ নাই।

শরাব খাওয়ার ইচ্ছা নাই।

জোয়ান বয়সে এক আধ চুমুক খাবেন না, এইটা কেমন কথা ? ধর্মে যখন নিষেধ নাই তখন কত সুবিধা। আমরার ধর্মে নিষেধ, যে কারণে গোপনে খাইতে হয়।

আপনি তো শুনেছি প্রকাশ্যেই খান।

ঠিকই শুনেছেন। পুলের উপরে বইসা করতেছিলেন কী ?

কবিতা আবৃত্তি করছিলাম। নিজের কবিতা। আমি আবার একজন কবি। শুনবেন কবিতা ?

জে না। কবিতা, গানবাজনা শোনার মতো মনের অবস্থা না। শরীর ভালো না। শরীর ভালো থাকলে শুনতাম। আপনি বাদ্যবাজনা পারেন শুনেছি— একদিন আপনার বাড়িতে গিয়া বাদ্য শুনব। যদি অনুমতি পাই।

অনুমতি দিলাম।

রাগ না করলে একটা উপদেশ দিতাম।

শশী মাস্টার বললেন, উপদেশ শুনতে আমার ভালো লাগে না। তারপরেও দিন, রাগ করব না।

ধনু শেখ গলা নামিয়ে বলল, আপনের জোয়ান বয়স। পুলের উপরে খামাখা বইসা আছেন কোন কামে? আমার কথা শোনেন, রঙিলাবাড়িতে যান। কুয়াশা যা পড়ছে। কেউ আপনেরে দেখবে না। আর দেখলেই কী? আমি যাই, পেটের বেদনাটা বাড়তেছে। বেদনা কম থাকলে আরো কিছুক্ষণ গফ করতাম। আপনার বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছি— পরিচয় হয় নাই।

কী শুনেছেন?

আপনে পাগলা মানুষ। পাগলা মানুষ আমার পছন্দ, তবে পাগলা মেয়েমানুষ পছন্দ না। যাই?

ধনু শেখ চলে যাচ্ছে। শশী মাস্টার তাকিয়ে আছেন। ধনু শেখের পেছনে তিনজন যাচ্ছে। এরা মনে হয় পাহারাদার। একজনের হাতে তালকাঠের বর্শা। এতক্ষণ আড়ালে ছিল। তিনজনের একজন শশী মাস্টারের পরিচিত। অম্বিকা ভট্টাচার্য। বর্তমান নাম সিরাজুল ইসলাম। সে ধনু শেখের অধীনে চাকরি নিয়েছে হয়তো। তার মাথায় কিস্তি টুপি। অন্ধকারে শাদা কিস্তি টুপি জ্বলজ্বল করছে।

জুলেখা সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, আসেন গো। মনে হয় আপনেরে 'জারে' ধরছে (শীতে ধরেছে), কাঁপতেছেন। এমন শীত তো নাই। আসেন আসেন। পানি দিতেছি, হাত-মুখ ধোন।

শশী মাস্টার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইচ্ছে করছে দৌড়ে পালিয়ে যেতে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। পা স্থানু হয়ে আছে। দরজার গোড়ায় পিতলের দু'টা কুপি জ্বলছে। জুলেখার হাতে কাশেমপুরি পেটমোটা হারিকেন। এই হারিকেন শাদা কেরোসিনে জ্বালাতে হয়। এর আলো হ্যাজাকবাতির মতো উজ্জ্বল। হারিকেনের আলো পড়েছে জুলেখার মুখে। তাকে ইন্দ্রানীর মতো দেখাচ্ছে। পানের রঙে ঠোঁট লাল। চোখে কাজল। কাজলের কারণেই চোখ হয়েছে বিষণ্ণ। জুলেখা বলল, আপনি যে আসবেন আমি জানতাম।

শশী মাস্টার বললেন, কীভাবে জানতে?

ঘরে আইসা বসেন তারপরে বলি।

ঘরে ঢুকব না জুলেখা।

দোয়ার থাইকা চইলা যাবেন?

হ্যাঁ। ঘোরের মধ্যে চলে এসেছিলাম।

ঘোর কি কাটছে?

শশী মাস্টার জবাব দিলেন না। তাঁর ঘোর কাটে নি, বরং বাড়ছে। জুলেখা বলল, আপনে আমার গান শুনতে চাইছিলেন। আইজ গান শুনবেন ? বিচ্ছেদের গান। উকিল মুনসির বিচ্ছেদি।

শশী মাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন। এই শীতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জুলেখা হাত ধরে তাঁকে ঘরে ঢুকাল।

কী সুন্দর পরিপাটি ঘর! সামান্য আসবাব। কার্তিকের মূর্তির সামনে পাথরের ফুলদানিতে টকটকে লাল রঙের জবাফুল। ফুল এখনো সতেজ। বিছানায় বকুলফুল ছড়ানো। হালকা মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।

তুমি জানতে যে আমি কোনো একদিন আসব ?

হুঁ।

কীভাবে জানতে ?

আপনের চোখে লেখা ছিল। আমি চোখের লেখা পড়তে পারি।

এখন আমার চোখে কী লেখা ?

এখন কিছু লেখা নাই ?

নিশ্চয়ই লেখা আছে। পড় কী লেখা।

জুলেখা বলল, এখন আপনের চোখে লেখা— আমি বাকি জীবন এই মেয়েটার সঙ্গে থাকব। এরে ছাইড়া যাব না। লেখা ঠিকমতো পড়ছি না ?

শশী মাস্টার জবাব না দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁর প্রচণ্ড পানির পিপাসা পেয়েছে। মনে হচ্ছে বুক শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে।

জুলেখা, জল খাব।

একটু ঠাণ্ডা হন তারপর খান।

শশী মাস্টার বললেন, আমার ভিন্ন একটা পরিচয় আছে। পরিচয়টা তোমাকে দিতে চাচ্ছি।

কেন ?

তোমাকে গোপন কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। আমার নাম শশী না। আমার নাম কিরণ গোস্বামী। বিপ্লবী কিরণ গোস্বামী। আমি একজন ইংরেজ সাবজজ এবং দু'জন ইংরেজ কনস্টেবল বোমা মেরে মেরেছি। এখন আমি পলাতক। আমার অনুপস্থিতিতে বিচারে আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ইংরেজ পুলিশ আমাকে ধরতে পারলেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

জুলেখা বলল, আপনে ঘামতেছেন। একটু বাতাস করি ?

করো। জল খাব।

একগ্লাস শরবত বানায়ে দেই ? লেবুর শরবত ?

দাও।

জুলেখা শরবতের গ্লাস নিয়ে এসে দেখে, শশী মাস্টার বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বাচ্চাদের মতো হাত-পা কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে। তৃষ্ণা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক না। ঘুমুতে যেতে হয় যাবতীয় তৃষ্ণা মোচনের পর। জুলেখা কী করবে বুঝতে পারছে না। সে কি এই মানুষটাকে ডেকে তুলবে ?

হরিচরণ রাত জেগে শশী মাস্টারের বাবাকে একটি চিঠি লিখছেন—

> মহাশয়,
>
> সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক নিবেদনমিদং। অধীনের নাম হরিচরণ। আপনার আদরের সন্তান শশী আমার আশ্রয়ে আছে। নিরাপদে আছে। সে আপনাদের সান্নিধ্যের জন্যে অতিব ব্যাকুল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব...

বান্ধবপুর গ্রামের নৌকাঘাটায় চৈত্রমাসের এক সকালে ছইওয়ালা একটা নৌকা ভিড়েছে। নৌকার আরোহী তরুণ এক যুবাপুরুষ। তার চোখে বাহারি চশমা। গাত্রবর্ণ গৌর। এই গরমেও তার গায়ে ঘিয়া রঙের চাদর। কালো চামড়ার একটা ব্যাগ তার সঙ্গে। নৌকা ঘাটে ভেড়ার পরও যুবাপুরুষ নৌকা থেকে নামছে না। কাছেই কোথাও গুলির শব্দ হচ্ছে। একটা শব্দ না। অনেক শব্দ।

এই নিস্তরঙ্গ গহীন গ্রামে গোলাগুলির শব্দ হবে কেন ? যুবাপুরুষ অবাক হয়ে নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞেস করল, শব্দ কিসের গো ?

মাঝি বলল, শিমুল ফুলের বিচি ফাটতাছে। এই অঞ্চলে শিমুল গাছ বেশি। মাছহাটায় আছে সাতটা শিমুল গাছ।

যুবাপুরুষ ব্যাগ হাতে নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে বের হয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। গাছ থেকে মেঘের ছোট ছোট খণ্ডের মতো শিমুল তুলা বিচি ফেটে বের হচ্ছে, বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। তার কাছে মনে হলো, সে তার জীবনে এত সুন্দর দৃশ্য দেখে নি।

মাঝি বলল, আপনে যাবেন কই ?

শশী মাস্টারের কাছে যাব। শশী মাস্টারকে চেন ?

চিনব না কী জন্যে ? উনারে কে চিনে না বলেন। পাগলা মাস্টার।

পাগল না-কি ?

বিরাট পাগল। চরের বালি দিয়া শরীর ঢাইক্যা শুইয়া থাকে। সারারাইত হাঁটে।

কেন ?

ক্যামনে বলব ? পাগল মানুষের কাজের কোনো ঠিকানা থাকে না। তয় লোক ভালো। শিক্ষক ভালো। আমার এক পুলা তার স্কুলে যায়। পুলার নাম তমিজ মিয়া।

বাহ্‌, সুন্দর নাম।

আপনার নাম কী ?

আমার নাম মফিজ। মোহাম্মদ মফিজ।

মাঝি অবাক হয়ে বলল, আপনি মুছলমান ?

নাম শুনে কী মনে হয় ?

আমি ভাবছিলাম আপনে হেন্দু। আপনের চেহারার মধ্যে হেন্দু আছে।

আমার গালে দাড়ি দেখছ না ?

অনেক হেন্দুর মুখেও দাড়ি আছে। শশী মাস্টারের গালেও দাড়ি।

শশী মাস্টারের কাছে যাব কীভাবে বলে দাও।

বাজারের রাস্তা বরাবর যাবেন। শেষ মাথায় দেখবেন ডাইনে এক রাস্তা। বাঁয়ে আরেকটা। ডাইনের রাস্তায় যাবেন। জুম্মাঘর পাইবেন। জুম্মাঘরে মাওলানা ইদরিস সাহেবরে পাইবেন, সে পথ বাতলায়া দিবে। পাগলা মাস্টার নদীর ধারে ঘর বানায়া একলা থাকে। হরিবাবুর বাড়ি পুরা খালি। সেখানে থাকবে না। তার নাকি 'জল' না দেখলে ঘুম আসে না।

মোহাম্মদ মফিজ নৌকা থেকে নামল। শিমুল গাছের নিচ থেকে কিছু তুলা কুড়ালো, তারপর হাঁটতে শুরু করল। আজ হাটবার না থাকায় দোকানপাট বেশিরভাগই বন্ধ। যুবাপুরুষকে কেউ লক্ষ করল না।

এই রূপবান যুবাপুরুষের আসল নাম জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। বাড়ি ঢাকা জেলার পাত্রসারে। পিতা জানকিনাথ। ১৯০৭ সনে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার হন। প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। আলীপুর বোমা মামলার পর বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন। এখন তিনি পলাতক। পুলিশ ভয়ানক সন্ত্রাসী হিসেবে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে। জীবনলাল এসেছেন আত্মগোপন করতে।

মাওলানা ইদরিস মসজিদের সামনে কাঠের টুলে বসে আছেন। তাঁর চোখেমুখে মুগ্ধতা। মুগ্ধতার কারণ মসজিদের টিউব কল। হরিচরণ এই টিউবওয়েল করে দিয়ে জায়গাটা বাঁধিয়ে দিয়েছেন। লোকজন পাত্র নিয়ে পানি নিতে আসে, তাঁর দেখতে খুব ভালো লাগে। আল্লাহর অসীম রহমতে পানি বের হয়েছে অতি স্বাদু। যে একবার এই পানি খাবে, তার স্বাদ মনে থাকবে। তাঁর মনে একটাই কষ্ট— হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ পানি নিতে আসছে না। পানির তো আর হিন্দু মুসলমান নেই। মসজিদের টিউব কলের পানি যে-কেউ খেতে পারে। হিন্দুরা খায় না। ন্যায়রত্ন রামনিধি ঘোষণা দিয়েছেন, যে এই জল পান করবে সে মহাপাতকি হবে।

আসসালামু আলায়কুম!

মাওলানা ঘাড় ঘুরিয়ে অচেনা আগন্তুককে দেখলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম। জনাব, আপনার পরিচয় ?

আমার নাম মোহাম্মদ মফিজ। আমি বাবু হরিচরণের স্কুলের নতুন শিক্ষক।

মাওলানার মন আনন্দে পূর্ণ হলো। আশেপাশের অঞ্চলের কোনো স্কুলেই মুসলমান শিক্ষক নেই। এই প্রথম একজন পাওয়া গেল। মাওলানা এগিয়ে গেলেন। হাত মেলালেন।

শশী মাস্টারের বাড়িতে যাব। কোনদিকে যাব যদি বলে দেন।

মাওলানা বললেন, আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যাব। প্রথম এই অঞ্চলে এসেছেন, জুম্মাঘরের সীমানায় পা দিয়েছেন, দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েন, তারপর চলেন আপনাকে নিয়ে যাই। আপনার দেশের বাড়ি কোথায় ?

জব্বলপুর।

শুনে খুশি হলাম। আপনি কোন মাজহাবের ?

আমি হানাফি। ইমাম আবু হানিফার মাজহাব।

আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিজে হানাফি মাজহাবের। একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না নেন।

অবশ্যই বলবেন।

আপনি অল্পবয়সে সুন্নতি দাড়ি রেখেছেন দেখে ভালো লাগছে। কিন্তু ভাই সাহেব, দাড়ির সঙ্গে গোঁফ রাখা ঠিক না। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হেস সালাম গোঁফ রাখতেন না। দাড়িগোঁফ একসঙ্গে রাখা সুন্নতের বরখেলাফ। কোনো খাদ্যদ্রব্যের সাথে যদি গোঁফের স্পর্শ হয় সেই খাদ্যদ্রব্য নাপাক হয়ে যায়।

আগুন্তুক বলল, আমার মায়ের কারণে গোঁফ রাখতে হয়েছে। মা বলেন গোঁফ ছাড়া দাড়িতে আমাকে না-কি খুবই খারাপ দেখায়।

তাহলে ঠিক আছে। মায়ের মনে কষ্ট দেয়া কোনোক্রমেই ঠিক না। নবিজির হাদিস আছে— 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।' আপনার কি অজু আছে ? না-কি অজু করবেন ?

অজু করব।

আসেন অজু করেন। আমি কল চাপব। এই কল নতুন বসানো হয়েছে। অতি সুমিষ্ট পানি। এক চুমুক খেলে দিল ঠাণ্ডা হয়।

মাওলানা তাকিয়ে আছেন। আগন্তুক অজু ঠিকমতো করতে পারছে কি-না এটাই তাঁর দেখার বিষয়। বেশিরভাগ মানুষ অজু ঠিকমতো করতে পারে না। হাতে ধরে অজু শেখাতে হয়। অজুর দোয়া শেখাতে হয়।

আপনি কি অজুর নিয়ত জানেন ?

আরবিতে জানি না। নিয়ত বাংলায় পড়ি।

বাংলায় পড়লেও হবে। সোয়াব সামান্য কম হবে। আমি আপনাকে আরবি নিয়ত শিখায়া দিব।

আগুন্তুক বললেন, শুকরিয়া।

আগন্তুক সুষ্ঠুমতে অজু করল। মাওলানা আনন্দ পেলেন।

মোহাম্মদ মফিজ শশী মাস্টারের বাড়ি দেখে বলল, বাহ্।

শশী বলল, বাহ্ মানে কী ? আনন্দের বাহ্ না অবজ্ঞার বাহ্ ?

মফিজ বলল, বিস্ময়ের বাহ্। তোর বাড়িঘর দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজ থাকুক ইংরেজের মতো। আমরা এইখানে জীবন পার করে দেই। মৎস্য মারিব খাইব সুখে।

শশী মাস্টার বলল, এক্কেবারে আমার মনের কথা।

মফিজ বলল, এটা কি তোর মাছ মারার জায়গা ?

হুঁ। সুন্দর কি না বল ?

'বাহ্' টাইপ সুন্দর।

মাছ ধরার জায়গাটা বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া। হিজল গাছের বড় দু'টা ডাল মাধাইখালের উপর দিয়ে কিছুদূর যাবার পর উপরের দিকে উঠেছে। ডাল দু'টার উপর পাটাতন বিছিয়ে মাছ ধরার জায়গা করা হয়েছে। রোদ যেন মাথায় না লাগে সেই ব্যবস্থাও আছে।

শশী মাস্টার বলল, নিজের হাতে মাছ ধরি, রান্না করি।

মফিজ বলল, কাজকর্ম না থাকলে তুই না-কি চরের বালি মেখে শুয়ে থাকিস ?

হুঁ। বালু চিকিৎসা।

এতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আমাদের উচিত লো প্রোফাইলে থাকা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা না।

শশী মাস্টার বলল, আমি একমত হলাম না। হাই প্রোফাইলের মানুষ সবসময় চোখের সামনে থাকে বলে তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। কৌতূহল তৈরি হয় লো প্রোফাইলের মানুষের দিকে।

মফিজ বলল, বিনোদের ফাঁসি হয়েছে, খবর পেয়েছিস ?

হুঁ।

ফাঁসির সময় হঠাৎ না-কি খুব ভড়কে গিয়েছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিল। কিছুতেই ফাঁসিতে ঝুঁলবে না। টেনে হিঁচড়ে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে।

শশী মাস্টার বলল, গাধা।

গাধা তো বটেই। এতে অন্য বিপ্লবীদের মন দুর্বল হয়। ভালো কথা, আমার থাকার জায়গা কি তোর এখানে ?

না। আমি সাত্বিক ব্রাহ্মণ। তোর মতো যবনকে নিজের বাড়িতে স্থান করে দেব কেন! তুই থাকবি ঋষি হরির বাড়িতে।

ঋষি হরিটা কে ?

যার স্কুলের আমি শিক্ষক তাঁর নাম হরিচরণ। লোকে তাঁকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সাধুপুরুষ হিসেবে জানে। যদিও তিনি জাতিচ্যুত। ধর্মচ্যুত। ভালো কথা, তুই থাকবি কতদিন ?

জানি না কতদিন। তবে তোকে চলে যেতে হবে। তোর ডাক এসেছে। নতুন মিশন।

কবে যেতে হবে ?

শিগগিরই যেতে হবে। তুই যাবি চট্টগ্রামে। মাস্টারদার সঙ্গে যোগ দিবি।

গুড। গেটআপ ভালো নিয়েছিস। দেখেই মনে হচ্ছে, অতি ধর্মপ্রাণ মাওলানা। নামাজের নিয়মকানুন জানিস ?

অবশ্যই।

শশী মাস্টারের বর্শিতে মাছ ধরা পড়েছে। সে বর্শি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাছের ঝাঁপাঝাঁপিতে মনে হচ্ছিল বিশাল কোনো মাছ। দেখা গেল বিশাল কিছু না, মাঝারি আকৃতির আড় মাছ।

শশী মাস্টার বলল, আমার মায়ের কোনো খবর রাখিস ?

না। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

তোর বাবা মা'র খবর কী ?

জানি না। তোর গানাবাজনা কি চলছে ?

হুঁ।

তোর জন্যে দু'টা রেকর্ড এনেছি। কানা কেষ্টর কীর্তন। এখনই বের করে দেব, না পরে নিবি ?

এখন দে। সেলিব্রেট করি।

সেলিব্রেশনটা কিসের ?

দুই বন্ধুর মিলন।

কলের গানে গান বাজছে। দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে আছে।

তনু যৌবনে তপন তটিনি
খেলে। কৃষ্ণ দ্বীজ যায়...
যমুনায়, যমুনায়।...

শশী মাস্টার গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে আমি প্রথম কাজ কী করব জানিস ? বিবাহ করব।

অতি উচ্চশ্রেণীর কোনো চিন্তা বলে তো মনে হচ্ছে না।

এটা যে কত বড় উচ্চশ্রেণীর চিন্তা বিবাহের পর বুঝতে পারবি। পতিত কন্যা বিবাহ করব।

ডোম কন্যা ? অচ্ছুৎ ?

শশী মাস্টার জবাব না দিয়ে দ্বিতীয় রেকর্ডটি কলের গানে রাখল।

মোহাম্মদ মফিজের স্থান হলো হরিচরণের বাড়িতে।

শশী মাস্টার ব্যবস্থা করে দিলেন। শশী মাস্টার বললেন, মোহাম্মদ মফিজ আমার পরিচিত। জব্বলপুরের মানুষ। শহরের নোংরা আবহাওয়ায় শরীর খারাপ করেছে বলে কিছুদিন গ্রামে থাকবেন। আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার অনুপস্থিতিতে উনি ছাত্র পড়াবেন।

হরিচরণ বললেন, কোনো অসুবিধা নাই। যতদিন ইচ্ছা থাকবেন। আমার বাড়ি তো খালি পড়ে আছে।

অতিথিকে হরিচরণের পছন্দ হলো। নির্বিরোধী ভালো মানুষ। পড়াশোনায় খুবই আগ্রহ। বেশিরভাগ সময় বই নিয়ে আছেন। বই পড়ার স্থানও বিচিত্র। কখনো পুকুরঘাটে, কখনো শতরঞ্চি পেতে শিউলিতলায়, আবার কখনো বা বই হাতে হাঁটতে হাঁটতে পড়া। হরিচরণের সঙ্গে অতিথির কথাবার্তা হয় না বললেই চলে। মানুষটা স্বল্পবাক।

টুকটাক কথা যা হয় খাবার সময় হয়। একদিন মফিজ বললেন, শুনেছিলাম আপনার দু'টা হাতি আছে। হাতি কই ?

হরিচরণ বললেন, পুরুষ হাতিটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম। দু'টা হাতি বাহুল্য ভেবেছি। মেয়ে হাতিটা আসামের জঙ্গলে পাঠিয়েছি। পুরুষ সঙ্গী খুঁজে বের করবে। কিছুদিন তার সাথে থাকবে, তারপর গর্ভবতী হয়ে ফিরে আসবে।

মফিজ বললেন, এও কি সম্ভব!

হরিচরণ বলল, সম্ভব কি-না জানি না। একটা পরীক্ষা বলতে পারেন। হাতির অন্তরে মায়াভাব প্রবল। সে গৃহকর্তার কাছে ফিরে আসে। গৌরীপুরের মহারাজার একটা মাদী হাতি পালিয়ে আসামের জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। গর্ভবতী হয়ে সে মহারাজার কাছে ফিরে আসে। হাতি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসার বুদ্ধি সেখান থেকে পাওয়া।

আপনার এই জংলি বাগান অতি মনোহর। কত ধরনের গাছ আপনার আছে জানেন?

না।

আমি গাছের একটা পূর্ণ তালিকা তৈরি করছি। আপনার এখানে কিছু দুর্লভ গাছ আছে। কর্পূর গাছ যে আছে আপনি জানেন?

না। আমার বাবার গাছের শখ ছিল, তিনি নানান জায়গা থেকে গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। আমার গাছের শখ নাই।

আপনার কিসের শখ?

আমার কোনোকিছুর শখ নাই। তবে আপনার গাছের প্রতি আগ্রহ দেখে ভালো লাগল।

আমাদের নবিজির গাছপালার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। একটা হাদিসে আছে তিনি বলেছেন— 'তুমি যদি জানো পরের দিন রোজ কেয়ামত, তারপরেও একটা গাছ রোপণ করো।'

হরিচরণ মুগ্ধ গলায় বললেন, বাহ্ সুন্দর কথা তো!

মফিজ বললেন, নবিজির অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে। আপনি আগ্রহী হলে আমি আপনাকে বলব।

হরিচরণ বললেন, আরেকটা বলুন।

মফিজ বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আরবের অন্ধকার যুগে কন্যা শিশুদের নানাভাবে নির্যাতন করা হতো। অনেককে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। নবিজি সারাজীবন চেষ্টা করেছেন শিশুকন্যাদের মঙ্গল করতে। তাঁর একটা হাদিস আছে, তিনি বলেছেন— 'যারা শিশুকন্যাদের জন্যে কোনো উপহার নিয়ে আসে, তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রী আনার মতো পুণ্যের কাজ করে।'

হরিচরণ বললেন, আপনার তো ধর্ম বিষয়ে অনেক জানাশোনা, কিন্তু আপনাকে ধর্মকর্ম করতে দেখি না। মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবেলা নামাজ পড়ার বিধান আছে বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছেন। আমি সেরকম ধার্মিক মানুষ না। আমি শুধু জুম্মাবারে মসজিদে যাই। এখন আপনি যদি বিব্রত না হন, তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?

করুন।

আপনি ধর্মচ্যুত হয়েছেন বলে শুনেছি। আপনি আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন না কেন?

হরিচরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সমাজ আমাকে ধর্মচ্যুত করেছে। আমি তো নিজেকে করি নাই।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। অনেক বিশিষ্টজন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন।

ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

আপনি অনুমতি দিলে এই বিষয়েও আপনাকে কিছু বলব।

ব্রাহ্মধর্মের বিষয়ে আমি জানতে চাই।

আমি যা জানি আপনাকে বলব। এই ধর্মের প্রচলন করেন রাজা রামমোহন রায়। ইসলামধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে উনার প্রচুর জ্ঞান ছিল। এই ধর্মে প্রভাবিত হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম শুরু করেন। এই ধর্মের মূল বিষয় একেশ্বরবাদ। ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজার ঘোরবিরোধী। আপনি জনহিতকর কাজ করতে চান এমন শুনেছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করবেন?

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন কী?

তিনি বিশ্বভারতী নামের ইউনিভার্সিটি শুরু করেছেন। তাঁর প্রচুর অর্থ প্রয়োজন।

আমার মতো অভাজনের অর্থ কি তিনি গ্রহণ করবেন?

অবশ্যই করবেন। আমি কি আপনার হয়ে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করব?

করলে ভালো হয়।

হরিচরণ আনন্দিত। এই তরুণের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বিস্মিত।

বান্ধবপুরের আরো একজনকে মফিজ বিস্মিত করল। তার নাম ইদরিস। মসজিদের ইমাম। জুম্মার দিনে, নামাজের পরে দু'জন বসে থাকেন। ধর্মের

নানান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মফিজ ধর্ম নিয়ে নবিজিকে নিয়ে নানান কথা বলেন। মাওলানা ইদরিসের বড় ভালো লাগে। নবিজি কখনো তসবি পড়তেন না, হাতের আঙুলে গুনতেন— এই তথ্য মাওলানা ইদরিস জানতেন না। নবিজি ঘাড় পর্যন্ত উঁচু একটা লাঠি সবসময় ব্যবহার করতেন, এই তথ্যও মাওলানা ইদরিসের অজানা। তিনি জানতেন নবি হযরত মুসা আলায়হেস সালামই শুধু লাঠি ব্যবহার করতেন— যে লাঠি মাটিতে ফেললে সাপ হয়ে যেত।

জুম্মাবারে নামাজ পড়ার কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় সবার সঙ্গেই মোহাম্মদ মফিজের সখ্য হলো। সবচে' বেশি হলো ধনু শেখের সঙ্গে। ধনু শেখের বাড়িতে যে-কোনো উৎসবে মোহাম্মদ মফিজের ডাক পড়ে। ছেলের খৎনা, মেয়ের জন্ম উপলক্ষে আকিকা, অন্য কেউ থাকুক না-থাকুক মোহাম্মদ মফিজ আছে। খাওয়া-দাওয়ার শেষে খাসকামরায় গল্পগুজব।

ধনু শেখ পান চাবাতে চাবাতে হুক্কার নল টানতে টানতে দরাজ গলায় বলে, মফিজ ভাই! আমি যে দিলখোলা লোক এইটা বুঝেন তো? পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সবদিক আমার খোলা।

মফিজ বলেন, শুধু চারদিক কেন? বাকি ছয়দিকও আপনার খোলা।

বাকি ছয়দিক কী?

ঈশান, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি, ঊর্ধ্ব, অধ।

বাহবা। আপনার তো জ্ঞানের সীমা নাই। আমি মূর্খ, মহামূর্খ। তবে এমন মূর্খ যার ধন আছে।

শুধু ধন না, বুদ্ধিও আছে। বুদ্ধি বিনা ধন আসে না।

মারহাবা। ভালো বলেছেন। এইজন্যেই আপনাকে পিয়ার করি। আমার বুদ্ধি কেমন সেই বিষয়ে একটা গল্প শুনবেন?

শুনব।

ধনু শেখ গলা নামিয়ে বলল, আপনাকে অতি আপনা লোক ভেবে বলতেছি। আর কাউরে এই ঘটনা বলা যাবে না। যৌবন বয়সে এই বুদ্ধি মাথায় আসল। কোনো হিন্দুমেয়েকে যদি কোনোরকমে পাট খেতে ঢুকায়ে ফেলা যায়, তার সঙ্গে কুকর্ম করা যায়, সে এই কথা প্রকাশ করবে না। প্রকাশ করলে তার জাত যাবে। তার গুষ্ঠির জাত যাবে। কাজেই কুকর্মের কথা কেউ জানবে না।

মফিজ বললেন, বুদ্ধিমতো কাজ করেছেন?

কয়েকবার করেছি। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলে নাই। হিন্দুর কাছে জাত বিরাট জিনিস। ঠিক না?

হুঁ।

বুঝেছি কাজটা অন্যায়। দুষ্টু বয়সে কিছু অন্যায় সবাই করে। আমিও করেছি। পাপ হয়েছে মানি। সেই পাপ কাটান দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি।

কী ব্যবস্থা ?

এই অঞ্চলে মাদ্রাসা দিব। মাদ্রাসায় তালেবুল এলেমরা আল্লাখোদার নাম নেবে। তারা যে সোয়াব কামাবে তার একটা অংশ আমি পাব। ভালো বুদ্ধি না ?

হুঁ।

আরো ব্যবস্থা রেখেছি। প্রতি ঈদুল ফিতরের নামাজের আগে আমি তওবা করি। এতে আগের সব পাপ কাটা যায়। নিষ্পাপ অবস্থা শুরু হয়। বুদ্ধি ঠিক আছে না ?

যিনি পাপ পুণ্য দেন তিনি কি আর আপনার কূটবুদ্ধি বুঝবেন না ?

তাও ঠিক। তারপরেও চেষ্টা চালায়ে যাব। কোনো এক ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যাব। কনি জাল ফেলার পরে জাল যখন টানা হয়, তখন দেখা যায় কিছু মাছ ফাঁক দিয়ে আরামসে বের হয়। হয় না ?

হয়।

মাদ্রাসার ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। টাইটেল পাশ মাওলানা রাখব। ছাগলা ইদরিসকে দিয়ে কাজ হবে না।

ইদরিস মাওলানা মানুষ হিসেবে প্রথম শ্রেণীর।

ইদরিস মানুষ খারাপ এইটা আমি বলব না, তবে তার প্রধান দোষ— মালাউনরে তোয়াজ করা। মালাউনরে তোয়াজের কী আছে ?

মফিজ বললেন, হিন্দুদের প্রতি আপনার এই প্রবল বিদ্বেষের কারণ কী ?

কারণ একটাই— এরা মুসলমানদের মানুষই মনে করে না। মনে করে আমরা কুকুরের অধম। ছোটবেলায় এক মিষ্টির দোকানে ভুলে ঢুকে পড়েছিলাম। ময়রা কী করল শুনেন। দোকানের সব মিষ্টি নিয়ে পুকুরে ফেলল। আমারে মারতে মারতে মিষ্টির উপরে ফেলল। কেউ কিছুই বলল না। মুসলমানরাও না। আফসোস কি-না বলেন ?

অবশ্যই আফসোস।

বদগুলা স্বরাজ স্বরাজ করতেছে। স্বরাজ আসুক, পিটায়া লাশ বানাব। ইংরাজ পুলিশের ভয়ে এখন কিছু করতে পারতেছি না। হিসাব মতো হিন্দুস্থানের মালিক আমরা। দিল্লির সিংহাসন ছিল আমাদের। যদি স্বরাজ হয়, হিন্দুস্থানের নাম বদলায়া করব— মুসলমান স্থান।

সপ্তাহে একদিন হরিচরণের কাছে 'কলিকাতা গেজেট' নামের পত্রিকাটি আসে। মফিজ পত্রিকাটি অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। বিপ্লবীরা কোথায় কী করছে সব খবর পাওয়া যায়। পুলিশের কর্মকাণ্ডের খবরও থাকে।

ব্রিটিশ সিংহ কিছুটা নরম হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের ভারতবাসীর সমর্থন দরকার। তাদের ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে, তারা যুদ্ধে জিতলে কিছুটা ছাড় দেবে। অনেকেই ব্রিটিশদের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তখন শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র। তিনি পড়াশোনা বাদ দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে সরাসরি যুক্ত করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বঙ্গদেশের মুসলমানদের জন্যে শুভ হয়েছিল। মুসলমানদের বড় অংশ চাষী শ্রেণীর। পাট তাদের প্রধান কৃষিপণ্য। যুদ্ধের কারণে পাটের দাম লাফিয়ে বাড়তে শুরু করে। পাঁচ টাকা মণ থেকে সত্তর টাকা মণে পৌছে যায়।

হতদরিদ্র চাষী মুসলমান শ্রেণীর হাতে প্রথম কিছু কাঁচা টাকা চলে আসে। বেশিরভাগই সেই কাঁচা টাকা ব্যয় করে ফূর্তির পেছনে। রঙিলা বাড়ি ঝলমল করতে থাকে। ঘাটু গান এবং যাত্রা গানের জোয়ার শুরু হয়।

চাষী মুসলমান শ্রেণীর একটা ক্ষুদ্র অংশ কাঁচা টাকা ব্যয় করেন সন্তানদের পড়াশোনার পেছনে। বেশকিছু মুসলমান ছাত্র প্রথমবারের মতো স্কুলে ভর্তি হলো। কোলকাতায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল— যার যাত্রা শুরু হয়েছিল এগারোজন ছাত্রী নিয়ে তার ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে হলো সত্তর। বেশিরভাগই মুসলমান ছাত্রী।

হরিচরণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। মোটা হলুদ কাগজে টানা লেখা। শেষে নামসই করা— শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিতে লেখা—

> শ্রী হরিচরণ সাহা,
>
> প্রীতিভাজনেষু,
>
> বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন— আপনার প্রেরিত অর্থ পাইয়াছি। এই অর্থ গ্রীষ্মের তাপদাহে শীতল জলধারার মতো বোধ হইয়াছে। আপনার কল্যাণ হোক।
>
> ইতি
>
> শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
>
> শান্তিনিকেতন।

হরিচরণ এই চিঠি দীর্ঘসময় কপালে ছুঁইয়ে রাখলেন। তারপরেও মনে হলো চিঠির যথাযোগ্য সম্মান করা হলো না।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি হরিচরণকে আনন্দিত করেছে, একই সঙ্গে অন্য আরেকটি চিঠি তাঁকে মহাবিব্রত করল। সেই চিঠি পত্রবাহক মারফত হাতে হাতে পাঠিয়েছেন মনিশংকর দেওয়ান। সেই চিঠিতে লেখা—

> আমি মহাবিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। একমাত্র পুত্র শিবশংকর দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুপথযাত্রী। ডাক্তার-কবিরাজ কেহই রোগের কারণ বা প্রতিকারের পথ দিতে পরিতেছে না। আমি সাহেব ডাক্তার দেখাইয়াছি। ইউনানী চিকিৎসাও করিয়াছি। আমার পুত্রের যন্ত্রণা সীমাহীন। পিতা হিসেবে এই যন্ত্রণা দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকমুখে শুনতে পাই আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদে রোগহরণ করিতে পারেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে আপনার দ্বারস্থ হইলাম। আমি পুত্রকে নিয়া যে-কোনো সময় বান্ধবপুরে উপস্থিত হইব। আপনি যথাসাধ্য করিবেন ইহাই আমার প্রার্থনা। যাত্রার শুভদিন নির্ণয়ের জন্যে পঞ্জিকা দেখিতেছি। বুধবার বারবেলা শুভদিন পড়িয়াছে। ঐ দিন রওনা হইবার সম্ভাবনা আছে। বুধবার রওনা হইলে শুক্রবার নাগাদ পৌঁছিবার কথা। বাকি ঈশ্বরের ইচ্ছা।

মনিশংকর তাঁর পুত্রকে বান্ধবপুরে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দোতলা বাড়ির বারান্দায় খাটের উপর পাটি পেতে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ছেলের পায়ের কাছে মনিশংকর মাথা নিচু করে বসে আছেন। ছেলের যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারছেন না, আবার উঠে চলেও যেতে পারছেন না। ছেলের মা ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। সেখানে পূজা চলছে। পূজার জন্যে দু'জন ব্রাহ্মণ এসেছেন কোলকাতা থেকে।

উঠানে নাম সংকীর্তন হচ্ছে। অনেক লোকজন ভিড় করেছে। দুর্গাপূজার মতো জমজমাট অবস্থা। গভীর বিষাদেও এক ধরনের উৎসবের ছোঁয়া থাকে।

শিবশংকরের বয়স মাত্র নয়। তীব্র ব্যথা সে নিতে পারছে না। ব্যথার একেকটা ধাক্কা আসে, ছেলে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে— বাবা, ব্যথা কমায়া দাও। বাবা, ব্যথা কমায়া দাও। অসহায় বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠেন।

খবর পেয়ে হরিচরণ এসেছেন। তাঁকে দেখে মনিশংকর ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, আমাকে বিষ এনে দেন। আমি বিষ খেয়ে মরে যাই। ছেলের যন্ত্রণা নিতে পারছি না।

হরিচরণ খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। শিবশংকর বলল, হরিকাকু, ব্যথা! ব্যথা!

হরিচরণ বললেন, বাবা, কোথায় ব্যথা ?

শিবশংকর তার পেটের দিকে ইশারা করল। হরিচরণ হাঁটু গেড়ে ছেলের পাশে বসলেন। তার পেটে হাত রেখে চোখ বন্ধ করলেন। মনে মনে ডাকলেন, হে পরম পিতা। হে দয়াময়। তোমার সৃষ্ট এই ক্ষুদ্রপ্রাণের প্রতি তুমি দয়া কর।

হরিচরণ অতি দ্রুত প্রার্থনার গভীরে পৌছে গেলেন। তিনি কোথায় আছেন, কী করছেন কিছুই তাঁর মনে রইল না। তাঁর শুধুই মনে হলো, তিনি কোনো এক অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। গৃহ মন্দিরের পূজার ঘন্টার শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসছে। লোকজনের চলাচল, কথাবার্তার কোনো শব্দই তাঁর কানে আসছে না। তিনি গভীর বিশ্বাস থেকে বলে যাচ্ছেন— দয়া কর দয়াময়। দয়া কর। দয়া কর।

হরিচরণের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। একসময় হঠাৎ তাঁর কাছে মনে হলো, তিনি সাঁতরাতে শুরু করেছেন। কূল কিনারা নেই এমন কোনো দিঘি। যার জল স্বচ্ছ ও শীতল। একটি শিশু ডুবে যাচ্ছে। তাকে ধরতে হবে। এই তাকে আবছা দেখা যাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে না। অনেক দিন আগে এরকম ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর শরীর অবসন্ন। তিনি দম পাচ্ছেন না। জলের শীতলতায় তাঁর শরীর জমে যাচ্ছে। তিনি হাত-পা নাড়তে পারছেন না।

উঠান থেকে অনেকটা দূরে বাবলা গাছের নিচে শশী মাস্টার এবং মফিজ দাঁড়িয়ে। দু'জনের দৃষ্টি হরিচরণের দিকে। দোতলার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে হরিচরণের মুখ দেখা যাচ্ছে। হরিচরণ সামান্য দুলছেন। শশী মাস্টার বললেন, দৃশ্যটার মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে। যদিও আমি জানি অলৌকিকত্ব বলে কিছু নেই। প্রার্থনায় কিছু হয় না। প্রার্থনায় কিছু হলে পৃথিবীর মানুষ সব ফেলে প্রার্থনাই করে যেত।

মফিজ বললেন, প্রার্থনায় কিছু হয় না, তারপরেও আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই প্রার্থনা করি।

শশী মাস্টার বললেন, হরিবাবুর এই প্রার্থনা কতক্ষণ চলবে বলে তোর মনে হয়?

মফিজ বললেন, বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা উনি Trance State-এ চলে গেছেন। Trance ভাঙতে সময় লাগবে।

শশী মাস্টার বললেন, যতক্ষণই লাগুক আমি অপেক্ষা করব।

হরিচরণ এসেছিলেন দুপুরের আগে আগে— সন্ধ্যা হয়ে গেল। মনিশংকরের বাড়িতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানো হলো। পূজার ঘণ্টা এবং শাঁখ বাজতে লাগল। হরিচরণ ছেলের গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। শিবশংকর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা জল খাব।

মনিশংকর কাঁসার গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলেন। চামচ আনলেন, চামচে করে খাওয়ানোর জন্যে। শিবশংকর বলল, বাবা আমাকে উঠারে বসাও, আমি হাত দিয়ে গ্লাস ধরে চুমুক দিয়ে জল খাব। আমার ব্যথা নাই।

মনিশংকর হতভম্ব গলায় বললেন, ব্যথা নাই? সত্যি ব্যথা নাই?

ছেলে না-সূচক মাথা নাড়ল।

মনিশংকর এই আনন্দ নিতে পারলেন না, অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। [মনিশংকরের পুত্র শিবশংকর পরিণত বয়সে যক্ষায় মারা যান। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার এবং পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার।]

হরিচরণ বারান্দার বেতের চেয়ারে শুয়ে আছেন। তিনি ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। তাঁর চোখ বন্ধ। তিনি বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছেন। কিছুক্ষণ আগেও তীব্র মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, এখন নেই। রাত অনেক হয়েছে। দ্বিতীয় প্রহরের শেয়াল ডাকাডাকি শুরু করেছে। হরিচরণের সামনে কাঠের চেয়ারে কাঁসার জগভর্তি পানি এবং গ্লাস। তিনি কিছুক্ষণ পরপরই পানির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর পেছনে শশী মাস্টার বসে আছেন। মফিজ আছেন মনিশংকরের বাড়িতে।

শশী মাস্টার বললেন, এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন?

হরিচরণ বললেন, না।

মাথার যন্ত্রণা কমে নাই?

মাথার যন্ত্রণা কমেছে, বুকে চাপ ব্যথা।

পালংকে শুয়ে থাকবেন?

না।

শশী মাস্টার বললেন, যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার সঙ্গে রাতটা কাটাই।

হরিচরণ বললেন, আমি বারান্দাতেই বসে থাকব।

শশী মাস্টার বললেন, আমিও থাকব। অলৌকিক কোনো কিছুতে আমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু আজকের ঘটনাটা নিতে পারছি না।

হরিচরণ বললেন, আমিও না। তবে প্রবল ঘোরের মধ্যে আমার বিশেষ এক ধরনের উপলব্ধি হয়েছে। হয়তো পুরোটাই ভ্রান্তি, মনের ভুল। জগৎ, সৃষ্টি রহস্য, পরকাল— এইসব নিয়ে খুব চিন্তা করি বলেই হয়তো দেখেছি।

কী দেখেছেন?

আজ থাক। আরেকদিন বলব।

আচ্ছা।

অভিজ্ঞতা বলে বোঝাতে পারব সেরকমও মনে হচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটা অস্পষ্ট।

অস্পষ্ট?

হরিচরণ বললেন, অস্পষ্ট বলাটাও ঠিক না, খুব স্পষ্ট; তবে সেই স্পষ্টতার ধরন ভিন্ন।

কথাটা বুঝতে পারলাম না।

হরিচরণ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমার কাছে হঠাৎ মাকড়সার জালের মতো মনে হলো। কেউ আলাদা না, সবাই যুক্ত এবং প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে। ইট, কাঠ, বালুকণা—সবই জীবন্ত। আরেকটা উপলব্ধি হয়েছে...

আপনি ক্লান্ত। বিশ্রাম করুন। আরেকদিন শুনব। তবে আজ না বললে আপনি আর কোনোদিন বলতে পারবেন না।

হরিচরণ বললেন, কেন বলতে পারব না ?

শশী মাস্টার বললেন, আমি যতদূর অনুমান করছি আপনার অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নের স্মৃতি অতি অল্প সময়ের স্মৃতি। আপনি ভুলে যাবেন।

হরিচরণ গ্লাসে পানি ঢেলে চুমুক দিলেন। চেয়ারে শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি একটা সুখ স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নের মধ্যেও তিনি একই জায়গায় ঘুমুচ্ছেন, শিউলির মা রাণীবালা এসে তাঁর ঘুম ভাঙালেন। তিনি উঠে বসতে বসতে বললেন, বউ কোনো সমস্যা ?

রাণীবালা বললেন, আপনার কন্যার বিবাহ, আর আপনি এখানে শুয়ে আছেন!

শিউলির বিবাহ ?

হুঁ। কিছুক্ষণের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান হবে। নিন গরদের চাদরটা গায়ে দিন।

তিনি অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে চাদর গায়ে দিতেই দৃশ্য বদলে গেল। তিনি দেখলেন বিয়ের আসরে পুরুতের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনেই তাঁর বাবা প্রিয়নাথ। হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, বাবা তুমি এসেছ!

প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি আসব না কীভাবে ভাবলি ? তুই ছোটবেলায় যেরকম গর্ধব ছিলি এখনো তো গর্ধবই আছিস। উন্নতি কিছুই তো হয় নাই।

বাবা, মা কি এসেছে ?

তাকে ছাড়া আমি আসব এটা ভাবলি কীভাবে ? সবাইকে নিয়ে এসেছি। কেউ বাদ নাই। শুধু আমার মেজদা আসেন নি।

উনি আসেন নি কেন ?

মেজদা সন্ন্যাস নিয়ে কোথায় যে চলে গেল। অনেক সন্ধান করেও খোঁজ পাই নি।

হরিচরণ অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। বাড়ি গমগম করছে। মৃত-জীবিত সবাই উপস্থিত। প্রিয়নাথ ধমক দিলেন, হা করে দেখছিস কী ? সবাইকে প্রণাম কর। কেউ যেন বাদ না থাকে। নারায়ণ। নারায়ণ।

হরিচরণের স্বপ্নভঙ্গ হলো 'নারায়ণ নারায়ণ' শব্দে। খাটে শুয়ে আছেন। ঘুমের মধ্যেই কেউ তাঁকে ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিয়েছে।

এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা ইদরিস মনিশংকর বাবুর ছেলের খোঁজ নিতে গেলেন।

ছেলে ভালো আছে। আরাম করে ঘুমাচ্ছে। সারাদিন কিছু খায় নি। ঘুমানোর আগে এক বাটি দুধ খেয়েছে। মাওলানা বললেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

মনিশংকর এখনো স্বাভাবিক হতে পারেন নি। কিছুক্ষণ পর পর ছটফট করে উঠেন, এদিক ওদিক তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, আমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিন এক পুণ্য করেছিলাম। সেই মহাপুণ্যটা কী ? তোমরা কেউ আমাকে বলবে কী সেই মহাপুণ্য ?

মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এসেছেন। তারা উঠোনের এক কোনায় গোল হয়ে বসা। তাদের মধ্যমণি সুলেমান, এক সন্ধ্যায় সে হরিচরণের বাড়ির দিঘির ঘাটে কী দেখেছিল সেই গল্প নিচু গলায় বলছে। চোখ বড় বড় করে সবাই শুনছে। শ্রোতাদের মধ্যে কাউকেই শূন্যে ভাসার বিষয়টির অস্বাভাবিকতা স্পর্শ করছে না। মোহাম্মদ মফিজ বললেন, আপনি নিজে দেখেছেন ?

সুলেমান বলল, অবশ্যই। আমি যদি মিথ্যা বলি আমার মাথায় যেন ঠাডা পড়ে। মাওলানা সাবও তাঁর বিষয়ে একটা জিনিস দেখছেন, তারে জিজ্ঞাস করতে পারেন। মাওলানা, ঘটনাটা বলেন।

মাওলানা আসর ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাঁর প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। বাড়িতে যাবেন, রান্না করবেন তারপর খাওয়া। ইদানীং রাতের খাওয়া তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রায়ই মনে হচ্ছে, কেউ একজন যদি থাকত যে রান্না করে রাখবে। এবাদত বন্দেগি শেষ করে যাকে নিয়ে তিনি খেতে বসবেন। খেতে খেতে সুখ-দুঃখের কিছু গল্প। সবার ভাগ্যে সব কিছু হয় না। ভাগ্যকে দোষ দেওয়াও ঠিক না, কারণ আল্লাহপাক স্বয়ং বলেছেন, 'ভাগ্যকে দোষ দিও না, কারণ আমিই ভাগ্য।'

মাওলানা রান্না চড়িয়েছেন। চাল ডালের খিচুড়ি। ঘরে ঝিংগা ছিল, কুচি কুচি করে ঝিংগা দিয়েছেন। খুঁজে পেতে দু'টি আলু পাওয়া গেল। আলু দু'টি

দিয়ে দিলেন। খিচুড়ি নামাবার আগে আগে এক চামচ ঘি দিয়ে দেবেন। ঘিয়ের সুঘ্রাণে সমস্ত ত্রুটি ঢাকা পড়ে যাবে।

মাওলানা, বাড়িতে আছেন?

মাওলানা ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন, মোহাম্মদ মফিজ।

আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।

মাওলানা আনন্দিত গলায় বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

কী করছিলেন?

রান্না বসায়েছি জনাব। আসেন রান্নাঘরে চলে আসেন। বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক নাই। পর্দা করার কেউ নাই।

কী রান্না করছেন?

সামান্য খিচুড়ি। দুই ভাই মিলে খেয়ে ফেলব।

দুই ভাইটা কে?

মাওলানা বললেন, আমি আর আপনি। জনাবের নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নাই?

জি-না। আপনার সঙ্গে অতি আগ্রহের সঙ্গে খাব।

মাওলানা বললেন, আল্লাপাক আপনার আজ রাতের রিজিক আমার হাঁড়িতে দিয়েছেন। উনার অশেষ মেহেরবানি।

মোহাম্মদ মফিজ বললেন, আপনার মতো খোদাভক্ত মানুষ খুব বেশি আছে বলে আমি মনে করি না। এই ধরনের ভক্তি দেখাতেও আনন্দ।

দু'জন রান্নাঘরে বসেছেন। মাওলানা আরেক মুঠ চাল হাঁড়িতে দিয়ে দিয়েছেন। মাওলানা রান্নার প্রক্রিয়ায়ও একটা পরিবর্তন করেছেন। খিচুড়ি ডালের মতো বাগাড় দেবেন বলে ঠিক করেছেন। সিদ্ধ হয়ে গেলে অন্য একটা হাঁড়িতে ঘি'র সঙ্গে পেঁয়াজ ভোজ বাগাড়। অতিথির কারণে উন্নত ব্যবস্থা।

মাওলানা সাহেব!

জি জনাব?

সুলেমান নামের লোকটা বলছিল, আপনি হরিবাবুর একটা বিশেষ জিনিস জানেন, সেটা কী?

উনি সাধু প্রকৃতির মানুষ। উচ্চশ্রেণীর সাধু। এর বেশি কিছু জানি না।

সুলেমান যে বলল, আপনি বিশেষ কিছু জানেন।

গ্রামের মানুষ অন্যকে সাক্ষী মেনে কথা বলতে পছন্দ করে। তাদের অনেক দোষের মধ্যে এটা বড় দোষ।

আজ যে ঘটনা ঘটল এই বিষয়ে আপনার মতামত কী ?

মাওলানা বললেন, আল্লাহপাক মনিশংকর বাবুর পুত্রকে দয়া করেছেন। উনি যখন যাকে ইচ্ছা দয়া করেন।

হরিচরণ বাবুর এখানে কোনো ভূমিকা নাই ?

আছে। আল্লাহপাক উনার মাধ্যমে দয়া করেছেন। উনার মাধ্যমে দয়া করেছেন বলে উনাকেও দয়া করা হয়েছে। আমাদের ঈসা নবির কথা মনে করেন, উনি অন্ধকে দৃষ্টি দিতেন, কুষ্ঠরোগী ভালো করতেন।

হরিচরণ বাবু নিশ্চয়ই ঈসা নবি না।

অবশ্যই না। আমরা কেউ কারো মতো না। সবাই আলাদা।

মোহাম্মদ মফিজ বললেন, আল্লাহপাকের কাছেও কি প্রতিটি মানুষ আলাদা, না-কি তাঁর কাছে সবাই এক ?

মাওলানা ইদরিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অতি জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব দিবার মতো জ্ঞান আমার নাই। তবে কথাটা আমার মনে থাকবে। যদি কখনো কোনো প্রকৃত জ্ঞানী মানুষের সন্ধান পাই তাকে জিজ্ঞেস করব। খানা তৈয়ার হয়েছে, আসেন খানা খাই।

খাওয়া শেষ করে মোহাম্মদ মফিজ বললেন, আমি আমার এক জীবনে অনেক ভালো ভালো খাবার খেয়েছি— এত ভালো খাবার খাই নি। যত দিন বেঁচে থাকব আপনার হাতের রান্না মনে থাকবে।

মাওলানা বললেন, সবই আল্লাহপাকের খেলা, তিনি আমাদের মুখে রুচি দিয়েছেন। উনার দরবারে শুকরিয়া। আসেন দুই ভাই মিলে আল্লাহপাকের দরবারে মোনাজাত করি।

মোহাম্মদ মফিজ বললেন, কিছু মনে করবেন না। এই দোয়াটা আপনি একা করুন। আমি পাশে বসে দেখি।

হরিচরণ পারুল গাছের নিচে বসে আছেন। তাঁর শরীর দুর্বল। রোজ রাতে নিয়ম করে জ্বর আসছে। সকালে জ্বর সেরে যায় কিন্তু তার থাবা রেখে যায়। সারাটা দিন কাটে ক্লান্তিতে এবং রাতে জ্বর আসবে তার প্রতীক্ষায়।

কড়া রোদ উঠেছে। হরিচরণের গায়ে রোদ চিড়বিড় করছে। একটু সরে বসলেই রোদের হাত থেকে বাঁচা যায়। সরে বসতেও ইচ্ছা করছে না। হরিচরণের চোখ বন্ধ। তাঁর ঝিমুনির মতো এসেছে। কে যেন তাঁর পায়ে হাত

দিল। হরিচরণ চমকে উঠে চোখ খুললেন। কিশোরী এক মেয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। শাড়ি পরায় তাকে বড় বড় দেখাচ্ছে। মেয়েটার মুখে অস্বাভাবিক মায়া। হরিচরণ বললেন, এই তুই কে ?

আমার নাম যমুনা।

তুই করিরাজ সতীশ বাবুর মেয়ে না ?

হুঁ।

এতবড় হয়ে গেলি কবে ?

যমুনা খিলখিল করে হাসল। হরিচরণ বললেন, তুই যে আমার পায়ে হাত দিলি তোর তো জাত গেছে।

যমুনা বলল, কেউ দেখে নাই।

হরিচরণ বললেন, তাও ঠিক। জাত যাবার জন্যে কাউকে না কাউকে দেখতে হবে। তুই এত দূরে একা এসেছিস ?

যমুনা বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসছি।

বলিস কী! কী জন্যে ?

যমুনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, বলতে লজ্জা করে।

হরিচরণ হাসতে হাসতে বললেন, চোখ বন্ধ করে বল। চোখ বন্ধ করে বললে লজ্জা লাগবে না।

যমুনা চোখ বন্ধ করল না, অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন।

কী আশীর্বাদ ?

আমার যেন বিবাহ হয়।

বিবাহ তো এমনি হবে। এর জন্যে আশীর্বাদ লাগবে কেন ?

যমুনা জবাব দিল না, গা মোড়ামুড়ি করতে লাগল। লজ্জায় তার গালে লালচে আভা দেখা দিল। হরিচরণ বললেন, বিশেষ কারো সঙ্গে বিবাহ ?

হুঁ।

নাম কী ?

সুরেন। কলিকাতায় থাকে। কলেজে পড়ে।

তোর ধারণা আমি আশীর্বাদ করলেই সুরেনের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে ?

হুঁ।

হরিচরণ হাসতে হাসতে বললেন, কাছে আয়, আশীর্বাদ করে দিচ্ছি।

যমুনা তাঁর সামনে মাথা নিচু করল। হরিচরণ উচ্চস্বরে প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান! হে পরমপিতা! তোমার এই সন্তানটির অন্তরের গোপন বাসনা তুমি পূর্ণ কর। সুরেনের সঙ্গে তোমার এই সন্তানের শুভবিবাহ যেন হয়। সেই বিবাহ যেন মঙ্গলময় হয়। তুমি তোমার এই অবোধ সন্তানকে দয়া কর।

যমুনা প্রার্থনা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হরিচরণের হঠাৎ মনে হলো যমুনা কাঁদছে না। কাঁদছে তাঁর কন্যা শিউলি। এই ধরনের ভ্রান্তি আজকাল তাঁর ঘন ঘন হচ্ছে।

ন্যায়রত্ন রামনিধি কাশির এক পণ্ডিত নিয়ে এসেছেন। পণ্ডিতের নাম নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তর্কালঙ্কার। তাঁরা সরাসরি হরিচরণের বাড়িতে এসেছেন। হরিচরণ অতি সমাদরে তাদেরকে বসিয়েছেন। তাদের আগমনের হেতু বিচিত্র। হরিচরণ পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। এখন তিনি আর জাতিচ্যুত না। তার বাড়িতে অতি উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাও জল গ্রহণ করতে পারবেন। বিধান এসেছে সরাসরি কাশি থেকে।

রামনিধি বললেন, তোমার বাড়িতে ফলাহার করতেও এখন আর আমাদের আপত্তি নাই। এই মীমাংসা করতে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। কয়েকবার কাশি যেতে হয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে এই খরচ দিতে পার, না দিলেও ক্ষতি নাই।

হরিচরণ বললেন, এত ঝামেলা করেছেন কী জন্যে?

তোমার দিকে তাকিয়ে করেছি। তুমি বিশিষ্টজন। ভালো কথা, উড়া উড়া অনেক কথা তোমার বিষয়ে শুনি। তুমি শরীরে হাত দিলে নাকি রোগ সারে?

হরিচরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, কিছু বললেন না। রামনিধি গলা নামিয়ে বললেন, দীর্ঘ দিন শূল বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি। দেখ কিছু করতে পার কিনা। তুমি হাত দিলেই কাজ হয়, না-কি মন্ত্র পাঠ করতে হয়? কী মন্ত্র পড়? নগেন বাবুর বাম হাঁটুতেও বিরাট সমস্যা। হাঁটতে পারেন না বললেই হয়। তাঁর বিষয়েও কিছু করা যায় কি-না দেখ।

হরিচরণ বললেন, আমি শরীরে হাত দিলে রোগ সারে না। আমি কোনো অবধূত না। আমি সাধারণ মানুষ। আপনার শরীরে হাত রাখতে আমার কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু আপনি ভেবে দেখেন হাত রাখা ঠিক হবে কি-না? আমার এই বাড়িতে একজন মুসলমান শিক্ষক থাকেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ মফিজ।

রামনিধি এবং তর্কালঙ্কার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। হরিচরণ বললেন, তারচেয়েও বড় সমস্যা, এক ডোমের মেয়ে আমাকে বাবা ডাকে। সে মাঝে মাঝে এসে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে।

রামনিধি বললেন, সর্বনাশ! আগে বলবা না! তুমি দেখি আমাদের নরকবাসী করার বুদ্ধি করেছ। রাম রাম।

হরিচরণ বললেন, ডোম কন্যাদের সঙ্গে যৌন কর্মে বর্ণহিন্দুর সমস্যা নাই। এতে তাদের জাত যায় না, কিন্তু এরা বর্ণহিন্দুর বাড়িতে এসে ঘর ঝাট দিলে জাত যায়— এটা কেমন কথা ?

তোমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনার জন্যে আমি আসি নাই। শাস্ত্র বোঝার মতো জ্ঞান বুদ্ধি তোমার হয় নাই। আমরা উঠলাম। আজকাল হাড়ি ডোম মেথর নিয়া আছ আমাদের জানা ছিল না।

দুই শাস্ত্র পণ্ডিত হরিচরণের বাড়ি থেকে বের হয়েই গঙ্গাজলে স্নান করে পবিত্র হলেন। বোতলভর্তি গঙ্গাজল তাদের সঙ্গেই ছিল। এই জলের কয়েক ফোঁটা স্নানের পানিতে মিশিয়ে নিলেই গঙ্গা স্নান হয়।

শশী মাস্টার চলে যাবেন, তার ডাক এসেছে। তাকে যেতে হবে চট্টগ্রামে। সূর্যসেন নামের একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। যাকে সবাই চেনেন 'মাস্টারদা' নামে। হরিচরণকে বললন, মা'র শরীর ভালো না। উনি আমাকে ক্ষমা করে কাছে ডেকেছেন। হরিচরণ বললেন, অতীব আনন্দ সংবাদ। রওনা হবার আগে আগে শশী মাস্টার হরিচরণের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। হরিচরণ আঁতকে উঠে বললেন, কর কী, কর কী, তুমি ব্রাহ্মণ!

শশী মাস্টার বললেন, আপনার চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ তো আপাতত চোখে পড়ছে না।

তোমার পিতা-মাতাকে আমার প্রণাম দিও। তুমি কি এখনই রওনা দিচ্ছ ?

শশী মাস্টার বললেন, আমি রাতে যাব। সন্ধ্যাবেলায় এক জায়গায় যাব। একজনের সঙ্গে দেখা করব। তাকে একটা জিনিস দেব। তার নাম যদি জানতে চান বলতে পরি।

হরিচরণ বললেন, নাম বলার প্রয়োজন নাই।

জুলেখার কাছ থেকে শশী মাস্টার বিদায় নিয়েছেন। কলের গান জুলেখাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কীভাবে দম দিতে হয় কীভাবে পিন বদলাতে হয় শিখিয়ে দিয়েছেন।

হাসিমুখে বলেছেন, জুলেখা যাই ?

জুলেখা বলল, একটু বসেন। শরবত দেই। শরবত খান।

শশী মাস্টার বসতে বসতে বললেন, বসতে যখন বলছ বসে যাই। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ।

জুলেখা বলল, রাতটা থাকেন, আরাম করে ঘুমান। আমি সারারাত আপনার পায়ে হাত বুলায়ে দিব।

সেবা নেওয়ার অভ্যাস নাই জুলেখা।

জুলেখা বলল, মানুষ মানুষের সেবা নেয়। পশু পশুর সেবা নিতে পারে না।

সেবার প্রয়োজন নাই। একটা গান শোনাও। তুমি কি রবিবাবুর কোনো গান কখনো শুনেছ ?

না।

উনার গান সম্পূর্ণ অন্য ধারার। শুনলে তোমার ভালো লাগত। আমার গলায় সুর নাই। তারপরেও শোন—

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ?
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না ?
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
হারাই-হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে ॥

জুলেখা বলল, আপনাকে একটা অদ্ভুত কথা বলব। কথাটা শোনার পর আপনি আমাকে খুব খারাপ ভাববেন। তারপরেও বলব।

বলো।

আমার মনে হয় আমার অনেক ভাগ্য যে রঙিলা বাড়িতে আমার স্থান হয়েছে।

বলো কী ?

জুলেখা চাপা গলায় বলল, এইখানে আছি বইলাই আপনার মতো মানুষের সাথে পরিচয় হইছে। গান আমার অন্তরের জিনিস। গান গাইতে পারতেছি। শিখতেছি।

শশী মাস্টার বললেন, অতি কুৎসিত জীবনের বিনিময়ে যেটা পাচ্ছ সেটা কি অতি তুচ্ছ না ?

জুলেখা বলল, আমার কাছে না।

শশী মাস্টার বললেন, তুচ্ছ না তাহলে কাঁদছ কেন ?

জুলেখা বলল, আপনারে আর দেখব না এই দুঃখে কাঁদতেছি। রবিবাবুর আরেকটা গান করেন, আমি গলায় তুলব।

শশী মাস্টার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গান ধরলেন—

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে—
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে   বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার   বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর—
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,   ফেলো না আমারে ছড়ায়ে ॥
চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা   বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী   তোমারি কাছেতে হারিয়া।

শশী মাস্টার মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় পুলিশের গুলিতে মারা যান। তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সাল। অসীম সাহসী মাস্টারদা সূর্যসেনের কারণে ৪৮ ঘণ্টা চট্টগ্রাম শহর ছিল স্বাধীন শহর। ব্রিটিশ শাসনের আওতার বাইরের এক নগরী।

মাস্টারদা ধরা পড়েন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের তিন বছর পরে। তাঁরই জ্ঞাতি ভাই নেত্র সেন তাঁকে ধরিয়ে দেন। চট্টগ্রাম জেলে বাংলার বীর সন্তান সূর্যসেনকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

চৈত্র মাসের শেষ দিকের কথা। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা মিলিয়েছে। হরিচরণের শরীর খারাপ করেছে। তাঁর প্রবল শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শরীর খারাপের কারণ আধিভৌতিক। সন্ধ্যাবেলায় তিনি ঘাটে বসেছিলেন। আকাশে ঘন মেঘ থাকায় আগেভাগে অন্ধকার নেমেছে। দিঘির ডানপাশে জোনাকি পোকার বড় একটা ঝাঁক বের হয়েছে। এরা দলবেঁধে পশ্চিম দিকে এগুচ্ছে। হরিচরণ গভীর আগ্রহে এদের গতি-প্রকৃতি লক্ষ করছেন। দিঘির পাড় থেকে বের হয়ে এরা লেবুতলায় কিছুক্ষণ স্থির হলো। সেখান থেকে উড়তে উড়তে বেত ঝোপের পাশে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়ে আবার দেখা দিল। এখন এরা যাচ্ছে শিউলি গাছের দিকে।

হরিচরণ তাকালেন শিউলি গাছের দিকে। হঠাৎ তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন— শিউলি গাছের নিচে ফ্রক পরা এক মেয়ে। মেয়েটার দৃষ্টি তাঁর দিকে। সে হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে আছে। তার দিকে দৃষ্টি পড়ার পর সে গাছের আড়ালে চলে গেল। অতি দ্রুত যে গেল তাও না। ধীরে পা ফেলে গেল, তবে সে তার দৃষ্টি একবারের জন্যেও ফিরিয়ে নিল না। হরিচরণের মেয়েটাকে চিনতে কোনো সমস্যা হলো না। মেয়েটা শিউলি। ঢেউ খেলানো চুল, রোগা শরীর, লম্বাটে মুখ।

হরিচরণ চাপা গলায় ডাকলেন, কে! কে গো!

গাছের আড়াল থেকে কেউ উত্তর দিল না। তবে হরিচরণ কিশোরীর পাতলা হাসির শব্দ শুনলেন। এটা কি কোনো বিভ্রান্তি ? কোনো মায়া ? তিনি যদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন তাহলে কি মেয়েটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে ? হরিচরণ পুকুরের দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন—

যা দেবীষু ভ্রান্তরূপেনু সংস্থিতা
দেবী ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করেন।

তিনি আবার তাকালেন শিউলি গাছের দিকে। হ্যাঁ, মেয়েটাকে আবার দেখা যাচ্ছে। সে এখন গাছে হেলান দিয়ে আছে। মেয়েটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই

তো তার রোগা রোগা ফর্সা পা। হরিচরণ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চাপা গলায় ডাকলেন— মা শিউলি!

মেয়েটি এবার হাত ইশারায় তাঁকে কাছে ডাকল। হরিচরণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি চোখে পলকও ফেলছেন না। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে, পলক ফেললেই এই ছায়াময়ীকে আর দেখা যাবে না।

জঙ্গল আলো করে বিদ্যুৎ চমকালো। মেয়েটাকে আর দেখা গেল না।

হরিচরণ নিজের ঘরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছে হারিকেন জ্বলছে। বাঁ-দিকের জানালা খোলা। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাট আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হরিচরণ মাঝে মাঝে সামান্য কাঁপছেন। তিনি বুকের ব্যথা নিয়ে শুয়েছিলেন। সেই ব্যথা বাড়ছে। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হারিকেন হাতে মফিজ ঢুকলেন। চিন্তিত গলায় বললেন, আপনার শরীর কি খারাপ করেছে?

হরিচরণ বললেন, একটা কাগজ-কলম নিয়ে আমার পাশে বসো? কিছু কাজ আছে।

আপনার কি শরীরটা খারাপ করেছে?

হুঁ।

ডাক্তার খবর দেই?

ডাক্তার কবিরাজ পরে খবর দিবে। আগে কাগজ-কলম নিয়ে বসো।

মফিজ কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। হরিচরণ বললেন, আমার ধারণা আমি বাঁচব না। আমি আমার বিষয়সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করব। সাক্ষী হিসেবে থাকবে তুমি এবং মাওলানা ইদরিস।

মফিজ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমার পক্ষে সাক্ষী হওয়া সম্ভব না।

সম্ভব না কেন?

আমার নাম মফিজ না। আমার নাম জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়।

হরিচরণ বিছানা থেকে উঠে বসলেন। তাকালেন তীক্ষ্ণচোখে। জীবনলাল বললেন, আমি আপনার আশ্রয়ে আত্মগোপন করে আছি।

বিপ্লবী?

জীবনলাল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হরিচরণ বললেন, আমি কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। যাই হোক, আমি আমার সমুদয় বিষয়সম্পত্তি একজনকে দান করতে চাই— তার নাম জহির। সে মুসলমান ছেলে। তার বিষয়ে একটি বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছিলাম বলে এই সিদ্ধান্ত।

জীবনলাল বললেন, স্বপ্নের মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক না।

হরিচরণ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, স্বপ্ন তুচ্ছ না। এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্কে যাব না। যা লিখতে বলেছি লেখ। কাগজ-কলম নিয়ে বসো। আমার শরীর এখন ভালো। এই ভালো থাকবে না। শরীর স্পর্শ করে অনেকের রোগ সারিয়েছি। নিজেরটা পারব না।

জীবনলাল বললেন, সাধারণ কাগজে লেখা দানপত্র টিকবে না। আপনার ঘরে কি স্ট্যাম্প আছে ? আপনি এত বড় ব্যবসায়ী। জমিদারিও আছে। কোম্পানির স্ট্যাম্প তো থাকার কথা।

হরিচরণ বললেন, বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ। স্ট্যাম্প আছে। বড় ঘরের সিন্দুকে স্ট্যাম্প আছে।

সিন্দুকের চাবি কোথায় ?

হরিচরণ বালিশের নিচ থেকে চাবি বের করে দিলেন।

জীবনলাল স্ট্যাম্প এবং কলম নিয়ে পাশে বসলেন। শান্ত গলায় বললেন, ছেলের বাবার নাম কী ? বাবার নাম লাগবে।

বাবার নাম ভুলে গেছি। মায়ের নাম মনে আছে। জুলেখা।

ঠিকানা কী ?

জুলেখা থাকে বেশ্যাপল্লীতে। রঙিলা বেশ্যাপল্লী।

জীবনলাল চমকে তাকালেন। হরিচরণ বললেন, তুমি যা ভাবছ তা-না। জুলেখা আমাকে বাবা ডাকত। আমি তাকে কন্যাসম জ্ঞান করেছি।

দানপত্র লেখা হলো। হরিচরণ দস্তখত করলেন। বুড়ো আঙুলের ছাপ দিলেন। জীবনলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, সাক্ষী হিসেবে তুমি নিজ নামে দস্তখত কর।

জীবনলাল দস্তখত করলেন। হরিচরণ বললেন, দানপত্রে মাওলানা ইদরিসের দস্তখত নিয়ে আস। ভালোকথা, দানপত্র তোমার হেফাজতে রাখবে। ব্যবস্থা নিবে যেন দানপত্র মতো কাজ হয়।

ঠিক আছে।

এখন আমাকে ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে যাও।

আপনার শরীর খুবই খারাপ, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

হরিচরণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তোমাকে যা করতে বলছি সেটা কর। তারপর ডাক্তার-কবিরাজ যা আনবার আনবে।

হরিচরণকে বারান্দার ইজিচেয়ারে শুইয়ে জীবনলাল ডাক্তারের সন্ধানে গেলেন। বৃষ্টি নেমেছে জোরেশোরে। বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। হরিচরণ চোখ বন্ধ করলেন। উপনিষদের মঙ্গলাচরণ আবৃত্তি করলেন—

ওঁ ভদ্রং কর্নেভি; শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমক্ষ ভির্যজত্রাঃ।
ধ্যাশেম দেবহিতং যদায়ু :
ওঁ শান্তি : শান্তি : শান্তি।

হে দেবগণ, কান দিয়ে যা কিছু ভালো তাই যেন শুনতে পাই। যা কিছু ভালো তাই যেন চোখ দিয়ে দেখতে পাই। আমার জন্যে নির্দিষ্ট যে আয়ু দেবতারা ঠিক করে দিয়েছেন, তা যেন শান্তিময় হয়।

হরিচরণ চোখ খুললেন, অবাক হয়ে দেখলেন, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাঁর কন্যা শিউলি এগিয়ে আসছে। কী আশ্চর্য, তার পায়ে লাল টুকটুক জুতা। এই জুতাই তো পূজার সময় তিনি এনে দিয়েছিলেন। জুতাজোড়া পায়ে দেবার আগেই তার মৃত্যু হলো। তার মা জুতাজোড়া সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। আহারে কতদিন আগের কথা। শিউলি এসে হরিচরণের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি!!

হরিচরণ দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শিউলি ঠোঁট টিপে হাসছে এবং পায়ে পায়ে এগুচ্ছে। হরিচরণ অপেক্ষা করছেন কখন তাঁর মেয়ে এসে তাঁর হাত ধরে। হরিচরণ ঢোলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। ঢোল, করতাল বাজিয়ে নামজপ হচ্ছে। বহু মানুষ একত্রে হরি হরি করছে। সেই শব্দ সমুদ্র গর্জনের মতো।

হরিচরণের বাড়িতে ঢোল, করতাল বাজছে না। নামজপও হচ্ছে না। তবে জহির যে প্রকাণ্ড কেরায়া নৌকায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে সেখানে নামজপ হচ্ছে। নৌকা কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। জানার আগ্রহও বোধ করছে না। তার হাতে একটা কানাকড়িও নেই। সকাল থেকে সে কয়েক দফা পানি ছাড়া কিছুই খায় নি। এখন ক্ষিধেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে। সে গভীর আগ্রহে নৌকার গলুইয়ে বসা এক বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধ কোঁচড়ভর্তি মুড়ি নিয়ে বসেছে। তার হাতে

পাকা মর্তমান কলা। সে এক গাল মুড়ি মুখে দিচ্ছে এবং কলায় কামড় দিচ্ছে। জহিরের মনে হচ্ছে, এরচে' সুন্দর কোনো দৃশ্য সে তার জীবনে দেখে নি।

বৃদ্ধ জহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, মুড়ি খাইবা?

জহির বলল, না।

বৃদ্ধ বলল, না কেন? মুখ দেইখা বোঝা যায় ভুখ লাগছে।

জহির বলল, আমি মুসলমান।

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে গিয়ে বলল, সেইটা বলো। সে একটা মর্তমান কলা জহিরের দিকে গড়িয়ে দিয়ে বলল, ফল খাও। ফলে দোষ লাগে না।

কলাটা গড়াতে গড়াতে জহিরের পায়ের কাছে এসে থামল। জহির কলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। হাতে নিল না।

বৃদ্ধ বললেন, তোমার নাম কী?

জহির বলল, আমার নাম লাবুস। মোহাম্মদ লাবুস।

বৃদ্ধ বলল, লাবুস আবার কেমন নাম?

জহির বলল, খুবই ভালো নাম।

উকিল মুনসির স্ত্রী লাবুসের মা'র মন বিষণ্ণ। লাবুস কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অথচ এই ছেলেটার প্রতি তাঁর মমতার কোনো সীমা ছিল না। লাবুসের মা তাহাজ্জুদের নামাজ শেষ করে দীর্ঘসময় নিয়ে প্রার্থনা করলেন। যেন তাঁর লাবুস ভালো থাকে সুখে থাকে। কোনো একদিন যেন ফিরে আসে তাঁর কাছে।

রাত অনেক। লাবুসের মা খাটে হেলান দিয়ে বসেছেন। উকিল মুনসি বাড়িতে নেই। গানের দল নিয়ে সুনামগঞ্জ গিয়েছেন। কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। লাবুসের মা নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। স্বামীর জন্যে খুব খারাপ লাগছে। তিনি ঠিক করলেন, রাতে ঘুমাবেন না। এবাদত বন্দেগি করে রাতটা পার করবেন।

দরজার পাশে খুট করে শব্দ হলো। লাবুসের মা ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হলেন। ফুটফুটে একটা মেয়ে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে চাপা হাসি। যেন বড়ই আনন্দময় কোনো ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে। লাবুসের মা বললেন, তুমি কে গো? তুমি কোন বাড়ির?

মেয়েটি বলল, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি।

কী খবর ?

আমার বাবা মারা গেছেন।

লাবুসের মা অবাক হয়ে বললেন, তোমার বাবা মারা গেছেন কিন্তু তোমার মনে আনন্দ। ঘটনা কী ? তোমার নাম কী ? তোমার বাবার পরিচয় কী ?

আমার নাম শিউলি। আমার বাবার নাম হরিচরণ। তিনি বান্ধবপুরের ছয় আনির জমিদার। আমি যাই ?

মেয়েটা খুব স্বাভাবিকভাবেই দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। লাবুসের মা মেয়েটার পেছনে পেছনে গেলেন। কাউকে দেখতে পেলেন না।

মাওলানা ইদরিস বিসমিল্লাহ্ বলে দানপত্রে দস্তখত করতে করতে বললেন, জীবনলাল নামের যে সাক্ষী উনাকে তো চিনলাম না। উনি কে ?

জীবনলাল বললেন, আমার নাম জীবনলাল। আমি আপনার কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছি। তার জন্যে ক্ষমা করবেন।

মিথ্যা পরিচয় কেন দিয়েছেন জানতে পারি ?

আমি বিপ্লবী দলের মানুষ। মিথ্যা নাম নিয়ে পালিয়ে আছি। হরিচরণ বাবুও আমার আসল পরিচয় আজ জেনেছেন। আমরা আসল পরিচয় কখনো প্রকাশ করি না।

আমার কাছে তো করেছেন।

জীবনলাল বললেন, আপনার কাছে পরিচয় কেন প্রকাশ করলাম নিজেও বুঝতে পারছি না। দুর্বল মুহূর্তে মানুষ এইসব কাণ্ড করে। অসুস্থ হরিচরণ বাবুকে দেখে মনটা দুর্বল হয়েছে।

মাওলানা ইদরিস ইতস্তত করে বললেন, ইসলাম ধর্ম বিষয়ে আপনি আমাকে অনেক কিছু বলেছেন। সবই আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছি। কথাগুলি কি সত্য ?

যা বলেছি সবই সত্য। একজন বিধর্মীও তো আপনাদের ধর্ম বিষয়ে জানতে পারে। পবিত্র কোরান শরিফ বাংলাভাষায় একজন হিন্দু প্রথম অনুবাদ করেছেন। এটা কি জানেন ?

মাওলানা ইদরিস বিস্মিত হয়ে বললেন, জানি না। আজ প্রথম শুনলাম। উনার নাম কী ?

গিরিশ চন্দ্র সেন। তাঁর এই কাজের জন্যে মুসলমানরা তাঁকে সারাজীবনই যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে। মুসলমানরা তাঁকে ডাকত ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন।

মুসলমান কখনোই তাঁকে শুধু গিরিশ চন্দ্র ডাকত না। তিনি সবার কাছে ভাই গিরিশ চন্দ্র।

মাওলানার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, বড় সুন্দর একটা ঘটনা আপনার কাছে শুনলাম। খুবই আনন্দ পেয়েছি। আনন্দে চোখে পানি এসেছে। আপনাকে শুকরিয়া। এই বাংলা কোরান শরিফ কীভাবে সংগ্রহ করা যায় একটু বলবেন ?

আমি ব্যবস্থা করে দিব। উঠি ? আসসালামু আলায়কুম।

মাওলানা বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম। তাঁর ভেতরে সামান্য অস্বস্তি কাজ করছে। একজন বিধর্মীর সালামের উত্তরে ওয়ালাইকুম সালাম বলা কি ঠিক হচ্ছে ? এই বিষয়ে হাদিস-কোরানের বিধানইবা কী ? নিজের স্বল্পজ্ঞানের জন্য নিজের উপরই রাগ লাগছে।

জীবনলাল ঘর থেকে বের হবার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, মাওলানা সাহেব, একটা কথা। আপনার একটা বিষয় দেখে অবাক হয়েছি। হরিচরণ বাবু বিপুল বিষয়সম্পত্তি একজন অনাত্মীয় ছেলেকে দিয়ে গেছেন। এই বিষয়ে আপনার কোনো কৌতূহল হলো না কেন ?

মাওলানা বললেন, একটা হাদিসে পড়েছিলাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম বলেছেন, 'প্রতিবেশীর বিষয়ে অকারণ কৌতূহল দেখাইবে না।' হাদিসটা মানি। তাছাড়া হরিচরণ বাবু অতি সাধু পুরুষ। উনি যা সিদ্ধান্ত নিবেন ঠিকই নিবেন। তারপরও আসল ব্যাপার অন্যখানে।

আসল ব্যাপার কী ?

সমস্ত সিদ্ধান্তই আল্লাহপাকের। উনি ঠিক করেছেন জহির বিপুল সম্পত্তির মালিক হবে। বাকি সবই উছিলা।

বান্ধবপুর বাজারে একজন ক্যাম্বেল পাশ এলএমএফ ডাক্তার আছেন। নাম সুধিন দাস। তিনি সারাবছরই নানান রোগব্যাধিতে শয্যাশায়ী থাকেন। আজও তাই। প্রবল জ্বরে তিনি অচেতন প্রায়। তাঁর দুই মেয়ের একজন তাঁর পায়ে তেল মালিশ করছে, অন্য মেয়ে মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। এই অবস্থাতেই তিনি হরিচরণের বিষয়ে বিধান দিলেন, রসুন-সরিষার তেলের মালিশ। এতেই রাতটা নির্বিঘ্নে কাটবে। সকালে মিকচার দিয়ে দিব।

জীবনলাল বললেন, উনার বুকে ব্যথা। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

সুধিন ডাক্তার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, রসুন এই রোগের একমাত্র বিধান। আজ অমাবস্যাও না, পূর্ণিমাও না। রোগী মারা যাবে না। বেশিরভাগ বৃদ্ধ মারা যায় অমাবস্যা পূর্ণিমার টানে। রোগী টিকে থাকবে। সকালে নাড়ি দেখে মিকচার দিব।

জীবনলাল সুধিন ডাক্তারের ঘর থেকে বের হলেন। বাজারে নামকরা একজন কবিরাজ থাকেন। চাঁদসির ক্ষত চিকিৎসা করেন। রাতে তিনি বাজারে থাকেন না। তাঁর বাড়ি খুঁজে বের করতে হলে স্থানীয় কারো সাহায্য দরকার। দুর্যোগের রাতে বাজারে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

মফিজ ভাই, এত রাতে এখানে কী করেন ?

ধনু শেখ ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকখানি দূরে তাঁর তিনসঙ্গী। একজনের হাতে বর্শা। ধনু শেখের মুখ দিয়ে ভকভক করে দেশী মদের গন্ধ আসছে। জীবনলাল কিছু বলার আগেই ধনু শেখ বলল, আসল খবর কি শুনেছেন ?

আসল খবর কী ?

ময়মনসিংহ থেকে পুলিশের এসপি জনকিন্স সাহেব স্বয়ং এসেছেন লঞ্চ নিয়ে। তারা খবর পেয়েছেন, এই অঞ্চলে একজন বিপ্লবী লুকিয়ে আছে।

জীবনলাল কিছু বললেন না।

ধনু শেখ বলল, আপনাকে সাবধান করার জন্যে বললাম। আপনি তো সেই লোক, ঠিক বলেছি না ? আমার অনুমান ঠিক আছে না ভাইসাহেব ?

জীবনলাল বললেন, পুলিশকে খবর দিয়ে কি আপনি এনেছেন ?

ধনু শেখ বলল, আমি যদি পুলিশ খবর দিয়ে আনতাম—আপনাকে সাবধান করতাম না। পুলিশ নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হতাম। আপনাকে ধরিয়ে দিতাম। ব্রিটিশ রাজ বলত, মারহাবা। একটা কথা, আপনার সঙ্গে কি অস্ত্র আছে ?

জীবনলাল বললেন, আছে।

ধনু শেখ বলল, আমার বুদ্ধি শোনেন। নৌকা নিয়া হাওর পাড়ি দেন। ব্রিটিশ পুলিশ রাত বিরাতে হাওর পাড়ি দিবে না। তারা হাওর ভয় পায়। আমি নৌকার ব্যবস্থা করে দিব। আমার নিজের নৌকা আছে। ভালো মাঝি আছে।

জীবনলাল বললেন, আমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন কেন ?

আপনাকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছিলাম এই কারণে। আমি লোক খারাপ—তবে যত খারাপ সবাই ভাবে তত খারাপ না। একবার আমি যারে বন্ধু ভাবি সে বাকি জীবনের বন্ধু। আপনি আমার বন্ধু। আপনার সঙ্গে অনেক সুখ দুঃখের

আলাপ করেছি। এখন ইচ্ছা করলে আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। ইচ্ছা না করলে নাই।

জীবনলাল বললেন, নৌকা ঠিক করে দিন। হাওর পাড়ি দিব। তার আগে রঙিলা বাড়ির একটা মেয়েকে আমার দেখার শখ।

হতভম্ব ধনু শেখ বলল, রঙিলা বাড়ির মেয়ের সাথে আপনার কী ?

মেয়েটার রূপের প্রশংসা শুনেছি।

চান বিবির কথা বলছেন ? আসল নাম জুলেখা।

হ্যাঁ জুলেখা।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বলল, খামাখা সবাই তার রূপের কথা বলে। এমন কিছু না। এরচে' পরী বিবি নামে একজন আছে— ছোটখাটো। কিন্তু ধানী মরিচ।

আমি জুলেখাকে একনজর দেখব।

চলেন ব্যবস্থা করে দেই। তবে দেরি করা ঠিক হবে না। ইংরেজ পুলিশ, এরা জোঁকের চেয়েও খারাপ। লবণ দিলে জোঁক ছেড়ে দেয়, ইংরেজ পুলিশ ছাড়ে না।

জীবনলাল দাঁড়িয়ে আছেন জুলেখার সামনে। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। ধনু শেখ দরজার বাইরে। তার লোকজন নৌকা আনতে গেছে। নৌকা রঙিলা বাড়ির ঘাট থেকে ছাড়বে। রঙিলা বাড়ি জায়গাটা উঁচু। পুলিশের আগমন আগেই টের পাওয়া যাবে।

জীবনলাল বললেন, তোমার নাম জুলেখা ?

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

এই কাগজটা যত্ন করে রাখ।

কাগজটা কী ?

এটা একটা দানপত্র। হরিচরণ বাবুর দানপত্র। এর বেশি ব্যাখ্যা করতে পারব না। তুমি কি বাংলা পড়তে পার ?

পারি।

অবসর সময়ে পড়বে। আর এই পুঁটলিটা রাখ। পুঁটলিতে একটা রিভলবার আছে। আমার লোকজন এসে কোনো একদিন তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।

রঙিলা বাড়ির ঘাটে নৌকা চলে এসেছে। জীবনলাল নৌকায়। ধনু শেখ বন্ধুকে বিদায় জানাতে নৌকায় উঠেছে। সে জীবনলালের হাত ধরে বলল, নিশ্চিন্ত মনে

যান। মাঝিকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছি। সোজা চলে যাবেন মদনপুর। মদনপুর থেকে লঞ্চে উঠবেন সোজা নারায়ণগঞ্জ। একবার নারায়ণগঞ্জ পৌঁছলে কোনো বাপের ব্যাটা আপনেরে ধরতে পারবে না। ইচ্ছা করছে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে যাই। সেটা সম্ভব না। অতিরিক্ত মদ্যপান করেছি। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আচ্ছা ভাইসাহেব তাহলে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।

পুলিশ তখন হরিচরণের বাড়ি ঘেরাও করেছে। বাড়িতে বারান্দায় মরে পড়ে থাকা বৃদ্ধ হরিচরণ, আর কেউ নেই। জীবনলাল নৌকা নিয়ে সরে পড়েছে, এই খবর তাদের কাছে অজানা।

এসপি জনকিন্সে'র কাছে ধনু শেখ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত লঞ্চ নিয়ে হাওরের দিকে গেলে বিপ্লবী জীবনলালকে পাওয়া যাবে— এই খবর দেয়া হয়েছে। জীবনলালের সঙ্গে অস্ত্র আছে, এই তথ্যও জানানো হয়েছে। জনকিন্স সাহেব দলবল নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন। যাবার আগে ধনু শেখকে বললেন, এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবী যদি ধরা পড়ে তাহলে তিনি চেষ্টা নেবেন যেন ধনু শেখ 'খান সাহেব' টাইটেল পান।

তারিখ ১৩ই এপ্রিল। সন ১৯১৯। ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ড তখন তুঙ্গে।

এই দিনেই পাঞ্জাবে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে অমৃতসরের জালিওয়ানওয়ালাবাগে এক হাজার মানুষ নির্মমভাবে নিহত এবং দুই হাজার আহত হয়। ডায়ার তখনই কার্ফু জারি করে, যে কারণে কোনো চিকিৎসা সাহায্য না পৌঁছায়, ময়দানে ও রাস্তায় শত শত মানুষ প্রাণ ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ রাজের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

তুরস্কের সুলতান ছিলেন ভারতীয় মুসলমানসহ পৃথিবীর সকল সুন্নি মুসলমানের খলিফা। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষ নেয়ায় ব্রিটিশ রাজ সুলতানের পদচ্যুতি ঘটায়। সুলতানের অধিকার রক্ষার জন্যে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

ভয়ঙ্কর বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে ধরিয়ে দেবার পুরস্কার হিসেবে ধনু শেখ 'খান সাহেব' উপাধি পেয়েছেন। জীবনলাল আছেন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। বিচার শুরু হয়ে যাবে। জীবনলালের ফাঁসি হবে, এ বিষয়টা মোটামুটি নিশ্চিত।

খান সাহেব ধনু শেখ বসে আছেন হরিচরণের বাড়ির উঠানে। মাঘ মাস। শীত পড়েছে প্রচণ্ড। তাঁর হাতে কাচের বড় গ্লাসভর্তি খেজুরের রস। খেজুরের রস খেতে হয় সূর্য উঠার আগে। বেলা হয়ে গেছে। রস খানিকটা টকে গেছে, তবে খান সাহেব ধনু শেখ টকে যাওয়া রস খেয়ে যথেষ্টই আনন্দ পাচ্ছেন। ইদানীং সবকিছুতেই তিনি আনন্দ পান। বেদানা নামের তের বছর বয়সি এক বালিকাকে সম্প্রতি বিবাহ করেছেন। মেয়েটি রূপবতী না। গাত্রবর্ণ কালো। মাথার চুল পিঙ্গল। তারপরেও তার সঙ্গে গল্পগুজব করেও তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। কেন এরকম হচ্ছে তিনি জানেন না। তাঁর প্রথম স্ত্রী কমলার ধারণা, বেদানা জাদুটোনা করেছে। সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই, তা-না।

হরিচরণের বিষয়সম্পত্তির দখল ধনু শেখ নিয়ে নিয়েছেন। তেমন কোনো সমস্যা হয় নি। হরিচরণ নাকি মৃত্যুর আগে আগে কোম্পানির স্ট্যাম্পে সব দিয়ে গেছেন ধনু শেখকে। স্ট্যাম্পে তিনি দস্তখত করেছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দস্তখত সামান্য আঁকাবাঁকা হয়েছে। সে-কারণেই তিনি বুড়ো আঙুলের ছাপও দিয়েছেন। দু'জন সাক্ষীর দস্তখতও আছে। একজন প্রাক্তন জমিদার শশাংক পাল। অন্যজন অম্বিকা ভট্টাচার্য। মুসলমান হবার পর যার নাম সিরাজুল ইসলাম ঠাকুর।

ধনু শেখের কারণে জানা গেছে, হরিচরণ মৃত্যুর আগে আগে কলেমা তৈয়ব পাঠ করে মুসলমান হয়েছেন। তাঁকে দাহ্ করা হয় নি। মসজিদের পাশের গোরস্তানে তাঁর কবর হয়েছে। ধনু শেখ নিজ খরচায় কবর বাঁধিয়ে দিয়েছেন। কবরে লেখা— বিশিষ্ট দানবীর, সমাজসেবক মোহম্মদ আহম্মদ। যারা শেষ সময়ে মুসলমান হয়, আকিকা করে নাম রাখার সুযোগ হয় না, তাদের নাম

মোহম্মদ আহম্মদ রাখাই না-কি বিধান। কবরের ভেতর একটা স্বর্ণচাপা গাছ লাগানো হয়েছে। অল্পদিনেই গাছ তরতাজা হয়েছে। মাওলানা ইদরিস গাছটার যত্ন নেন। অজুর শেষে পানি ছিটিয়ে দেন। কবরের উপর গাছ থাকা রহমতের ব্যাপার। গাছ আল্লাহপাকের নাম জিগির করে, তার সোয়াবের কিছু অংশ কবরবাসী পায়। আল্লাহপাক তার বান্দাদের উদ্ধারের নানান ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

মাঝে মাঝে কবরের পাশে একজন তরুণীকে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার চোখে থাকে বিস্ময়।

একদিন মাওলানা ইদরিস অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটি বাঁধানো কবরের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এমনভাবে হাত বুলাচ্ছে যেন সে ঘুমন্ত মানুষের গায়ে হাত বুলাচ্ছে। মাওলানা কৌতূহল সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, মাগো আপনি কে?

তরুণী চমকে উঠে ভীত গলায় বলল, আমার নাম যমুনা।

এখানে কী করেন?

কিছু না।

মেয়েছেলের উচিত না পুরুষের কবরে হাত রাখা।

আর রাখব না।

অনেকবার আপনারে এই কবরের কাছে আসতে দেখেছি। কেন আসেন?

যমুনা ক্ষীণ গলায় বলল, আর আসব না।

মাঘ মাসের শীতের সকালে ধনু শেখের সঙ্গে সাক্ষী দু'জনও উপস্থিত। সিরাজুল ইসলাম ঠাকুর বসেছেন টুলে। তিনি দাড়ি রেখেছেন। মুখভর্তি চাপদাড়িতে তাকে খুব মানিয়েছে। ধনু শেখ তাকে স্থায়ী চাকরি দিয়েছেন। এখন মাসে পঁচিশ টাকা করে পান। বিনিময়ে হরিচরণের বাড়িঘর দেখাশোনা করেন।

শশাংক পাল হরিচরণের টিনের ঘরে থাকেন। তাঁর অরুচি রোগ হয়েছে। কোনোকিছুই হজম করতে পারেন না। তাঁকে লবণ দিয়ে সাগু জ্বাল দিয়ে দেয়া হয়। সকালবেলা চামচ দিয়ে তাই খানিকটা খান। কিছুক্ষণ পর পুরোটাই বমি করে দেন। ধনু শেখ কথা দিয়েছেন তাকে কোলকাতায় নিয়ে চিকিৎসা করাবেন। কোলকাতায় ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদশাস্ত্রী আছেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অরুচির ভালো চিকিৎসা আছে।

শশাংক পাল বললেন, খান সাহেব, আমরা যাব কবে?

ধনু শেখ বললেন, সময় হলেই যাব। সময় এখনো হয় নাই।

সময় কবে হবে ?

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, ঢাকার কমিশনার সাহেব পাখি শিকারে আসবেন। পাখি শিকারের পরে যাব।

শশাংক পাল বললেন, ততদিন আমি বাঁচব না।

ধনু শেখ নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, মরে গেলে খাঁটি ঘি দিয়ে দাহর ব্যবস্থা করব। চিন্তার কিছু নাই।

শশাংক পাল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। কঠিন কিছু কথা তাঁর ঠোঁটে এসে গেছে। অনেক কষ্টে কথাগুলি আটকালেন। ধনু শেখ এখন এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে কঠিন কথা বলা যায় না। সামলে কথা বলতে হয়।

ধনু শেখ গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, সিরাজ ঠাকুর ?

সিরাজ ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে বললেন, জে খান সাব।

এইবারের কোরবানির ঈদে মসজিদের সামনে আমি কোরবানি দিব বলে মনস্থ করেছি।

অবশ্যই দিবেন।

হিন্দুরা লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারে। করলে করবে। আপনি কী বলেন ?

অবশ্যই। তারা ধর্মকর্ম করবে, আমরা করব না— এটা কেমন কথা ? আমাদেরও ধর্মকর্মের হক আছে।

ধনু শেখ বললেন, মাগরিবের নামাজের সময় এরা মন্দিরে ঘণ্টা বাজায়। মুসুল্লিদের নামাজের অসুবিধা হয়। এরও একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘণ্টা বাজাইতে দোষ নাই। নামাজের সময় বাদ দিয়ে।

সিরাজ ঠাকুর জোরের সঙ্গেই বললেন, অবশ্যই।

ধনু শেখ বললেন, ভালো দেখে একটা ঘোড়া খরিদ করা দরকার। ঘোড়া বিনা বিশিষ্ট মানুষের ইজ্জত রক্ষা হয় না।

সিরাজ ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অবশ্যই। শাদা রঙের ঘোড়া, যেন দূর থেকে নজরে আসে।

শশাংক পাল বললেন, উ হুঁ। ঘোড়াতে কোনো ইজ্জত নাই। থানার ওসি ঘোড়ায় চড়ে। ইজ্জত হাতিতে। হাতি খরিদ করেন।

ধনু শেখ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর হাতি-ভাগ্য ভালো না। হরিচরণ বেকুবের মতো তাঁর হাতি আসামের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। সেই হাতি

ফিরে আসে নি। ধনু শেখ শাল্লার দশআনি জমিদার নেয়ামত হোসেনের কাছে হাতি কিনতে গিয়ে অপদস্ত হয়েছেন। নেয়ামত হোসেন ধনু শেখকে 'তুমি তুমি' করে বলেছেন, যেন ধনু শেখ তার অধস্তন কর্মচারী।

হাতি কিনতে চাও ?

জি। শুনেছি আপনি আপনার হাতি বিক্রি করবেন। খরিদ্দার অনুসন্ধান করছেন।

হাতি দিয়া তুমি করবা কী ?

বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করতে হয়।

পালকিতে যাওয়া আসা করবা। হাতি একটা ইজ্জতের প্রাণী। তার ইজ্জতের দিকে আমাদের লক্ষ রাখা দরকার। যে মুচি, জুতা সেলাই করে, তার বাড়িতে হাতি দেওয়া যায় না। এতে হাতির ইজ্জতের হানি হয়।

ধনু শেখ আহত হয়ে বলেছেন, আমি কি মুচি ?

নেয়ামত হোসেন হাই তুলতে তুলতে বলেছেন, কথার কথা বলেছি। নিজের ঘাড়ে টান দিয়া নিবা না। ছোটলোকের স্বভাব কি জানো ? সবকথা নিজের ঘাড়ে টান দিয়া নেয়। সে ভাবে সবাই তাকে অপমান করতে নামছে। তুমি বড় মানুষ হওয়ার চেষ্টায় আছ— এইসব শিখবা না ?

ধনু বিড় বিড় করে বলেছেন, অবশ্যই। অবশ্যই।

নেয়ামত হোসেন হুঁকোয় টান দিয়ে উপদেশের ভঙ্গিতে বলেছেন, হাতির চিন্তা বাদ দাও। আমার কথা শোন, হাঁটাহাঁটির মধ্যে থাক। এতে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। শরীর ঠিক রাখা প্রয়োজন না ?

ধনু শেখ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমি উঠি।

নেয়ামত হোসেন দরাজ গলায় বললেন, আরে এখনই কি উঠবা ? শরবত খাও, মিষ্টি খাও। মিষ্টি মুখে না দিয়া আমার বাড়ি থেকে কেউ যায় না। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরি কিছু কথাও ছিল।

কী কথা ?

দুষ্ট লোকে বলে, তুমি নাকি মরা হরিচরণের আঙুলের ছাপ দিয়া দলিল বানিয়েছ— এটা কি সত্য ?

দুষ্ট লোকটা কে ?

দুষ্ট লোকের আলাদা পরিচয় থাকে না। তারা গলায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ঘুরে না। কথা সত্য কিনা বলো।

নেয়ামত হোসেন চেয়ারে গা এলিয়ে গড়গড়া টানছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। ধনু শেখকে আচমকা এই প্রশ্ন করে 'তবদা' বানিয়ে দিতে পারার আনন্দেই তিনি আত্মহারা। তবে ধনু শেখ জবাব দিলেন। এই জবাব শোনার জন্যে নেয়ামত হোসেন প্রস্তুত ছিলেন না। নেয়ামত হোসেন মনে মনে ধনু শেখের সাহসের প্রশংসা করলেন।

ধনু শেখ বললেন, দুষ্ট লোক বা শিষ্ট লোক আমার বিষয়ে কী কথা বলেছে আমি জানি না, তবে আপনার কাছে স্বীকার করছি— ঘটনা সত্য!

নেয়ামত হোসেন বললেন, ঘটনা সত্য ?

জি জনাব সত্য। হরিচণের না আছে কোনো ওয়ারিশান না আছে কিছু। তার বিষয়সম্পত্তি সাত ভূতে লুটে খাবে, এটা কেমন কথা! এইসব বিবেচনা করে দখল নিয়েছি। জনাব, উঠি ?

হাতি বিষয়ক এইসব কথাবার্তা যখন হয়েছে তখনো ধনু শেখ 'খান সাহেব' হন নাই। জমিদার নেয়ামত হোসেন তাকে অপমান করতে পারে। ধনু শেখ অপমান গায়ে মাখেন নাই। হাসিখুশি অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন। বালিকাবধূর সাথে লুডু খেলেছেন। তিন দান খেলা হয়েছে। দুইবারই তিনি জিতেছেন। বেদানা লুডুতে হারার অপমান নিতে না পেরে কান্নাকাটি করেছে। তাকে শান্ত করতে ধনু শেখের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

বেদানাকে ধনু শেখ বড়ই পিয়ার করেন। তাঁর এই বালিকাবধূ ভাগ্যবতী। তাকে বিয়ে করার পরই আচমকা 'খান সাহেব' টাইটেল। ইংরেজ জাতি হিসেবে ভালো, তারা উপকারীর উপকার ভোলে না।

ধনু শেখ ধরেই নিয়েছিলেন টাইটেল পাওয়ার পর নেয়ামত হোসেনের বাড়িতে তার দাওয়াত হবে। তা হয় নি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনবার লোক মারফত খবর পাঠিয়েছেন। নেয়ামত হোসেন কথা বলতে চান। বিশেষ জরুরি।

প্রথমবার খবর পাঠালেন তার নিজ বাড়িতে ডাকাতি হবার পর। দ্বিতীয়বার খবর পাঠালেন, তার বজরায় ডাকাত দলের গোলাগুলির ঘটনার দিনে। তৃতীয় দফায় খবর পাঠিয়েছেন কিছুদিন আগে। ধনু শেখ ঠিক করে রেখেছেন, যাবেন। সদর খাজনা দেবার তারিখ হবার আগে আগে। নেয়ামত হোসেন যেন সদর খাজনা দিতে না পারেন এই ব্যবস্থা তিনি নিয়ে রেখেছেন। টাকা নিয়ে যারা যাবে তারা ডাকাতের হাতে পড়বে। দুই চারজনের প্রাণহানী ঘটবে। কী আর করা। সবই উপরের হুকুম। জগত চলে উপরের হুকুমে, মানুষের করার কিছু নাই। ভালো ব্যবস্থা। তবে সব ব্যবস্থা সবসময় কাজ করে না।

মাওলানা ইদরিস হাফেজ টাইটেলের পরীক্ষায় ফেল করেছেন। দেওবন্দে চারজন হাফেজের সামনে পরীক্ষা দিতে বসে পদে পদে ভুল করেছেন। চারজন হাফেজই বিরক্ত হয়েছেন, যদিও তাঁরা মনের ভাব প্রকাশ করেন নি।

একজন মাওলানা ইদরিসের কাঁধে হাত রেখে বলেছেন, সবাই হাফেজ হতে পারে না। হওয়ার প্রয়োজনও নাই। আপনি এই পথ ছেড়ে দেন। আল্লাপাকের কালাম ভুলভাল বলে আপনি মহাপাপী হচ্ছেন। প্রয়োজন কী ?

মাওলানা বললেন, এক দুই বৎসর পরে আবার আসি ? আপনাদের চারজনকে একসঙ্গে দেখে ভয় পেয়েছি বিধায় সব আউলা ঝাউলা হয়েছে।

এক বৎসর পর যখন আসবেন তখনো তো আমরা চারজনই থাকব। তখন কি মাথা আউলা হবে না ?

মাওলানা ইদরিস এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। বিষণ্ন হৃদয়ে বান্ধবপুরে ফিরে এসেছেন। হাফেজ টাইটেল পাওয়ার পর বিবাহ করবেন এরকম বাসনা ছিল। সেই বাসনা এখন তার আর নেই। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোরান মজিদ আবারো ভালোমতো মুখস্থ করবেন। আবারো দেওবন্দ যাবেন। শুদ্ধ নিয়তের প্রতি আল্লাহপাকের মমতা আছে। তাঁর নিয়ত শুদ্ধ।

বৈশাখ মাসের এক রাত। মসজিদে এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা বাড়ি ফিরে দেখেন ভেতর বাড়িতে হারিকেন জ্বলছে। তিনি খুবই বিস্মিত হলেন। তাঁর বাড়ি থাকে অন্ধকার। তিনি এসে হারিকেন জ্বালান। কে এসে বাড়িতে হারিকেন জ্বালাবে ? তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হলো, জহির হয়তো ফিরে এসেছে। জহিরের নিরুদ্দেশের খবর তিনি উকিল মুনসির মাধ্যমে পেয়েছেন।

মাওলানা উঠানে দাঁড়িয়ে বললেন, কে ?

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে কেউ একজন বলল, আমি।

মাওলানা বললেন, আপনার পরিচয় ?

আমার নাম জুলেখা, আমি জহিরের মা। মাওলানা সাহেব, আপনাকে আসসালাম।

মাওলানার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কী সর্বনাশের কথা! রঙিলা বাড়ির অতি পাপিষ্ঠ নারীদের একজন তার ঘরে। জানাজানি হলে বিরাট সর্বনাশ হবে। জানাজানি না হলেও ঘরদুয়ার অপবিত্র হয়েছে। কুকুর যে ঘরে ঢুকে সেই ঘর নাপাক হয়ে যায়। সেখানে নামাজ হয় না। এরা তারও অধম।

জুলেখা বলল, মাওলানা সাহেব, ভেতরে আসবেন ? আপনার সঙ্গে দুইটা কথা বলব।

মাওলানা বললেন, আপনি আমার বাড়িতে এসে বিরাট অন্যায় করেছেন।

অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চাই। আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল বলে এসেছি। কথা শেষ করে চলে যাব।

মাওলানা বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা নাই। আপনি চলে যান।

বাড়ির ভেতর থেকে মৃদু হাসির শব্দ পাওয়া গেল। এই পরিস্থিতিতে কোনো মেয়ে হাসতে পারে তা মাওলানার কল্পনাতেও নেই। মাওলানা বললেন, আপনাকে আল্লাহর দোহাই লাগে আপনি চলে যান।

জুলেখা বলল, আমি যে আপনার স্ত্রী এইটা কি জানেন ?

মাওলানা হতভম্ব গলায় বললেন, তুমি কী বললা ?

মাওলানা এতক্ষণ আপনি করে বলছিলেন, হঠাৎ তুমি সম্বোধনে চলে গেলেন।

জুলেখা শান্ত গলায় বলল, পুরান কথা মনে কইরা দেখেন। আপনের কলেরা হয়েছিল। আপনি মরতে বসেছিলেন। আমি ছিলাম আপনার সাথে। আপনার সেবা করেছিলাম। মনে আছে ?

মাওলানা চাপা গলায় বললেন, মনে আছে।

জুলেখা বলল, এক রাতে আপনি আমারে বললেন, কোনো অনাত্মীয় তরুণী পুরুষের সেবা করতে পারে না। দুইজনেরই বিরাট পাপ হয়। তখন আমি বললাম, এক কাজ করেন, আমাকে বিবাহ করেন। আপনার কি মনে আছে ?

মাওলানা চুপ করে রইলেন। তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগল। এই মেয়েটা ভয়ঙ্কর কথা বলছে। মেয়েটা মিথ্যাও বলছে না। তাঁর আবছা আবছা মনে পড়ছে।

জুলেখা বলল, আপনার মনে না থাকলেও আমি আপনাকে দোষ দিব না। আপনি তখন মরতে বসেছিলেন। মৃত্যুর সময় মানুষ অনেক কিছু করে। আপনি কি উঠানে দাঁড়ায়ে থাকবেন ? ভেতরে আসবেন না ?

মাওলানা এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। তিনি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর কথা বলার শক্তি চলে গেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ইবলিশ শয়তান আশেপাশে আছে এটা বোঝা যাচ্ছে। সে মজা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। মাওলানা বিড়বিড় করে বললেন, আল্লাহ্‌পাক আমাকে ইবলিশের হাত থেকে বাঁচাও।

জুলেখা ঘরের ভেতর থেকে উঠানে এসে দাঁড়াল। তার সমস্ত শরীর বোরকায় ঢাকা। চিকের পর্দার আড়ালে চোখ। অন্ধকারের কারণে সেই চোখও দেখা যাচ্ছে না। জুলেখা বলল, তখন আপনি আমারে কবুল বলতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম। আপনার হাত ধরে তিনবার বলেছি— কবুল, কবুল, কবুল।

মাওলানা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, তুমি বলেছিলে, আমি বলি নাই।

আপনি বলেছিলেন। ইয়াদ করে দেখেন।

আমার ইয়াদ নাই।

আমি আপনারে ফেলে চলে যেতাম না। আমি ভেবেছিলাম আপনার মৃত্যু হয়েছে। চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।

মাওলানা বললেন, এইটাই কি তোমার জরুরি কথা?

জুলেখা বলল, এইটা কোনো জরুরি কথা না। রোগের যন্ত্রণায় আপনি কী করেছেন না করেছেন সেটা কিছু না। আমার কথাবার্তা শুনে আপনি বড়ই অস্থির হয়েছেন। মন শান্ত করেন। মন শান্ত করার জন্য তিনবার তালাক বলে দেন। আমাদের ধর্মে বিবাহ যেমন সোজা তালাকও তেমন সোজা।

ধর্ম নিয়া কথা বলবা না।

গোস্তাকি হয়েছে। আর বলব না।

জরুরি কথাটা বলো।

আমার কাছে একটা কাগজ আছে। দানপত্র। জীবনলাল নামের এক লোক পাঠায়েছে। সেখানে আপনার দস্তখত আছে।

মাওলানা দ্বিতীয়বার চমকালেন।

জুলেখা বলল, ধনু শেখ এতবড় অন্যায় করেছে, আপনি সব জেনেও কিছু বলেন নাই।

মাওলানা বিড় বিড় করে বললেন, আমি ছোট মানুষ।

জুলেখা বলল, আপনি আল্লাওলা মানুষ। আল্লাওলা মানুষ জানে মানুষের মধ্যে বড় ছোট নাই। সবাই সমান। আপনি জানেন না?

মাওলানা চুপ করে রইলেন।

জুলেখা বলল, কাগজটা কি আপনার কাছে রেখে যাব?

মাওলানা বললেন, না। তুমি চলে যাও।

জুলেখা বলল, এক কথায় চলে যাব? আমি আপনার স্ত্রী। ভাব ভালোবাসার দুইটা কথা বলেন। শুইন্যা যাই।

তুমি চলে যাও।

জুলেখা বলল, আপনার কাছে একটা প্রস্তাব আছে। দোষ না নিলে প্রস্তাবটা দিব। দোষ ধরলেও দিব।

কী প্রস্তাব?

চলেন অনেক দূরের কোনো দেশে চইল্যা যাই। যেখানে আপনারে কেউ চিনে না। আমারেও না।

তুমি অতি পাপিষ্ঠ।

জুলেখা হাসতে হাসতে বলল, আপনার মতো এত বড় মাওলানা যার স্বামী তার চিন্তা কী? সে তওবা করায়া আমারে পবিত্র করব।

স্বামী নাম আর কোনোদিন মুখে আনবা না।

আচ্ছা আনব না।

এখন বিদায় হও। তোমার সাথে কথা বলাও পাপ।

জুলেখা বলল, অনেক পুণ্য তো সারাজীবন করেছেন। কিছু পাপ করলেন। এই বিষয়ে আমার বাপজানের একটা গান আছে। শুনবেন?

চুপ বললাম। চুপ।

জুলেখা নিচু গলায় গান ধরল—

ভালো চিনতে মন্দ লাগে
মন্দ চিনতে ভালো।
শাদা কেউ চিনে না বান্ধব
না থাকিলে কালো।

মাওলানা উঁচু গলায় বললেন, বিদায় হও। বিদায়।

জুলেখা হাঁটা শুরু করল। মাওলানা তাকিয়ে আছেন। কালো বোরকার কারণে জুলেখা মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকারে ঢেকে গেল। মাওলানা অনেক রাত পর্যন্ত উঠানে বসে আল্লাহর নাম জপলেন। কিছুক্ষণ পর পর হাত উঠিয়ে মোনাজাত করলেন, হে আল্লাহপাক, তুমি আমাকে একটা ইশারা দাও। বলে দাও আমি কী করব।

মাওলানার শরীর দিয়ে ঘাম পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন পায়ের থপথপ শব্দ। তাকে ঘিরে কে যেন হাঁটছে। নাকে কটু গন্ধ আসছে। পশুদের গা থেকে যেমন গন্ধ আসে তেমন গন্ধ। আকাশে মেঘ করেছিল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি গরম। এরকম তো কখনো হয় না।

খান সাহেব ধনু শেখ শাল্লার জমিদার বাড়িতে এসেছেন। খান সাহেব হবার পর এটা তাঁর প্রথম আসা। আয়োজন করে আসা উচিত। তা-না, তিনি একা

এসেছেন, খালি পায়ে এসেছেন। তাঁর দুই পাভর্তি ধূলা। পায়ের ধূলা ধুয়ে ফেলার জন্যে তাঁকে রূপার বদনা ভর্তি করে পানি দেয়া হয়েছে। একজন খানসামা তাঁর পায়ে পানি ঢালছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছেন নেয়ামত হোসেন। তাঁর চোখ তীক্ষ্ম। মুখ গম্ভীর। নেয়ামত হোসেন বললেন, খান সাহেব মানুষ খালি পায়ে পথ চলে, এটা কেমন কথা ?

ধনু শেখ বললেন, ঠিক করেছি হাতি খরিদ না করা পর্যন্ত খালি পায়ে হাঁটব। এইটা আমার একটা জিদ।

খারাপ না। পুরুষমানুষের জিদ থাকা ভালো। আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন ?

ধনু শেখ মনে মনে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষটা 'আপনি' বলা শুরু করেছে। ধনু শেখ বললেন, আপনি কয়েকবার খবর পাঠিয়েছেন দেখা করার জন্য। নানান কাজকর্মে থাকি, সময় করতে পারি নাই। আজ আমি অবসর। ভাবলাম যাই। গফসফ করে আসি। আপনার মতো বিশিষ্ট মানুষ থাকতে আমার গফের মানুষ নাই। এটা আফসোসের বিষয়।

নেয়ামত হোসেন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আপনি অবসর এই জন্যে এসেছেন এটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ ছাড়া আপনি আসেন নাই। কারণটা বলেন।

সদর খাজনার সময় হয়েছে। টাকার জোগাড় কি হয়েছে ?

নেয়ামত হোসেন বললেন, খাজনার টাকা আছে। যদিও কয়েকবার আমার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা কিছু নিতে পারে নাই— এই খবর আপনার জানার কথা।

ধনু শেখ বললেন, আমি কী করে জানব ? আমি তো ডাকাতের দলে ছিলাম না। না-কি আপনার ধারণা আমিও ছিলাম ?

নেয়ামত কিছু বললেন না। ধনু শেখের এ বাড়িতে আসার উদ্দেশ্য এখনো পরিষ্কার হচ্ছে না। খারাপ কোনো মতলব আছে এটা বোঝা যাচ্ছে।

ধনু শেখ বললেন, জমিদার সাব। আপনাকে অত্যধিক চিন্তাযুক্ত মনে হইতেছে। আমি কী কারণে আসছি বুঝতে পারতেছেন না বইলা চিন্তিত। আমি আসছি আপনারে সাবধান করতে।

আমাকে সাবধান করতে এসেছেন ?

ধরেন সদর খাজনা নিয়া আপনার ম্যানেজার রওনা হইল। পথে পড়ল ডাকাতের হাতে। বিপদ না ? খাজনা দিতে পারলেন না। জমিদারি উঠল নিলামে। শশাংক পালের ঘটনা।

নেয়ামত হোসেনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি 'তুমি'তে ফিরে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ? ডাকাতির ভয়?

ধনু শেখ বললেন, আপনি ব্যবস্থা ভালো নিয়েছেন। এমন এক পথে খাজনা যাবে যে পথে কেউ যায় না। খাজনা যাবে ঘোড়ার পিঠে। মিশাখালির বাজারের পথে। ঠিক বলেছি না? আপনার নিজের লোকই যদি সব বলে দেয় তখন তো ভয় আপনাতেই আসে। তার উপরে দেশ ভর্তি হয়েছে স্বরাজের বোমাবাজদের দিয়ে। টাকা লুটপাটে এরা ওস্তাদ। এরা পরিচয় দেয় স্বদেশী, বিপ্লবী। আসলে ডাকাত।

নেয়ামত হতভম্ব। সদর খাজনা মিশাখালি বাজার দিয়ে ঘোড়ার পিঠে যাবে এটা সত্য। এই সত্য বাইরের মানুষের জানার কথা না।

ধনু শেখ উঠে দাঁড়ালেন। চলে যাবার প্রস্তুতি। নেয়ামত হোসেন বললেন, একটু বসেন।

জরুরি কাজ ছিল।

একটু আগে বলেছেন আজ আপনি অবসর। গফসফ করতে এসেছেন।

ও আচ্ছা, আসলেই তো আজ কোনো কাজকর্ম নাই।

দুপুরে আমার সঙ্গে খানা খান।

ধনু শেখ বললেন, মন্দ না। আপনার বাবুর্চির সুনাম শুনেছি। তার হাতের রান্ধন চাখবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমি বিরাট ভাগ্যবান।

নেয়ামত বললেন, আপনার সঙ্গে আমি কোনো বিবাদে যেতে চাই না। আপোস করতে চাই। আপনি বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েছেন। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরে দেখবে এই নিয়ম। আপনি আমার স্বার্থ দেখবেন, আমি আপনার স্বার্থ দেখব।

ধনু শেখ বললেন, অবশ্যই। খাঁটি কথা বলেছেন। এই কথার দাম লাখ টাকার উপরে।

নেয়ামত বললেন, মাঝে মাঝে আমরা দুই ভাই মজলিশে বসব। গানবাজনা হবে। লখনৌ-এর এক বাইজি আমার এখানে আছে। শুনেছেন বোধহয়।

শুনেছি।

তার ঘাঘড়া নৃত্য দেখার মতো জিনিস। আজ রাতেই নাচের ব্যবস্থা করব, যদি মেয়েটার শরীর ভালো থাকে।

ধনু শেখ বললেন, আপনার বিরাট মেহেরবানি।

নিয়ামত বললেন, আমার খাজনা নিয়ে যখন যাবে তখন তাদের সাথে আপনার কয়েকজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে দিবেন।

অবশ্যই।

নেয়ামত বললেন, এক কাজ করুন, রাত পর্যন্ত থাকেন। রাতে ভালো আয়োজন করি। সামান্য গানবাজনার আয়োজনও থাকল।

মন্দ না।

ধনু শেখ গিয়েছিলেন খালি পায়ে, ফিরলেন হাতিতে চড়ে। নেয়ামত হোসেন বন্ধুকে হাতিতে করে ফেরত পাঠালেন।

এত করেও শেষরক্ষা হলো না। নেয়ামত হোসেনের খাজনার দলে ডাকাত পড়ল। বন্দুকের গুলিতে নেয়ামত হোসেনের তহসিলদার এবং এক নায়েব মারা গেল। স্বদেশী ডাকাতদের কাজ। এদের জন্যে টাকা পয়সা নিয়ে বের হওয়াই মুশকিল। পুলিশের এসপি সাহেব স্বয়ং নিজে কয়েকবার এসে তদন্ত করে গেলেন। কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

ধনু শেখের শরীর ভালো না। জ্বর জ্বর ভাব। সারাদিনই তিনি বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছেন। সন্ধ্যার পর বেদানার সঙ্গ সাপলুডু নিয়ে বসেছেন। সাপলুডু পুরোপুরি ভাগ্যের খেলা। বেদানার গুটি খাওয়ার পারদর্শীতা সাপলুডুতে কাজে লাগে না। তারপরেও এই খেলাতেও সে জেতে। ধনু শেখ ভালোই খেলছিলেন। তার গুটি তরতর করে উঠে যাচ্ছিল। নিরান্নব্বইতে এসে সাপের মুখে পড়ে দুইয়ের ঘরে চলে যেতে হলো। বেদানার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। দু'জনেরই বড় সুখের সময়।

সুখের সময়ে বাঁধা পড়ল। সিরাজুল ইসলাম ঠাকুর এসে খবর দিল, জুম্মাঘরের ইমাম এসেছেন। দেখা করতে চান।

ধনু শেখ বললেন, এখন ব্যস্ত আছি। পরে আসতে বলো।

তিন দান লুডু খেলা হলো। তিনটিতেই বেদানা জিতল। ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, ঐ বান্দি, তোর সাথে পারা মুশকিল।

স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত মমতা তৈরি হলে ধনু শেখ তাকে 'বান্দি' সম্বোধন করেন এবং তুই তোকারি করেন।

বেদানা বলল, আপনের শরীর কি এখনো খারাপ?

ধনু শেখ বললেন, হুঁ। দুই দানা আফিং খাইলে মনে হয় শরীর ঠিক হইত। [সে-সময় আবগারী দোকানে আফিম বিক্রি হতো। যে-কেউ আফিম কিনে খেতে পারত।]

বেদানা বলল, আফিং খান। দুধ জ্বাল দিয়া দিতে বলি, দুধ দিয়া খান।

ধনু শেখ বললেন, শরাব খাইলেও চলে। শরাব শরীর ম্যাজমেজানির আসল ওষুধ।

বেদানা বলল, শরাব খাইতে চাইলে খান। গেলাস দিতে বলি ?

বল।

শরাব আর আফিং একসাথে খাইলে কী হয় ?

কিছুই হয় না। 'নিশা' ভালো হয়।

দুইটা একসাথে খান। আমিও আপনের সাথে খাব।

মেয়েছেলের এইসব খাওয়া ঠিক না।

ঠিক না হইলেও খাব। আপনের গেলাসে একটা চুমুক দিব।

ধনু শেখ দরাজ গলায় বললেন, আচ্ছা যাও দিও।

অতি আনন্দময় এই মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল, মাওলানা ইদরিস যায় নি। এখনো বৈঠকখানায় বসে আছে। ধনু শেখের বিরক্তির সীমা রইল না। তিনি মাওলানাকে শোবার ঘরেই ডাকলেন। বেদানাকে কিছু সময়ের জন্যে বাইরে পাঠালেন। বেদানা পুরোপুরি গেল না। দরজায় কান পেতে রাখল। পুরুষ মানুষদের জটিল কথা শুনতে তার বড় ভালো লাগে। মামলা মোকদ্দমার কথা, ব্যবসার কথা। এদের কথাবার্তার ধরনই অন্যরকম।

আসসালামু আলায়কুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। মাওলানা, তোমার কী ব্যাপার ? [ধনু শেখ আগে মাওলানাকে আপনি করে বলতেন। খান সাহেব হবার পর থেকে তুমি বলছেন।]

আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

শরীরটা ভালো না। কথা শোনার মতো মনের অবস্থা না। তারপরেও বলো।

হরিচরণ বাবুর বিষয়সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা নিয়া একটা দলিল হয়েছিল, এই বিষয়ে কি আপনি জানেন ?

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, জানব না কেন ? দলিল আমার কাছে। আরেকটা কথা, তুমি হরিচরণ হরিচরণ করতেছ কোন কামে ? তার নাম মোহম্মদ আহম্মদ।

মাওলানা বললেন, আপনার কাছে যে দলিল আছে তার বিষয়ে বলতেছি না। মূল দলিল।

গাধার মতো কথা বলবা না। তুমি মাওলানা, গাধা না।

দলিলটা একজনের কাছে রক্ষিত আছে।

তোমার কথা কি শেষ হয়েছে ? কথা শেষ হয়ে থাকলে বিদায় হও। লোকমুখে শুনেছি তুমি হাফেজি পরীক্ষায় ফেল করেছ। এটা কি সত্য ?

জি জনাব।

ফেলটুস মাওলানা দিয়ে তো আমাদের চলবে না। তুমি অন্য কোনোখানে কাজ দেখ। আমি পাশ করা ভালো মাওলানার সন্ধানে আছি। বুঝেছ কি বলেছি ?

জি।

এখন বিদায় হও। জুমার নামাজের খুতবা ঠিকমতো পড়তে পার তো ? না-কি তোমার পেছনে দাঁড়ায়ে আমরা সবাই গুনাগারি হইতেছি ? দাঁড়ায়া থাকবা না, যাও বিদায়।

মাওলানা চলে গেলেন। ধনু শেখ শরাব নিয়ে বসলেন। বেদানার এক চুমুক খাওয়ার কথা, সে কয়েক চুমুক খেয়ে ফেলল। মুখ বিকৃত করে বলল, মজা পাইতেছি না তো।

ধনু শেখ বললেন, ঝিমভাব হয়, এইটাই মজা।

আমার তো ঝিমভাব হইতেছে না। আরো একটা চুমুক দিব ?

ধনু শেখ দরাজ গলায় বললেন, দেও।

বেদানা বড় করে চুমুক দিয়ে শাড়ির আঁচলে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, মূল দলিল কার কাছে খোঁজ নেয়া উচিত না ?

ধনু শেখ বিস্মিত হয়ে বললেন, দলিলের বিষয়ে তুমি কি জানো ?

আড়াল থাইক্যা শুনছি।

কাজটা ঠিক কর নাই।

আপনেরে এক নিমিষ না দেখলে অস্থির লাগে, এইজন্যে দরজার চিপা দিয়া দেখতে ছিলাম। ভুল হইলে মাফ চাই। এই আপনের পায়ে ধরলাম।

ভুল তো অবশ্যই হয়েছে।

বেদানা বললেন, মূল দলিল উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।

ধনু শেখ বললেন, মূল দলিল বইল্যা কিছু নাই। আমি যখন হরিচরণের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম তখন সে মইরা 'চেগায়া' পইড়া আছে। তার দলিল লেখনের সময় কই ? আর দলিল কইরা সে কারে বিষয়সম্পত্তি দিবে ? তার আছে কে ?

বেদানা বলল, আমরার মাওলানা সাব কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না।

মিথ্যা বলে না এইটা ঠিক আছে, তবে ভুলভাল কথা বলে। তার মাথাতে সামান্য দোষও আছে। ঐদিন আমারে বলতেছিল সে না-কি ইবলিশ শয়তানরে দেখছে। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। এইসব মাথাখারাপ লোকের কথা।

বেদানা আগ্রহের সঙ্গে বলল, ইবলিশ শয়তান দেখতে কেমন ? জিজ্ঞাস করছিলেন ?

না।

আমার জানতে ইচ্ছা করতেছে। উনারে খবর পাঠায়া আনাই ?

ঝামেলা করবা না। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। গ্লাস শেষ হইছে। গ্লাসে জিনিস দাও।

বেদানা গ্লাস ভর্তি করে দিল।

পরের বছর নেয়ামত হোসেনের জমিদারি নিলামে উঠল। খান সাহেব ধনু শেখ জমিদারি কিনে নিলেন। জমিদারি কেনা উপলক্ষে তিনি বান্ধবপুরের সবার জন্যে মেহমানির আয়োজন করলেন। হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নাই, সবাই খাবে। হিন্দুদের পাক ব্রাহ্মণ বাবুর্চি করবে। তাদের পাক এক জায়গায়, মুসলমানদের পাক আরেক জায়গায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খাওয়ার শেষে এক টাকা করে পাবেন। মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধু সৈয়দ বংশীয়দের জন্যে এই ব্যবস্থা। খাওয়াদাওয়ার শেষে সারারাত যাত্রা পালা। পালার নাম 'রাজা হরিশচন্দ্র'। মেয়েরাও যেন যাত্রা দেখতে পারে সে ব্যবস্থা হয়েছে। চিক দিয়ে ঢেকে একটা অংশ আলাদা করা হয়েছে।

খান সাহেব ধনু শেখ রাত জেগে যাত্রা দেখলেন। রাজা হরিশচন্দ্রের দুঃখে বারবার তাঁর চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে গেল।

ইদুল ফিতরের নামাজ শেষ হয়েছে। কোলাকুলিপর্ব শুরু হবার আগে আগে মাওলানা ইদরিস বললেন, সুলেমান আপনাদের কিছু বলবে।

কাঠমিস্ত্রি সুলেমান মাওলানার পাশে এসে দাঁড়াল। তার মুখ বিষণ্ন। চোখে হতাশা ও লজ্জা। সে কারো দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে যে কথা বলল তার অর্থ— সে অনেকের কাছে দেনাগ্রস্ত। দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেবার পর দেনমোহরানার টাকা দিতে হওয়ায় বসতবাড়ি এবং সামান্য যে জমি ছিল বিক্রি করতে হয়েছে। উপায় না দেখে আজ থেকে সে নিজেকে ভিক্ষুক ঘোষণা করেছে। কাঠের কাজ সে আজ থেকে করবে না। বাকিজীবন ভিক্ষা করে কাটাবে। ভিক্ষার সুবিধার জন্যে সে একটা ঘোড়া কিনেছে। সে সবার দয়া এবং করুণা চায়।

ঘোষণা করে ভিক্ষুক হবার প্রচলন তখন ছিল। পাওনাদারদের হাত থেকে চিরমুক্তির একটাই পথ।

ঈদের দিন থেকেই সুলেমান ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষাবৃত্তির নতুন জীবন শুরু করল। ঘোড়ার পিঠে দু'টা বস্তা বাঁধা। একটা চালের জন্যে, একটা ধানের জন্যে। ঘোড়া নিয়ে সে একেক বাড়ির সামনে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষীণ গলায় বলছে— 'ভিক্ষুক বিদায় করেন গো।' ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। মাথা নাড়লে ঘণ্টাও বেজে উঠছে। ভিক্ষুকের ঘোড়ার ঘণ্টাধ্বনিও গিরস্তজনের চেনা। কেউ চাল আনে, কেউ ধান। ঘোড়ায় চড়া ভিক্ষুকের সামাজিক অবস্থান খারাপ না। এরা ভিক্ষা পায়।

খান সাহেব ধনু শেখ দয়াপরবশ হয়ে সুলেমানকে থাকতে দিয়েছেন। তার স্থান হয়েছে হরিচরণের পুরনো বাড়িতে। শশাংক পালও সেখানেই থাকেন। তিনি এখন পুরোপুরি শয্যাশায়ী। সারাদিন উঠানে পড়ে থাকেন, সন্ধ্যার পর তাকে ধরাধরি করে ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরে নিয়ে যাওয়া, পানি খাওয়ানো, এই কাজগুলি করে সুলেমান। কাজেই সুলেমানের সঙ্গে তাঁর একধরনের সখ্য হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় শশাংক পাল আগ্রহ নিয়ে গল্প করছেন সুলেমানের

সঙ্গে। গল্পের ধরাবাঁধা কোনো বিষয়বস্তু নেই। একেকদিন একেকরকম। শশাংক পাল পছন্দ করেন পুরনো দিনের শানশওকতের গল্প করতে। সুলেমানের পছন্দ তার বর্তমান জীবনের গল্প। ভিক্ষুক-জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প সে আনন্দের সঙ্গে করে। সে তার ঘোড়ার বুদ্ধিমত্তাতে মুগ্ধ। ইশারা ছাড়াই ঘোড়া যে সব বাড়িতে দাঁড়াচ্ছে এবং গলায় ঘন্টা নেড়ে উপস্থিতি জানান দিচ্ছে এই গল্প বারবার করেও তার মন ভরে না। ভিক্ষা বিষয়ক গল্প তো আছেই।

বুঝলেন কর্তা, এক বাড়িতে গেলাম। ঘন্টা বাজাইলাম। ভিতর থাইকা বলল, আইজ না। আইজ বুধবার।

আমি বললাম, বুধবারে বিষয় কী ?

বুধবারে ভিক্ষা দেই না।

দেন না কেন ?

বড়কর্তার নিষেধ।

কোনদিন নিষেধ নাই বলেন, সেই দিন আসব।

মঙ্গলবার।

গেলাম মঙ্গলবার। তখন কী হইছে শুনেন কর্তা। ভিতর থাইকা বলল, আইজ মঙ্গলবার। মঙ্গলবারে আমরা ভিক্ষা দেই না। সোমবারে আসেন।

শশাংক পাল উত্তেজিত গলায় বললেন, বিরাট বজ্জাত তো!

সুলেমান উদাস গলায় বলে, ভিক্ষুকের সঙ্গে মিছা কথা। এখন চিন্তা করেন সমাজ কই গেছে!

সমাজ রসাতলে গেছে।

দু'জনেই সমাজের সাম্প্রতিক রসাতলে প্রবেশে দুঃখিত বোধ করে। তাদের ভেতর এক বিচিত্র সহমর্মিতা দেখা যায়। মাঝে মাঝে গভীর রাতেও তাদের গল্পের আসর বসে। আসরের কথক শশাংক পাল। শুরু হয় তাঁর যৌবনের গল্প—

রায়নার ছোটবাবুর সঙ্গে একবার এক মুজরায় গিয়েছিলাম। রায়নার ছোটবাবু বিরাট জমিদার, সেই তুলনায় আমি নস্যি। মুজরার বাইজির নাম কুন্দন বাই। আহারে, গায়ের কী রঙ, যেন তুষের আগুন! আর কণ্ঠ ? মধু! গানাবাজনা চলছে, আমার মন খারাপ। কিছুতেই মজা পাচ্ছি না।

কেন ?

কুন্দন বাই আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার হাসি-তামাশা সবই রায়নার ছোটবাবুর সাথে। তাঁকে নিজের হাতে পান বানিয়ে দিচ্ছে। ফরসীর নল এগিয়ে দিচ্ছে। আমি কেউ না। আমি ছোটবাবুর গোমস্তা।

সুলেমান বলল, আপনার উচিত ছিল উইঠ্যা চাইলা আসা।

শশাংক পাল তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, শোন না ঘটনা। রাত একটার দিকে গানবাজনা কিছু সময়ের জন্যে থামল। রায়নার ছোটবাবু কুন্দন বাইকে একটা আশরাফি নজরানা দিলেন। কুন্দন বাই সালামের পর সালাম দিচ্ছে। আশরাফি পেয়ে তার দিলখোশ। তখন আমি নজরানা দিলাম।

কী দিলেন ?

আমি দিলাম তিনটা আশরাফি।

বলেন কী ?

তখন টাকা ছিল, খরচ করেছি। পরে কী হবে চিন্তা করি নাই। তারপরের ঘটনা শোন— রায়নার ছোটবাবুর মুখ হয়ে গেল ছাইবর্ণ। তার জন্যে বিরাট অপমান। কুন্দন বাই-এর চোখে পলক পড়ে না। আমাকে বলল, বাবুজি আপকা তারিফ ?

তারিফ মানে কী ?

তারিফ মানে নাম। আমার নাম জানতে চাইল। নাম বললাম। পরের ঘটনা না বলাই ভালো। রাতে থেকে গেলাম। মধু মধু।

রায়নার ছোটবাবুর কী হইল ?

উনি বিরাট শিক্ষার মধ্যে পড়লেন। জন্মের শিক্ষা। জুরিগাড়ি নিয়া চলে গেলেন।

সুলেমান বলল, উচিত শিক্ষা হয়েছে। পাছায় লাথি খাইছে।

শশাংক পাল বললেন, জীবন নিয়া আমার কোনো আফসোস নাই, বুঝেছ সুলেমান। মধুদিন কাটিয়েছি। এখন সামান্য বেকায়দায় আছি, তবে বেকায়দা যে-কোনো সময় কাটতে পারে। সুতা ভগবানের হাতে। উনি সুতা কীভাবে টান দিবেন কে জানে। উনার সুতার এক টানে দেবী লক্ষ্মী এসে আমার পাশে বসতে পারেন। পারেন না ?

অবশ্যই পারেন।

দেবী লক্ষ্মীর গল্প শুনবা ?

শুনব।

লক্ষ্মী এবং তার স্বামী নারায়ণ বৈকুণ্ঠে বসে রসালাপ করছিলেন। এমন সময় তাদের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল সূর্যপুত্র রেবন্ত। লক্ষ্মী তাঁর ঘোড়ার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। সেই ঘোড়া তো আর তোমার ঘোড়ার মতো মরা ঘোড়া না। স্বর্গের ঘোড়া, নাম উচ্চশ্রবা। যাই হোক,

নারায়ণ বললেন, লক্ষ্মী, তুমি চোখ বড় বড় করে কী দেখ? লক্ষ্মী ঘোড়া দেখে এতই মজেছেন যে উত্তর দিলেন না। নারায়ণের উঠল রাগ। উনি বললেন, ঘোড়া দেখে তুমি মজেছ, তোমাকে অভিশাপ দিলাম। তুমি পৃথিবীতে ঘোড়ী হয়ে জন্মাবে। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গম করবে এবং তোমার একটা ঘোড়াপুত্র হবে।

সুলেমান বলল, সর্বনাশ!

শশাংক পাল বললেন, দেবদেবীদের কাছে এইসব কোনো ব্যাপার না। তারা অভিশাপ দেওয়ার মধ্যেই থাকেন।

লক্ষ্মী কি ঘোড়া হয়ে জন্মেছিলেন?

অবশ্যই। তাঁর একটা ঘোড়াপুত্রও হয়েছিল। বিষ্ণুর আশীর্বাদে তার শাপমুক্তি ঘটে। ঘোড়াপুত্র মানুষ হয়। একবীর নামে সে দীর্ঘদিন পৃথিবী শাসন করে। নতুন এক বংশ স্থাপন করে। বংশের নাম 'হৈহয়' বংশ।

আজিব ব্যাপার।

দেবতাদের কাছে আজিব কোনো ব্যাপার নাই। তারা যদি ঘোড়া থেকে মানুষ বানাতে পারেন তাহলে আমাকে দুর্দশা থেকে কেন উদ্ধার করতে পারবেন না?

সুলেমান দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, অবশ্যই পারবেন।

নিশিরাতে শশাংক পালের সঙ্গে গল্প করতে সুলেমানের ভালো লাগে। জীবন আনন্দময় মনে হয়।

ভিক্ষুক জীবন যে এত সুখের হবে তা সুলেমানের কল্পনাতেও ছিল না। অল্পদিনেই ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে পড়ার দুর্লভ বিদ্যাও সে আয়ত্ত করেছে। ঘণ্টা বাজিয়ে হালকা চালে ঘোড়া চলে, সুলেমান লাগাম ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে শোনে— টুনটুন টুনটুন। শান্তির আনন্দযাত্রা।

সুলেমান যতটুকু আনন্দে আছে ঠিক ততটাই কষ্টে আছেন মাওলানা ইদরিস। তিনি কষ্টে আছেন দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্নটা তিনি এই নিয়ে তিনবার দেখেছেন। একই স্বপ্ন— ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা। স্বপ্নে হরিচরণ এসে তাকে ডাকেন। মাওলানা আছ? মাওলানা! মাওলানা ব্যস্ত হয়ে বের হন। তখন হরিচরণ বলেন, কাজটা কি ঠিক করেছ মাওলনা? আমি মুসলমান হই নাই। তুমি জানাযা পড়িয়ে আমাকে কবর দিয়ে দিলে। আমাকে দাহ করা উচিত ছিল না?

প্রতিবারই মাওলানা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চান। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, ধনু শেখ যেটা বলেছেন আমি সেটাই বিশ্বাস করেছি। আমি ভেবেছি মৃত্যুর আগে আপনি মুসলমান হয়েছেন।

হরিচরণ বলেন, উঁহু! তুমি বিশ্বাস কর নাই। তুমি আমার লেখা দানপত্রে দস্তখত করেছ। তুমি বিশ্বাস করবে কেন ? তুমি কাজটা করেছ ভয়ে। আমাকে মাটিচাপা দিয়েছ।

এখন কী করব সেটা বলে দেন।

আমার লাশটা কবর থেকে তোল। তারপর দাহ করার ব্যবস্থা কর। মুখাগ্নি তুমিই করবে।

আমি কী করে মুখাগ্নি করব ? আমি মাওলানা মানুষ!

জহিরকে খবর দাও। সে আমার পুত্রসম। পুত্রই মুখাগ্নি করে।

তাকে কই পাব বলেন! সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কেউ তার খোঁজ জানে না।

খোঁজ বের কর। বেশি দেরি করলে মহাবিপদে পড়বা।

কী বিপদ ?

আমি নিজেই কবর থেকে বের হয়ে পড়ব। তখন বিরাট বিশৃঙ্খলা হবে।

কী বিশৃঙ্খলা ?

বের হই, তারপর দেখ কী বিশৃঙ্খলা।

এই পর্যায়ে আতঙ্কে মাওলানার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি জেগে উঠে দেখেন তার বুক ধড়ফড় করছে। সারা শরীর ঘামে ভেজা। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম।

স্বপ্নের বিষয়ে তিনি খান সাহেব ধনু শেখের সঙ্গে আলাপ করলেন। ধনু শেখ অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। লোকজন সবসময় তাকে ঘিরে রাখে। সরাসরি তিনি এখন কারো সঙ্গে কথাও বলেন না। আগে তাঁর মুনসির সঙ্গে কথা বলতে হয়। মুনসির অনুমতি পেলে তবেই খান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত।

খান সাহেব মাওলানার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেন। মন দিয়ে স্বপ্ন শুনলেন। তারপর দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, স্বপ্ন নিয়া তুমি চিন্তিত ? (খান সাহেব কিছুদিন হলো দাড়ি রেখেছেন। দাড়িতে চেহারার ত্রুটি অনেকটাই ঢাকা পড়েছে।)

জি জনাব।

ভালো জিনিস নিয়া চিন্তা করা শিখো। স্বপ্ন কি কোনো বিষয় ?

স্বপ্নটা কয়েকবার দেখলাম। এই কারণে মন অস্থির।

মাত্র কয়েকবার ? একটা স্বপ্ন আমি এই নিয়া একশ'বার দেখেছি। স্বপ্নে আমি গেছি ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। খান বাহাদুর টাইটেল

দেয়া হবে। আমার খান বাহাদুর টাইটেল পাওয়ার কথা। সেখানে আরো অনেক বিশিষ্টজনরা আছেন। অতি মনোহর তাদের পোশাক। একমাত্র আমার শরীরে কোনো কাপড়-চোপড় নাই। পুরা নেংটা। একটা সুতাও নাই। ছোটলাট এই অবস্থাতেই আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তুমি বলো, খারাপ স্বপ্ন না ?

জি।

এই স্বপ্ন আমি একশ'বার দেখেছি, তাতে কী হয়েছে ? নাকি তুমি ভাবতেছ হরিচরণ মৃত্যুর আগে কলেমা তৈয়ব বলে মুসলমান হয় নাই ? আমি সবেরে মিথ্যা বানিয়ে বলেছি। একজন হিন্দুরে মুসলমান পরিচয় দিয়া কবর দেওয়ার মধ্যে আমার কোনো ফয়দা আছে ? চুপ করে থাকবা না। বলো ফয়দা আছে ?

জি-না। স্বপ্নের তফসির জানলে মনের অস্থিরতা কমত। আল্লাহপাক স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু জানান দেন।

খান সাহেব বললেন, তফসির জানতে চাইলে জানো। বিশিষ্ট আলেমদের কাছে যাও। রাহাখরচ যদি চাও আমার দিতে আপত্তি নাই। মুনসির কাছে দস্তখত দিয়া কুড়ি টাকা রাহাখরচ নেও।

মাওলানা বললেন, আপনার মেহেরবানি।

আমি যেন খান বাহাদুর টাইটেল পাই এই জন্যে দোয়াখায়ের সর্বক্ষণ করবা। অঞ্চলে একজন খান বাহাদুর থাকলে সবের লাভ। এতে অঞ্চলের ইজ্জত বাড়ে। বুঝেছ ?

জি।

তোমার বৃত্তি এই মাস থেকে পাঁচ টাকা বাড়াইলাম। আমি দরাজ হাতের লোক। সাল্লার নেয়ামত হোসেনের মতো 'কিরপিন' না। নেয়ামত হোসেন কী করেছে শুনেছ ?

জি-না।

লখনৌ-এর যে বাইজি নিয়া আসছিল তারে ফালায়া থুইয়া ভাগছে। সেই মেয়েরে যেসব গয়না দিয়েছিল তাও শুনছি নিয়া গেছে। মেয়ের না আছে টাকা পয়সা, না আছে কিছু। খাওয়া খাদ্যের ব্যবস্থাও করে নাই। বাধ্য হয়ে আমি ব্যবস্থা নিয়েছি।

ভালো করেছেন।

খান সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, কেউ বিপদে পড়লে তার জন্যে কিছু না করা পর্যন্ত অস্থির থাকি। এইটাই আমার সমস্যা।

লখনৌ-এর বাইজি পিয়ারীকে খান সাহেব ময়মনসিংহে ঘর ভাড়া করে রেখেছেন। পিয়ারীর সঙ্গে আছে তবলচি এবং সারেঙ্গিবাদক। তাদের রান্নাবান্নার জন্যে একজন বাবুর্চি আছে। দেখাশোনার জন্যে দারোয়ান আছে।

খান সাহেবকে কাজেকর্মে প্রায়ই ময়মনসিংহ যেতে হয়। তিনি পিয়ারীর ভাড়া বাড়িতে উঠেন। অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনা হয়। পিয়ারীর সঙ্গ তাঁর বড় মধুর মনে হয়। রাতে সুনিদ্রা হয়। মাঝে মাঝে লাটসাহেবকে দেখা স্বপ্নটা তাঁকে বিরক্ত করে।

দেওবন্দের আলেমরা মাওলানা ইদরিসের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। তবে দেওবন্দ যাওয়ায় মাওলানার একটা লাভ হলো, তিনি 'হাফেজ' টাইটেল পেয়ে গেলেন। নির্ভুল কোরান পাঠ করলেন। তাঁর ইচ্ছা করল তিনি দেওবন্দে থেকে যাবেন। আলেমদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে জীবন কেটে যাবে। বান্ধবপুরে ফিরে যাওয়া মানেই স্বপ্নে হরিচরণের সঙ্গে সাক্ষাত। এছাড়া রঙিলাবাড়ির বিষয়ও আছে। রঙিলাবাড়ির বিষয় তিনি চিন্তাও করতে চান না। তারপরেও হঠাৎ হঠাৎ চিন্তাটা আসে, তখন বড়ই অস্থির লাগে। শান্তির জীবন আল্লাহপাক তাকে দেন নাই। আল্লাহপাক দিয়েছেন ধারাবাহিক দুঃশ্চিন্তার জীবন।

হাফেজ মাওলানা ইদরিস বান্ধবপুরে ফিরেছেন। এখন আর কেউ তাঁকে মাওলানা ডাকছে না। সবই বলছে 'হাফেজ সাব'। সম্বোধনই বলে দিচ্ছে এই লোক কোরান মজিদ কণ্ঠস্থ করেছেন। ইনি সহজ কেউ না। শুনতে আনন্দ লাগছে। আনন্দের সঙ্গে গভীর শঙ্কাও জড়িত। মাওলানা জানেন ইবলিশ শয়তান এখন সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকবে। তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে। একজন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেয়ে কোরানে হাফেজকে বিভ্রান্ত করায় অনেক লাভ। ইবলিশ প্রাণপণে চেষ্টা করে যাবে তাঁকে দিয়ে মিথ্যা বলাতে। পাপ চিন্তা করাতে। পাপ কাজে যেমন গুনাহ্, পাপ চিন্তাতেও একইরকম গুনাহ্।

ইবলিশ যে এই বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসরও হয়েছে সেটাও তিনি বুঝতে পারছেন। কয়েকদিন আগে এশার নামাজ শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো বাড়িতে ঢুকেই দেখবেন জুলেখা উঠানে বসে আছে। (চিন্তাটা অবশ্যই ইবলিশ শয়তান তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছে। তিনি নিজে কখনো এ ধরনের নাপাকি চিন্তা করবেন না। আস্তাগফিরুল্লাহ।)

চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে দূর করে দেয়া প্রয়োজন, তা না করে তিনি চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেন (আবারো ইবলিশের কাজ)। তিনি কল্পনা করেই যেতে

লাগলেন। কী ঘটছে তিনি চোখের সামনে দেখতেও পাচ্ছেন— এই তিনি উঠানে পা দিলেন। জুলেখা জলচৌকিতে বসেছিল। পরনে শাড়ি। মাথায় ঘোমটা নেই। মাথাভর্তি চুল। তাঁকে দেখে লজ্জা পেয়ে জুলেখা উঠে দাঁড়াল।

তিনি বললেন, এখানে কী চাও ? তোমাকে না বলেছি এ বাড়িতে আসবে না ? আবার কেন আসছ ?

আপনাকে দেখার জন্যে আসছি।

কেন ?

আমি যত মন্দই হই, আপনি আমার স্বামী।

এরকম নাপাকি কথা বলবা না।

আমি নাপাক, কিন্তু আপনি আমার স্বামী— এর মধ্যে নাপাকি কী ? আমি তওবা করব। তওবা করে আপনার সঙ্গে সংসার করব।

চুপ।

ধমক দিয়েন না। অজুর পানি দেন। আমি অজু করে তওবা করব। বাকিজীবন বোরকা পরে থাকব। কেউ জানবে না আমি কে!

এইখানে থাকলেই জানাজানি হবে।

তাইলে চলেন নাও নিয়া দূরে চইলা যাই। ভাটি অঞ্চলে যাইবেন ? ভাটির শেষ সীমায় ?

চুপ করবা ?

না, চুপ করব না।

উঠানে পা দিয়ে মাওলানার চিন্তা বন্ধ হলো। উঠানে কেউ নেই। জলচৌকি শূন্য। তাঁর মনটা খারাপ হলো। সব শয়তানের খেলা। মাওলানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। রাতে গোসল করে পবিত্র হলেন। শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তিনবার সূরা ইয়াসিন পাঠ করলেন। মন পবিত্র করার জন্যে এরচে' ভালো সূরা নাই।

তাঁর মন ততটা পবিত্র হলো না। রাতে খেতে বসার সময় মনে হলো— জুলেখাকে ভাত খাইয়ে দেয়া উচিত ছিল। না খাইয়ে তাকে বিদায় করেছেন, কাজটা ঠিক হয় নাই। আজকে আয়োজনও ভালো ছিল। কাঁঠালের বিচি দিয়ে মুরগির সালুন। হাফেজ সাহেবের জন্যে রান্না করে কেউ একজন পাঠিয়েছে। আজ ডালটাও ভালো হয়েছে। আমচূর দিয়ে টক ডাল, এর স্বাদই অন্যরকম। মেয়েরা টক পছন্দ করে।

মাওলানার একবারও মনে হলো না— জুলেখা এ বাড়িতে আসে নি। পুরোটাই তাঁর কল্পনা। কিংবা তাঁর ভাষায়— শয়তানের জটিল খেলা। মাওলানার মস্তিষ্ক বিকৃতির সেটাই শুরু।

ফজরের নামাজ পড়ার জন্যে ঘুম ভাঙতেই মাওলানা শুনলেন পাশের ঘর থেকে জুলেখা মধুর স্বরে কোরান আবৃত্তি করছে। তিনি বললেন, জুলেখা, নিচু গলায় পড়। পরপুরুষ তোমার কণ্ঠস্বর শুনবে, এইটা ঠিক না।

জুলেখা বলল, জঙ্গলার মধ্যে বাড়ি। আপনি ছাড়া এইখানে তো কেউ নাই।

মাওলানা বললেন, এইটাও যুক্তির কথা। তারপরেও নিচু গলায় পড়া ভালো। ধর, জঙ্গলে কেউ লাকড়ির সন্ধানে যদি আসে। কিংবা হারানো গরু যদি খুঁজতে খুঁজতে আসে।

জুলেখা মনে হয় যুক্তি মেনেছে। এখন তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।

রঙিলাবাড়ির ঘাটে মাঝারি আকৃতির বজরা এসে থেমেছে। বজরায় আছেন মোহনগঞ্জের বাম গ্রামের শৈলজারঞ্জন মজুমদার। রসায়নশাস্ত্রে M.Sc করা দারুণ পড়ুয়া মানুষ। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ডাক পেয়েছেন। শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান ভবনে যোগ দেবার চিঠি। মানুষটা গানপাগল। চান বিবি নামের অতি সুকণ্ঠী গায়িকার খবর পেয়ে এসেছেন। রঙিলাবাড়িতে উপস্থিত হতে তাঁর রুচিতে বাঁধছে। তিনি চান বিবিকে খবর পাঠিয়েছেন। যদি সে বজরায় এসে কয়েকটা গান শোনায়। অপ্রচলিত গান সংগ্রহেও তাঁর ঝোঁক আছে। বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় (শ্রাবণ মাস এবং ভাদ্র মাস) নৌকায় ঘুরে ঘুরে গান সংগ্রহের বাতিকও তাঁর আছে। তিনি শুধু যে গান লিখে রাখেন তা না, গানের সুরও আকার মাত্রিক স্বরলিপিতে লিখে ফেলেন। স্বরলিপি লেখার বিষয়ে তাঁর দক্ষতা আছে।

চান বিবি সন্ধ্যাবেলায় বজরায় উপস্থিত হলো। তার সঙ্গে দুজন দাসি। একজনের হাতে কার্পেটের আসন। অন্যজনের হাতে রূপার পানদানিতে সাজানো পান। চান বিবি কার্পেটের আসনে বসতে বসতে বলল, কী গান শুনবেন গো ?

শৈলজারঞ্জন মজুমদার বললেন, তুমি তোমার পছন্দের গান কর।

চান বিবি বলল, আমার পছন্দের গান আমি করি আমার জন্য। আপনের জন্য কেন করব ?

শৈলজারঞ্জন বললেন, সেটাও তো কথা। তোমার যে গান গাইতে ইচ্ছা করে গাও।

ধামাইল শুনবেন ?

শুনব।

নাকি আমিন পাশার পাগলা গান শুনবেন।

পাগলা গান কী ?

পদে পদে তালফেরতা মজা আছে।

তোমার সঙ্গে তো তবলা নেই। তাল আসবে কোথেকে।

আমার গলায় তাল আছে।

শৈলজারঞ্জন তিনটি গান শুনেই বললেন, আর লাগবে না। চান বিবি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার গান কি আপনার পছন্দ হয় নাই ?

পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আর শুনব না। আমি অতি বিখ্যাত একজন মানুষকে তোমার গান শোনার ব্যবস্থা করে দেব। উনাকে গান শুনিও। উনি যদি খুশি হন তাহলে তোমার মানবজন্ম ধন্য হবে।

চান বিবি অবাক হয়ে বলল, এই মানুষ কে ?

শৈলজারঞ্জন বললেন, উনি বাংলাগানের রাজার রাজা। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তুমি নিশ্চয়ই তার গান কখনো শোন নি ?

আমি উনাকে চিনেছি। উনার গানরে বলে রবিবাবুর গান। একটা গানের সুর পরিষ্কার মনে আছে। কথা মনে নাই। এক দুই পদ মনে আসে।

শৈলজারঞ্জন অবাক হয়ে বললেন, এক দুই পদ শোনাও তো।

চান বিবি শুদ্ধ সুরে গাইল—

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে—
নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে।

শৈলজারঞ্জন আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আমি গানটা ঠিক করে লিখে দেই ? তুমি ভালোমতো শিখে রাখ। সত্যি যদি কোনোদিন সুযোগ হয় রবীন্দ্রনাথকে গানটা শোনাবে।

চান বিবি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় কাত করল।

মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন ময়মনসিংহে। তিনদিন থাকবেন। শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের উপর কয়েকটা বক্তৃতা দেবেন। ময়মনসিংহের ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার দেখবেন। তার জন্যে পাখি শিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তিনি শিকার পছন্দ

করেন না বলে সেই প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়েছে। তার বদলে ব্রহ্মপুত্র নদে বিহার এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহে পৌছে জমিদারদের টানাটানিতে পড়ে গেলেন। কোথায় রাত কাটাবেন এই নিয়েও সমস্যা। শশীকান্ত আচার্য চাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন তাঁর বাড়ি 'শশীলজ'-এ। গৌরীপুরের মহারাজা ব্রজেন্দ্র রায়চৌধুরী চাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ রাত কাটাবেন 'গৌরীপুর লজ'-এ। তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই দোতলা বাড়ি কবিগুরুর পছন্দ হবে। বাড়িটা তিনি চীনা মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করেছেন। সুদূর বার্মা থেকে আনা হয়েছে সেগুন কাঠ। এদিকে মুক্তাগাছার আরেক জমিদার রাজা জগত কিশোর আচার্য চাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন তাঁর নতুন বাড়ি 'আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল'-এ।

তিনদিনের ক্লান্তিকর ময়মনসিংহ ভ্রমণের শেষে রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন কেন্দুয়ার আঠারোবাড়িতে। আঠারোবাড়ির জমিদার বাবু প্রমোদ রায়চৌধুরী মহাসমাদরে তাঁকে নিয়ে এলেন। যে বাড়িতে তাঁকে রাখা হলো সেই বাড়িটা কাঠের। বাড়ির দোতলায় বিশাল বারান্দা। বারান্দায় কবির জন্যে আরামদায়ক কেদারা পাতা। ভ্রমণে ক্লান্ত কবি আরাম কেদারায় শুয়ে সারা সন্ধ্যা বাংলাদেশের ঘন বর্ষণ দেখলেন। রাতে গান রচনা করলেন—

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না ॥
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে ॥
মেঘমল্লারে সারা দিনমান
বাজে ঝরনার গান।
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা— মন চায়
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে ॥

কবিকে আনন্দ দেবার জন্যে নৈশভোজের পর গানবাজনার আয়োজন করা হলো। একজন বংশীবাদক বাঁশি বাজাল। কবি মন দিয়ে শুনলেন না। হাই তুলতে তুলতে বললেন, শরীরটা ক্লান্ত লাগছে। আজ শুয়ে পড়ি।

মহারাজা বললেন, অবশ্যই। শোবার আগে একটা গান কি শুনবেন ? আপনার রচিত গান। সুকণ্ঠী গায়িকা। মনে হয় আপনার ভালো লাগবে। বাবু শৈলজারঞ্জন মজুমদার আমাকে পত্র দিয়ে এই গায়িকার কথা বলেছেন। তাকে পালকি করে আনিয়েছি। অবশ্য সামান্য কিন্তু আছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, কিন্তু আছে মানে কী ?

মেয়েটির বাস ভদ্রঘরে না। তার বাস পঙ্কে।

পঙ্কে বাস তো পদ্ম'র। শুনি পদ্ম'র গান।

মহারাজা ইশারা করতেই পর্দার আড়াল থেকে জুলেখা বের হলো। জড়সড় হয়ে বসল পায়ের কাছে। মহারাজা বললেন, এর উচ্চারণ শুদ্ধ হবে না, কিন্তু কণ্ঠ মধুর।

জুলেখা খালি গলায় গাইল, চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে—

কবি চোখ বন্ধ করে গান শুনলেন। গান শেষ হবার পর চোখ মেলে বললেন, কণ্ঠের মাধুর্যে উচ্চারণের ত্রুটি ঢাকা পড়েছে। তোমার নাম কী ?

জুলেখা বিড়বিড় করে বলল, চান বিবি।

তুমি তাহলে চন্দ্রের স্ত্রী ? ভালো তো। তুমি শান্তিনিকেতনে আসবে ? গান শিখবে ?

কোনোকিছু না বুঝেই জুলেখা ঘাড় কাত করল। রবীন্দ্রনাথ মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার এই গান পূজাপর্বের। কিন্তু মেয়েটির গলায় গানটা শোনার পর মনে হচ্ছে গানটা প্রেমের। মানব-মানবীর প্রেম। কথা শেষ করেই তিনি জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, চন্দ্র-স্ত্রী, কাছে এসো, আশীর্বাদ করে দেই।

জুলেখা এগিয়ে এলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাথায় হাত রাখলেন।

জুলেখা কি টের পেল যে আজ তার পঙ্কের জীবন ধন্য হলো ?*

১৯২৬ ইংরেজি।

* গানের উপর অসাধারণ দখল দেখে শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞান ভবন থেকে কলা ভবনে নিয়ে আসেন। শৈলজারঞ্জনের প্রধান কাজ হয় রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি তৈরি করা। —লেখক

'বঙ্গবাসী' কাগজের শিরোনাম—

দুর্ধর্ষ বিপ্লবী জীবনলালের পলায়ন।

ঘটনার বিবরণে বলা হচ্ছে, আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে বন্দি স্থানান্তরের সময় জীবনলাল হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় পলায়ন করেন। ওঁৎ পেতে থাকা বিপ্লবীরা পুলিশের গাড়িতে বোমাবর্ষণ করলে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন জীবনলাল।

'ময়মনসিংহ গেজেট' পত্রিকার শিরোনাম—

খান সাহেব ধনু শেখ মুসলিম লীগের
ময়মনসিংহ জেলার আহ্বায়ক নির্বাচিত।

দুই পত্রিকায় দুইজনের ছবি। ধনু শেখের মাথায় তুর্কি ফেজ টুপি। গায়ে আচকান। জীবনলালের ছবিতে ফুল হাতা গেঞ্জি পরা এক যুবক, যার চেহারায় লজ্জাভাব প্রবল। ক্যামেরায় ছবি তোলা হচ্ছে এই কারণে সে বিব্রত।

এই দুই পত্রিকার কোনোটিতেই তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীর এক যুবকের ছবি বা খবর ছাপা হয় নি। যুবকের নাম চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন। তিনি ১৯৩০ সনে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর আপন ছোটভাইয়ের ছেলে সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখরও পঞ্চাশ বছর পর ১৯৮৩ সনে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। ভারতীয় পত্রিকাগুলি এই খবর ছাপাতেও কেন জানি ভুলে গিয়েছিল।

বান্ধবপুর পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার নিয়ে চিন্তিত না। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত না। গান্ধীজি হঠাৎ করেই অসহযোগ আন্দোলন কেন ভেঙে দিলেন তা নিয়েও চিন্তিত না। বান্ধবপুর চিন্তিত তার মানুষজন নিয়ে। মাওলানা ইদরিসকে নিয়ে। মানুষটার হয়েছে কী? এই রোগের কি কোনো চিকিৎসা আছে? তাকে ধরে বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়?

জঙ্গলে অমাবস্যা তিথিতে হো হো শব্দ কেন হয় তা নিয়ে বান্ধবপুর চিন্তিত। ভূতপ্রেতের বিষয় বোঝা যাচ্ছে। কন্ধকাটারা এমন শব্দ করে। কন্ধকাটা যতক্ষণ জঙ্গলে থাকবে ততক্ষণ ঠিক আছে, কিন্তু পাড়ায় ঢুকলে সমূহ বিপদ।

কবিরাজ সতীশ পরিবারের মেয়ে যমুনাকে নিয়ে বান্ধবপুর চিন্তিত। সালিশ বসা উচিত। এখনো বসছে না কেন ? সালিশে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, ঘটনা কে ঘটিয়েছে ? হিন্দু না মুসলমান ? ডাকাতদল যেহেতু যুক্ত, মুসলমান হবার সম্ভাবনাই বেশি। ডাকাতি বেশিরভাগ মুসলমানরাই করে।

ভারতীয় এক বিজ্ঞানী সমুদ্রের পানির রঙ নীল দেখায় কেন তা বের করে ফেলেছেন, এটা কি কোনো বিষয়! ঈশ্বর ঠিক করে রেখেছেন সমুদ্রের পানি নীল দেখাবে, এই কি যথেষ্ট না ?

হাফেজ মাওলানা ইদরিসের মাথা যে পুরোপুরি গেছে এই বিষয়ে বান্ধবপুরের মানুষদের মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই। বান্ধবপুরের মতো এতবড় অঞ্চলে একজন 'আউলা' মাথা থাকবে না, এটাই বা কেমন কথা ? গ্রামে এক দুইজন 'আউলা' মাথা থাকা ভালো, এতে গ্রামের উন্নতি। বদ্ধ উন্মাদ হলে ভিন্ন কথা। বদ্ধ উন্মাদকে নৌকায় করে দূরের কোনো গঞ্জে গোপনে ছেড়ে আসাটা বিধি। মাওলানা ইদরিস বদ্ধ উন্মাদ না। তিনি একটা বিষয় ছাড়া সর্ব বিষয়ে অতি স্বাভাবিক। মসজিদের নামাজ নিয়মমতো পড়াচ্ছেন। জুম্মাবারে একটা হাদিস বয়ান করা এবং তার ব্যাখ্যা করা তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস। এই অভ্যাসেরও পরিবর্তন হয় নি। গত জুম্মাবারে তিনি নবিজির হাদিস বয়ান করলেন।

মুসুল্লিদের আজ যে হাদিসটা বলব এই হাদিস আমরা পেয়েছি ইয়াজিদের কন্যা বিবি আসমার কাছ থেকে। তিনি বলছেন, একদিন নবিজি (সাল্লালালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে খাবার আনা হয়েছে। তিনি সেই খাবার আমার এবং আমার সঙ্গে উপস্থিত কিছু মহিলার সামনে রেখে বললেন, খাও। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম ক্ষুধার্ত, তারপরেও ভদ্রতা করে বললাম, আমাদের ক্ষুধা নাই। তখন নবিজি বললেন, "হে মহিলাবৃন্দ! ক্ষুধার সঙ্গে মিথ্যা মিশিও না।"

এখন মুসল্লিগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যা চিন্তা করেন। ব্যাখ্যা হলো, ভদ্রতার কারণে মিথ্যা বলা যাবে না। যেই মিথ্যায় ক্ষতি নাই সেই মিথ্যাও বলা যাবে না। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাবে না। সবাই বলেন— আলহামদুলিল্লাহ।

সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলল। মাওলানা দোয়া শুরু করলেন। কোথাও ভুল নেই। কোনো ভ্রান্তি নেই। শুধু এক জায়গাতেই সমস্যা। মাওলানার ধারণা ঘরে তাঁর স্ত্রী আছে। অতি রূপবতী স্ত্রী।

বাড়িতে ঢোকার আগে উঠানে দাঁড়িয়েই তিনি কয়েকবার গলা খাঁকারি দেন। যেন তাঁর স্ত্রী গায়ের কাপড় বেশামাল থাকলে ঠিকঠাক করে নিতে পারেন। স্ত্রীকে স্বামীর সামনেও আব্রু রক্ষা করার বিধান।

বাড়িতে ঢুকে পাগড়ি খুলতে খুলতে মাওলানা বলেন, বউ, রান্না কিছু হয়েছে ?

তাঁর প্রশ্নের কেউ জবাব দেয় না। কিন্তু মাওলানা জবাব শুনতে পান এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন, থাক থাক, জ্বর গায়ে নিয়ে এখন রান্না করতে বসতে হবে না। সামান্য চাল-ডাল আমি নিজেই ফুটিয়ে নিতে পারব। তুমি বরং কিছুক্ষণ শুয়ে থাক। গোসল করবে ? পানি এনে দেব ? তাহলে থাক গোসলের দরকার নাই। জ্বর সারুক। বউ, আমার কিন্তু ধারণা তোমার ম্যালেরিয়া হয়েছে। প্রতিদিন একই সময় জ্বর, এইটা ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু না। আমাকে মনে করিয়ে দিও, সতীশ কবিরাজের কাছ থেকে মিকচার এনে দিব। পাঁচ দাগ মিকচার খেলেই জ্বর শেষ। খেতে তিতা। নিষিন্দার রসের চেয়েও তিতা। কিন্তু ম্যালেরিয়ার যম।

মাওলানা বারান্দায় রান্না করতে বসেন। চোঙা দিয়ে চুলায় ফুঁ দিতে দিতে পরিষ্কার শুনতে পান উঠান ঝাট দেয়া হচ্ছে। পাতা জমানো হচ্ছে। মাওলানা দুঃখিত গলায় বললন, বউ, তুমি দেখি আমার কোনো কথাই শুন না। শরীরে জ্বর নিয়া উঠান ঝাঁট দিতে শুরু করলা। কয়েকটা শুকনা পাতা পইড়া আছে, এতে হইছে কী ? বন কর।

ঝাড় দেয়ার শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। মাওলানা বড়ই আনন্দ পান।

হাটের দিনে মাওলানাকে তাঁর অদৃশ্য স্ত্রীর জন্যে টুকটাক অনেক কিছু কিনতে দেখা যায়। সস্তার জিনিস— কাঁচের চুড়ি, ফিতা, কাঠের কাঁকই। দোকানিরা এই সময় তাঁর সঙ্গে নানান রহস্য করে। তিনি সেই রহস্যের কিছুই বোঝেন না। তাদের কথার জবাব দিয়ে যান। স্ত্রী প্রসঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগে।

মাওলানা সাব, কাঁচের চুড়ি যে কিনতেছেন ভাবি সাবের হাতের মাপ দরকার না ?

এই মাপেই চলবে। মাপ আমি জানি।

সবুজ চুড়ি কিনলেন, ভাবি সাবের গায়ের রঙ কী ? গায়ের রঙ শাদা না হইলে চুড়ি ফুটব না।

গাত্রবর্ণ অতি পরিষ্কার।

মাশাল্লাহ।

নতুন এক সাবান বাইর হইছে কোম্পানির, জলে ভাসা সাবান। পুসকুনিতে ছাইড়া দিবেন পানিতে ভাসতে থাকব। ভাবি সাবের জন্যে সাবান একটা দিব ?

না। সে পুকুরে স্নান করে না।

পুকুরে স্নান করতে সমস্যা কী ?

সমস্যা আছে। পর্দার সমস্যা। চাইর দিক খোলা।

সেইটাও তো একটা কথা।

মাওলানাকে নিয়ে নানান আমোদ হয়। বান্ধবপুরের লোকজন আমোদ করে। পরিচিতজনরা করে। অপরিচিতজনরাও করে। সবচে' বেশি আমোদ করেন ধনু শেখ। আজকাল তাঁর সময়ের খুব অভাব। নানান মিটিং করতে হয়। সভা সমিতিতে যেতে হয়। ময়মনসিংহ শহরে নিজের থাকার জন্যে তিনি বাড়ি বানিয়েছেন। বাড়ির নাম 'খান ভিলা'। বান্ধবপুরে মাসে এক দুই বারের বেশি আসতে পারেন না। যখনই আসেন মাওলানাকে ডেকে পাঠান। ধনু শেখের সময়টা ভালো কাটে।

মাওলানা, তোমার স্ত্রী আছে কেমন ?

জি জনাব ভালো। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

গতবারে তোমার কাছে শুনেছিলাম উনার ম্যালেরিয়া হয়েছে।

জি। সতীশ কবিরাজের কাছ থেকে এনে ওষুধ খাইয়েছি। এতে আরাম হয়েছে।

এখন আর জ্বর আসে না ?

জি-না। আল্লাপাকের মেহেরবানি।

এখন পর্যন্ত কেউ উনারে চউক্ষে দেখল না, এইটা কেমন কথা ?

পর্দা-পুসিদার মধ্যে থাকে।

স্ত্রীলোকের সামনেও কি পর্দা করে ?

জি।

ভালো তো। খুবই ভালো। তা তোমাদের সন্তানাদি কিছু হবে ? আছে কোনো খবর ?

এখনো খবর নাই।

খবর হইলে আগেভাগে বলবা। নয়তো একদিন হঠাৎ শুনব তোমার সন্তান হয়েছে, তারেও কেউ চোখে দেখে না।

খবর হইলে আপনারে জানাব।

তোমার স্ত্রীর নাম তো জুলেখা। নাম ঠিক বলেছি না ?

জি।

সে রঙিলা নটিবাড়ির জুলেখা না তো ?

জি-না। তওবা। আপনি কী বলেন!

না হইলেই ভালো। মাওলানা হইয়া নটি বিবাহ্ করলে লোকজন তোমার পেছনে দাঁড়ায়া নামাজ পড়বে না। ঠিক না ?

জি ঠিক।

রঙিলাবাড়ির জুলেখার খবর কিছু রাখ ? শুনেছি সে নাকি কলিকাতায় থাকে। তার গানের থাল বাইর হইছে। দুইটাকা কইরা থালের দাম।

আমি কিছু জানি না।

না জানাই ভালো। তুমি স্ত্রীকে নিয়া আছ ভালোই আছ। ভালো কথা, তোমার কি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ হয় ?

হয় না।

দুইজন মানুষ একসাথে বাস করতেছ, কিছু ঝগড়া তো হওয়ার কথা। ধমক ধামক কোনোদিনও দেও নাই ?

একবার দিয়েছিলাম, শুরু করল কান্দন। কান্দন দেইখা মন খারাপ হয়েছিল বিধায় ঠিক করেছি আর ধমক ধামক না।

তোমার স্ত্রীর মতো স্ত্রী সবের প্রয়োজন। এই রকম স্ত্রী জনপ্রতি দশবারোটা থাকলেও ক্ষতি নাই। শোন মাওলানা, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়া একবার আমার ময়মনসিংহের বাড়িতে আস। কী বাড়ি বানাইলাম দেইখা যাও। বাড়িতে ফুঁ দিয়া যাও। স্ত্রী পর্দার মধ্যে থাকবে, অসুবিধা কী ? বোরকা পইরা যাবে। বোরকা পইরা ফিরবে।

জি আচ্ছা যাব।

ধনু শেখের ময়মনসিংহের বাড়িতে মাওলানার যাওয়া না হলেও অন্য এক অতিথি হঠাৎ রাতদুপুরে উপস্থিত। মাঘ মাস। শীত পড়েছে জব্বর। সেই সঙ্গে কুয়াশা, এক হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না এমন অবস্থা। ধনু শেখ রাতের খাবার শেষ করেছেন। পানের জন্যে অপেক্ষা করছেন। জর্দা দিয়ে পান খেতে খেতে হুঁকো টানবেন। বাবুর্চি ছগীর পায়ে গরম তেল মালিশ করে দিবে। শরীর ভালো বোধ করলে পিয়ারীকে খবর দিয়ে আনবেন। কিছু গানবাজনা হবে। ইদানীং রাত জেগে দীর্ঘসময় গান শুনতে পারেন না। ঘুমিয়ে পড়েন। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যেও আনন্দ আছে। ধনু শেখ পিয়ারীকে আনতে পাঠাবেন কি

পাঠাবেন না তা নিয়ে আরামদায়ক অনিশ্চয়তায় আছেন। এই সময় অতিথি শোবার ঘরেই ঢুকে পড়ল। অতিথির মাথায় মাফলার। গায়ে ছাই রঙের চাদর।

ধনু শেখ চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। অতিথি অপরিচিত না। মাফলারে অতিথির মুখ প্রায় ঢাকা। তারপরেও তাকে চেনা যাচ্ছে। অতিথির নাম জীবনলাল। এই লোকের ফাঁসি হয়ে যাবার কথা। সে এখানে কী করছে? বাড়িতে দারোয়ান আছে। সে ঢুকলইবা কীভাবে? ধনু শেখের স্ত্রীদের কেউই এ বাড়িতে নেই। খানসামা এবং বাবুর্চি নিয়ে সংসার। বাবুর্চি জর্দা আনতে গিয়ে মারা গেছে নাকি কে বলবে!

আমাকে চিনেছেন? আমার নাম জীবনলাল।

ধনু শেখ ভীত গলায় বললেন, চিনেছি।

এই সময় বাবুর্চি জর্দা এবং হুঁকো নিয়ে ঢুকল। শোবার ঘরে অচেনা এক লোক বসে আছে এই নিয়ে তাকে মোটেই চিন্তিত মনে হলো না। সে ব্যস্ত হুঁকো ঠিক করতে। জীবনলাল বললেন, আপনার হুঁকোবরদারকে যেতে বলুন। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। কথা শেষ করি।

ধনু শেখ বাবুর্চিকে চলে যেতে ইশারা করলেন। বাবুর্চি চলে গেল। ধনু শেখ চাচ্ছিলেন বাবুর্চি যেন পুরোপুরি না যায়। দরজার পাশে থাকে। ডাকলেই ছুটে আসতে পারে এমন। কিন্তু হারামজাদা যে যাচ্ছে যাচ্ছেই। একবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছেও না। ধনু শেখের নিজেকে খুবই অসহায় লাগছে। পিস্তলের লাইসেন্স তিনি কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছেন। আলসেমি করে পিস্তল কেনা হয় নাই। বিরাট বোকামি হয়েছে।

খান সাহেব, আছেন কেমন?

ধনু শেখ ক্ষীণগলায় বললেন, ভালো। আপনাকে একটা কথা আগেই বলা দরকার। আগে না বললে আপনি ধারণা করতে পারেন আমি ঐ রাতে খবর দিয়ে পুলিশ এনেছিলাম। ঘটনা সত্যি না। তবে পুলিশের চাপে পড়ে ঐ দিন স্বীকার করেছিলাম যে আপনি হাওরের দিকে গিয়েছেন। পুলিশের চাপ কী জিনিস আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

জানি। পুলিশের চাপের প্রসঙ্গ থাক। এখন আমার চাপটা শুনুন। মন দিয়ে শুনতে হবে।

মন দিয়ে শুনছি।

আপনি কাল পরশুর মধ্যে বান্ধবপুর যাবেন। হরিবাবুর বিষয়সম্পত্তি যা দখল করেছেন সেসব ফেরত দিবেন।

কাকে ফেরত দেব ?

মূল মালিককে দেবেন।

মালিকটা কে ?

মাওলানা ইদরিসকে জিজ্ঞাস করলেই জানতে পারবেন।

মাওলানা ইদরিসকে কী জিজ্ঞাস করব ? তার তো মাথা নষ্ট। পুরাই নষ্ট।

হরিচরণের জমিজমার ওয়ারিশানের নাম জহির। তার মা'র নাম জুলেখা।

ধনু শেখ বললেন, কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে। হরিচরণ বাবু বেশ্যাবেটির ছেলেকে সম্পত্তি কেন দিবেন ? যদি দিয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে উনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মাথাখারাপ মানুষের দলিল গ্রাহ্য না। ভালো কথা, আপনি কি খাওয়াদাওয়া করবেন ? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ক্ষুধার্ত। বাবুর্চিকে খানা লাগাতে বলব ?

জীবনলাল চাদরের নিচ থেকে পিস্তল বের করে নিজের হাঁটুর উপর রাখতে রাখতে বললেন, আপনার বাবুর্চিকে খাবার গরম করতে বলুন। খাওয়া শেষ করে বিদায় নেবার সময় আপনার পায়ে একটা গুলি করব। আপনি মরবেন না, তবে পায়ের হাড্ডি চুরমার হবে। এই কাজটা করব যাতে আপনি বুঝতে পারেন আমি সহজ পাত্র না।

ধনু শেখ হাসির চেষ্টা করতে করতে বললেন, এইসব কী বলেন ? আপনার কথামতোই কাজ হবে। যা বলবেন তাই করব। আপনার নিজের যদি টাকা পয়সা লাগে সেটাও বলেন। স্বরাজ করতে টাকা লাগে। টাকা ছাড়া কিছুই হয় না।

জীবনলাল হাই তুলতে তুলতে বললেন, গুলি খাওয়ার পরই আপনি আমার কথামতো কাজ শুরু করবেন। তার আগে না। ভয় পাবেন না, আপনার বাড়ি থেকে হাসপাতাল দূরে না। অল্প সময়েই হাসপাতালে পৌছতে পারবেন। আরেকটা কথা, গুলি যে আমি করেছি এটা পুলিশকে না বললে ভালো হয়।

ধনু শেখ বললেন, ভাই সাহেব, খাওয়াদাওয়া করেন। আপনি ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কী বলতেছেন নিজেও বোধহয় জানেন না। রহমত কই ? বাড়িতে অতিথি। খাবারের ব্যবস্থা কর।

ভাই সাহেব, আপনি কি রাতে আমার এখানে থাকবেন ? থাকতে পারেন। দুইটা ঘর সাজানো আছে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে আসেন দুই ভাই মিলে পুরানা দিনের মতো গল্প করি। মাওলানা মাথা খারাপ হবার পরে কী করে আপনারে বলব, আপনি যদি মজা না পান দুই কান কাইট্যা ফেলব।

জীবনলাল তাকিয়ে আছে। তার চোখ শান্ত। ধনু শেখ বললেন, দাড়ি ফেলে দিয়ে ভালো করেছেন। আপনার চেহারা সুন্দর। দাড়ির কারণে আগে বুঝতে পারি নাই। আপনার ভাগ্যও কিন্তু ভালো। আজ বাড়িতে মাগুল মাছ রান্না হয়েছে। মাগুল মাছের নাম শুনেছেন ?

না।

অনেকে বলে মহাশোল। রুই মাছ, তবে দেখতে শউল মাছের মতো। পাহাড়ি নদীতে থাকে, দু'একটা নিচে নেমে আসে। এই মাছ একবার খেলে বাকি জীবন মুখে লেগে থাকবে। ভালো কথা, দেশ স্বাধীনের দেরি কত ?

দেরি নাই।

আমারও সেইরকমই ধারণা, দেরি নাই।

ধনু শেখ ভরসা ফিরে পাচ্ছেন। জীবনলাল গল্পগুজবে অংশ নিচ্ছে, এটা শুভ লক্ষণ। খাওয়াদাওয়া করার পর পেট শান্ত হবে। পেট শান্ত হলেই মাথা শান্ত। কিছু করবে বলে মনে হচ্ছে না। পিস্তল এনেছে ভয় দেখাবার জন্যে। এর বেশি কিছু না।

ধনু শেখের সমস্ত অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করে জীবনলাল ঠাণ্ডা মাথায় কাছ থেকে পায়ে গুলি করল। ছিটকে পা সরিয়ে নিতে গিয়েও লাভ হলো না, পায়ের হাড় ভেঙে গুলি বের হয়ে গেল।

কবিরাজ সতীশ ভট্টাচার্যের কন্যার বিষয়ে আজ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সমাজপতিরা সবাই এসেছেন। মুসলমানদের মধ্যে আছেন মাওলানা ইদরিস। ন্যায়রত্ন রামনিধিও আছেন। মূল সিদ্ধান্ত তিনি দেবেন। রামনিধির শরীর খুবই খারাপ, তারপরেও গুরুতর এই বিষয়ে তাঁকে আসতেই হয়েছে।

ঘটনা এরকম— কালবোশেখী ঝড়ের সময় যমুনা ঘোষবাড়ির আমবাগানে আম কুড়াতে গিয়েছিল। শুরুতে ঝড় তেমন কিছু ছিল না— এলোমেলো বাতাস। হঠাৎ ঝড় প্রবল হলো। সঙ্গে তুমুল বর্ষণ। যমুনা দৌড়ে ঢুকল ঘোষবাড়িতে। ঝড় বাড়তেই থাকল। বিপদের উপর বিপদ। এই সময় ঘোষবাড়িতে ডাকাত পড়ল। তারা চিৎকার চেঁচামেচি করছে, কেউ শুনছে না। ডাকাতির শেষে ডাকাতরা যমুনাকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে উদ্ধার করা হয় শেষ রাতে উলঙ্গ অবস্থায়।

রামনিধি বললেন, এ তো মহাসর্বনাশ। কবিরাজ, তোমার মনে কী আছে বলো। মেয়েরে কী করবা ?

সতীশ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রামনিধি বললেন, এই মেয়ে নিজ দোষে দোষী না। তস্করের কারণে দোষী। যে ঘটনা ঘটেছে তাতে তার গর্ভ সঞ্চারের সমূহ সম্ভাবনা। সেটা কোনো বিষয় না, গর্ভ নষ্ট করা যায়। কিন্তু মেয়ে যে পতিত হয়েছে তার গতি কী ?

সমাজপতিদের একজন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, কোনো গতি নাই।

রামনিধি বললেন, কঠিন বাস্তবতা হলো সমাজ এই মেয়েকে গ্রহণ করবে না। আত্মীয়স্বজন গ্রহণ করবে না। সে যেখানে যাবে যার কাছে যাবে সে পতিত হবে। তার ইহকাল পরকাল সবই শেষ।

সমাজপতিদের মধ্যে বিশিষ্টজন বিধান বাবু বললেন, মেয়ের বয়স অল্প এবং সে সুন্দরী বিধায় সমস্যা আরো প্রকট।

সতীশ কবিরাজ চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ফাঁসিতে ঝুলায়া মাইরা ফেলি ?

বিধান বাবু বললেন, বোকার মতো কথা বলবা না। ফাঁস নিয়া মরলে অসুবিধা আছে। থানা পুলিশ হবে। তোমারে ধরবে। একটা কাজ করা যায়, মেয়ের মাথা কামায়া তারে বাল বিধবা পরিচয়ে কাশিতে পার করা যায়। কাশি পূণ্যধাম। সেখানে রোজ গঙ্গাস্নান করলে এক পর্যায়ে পাপ কাটা যাবে।

সতীশ কবিরাজ বললেন, কাশিতে আমার কেউ নাই।

বিধান বাবু বললেন, আমি একটা প্রস্তাব দিতে পারি। শুনতে খারাপ লাগলেও প্রস্তাব উত্তম।

রামনিধি বললেন, কী প্রস্তাব ?

মেয়েটারে রঙিলাবাড়িতে পাঠায়ে দেওয়া। আমরা ধরে নিব যমুনা নামে কেউ সমাজে ছিল না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকল। মাওলানা ইদরিস বললেন, এটা আপনি কী বললেন ?

বিধান বাবু বললেন, অন্যায় কী বলেছি ? আপনার মুসলমান সমাজ কি এই মেয়েরে নেবে ? বলেন নেবে ? আপনি মুসলমান বানায়া এই মেয়েরে বিবাহ করবেন ?

মাওলানা বললেন, জনাব আমার স্ত্রী আছে। আমি কীভাবে বিবাহ করব ?

এক স্ত্রী আছে আরেক স্ত্রী হবে। আপনাদের সমাজে তিন চাইরটা স্ত্রী কোনো বিষয় না।

মাওলানা বললেন, আমার স্ত্রী রাজি হবে না। সংসারে সতীন তার পছন্দ না।

সমাজপতিদের কেউ কেউ হেসে উঠলেন। রামনিধি বিরক্ত গলায় বললেন, মূল বিষয়ে আস। খামাখা কথা বইলা সময় নষ্ট করার কিছু নাই। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্ত অতি অপ্রিয়, তারপরেও নিতে হবে। বিধান বাবুর কথা আমার পছন্দ হয়েছে। রঙিলাবাড়ি কিংবা এই ধরনের পতিত বাড়ি ছাড়া পতিত মেয়ের গতি নাই। আগের জন্মে এই মেয়ে বিরাট পাপ করেছিল বলে এই জন্মে শাস্তি। এই জন্মে শাস্তি ভোগের পরে পরের জন্মে সে উদ্ধার পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কয়েকজন একসঙ্গে বলল, খাঁটি কথা।

যমুনা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। বাবার কাছ থেকে সামান্য দূরে মাথা নিচু করে বসেছিল। এইবার সে মাথা তুলে বলল, আমি রঙিলাবাড়িতে যাব না।

বিধান বাবু বললেন, তুমি কী করবা, কী করবা না এটা কেউ জিজ্ঞাস করে নাই। তুমি চুপ করে থাক।

যমুনা বলল, আমি রঙিলাবাড়িতে যাব না। বাবা, আমি রঙিলা বাড়িতে যাব না।

সতীশ কবিরাজ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, মা'রে চুপ করে থাক।

রামনিধি বললেন, আমার শরীর ভালো না। জ্বর এসেছে। সভা এইখানেই শেষ। মেয়ে নিজের ইচ্ছায় রঙিলাবাড়িতে যাবে না। যাওয়ার কথাও না। তাকে জোর করে দিয়ে আসতে হবে। সমাজ রক্ষার জন্যে এটা ছাড়া গতি নাই। ব্যবস্থা আজই নিতে হবে। অনেক দেরি হয়েছে আর দেরি করা যাবে না।

যমুনা এই সময় দৌড় শুরু করল। তাকে ধরার ব্যবস্থা নেয়ার আগেই সে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। যেখান থেকে প্রতি অমাবশ্যা রাতে হো হো শব্দ হয়।

সমাজপতিরা বিচলিত হলেন না। জঙ্গল থেকে যমুনাকে বের হতে হবে। কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। বের হলে ধরে বেন্ধে রঙিলা বাড়িতে পার করা। সেখানে মেয়ে কেনাবেচার ব্যবস্থাও আছে। ভালো মহাজন পেলে বিক্রি হয়ে যাবে। সেবাদাসী হিসেবে জীবন কেটে যাবে। আগের জন্মের পাপের শাস্তি তো নিতেই হবে।

যমুনা জঙ্গলে ঢুকেছে সন্ধ্যাবেলায়। বর্ষার জঙ্গলে নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করা অসম্ভব ব্যাপার। ঝোপঝাড়, কাটালতা। সাপে কাটার ভয় আছে। গরু-ছাগল জঙ্গলে ঢুকে অনেক সময় সাপের কামড়ে মারা গেছে। সাপখোপ ছাড়াও ভয় আছে। ভূতপ্রেতের ভয়। খারাপ বাতাসের ভয়। বিশেষ এক ধরনের অপদেবতা আছে যারা জঙ্গলেই বাস করে। এরা ভয়ঙ্কর। নিষ্ঠুরতা তাদের খেলা।

যমুনা জঙ্গলের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ঘন জঙ্গল। জঙ্গলে এক ধরনের কুয়াশা পড়ে, তার নাম জংলি কুয়াশা। দেয়ালের মতো এই কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না। হাতড়ে পথ চলতে হয়। দৌড়ে আসার কারণে যমুনা হাঁপাচ্ছে। গা দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে। তৃষ্ণায় কলজে ফেটে যাচ্ছে। তৃষ্ণার চেয়ে বেশি লেগেছে ক্ষুধা। তার কাছে মনে হচ্ছে, গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে সে এখন খেতে পারবে, তার কোনো সমস্যা হবে না। জঙ্গলের ভেতর মাধাই খালের একটা শাখা গেছে। পানি খেতে হলে খালটা খুঁজে বের করতে হবে। খালটা কোথায় কে জানে! যমুনা দম নেবার জন্যে বসে আছে। তার প্রায় গা ঘেঁসে একটা শিয়াল দৌড়ে গেল। তার ভয় পাওয়া উচিত, সে কেন জানি ভয় পেল না। মহাবিপদের সময় ভগবানকে ডাকতে হয়। সে ভগবানকেও ডাকল না। তার জীবন হঠাৎ করেই ভয়শূন্য এবং ভগবানশূন্য হয়ে গেল।

শশাংক পালের জীবন এখন হয়েছে ভগবানময়। তিনি সময় পেলেই ভগবানকে ডাকছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা আরো খারাপ করেছে। তিনি এখন উঠে বসতেও পারেন না। সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। তাঁর পা ফুলে পানি এসেছে। নিজের পায়ের দিকে তাকালেই ভয়ে তাঁর শরীর কাঁপে। পায়ের দিকে তাকালেই মনে হয়, মৃত্যু দ্রুত এগিয়ে আসছে। ভগবান ছাড়া গতি নেই। ভগবান দয়া করলেই বৈতরণী পার হওয়া যাবে। ভগবান দয়া করবেন এমন মনে হচ্ছে না।

শশাংক পালের ছোট শ্যালক এসেছে জামাইবাবুর খোঁজে। ছোট শ্যালকের নাম পরিমল। তার নানান ব্যবসা আছে। পয়সাকড়ি ভালোই করেছে। তবে টাকা-পয়সার প্রকাশ নেই। সে হিসেবি ব্যবসায়ী।

পরিমল বলল, জামাইবাবু, আপনার একী অবস্থা!

শশাংক পাল বললেন, অবস্থা খারাপ কী ? শুয়ে আছি। দিনরাত শুয়ে থাকার ভাগ্য সবার হয় না। আমার হয়েছে।

চিকিৎসা করাচ্ছেন ?

সর্ব চিকিৎসা শেষ হয়েছে। এখন চলছে 'কেরোসিন' চিকিৎসা।

'কেরোসিন' চিকিৎসাটা কী ?

রোজ দুই চামচ করে কেরোসিন খাচ্ছি। কেরোসিন হলো বিষ। আমার উদরে আছে বিষ। বিষে বিষক্ষয়।

আমার সঙ্গে চলেন। দিদি আপনাকে নিতে বলেছে।

শশাংক পাল বললেন, সে বাঁশি বাজিয়েছে বলেই আমি দৌড় দিয়ে চলে যাব! সে শ্রীকৃষ্ণ না, আর আমিও রাধিকা না।

ভিক্ষুকের মতো পরের বাড়িতে থাকবেন ?

শুধু যে ভিক্ষুকের মতো থাকব তা-না, ভিক্ষাবৃত্তিও শুরু করব। একটা ঘোড়া কিনব, তারপর ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা।

আপনি সত্যি যাবেন না ?

না।

কিছু টাকা-পয়সা এনেছিলাম।

কত ?

একশ'।

সারাজীবন তোমাদের টাকা-পয়সা দিয়েছি, আজ একশ' টাকা নিয়ে হাত গান্ধা করব না। টাকা নিয়ে বিদায় হও।

চলে যাব ?

সেটা তোমার বিবেচনা। আমোদ ফূর্তি করতে চাইলে রঙিলা বাড়িতে চলে যাও। আমাকে একশ' টাকা দিয়ে নষ্ট করার চেয়ে একশ' টাকার আমোদ কিনে নাও। দুই রাত থাকবা, খরচ হবে পঞ্চাশ। মদ্যপান করবা। খাওয়া-দাওয়া করবা। বখশিশ। এতে খরচ করবা পঞ্চাশ। একশ' টাকার হিসাব পেয়েছ ?

জামাইবাবু আমি যাই ?

যাও যাও। ভাগো।

দিদিকে কিছু বলব ?

বলবা যে জামাইবাবু তোমাকে প্রতিদিন স্নানের আগে এক চামচ করে বিষ্ঠা খেতে বলেছে। বিষ্ঠা শরীরের জন্যে ভালো। গ্রামের কুকুর এত মোটাতাজা কীভাবে থাকে ? বিষ্ঠা খেয়ে। তুমিও খেয়ে দেখতে পার। তোমার শরীরও দুর্বল। দুর্বল শরীরের জন্যে বিষ্ঠা মহৌষধ।

পরিমল জামাইবাবুকে প্রণাম না করেই বিদেয় হলো।

শশাংক পাল সুখেই আছেন। মনটা কয়েকদিন সামান্য খারাপ, কারণ সুলেমান ভিক্ষা করতে গিয়ে ফিরছে না। চারদিন হয়ে গেল। দূরে ভিক্ষা করতে গেলে ফিরতে এক দুই দিন দেরি হয়। তবে এতদিন অনুপস্থিতি এই প্রথম। শশাংক ঠিক করে রেখেছেন, এবার সুলেমান ফিরলে তার ঘোড়ায় চড়ে তিনি প্রতিদিনই খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ ঘুরবেন। স্বাস্থ্যের জন্যে খোলা হাওয়ায় ঘোরাঘুরি অত্যন্ত উপকারী। তবে ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারবেন না। ঘোড়ার গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

এক সপ্তাহ শেষ হলো, সুলেমান ফিরল না। শশাংক পাল যখন চিন্তায় অস্থির তখনই তিনি ধনু শেখের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। কোলকাতা থেকে পাঠানো চিঠিতে ধনু শেখ লিখেছেন—

শ্রী শশাংক পাল

জনাব,

বিশেষ কারণে পত্র দিলাম। পত্রের নির্দেশ মোতাবেক কার্য করিবেন। আমার শরীর ভালো না। এক দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পাইয়াছিলাম। আঘাতে পচন ধরিবার কারণে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে পা কাটিয়া বাদ দিতে হইয়াছে। রোগ এখনো আরোগ্য হয় নাই। চিকিৎসা চলিতেছে।

এখন মূল বিষয়ে আসি। হরিচরণের বিষয়সম্পত্তির অধিকার আমি বিশেষ কারণে পরিত্যাগ করিয়াছি। সম্পত্তির প্রকৃত ওয়ারিশান পাওয়া গেলে তাহাতে সব কিছু বর্তাইবে। ওয়ারিশান পাওয়া না গেলে সরকার বাহাদুর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। এতদিন আপনি ভোগদখল করিলেন। নায়েবকে আমি এই বিষয়ে পত্র দিয়াছি। সে আপনাকে হিসাবপত্র বুঝাইবে।

আমি সহসা বান্ধবপুরে আসিব এইরূপ মনে হইতেছে না। আর যদিও আসি হরিচরণের বাড়িঘরে উপস্থিত হইব না। আপনি বিবেচনা মতো কার্য করিবেন।

ইতি
খান সাহেব ধনু শেখ
কলিকাতা

শশাংক পাল চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন নায়েবকে। নায়েবের নাম বিনয়। সে নামের মতোই বিনয়ী। হরিচরণের (বর্তমান ধনু শেখের) জমিদারির দেখাশোনার প্রধান দায়িত্ব তার। কাজকর্মে অতি দক্ষ।

বিনয়!

জে আজ্ঞে।

খান সাহেবের কোনো পত্র পেয়েছ ?

পেয়েছি।

বিষয় কিছু বুঝেছ ?

আজ্ঞে না। তবে বিষয় জটিল।

জটিল ভাবলেই জটিল। জটিল ভাববা না।

আপনে যেমন বলবেন।

ক্যাশে নগদ টাকা-পয়সা যা আছে আমার কাছে দিয়া যাবা।

যা বলবেন করব। চিঠিতে সেই রকম লেখা।

আমার জন্যে বিলাতি একটা বোতল জোগাড় করবা, রঙিলা বাড়িতে পাওয়া যাবে। নিজে যাইতে না চাও অন্যেরে দিয়া আনাইবা।

আচ্ছা।

রাতে মুরগির কোরমা আর পোলাও খাব। জামাইপছন্দ চাউল জোগাড় করতে পার কি-না দেখ।

আপনার শরীরের অবস্থা যেমন গুরুভোজন কি ঠিক হবে ?

আমার শরীর আমি বুঝব। তোমার চিন্তার কিছু নাই।

আচ্ছা।

একজন কর্মঠ কাউরে জোগাড় করো যার কাজ আমার সেবা করা। মেয়েছেলে হলে ভালো হয়। পুরুষমানুষ রোগীর সেবা করতে পারে না। মেয়েছেলে পারে। শরীর স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে। মুখের কাটিং ভালো হওয়া প্রয়োজন। বয়স হইতে হবে কুড়ির নিচে।

বিনয় হতাশ গলায় বলল, কই পাব এমন মেয়েছেলে ?

শশাংক পাল বললেন, নিচা জাতের মধ্যে খোঁজ। নিচা জাতের মধ্যে পাইবা। চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম। এদের মেয়েছেলেদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়। এখন আমারে ধরাধরি করে আরাম কেদারায় শোয়ার ব্যবস্থা করো। শরীরটা আজ ভালো ঠেকতেছে।

বিনয় তাকিয়ে আছে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। শশাংক পাল বললেন, এক মেয়ে শুনেছি জঙ্গলে পালায়া আছে, তার খোঁজ নিতে পার। আমার আশ্রয়ে থাকবে, অসুবিধা কী ?

বিনয় বলল, এইগুলা কী বলেন ?

শশাংক পাল বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি যা বলি চিন্তাভাবনা করে বলি। আমার শরীরে পচন ধরেছে, মনে পচন ধরে নাই। বুঝেছ ?

হুঁ।

সময় ফুরায়ে আসছে। আনন্দ ফুর্তি যা করার এখনই করতে হবে। হাতে সময় নাই। খাটিয়া ঘাড়ে নিয়া বল হরি হরি বলের সময় আগত।

শরীরটা ঠিক করেন। চলেন কইলকাতা যাই।

কইলকাতা যাব না। কইলকাতার ডাক্তার-কবিরাজ এইখানে নিয়া আস। সোনার মোহর দিয়া ভিজিট দিব। বুঝেছ ? এখন আমার টাকার অভাব নাই। রঙিলা বাড়ির জুলেখার খোঁজ পাও কি-না দেখ। প্রতি সন্ধ্যায় সে এই বাড়িতে গান করবে। টাকা-পয়সা যা লাগে দিব। নিয়মিত সঙ্গীত শুনলে শরীর আরোগ্য হয়। বুঝেছ ?

কিছু না বুঝেই বিনয় মাথা নাড়াল। সে বুঝেছে।

যমুনা বেতঝোঁপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। ঝোঁপের কাঁটায় তার শাড়ি আটকে গেছে। হাত এবং গাল কেটেছে। তার মুখে নোনতা ভাব। কাটা গালের রক্ত গড়িয়ে ঠোঁট পর্যন্ত এসেছে। যমুনা অবাক হয়ে লক্ষ করল, রক্তের নোনতা স্বাদ তার খারাপ লাগছে না। সে ঝোঁপের পাশে বসে বেতকাটা থেকে শাড়ি ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কাজটা সে করছে যত্ন নিয়ে এবং এই কাজটা করতেও তার ভালো লাগছে। কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

জঙ্গলের অন্ধকার তার চোখে সয়ে এসেছে। আবছা আবছা ভাবে অনেক কিছুই চোখে আসছে। জোনাকি পোকার দল বের হয়েছে। অনেকগুলি ছোট ছোট দল। তারা মাঝে মাঝে একত্র হচ্ছে, আবার ছড়িয়ে পড়ছে। তাকে কে যেন বলেছিল জোনাকি পোকার দলের সঙ্গে মা লক্ষ্মী থাকেন। ঘরের বন্দিজীবন যখন তাঁর অসহ্য বোধ হয় তখন তিনি খোলা মাঠে বা জংলায় বেড়াতে বের হন। জোনাকি পোকারা হয় তাঁর খেলার সাথি। জোনাকিদের পেছনে পেছনে তিনি মনের আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটেন।

যমুনা জোনাকির ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে বলল, মা লক্ষ্মী! আমি মহাবিপদে পড়েছি, আমাকে উদ্ধার কর।

যমুনার ঠিক মাথার উপরে একটা ডাল নড়েচড়ে উঠল। কিচকিচ শব্দ হলো। গাছের দিকে না তাকিয়েই যমুনা বুঝল বাঁদর। এই বনে বাঁদর আছে। হনুমানও আছে। এরা মানুষ ভয় পায় না। হনুমানও দেবতা। তার কাছেও প্রার্থনা করা যায়। যমুনা গাছের দিকে তাকিয়ে আবারো হাতজোড় করল।

আকাশে সন্ধ্যা থেকেই মেঘের আনাগোনা ছিল। এখন বিজলি চমকাতে লাগল। একেকবার বিজলি চমকায় বন আলোয় ঝিলমিল করে উঠে। বানর এবং হনুমানের দল ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে। বজ্রপাতের সময় বনে থাকতে নেই। তখন চলে আসতে হয় খোলা প্রান্তরে। তা না করে যমুনা খুঁজে পেতে লম্বা একটা তাল গাছের নিচে দাঁড়াল। তার মন চাচ্ছে এই গাছে একটা বজ্রপাত হোক। আকাশের বজ্র যখন নেমে আসবে তখন সে তালগাছ দু'হাতে জড়িয়ে ধরবে।

পুরো আকাশ ছিন্নভিন্ন করে বিদ্যুৎ চমকাল, আর তখনি যমুনা স্পষ্ট দেখল বেতঝোঁপের উল্টোদিকে কুজো হয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। শুধু যে দাঁড়িয়ে আছে তা-না, হাত ইশারায় যমুনাকে ডাকছে। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার সারা শরীর চাদরে ঢাকা। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মানুষটা যে হরিচরণ এই বিষয়ে যমুনার কোনো সন্দেহ নেই। যমুনা অবাক হয়ে ডাকল, হরিকাকু!

ছায়ামূর্তি জবাব দিল না। আবারো হাত ইশারা করল। যমুনার মনে রইল না, মানুষটা জীবিত না। একজন মৃত মানুষ গভীর বনে উপস্থিত হতে পারে না। যমুনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগুচ্ছে। ছায়ামূর্তি সরে সরে যাচ্ছে। যতবার যমুনা থমকে দাঁড়াচ্ছে ততবার ছায়ামূর্তিও দাঁড়াচ্ছে। তাকে কি ভুলোয় ধরেছে ? ভুলো ভয়াবহ জিনিস। সে প্রিয় মানুষের রূপ ধরে কাছে আসে। নাম ধরে ডাকে। তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পেছনে পেছনে যেতে হয়। একসময় ভুলো তার শিকারকে জলে ডুবিয়ে মারে।

যমুনা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, হরিকাকু আমার ভয় লাগছে। ছায়ামূর্তি জবাব দিল না। আবারো হাত ইশারায় ডাকল। বিদ্যুৎ চমকানোর সময় ছায়ামূর্তি স্পষ্টই দেখতে পাওয়ার কথা। তখন কিন্তু দেখা যায় না। তখন ছায়ামূর্তি বড় কোনো গাছের আড়ালে চলে যায়।

যমুনা ছায়ামূর্তি অনুসরণ করতে করতে জঙ্গলের শেষ সীমানায় চলে এলো। ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখন সে আর যমুনাকে ইশারায় কাছে ডাকছে না। বরং আঙুলের ইশারায় বিশেষ এক দিকে যেতে বলছে। যমুনা ভীত গলায় বলল, হরিকাকু ভয় পাচ্ছি। ছায়ামূর্তি নড়ল না। জঙ্গলের উত্তর সীমানার দিকে আঙুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাতাস দিচ্ছে, ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। যমুনা পায়ে পায়ে উত্তর দিকে এগুচ্ছে। হঠাৎ তার কাছে মনে হচ্ছে, যেদিকে সে যাচ্ছে সেদিকে শুভ কিছু তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বনের বাইরে পা দিয়েই সে মাওলানা ইদরিসকে পেল। মাওলানার মাথায় ছাতা। হাতে হারিকেন। সারা শরীর কাদায় পানিতে মাখামাখি।

মাওলানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এত সহজে তোমারে পাব ভাবি নাই। আল্লাহপাকের মেহেরবানি পেয়ে গেছি। এত বড় জঙ্গল, কোথায় খুঁজব ? চল যাই।

যমুনা বলল, কই যাব ?

মাওলানা বললেন, আমার বাড়িতে যাবা। তোমার ভাবি সাব, আমার স্ত্রী আমারে পাঠায়েছে। সে তোমার ঘটনা শুনে মিজাজ খারাপ করেছে। যে জীবনে

কোনোদিন উচা গলায় কথা বলে নাই সে আমাকে দিয়েছে ধমক। চিন্তা করেছ অবস্থা ?

যমুনা অবাক হয়ে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষটা এমনভাবে কথা বলছে যেন যমুনা তার অনেক দিনের চেনা।

মাওলানা বললেন, দাঁড়ায়া আছ কেন ? চল রওনা দেই। তোমার ভাবি চিন্তাযুক্ত আছে। মেয়েছেলেরে বেশি সময় চিন্তার মধ্যে রাখা ঠিক না। পুরুষমানুষ দীর্ঘ সময় চিন্তায় থাকতে পারে। মেয়েরা পারে না। তোমার কি ভুখ লেগেছে ?

হুঁ।

ঘরে যাবা। গরম পানি দিয়া গোসল দিবা, তারপরে গরম গরম খিচুড়ি খাবা। অমৃতের মতো লাগবে।

যমুনা বলল, আমাকে যে বাড়িতে নিতেছেন আপনার অসুবিধা হবে না ?

মাওলানা বললেন, অসুবিধা হলে হবে। কী আর করা! তোমারে জঙ্গলে ফালায়া গেলে তোমার ভাবি কী পরিমাণ বেজার হবে তুমি বুঝতেই পারবে না। আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিতে পারে। চল চল হাঁটা দাও। নাও ছাতিটা মাথার উপর ধর।

ছাতি লাগবে না।

তোমার কি গাল কেটেছে ? রক্ত পড়তেছে।

হুঁ।

কোনো চিন্তা নেই। তোমার ভাবি দূর্বা পিষে মলম বানায়ে দিবে। গালে দিলেই আরাম। এইসব টোটকা সে ভালো জানে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, যেখানে যা দেখে শিখে রাখে। পরে কাজে লাগে।

যমুনা রওনা হলো। অনেক দুঃখের পর তার এখন হাসি পাচ্ছে। পাগল একজন মানুষের পেছনে পেছনে সে যাচ্ছে যার ধারণা ঘরে তার মমতাময়ী স্ত্রী। তাদের ভালোবাসা সুখের সংসার। আহারে!

যমুনা অনেক সময় নিয়ে সাবান ডলে গরম পানিতে গোসল করল। নতুন সুতির শাড়ি পরল। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাওলানার সঙ্গে খেতে বসল। যমুনা বলল, আপনি যে অচেনা মেয়েমানুষের সঙ্গে খেতে বসেছেন আপনার পাপ হবে না ? আপনাদের ধর্মে মেয়েছেলের মুখের দিকে তাকানো নিষেধ। ঠিক না ?

মাওলানা বললেন, তা ঠিক। তবে রোজ কেয়ামতের সময় পুরুষ রমণীতে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। তোমার এখন রোজ কেয়ামত।

আপনার স্ত্রী খাবেন না ?

মাওলানা হতাশ গলায় বললেন, এই তার এক অভ্যাস। একা খাবে। আমার সামনে খেতে লজ্জা পায়। কতবার তাকে বলেছি— বউ, আমি তোমার স্বামী। স্বামীর সামনে কিসের লজ্জা ? শোনে না।

যমুনা বলল, খিচুড়ি খুব স্বাদ হয়েছে। কে রেঁধেছে ? আপনি না বৌদি ?

তোমার ভাবি জোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছে। আমি রেঁধেছি।

যমুনা বলল, যে দয়া আপনি আমাকে করেছেন তারচেয়ে অনেক বেশি দয়া ভগবান যেন আপনাকে করেন।

মাওলানা ব্যস্ত হয়ে বললেন, আমি কিছুই করি নাই। যা করার তোমার ভাবি করেছে। অতি আচানক মেয়ে। কেউ বিপদে পড়েছে শুনলে অস্থির হয়ে যায়।

যমুনা অনেক রাতে ঘুমাতে গেল। পরিপাটি বিছানা। গায়ে দেয়ার ধোয়া চাদর। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ। হঠাৎ করেই যমুনার মনে হলো, তার মতো সুখী মেয়ে এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। ঘুমের মধ্যে অতি আনন্দের একটা স্বপ্নও দেখল। স্বপ্নে সে এবং সুরেন বনে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে চার-পাঁচ বছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে। মেয়েটা তাদেরই। সে বড় দুষ্টুমি করছে। এই এক গাছের আড়ালে চলে গেল। ধরতে গেলে অন্য এক গাছের আড়ালে। সুরেন কপট বিরক্ত ভাব করে বলল, মেয়েটাকে এত দুষ্ট বানায়েছ কীভাবে ? যমুনা বলল, একা একা মেয়ে মানুষ করছি, দুষ্ট তো হবেই। তুমি থাক কলিকাতায়, আমি মেয়ে নিয়ে জঙ্গলে বাস করি।

জঙ্গলে বাস কর কেন ?

কেউ আমাকে বাড়িতে জায়গা দেয় না। জঙ্গলে বাস না করে করব কী ?

মাওলানা সাহেব তো তোমাকে জায়গা দিয়েছেন। টেলিগ্রামে খবর পেয়েছি।

ভুল খবর পেয়েছ। মাওলানা সাহেব এবং তার স্ত্রীকেও লোকজন তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনিও এখন আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে থাকেন। জঙ্গলে আমরা ঘর বানিয়েছি। কী যে সুন্দর ঘর। চল তোমারে দেখায়ে নিয়ে আসি।

আগে মেয়েটাকে খুঁজে বের কর। আমরা মেয়েটাকে ফেলে ঘর দেখতে যাব, সে যাবে হারিয়ে। আরেক যন্ত্রণা হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যমুনা মাওলানা ইদরিসের বাড়িতে থাকছে এ নিয়ে বান্ধবপুরে কোনো সমস্যা হলো না। মনে হলো মেয়েটার গতি হয়েছে এই ভেবে সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এক গভীর রাতে দেখা গেল মাওলানার বাড়ির উঠানে টিনের এক ট্রাংক। ট্রাংকভর্তি যমুনার জিনিসপত্র। শাড়ি, চুড়ি, গায়ের চাদর। স্যান্ডেল। তবে মাওলানা সামান্য বিপদে পড়ল। মুসুল্লিরা ঠিক করল তার পেছনে কেউ নামাজে দাঁড়াবে না। পাগল মানুষ ইমামতি করতে পারে না। তার পেছনে নামাজে দাঁড়ানো নাজায়েজ।

বান্ধবপুর জুম্মা মসজিদের জন্যে নতুন ইমাম এসেছেন। আব্দুল করিম কাশেমপুরী। তাঁর জন্মস্থান কাশেমপুরে বলেই কাশেমপুরী টাইটেল। তাঁর বয়স অল্প। তবে ভাবে ভঙ্গিতে অত্যন্ত কঠিন। প্রথম জুম্মার দিনেই তিনি মাওলানা ইদরিসকে নামাজ পড়তে দিলেন না। মাওলানা ইদরিসের অপরাধ, তিনি বাড়িতে যুবতী মেয়েমানুষ পুষছেন। এত বড় গুনার কাজ যে করে সে আমজনতার সঙ্গে নামাজে শরিক হতে পারে না। যুবতী বিদায় করে তওবা করতে হবে, তারপর বিবেচনা। খুতবা শেষ করে মাওলানা আব্দুল করিম কাশেমপুরী প্রথম ফতোয়া দিলেন—

> যে মুসলমানের স্ত্রীর চেহারা পরপুরুষ দিনে তিনবারের অধিক দেখে ফেলে তার বিবাহ বাতিল। তার সন্তানরা জারজ বলে গণ্য হবে।

মুসুল্লিরা হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। মাওলানা আব্দুল করিম বললেন, বিধর্মীদের বিষয়ে সাবধান। তারা সাক্ষাৎ শয়তানের অংশ। শয়তানকে যেমন বিনষ্ট করা প্রয়োজন তাদেরও বিনষ্ট করা প্রয়োজন। কাফেরের বিষয়ে এছলাম ধর্ম কোনো ছাড় দেয় নাই। কাফের বিনষ্টে যে মুসলমান মৃত্যুবরণ করবেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে শহীদের দরজা পাবেন। তাদের স্থান হবে জান্নাতুল ফেরদৌসে। তাঁরা পরকালে নজিবী (দঃ)-র আশেপাশে থাকার পরম সৌভাগ্য লাভ করবেন। বলেন আল্লাহু আকবার।

মুসুল্লিরা আল্লাহ্ আকবর বললেন, তবে তাদের গলায় তেমন জোর পাওয়া গেল না।

মাওলানা আব্দুল করিম বললেন, যারা আমাদের ধর্মে থেকেও কাফেরদের মতো কাজ কারবার করেন, তারা অতি বড় কাফের এবং মোনাফেক। মোনাফেকদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তি। আমাদের মধ্যে যারা মোনাফেক তারা সাবধান হয়ে যান। মোনাফেককে কেউ সাহায্য করবেন না। সমাজ থেকে তাকে আলাদা করে রাখবেন। যেমন মাওলানা ইদরিস। তাকে যে চাল-ডাল টাকা-

পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন তিনি তাঁর নিজের বিপদ ডেকে আনবেন। সবাই বলেন আল্লাহু আকবর।

মাওলানা ইদরিস মহাবিপদে পড়লেন। তাঁর বেতন বন্ধ। গ্রাম থেকে খরচের চাল-ডাল আসা বন্ধ। এক রাতে ঘরে রান্না হলো না। মাওলানা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি সন্তুষ্ট যে আজ আমার ঘরে খানা নাই।

যমুনা বলল, আপনি সন্তুষ্ট কেন?

মাওলানা বললেন, আমাদের নবিজির জীবনে কতবার এরকম ঘটেছে। ঘরে নাই খানা। এটা আল্লাহপাকের এক পরীক্ষা। সবেরে আল্লাহপাক এই পরীক্ষায় ফেলেন না। শুধু তাঁর পেয়ারা বান্দাদের এই পরীক্ষার ভেতর যেতে হয়।

যমুনা বলল, আমার চারগাছি স্বর্ণের চুড়ি আছে। বাজারে নিয়া বিক্রি করেন। চাল ডাল কিনেন।

মাওলানা হতভম্ভ হয়ে বললেন, এইটা তুমি কী বললা?

যা বলেছি ঠিক বলেছি। একবেলা না খেয়ে থাকতে পারবেন, তারপরে কী হবে?

রহমানুর রহিম ব্যবস্থা নিবেন। দেখবা সকালের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

কীভাবে?

কীভাবে জানি না। তবে সমস্যার সমাধান যে হবে এটা জানি।

যমুনা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার মতো মানুষ যে দুনিয়াতে আছে এইটাই জানতাম না। আমি বড় কোনো পুণ্যের কাজ করেছি বলেই আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

মাওলানার সমস্যার সমাধান হলো পরদিন দুপুরের আগেই। বিচিত্র ভাবেই হলো। মাওলানা একশ এক টাকার একটা মনি অর্ডার পেলেন। টাকাটা পাঠিয়েছেন কোলকাতা থেকে ধনু শেখ। তিনি মনি অর্ডারের কুপনে লিখেছেন—

> মাওলানা ইদরিস,
>
> আসসালামু আলায়কুম। আমি যে মহাবিপদে পতিত হইয়াছি তাহার কোনো কূল কিনারা নাই। বিপদ হইতে উদ্ধারের কোনো আশা দেখিতেছি না। আমার পা যে কাটা গিয়াছে এই সংবাদ নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। কাটা পায়ে পচন

ধরিবার কারণে আধ হাত উপরে আবার কাটিতে হইয়াছে। সেই স্থানেও পচন ধরিয়াছে। ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিয়াছেন আবার পা কাটিবেন। যে মহাযন্ত্রণায় আছি তার কোনো সীমা নেই। সর্বক্ষণ মনে হয় আমার কাটা পা কড়াইয়ের জ্বলন্ত তেলে ফুটিতেছে।

মাওলানা, আপনি সুফি মানুষ। আপনি আমার জন্যে কোরান খতম করিবেন এবং আমার রোগমুক্তির জন্যে খাস দিলে দোয়া করিবেন। মৃত্যু হইলে আমি রক্ষা পাই। কিন্তু আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।

ইতি

ধনু শেখ (খান সাহেব)

পুনশ্চ : লোকমুখে শুনিতেছি আমাকে খান বাহাদুর টাইটেল দিবার জন্যে সুপারিশ গিয়াছে। এই বিষয়েও পৃথকভাবে দোয়া করিবেন। মিলাদের আয়োজন করিবেন।

শশাংক পালের শারীরিক অবস্থাও ভয়াবহ। পায়ে পানি এসে ফুলে ঢোল হয়েছে। একেকবার তিনি নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেন। বিড়বিড় করে বলেন, হাতির পা নাকি ? এ্যাঁ হাতির পা ?

উদ্ভট উদ্ভট সব চিকিৎসার ভেতর দিয়ে তিনি এখন যাচ্ছেন। ফোলা পায়ে মৌমাছি হুঁল ফোটালে আরাম হবে। তিনি মৌমাছির সন্ধানে লোক পাঠিয়েছেন। কাচের বোয়মে কয়েকটা মৌমাছি ধরে আনাও হয়েছে। তিনি বোয়ামের খোলা মুখ পায়ে অনেকবার চেপে ধরেছেন। কোনো মৌমাছি হুঁল ফুটায় নি। হতাশ হয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন— বদ মৌমাছি! এইগুলারে পানিতে চুবায়া মারো। বোয়ামে পানি ঢেলে মৌমাছি চুবিয়ে মারা হয়েছে, তাতে তাঁর পায়ের সমস্যার কোনো সমাধান হয় নি।

মুখ থেকে রুচি সম্পূর্ণ চলে গেছে। জাউ ভাত হজম হয় না। টক ঢেকুর উঠে। বুক জ্বালাপোড়া করে। এর মধ্যে খবর পেয়েছেন মুসলমান বাড়ির বেশি করে তেল মশলা দেয়া মাংস খেলে রুচি ফিরবে। সেই চেষ্টাও করা হয়েছে। তার ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ। ক্রমাগত দাস্ত হচ্ছে। সেবাযত্নের চূড়ান্ত করছে সুলেমান। দাস্ত পরিষ্কার করানো, গোসল করানো, পাখা দিয়ে বাতাস— সব একা করছে। এর মধ্যে সবচে' কষ্টকর কাজ হলো বাতাস করা। কোনো এক

বিচিত্র কারণে শশাংক পালের গায়ে সারাক্ষণ মাছি বসে। মাছি তাড়ানোর জন্যেই বাতাসের আয়োজন। সুলেমান শশাংক পালকে মশারির ভেতর রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। শশাংক পাল রাজি হন নি। তাঁর নাকি দমবন্ধ লাগে। সুলেমান ক্লান্তিহীন বাতাস করে যায়, শশাংক পাল ক্লান্তিহীন কথা বলতে থাকেন। রোগের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বেশি কথা বলার সমস্যা শুরু হয়েছে। তাঁর সব কথাই রোগব্যাধি নিয়ে।

সুলেমান!

জি কর্তা ?

আমার মরণ তাহলে ঘনায়ে আসছে। কী বলো ?

সেই রকমই মনে হয়।

গঙ্গাতে পা ডুবায়ে মরতে পারলে ভালো হইত। মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্গ। তোমাদের ধর্মে এই রকম কিছু আছে ?

না। তবে তওবা করলে কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। তওবা করলে সব গুনা মাফ হয়ে যায়। এই জন্যেই আমাদের ধর্মে মৃত্যুর আগে আগে সবেই তওবা করে।

তোমাদের ব্যবস্থাও তো খারাপ না। শরীরে রোগ নিয়া গলায় পা ডুবায়া শুয়ে থাকার চেয়ে বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে তওবা কর।

কথা ঠিক।

তবে সুলেমান, আমি কিন্তু আরো কিছুদিন আছি। কীভাবে বুঝলাম শুনতে চাও ?

চাই।

মৃত্যুর আগে কিছুদিনের জন্যে মুখে রুচি ফিরে আসা। রোগী তৃপ্তি নিয়ে খাওয়া খাদ্য করে। আমার রুচি এখনো ফিরে নাই। কাজেই আছি আরো কিছুদিন।

ভালো বলেছেন কর্তা।

তোমার পুত্র যে নিরুদ্দেশ হয়েছে তার কোনো সন্ধান পেয়েছ ?

না।

মনে হয় না সন্ধান পাবা। অল্পবয়সে যারা গৃহত্যাগী হয় তারা আর ফিরে না। মধ্যবয়সে যারা ঘর ছাড়ে তারা কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে। কী জন্যে জানো ?

জি-না।

মধ্যবয়সে ভোগের জন্যে মায়া জন্মে। বুঝেছ এখন ?

জি।

তোমার ছেলের নামটা যেন কী ?

জহির।

সে ফিরে আসলে তার জন্যে সুসংবাদ ছিল। কিন্তু সে ফিরবে না, এটা একটা আফসোস।

অবশ্যই আফসোস।

দুটা নীল রঙের মাছি শশাংক পালের মুখের উপর ভোঁ ভোঁ করছে। বাতাসের ঝাপ্টায় তাদের কিছু হচ্ছে না। শশাংক পাল হতাশ চোখে মাছি দু'টার দিকে তাকিয়ে আছেন।

লাবুসের মা চরম হতাশা এবং বিরক্তি নিয়ে রান্নাঘরে বসে আছেন। কে একজন বিশাল আকারের এক বোয়াল মাছ দিয়ে গেছে। মাছ খাওয়ার মানুষ নেই— শূন্য বাড়ি। উকিল মুনসি গিয়েছেন নেত্রকোনার কেন্দুয়া। তাঁর শিষ্য জালাল খাঁর বাড়িতে। শিষ্য গুরুকে অতি আদরে নিয়ে গেছেন। গানবাজনার ফাঁকে গূঢ় তথ্য নিয়ে গোপনে আলাপ হবে। আলাপের বিষয় 'হাবলঙ্গে'র বাজার। সাধক বাউলরা 'হাবলঙ্গের বাজার' কথাটা মাঝে মাঝেই তাদের গানে ব্যবহার করেন। শ্রোতারা আর দশটা বাজারের মতোই হাবলঙ্গের বাজারকে দেখে। এর গূঢ় অর্থ জানে না। গূঢ় অর্থ সাধকরা জানেন। তাঁরা প্রকাশ করেন না। বাতেনি বিষয় সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে নেই। জালাল খাঁ বিশেষ একটা গানের অর্থ নিয়ে অস্থিরতার মধ্যে আছেন। তিনি একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যা সঠিক কি-না ধরতে পারছেন না। গুরুর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। গানটা হলো—

'হাবলঙ্গের বাজারে গিয়া
এক টেকা জমা দিয়া
আনিও কন্যা কিনিয়া মনে যদি লয়'

হাবলঙ্গের বাজার যদি হয় শেষ বিচারের হাশরের মাঠ তাহলে সেখানে এক টাকা জমা দিয়ে কন্যা কেনার অর্থ কী ? 'কন্যা' মানে কি পুণ্য ? পুণ্য তো হাশরের মাঠে কেনা যাবে না। পাপ পুণ্যের বাজার তার আগেই শেষ।

লাবুসের মা কাঁচা টাকার মতো ঝকঝকে জীবন্ত বোয়াল মাছ থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না। মাছটা দেখলে যে দু'জন সবচে' খুশি হতো সে দু'জন নেই। একজন ফিরে আসবে, অন্যজন মনে হয় না ফিরবে।

মা!

লাবুসের মা চমকে পেছনে তাকালেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে। কারণ তাঁর ঠিক পেছনে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে লাবুস দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখভর্তি ফিনফিনে দাড়ি গোঁফ। চুল লম্বা হয়েছে। তার গায়ে হলুদ রঙের চাদর। চাদরটা পরিষ্কার। লাবুসের মুখ হাসি হাসি।

লাবুস বলল, বাঁটিতে সরিষার তেল দাও মা, সিনান করব। ঘরে সাবান আছে ?

লাবুসের মা'র হতভম্ব ভাব কাটছে না। কত স্বাভাবিকভাবেই না এই ছেলে কথা বলছে। যেন সে কখনো বাড়ি ছেড়ে পালায় নি। আজ সকালে কাজে গিয়েছিল, দুপুরে খেতে এসেছে।

লাবুসের মা প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। ছেলে যেমন আচরণ করছে তিনিও সে রকমই করবেন। তিনিও ভাব করলেন যেন এই ছেলে ঘরেই ছিল। কখনো পালিয়ে যায় নি। লাবুসের মা স্বাভাবিক গলায় বললেন, উঠানে জলচৌকির উপর বোস। আমি গোসল দিব। গামছা সাবান নিয়ে যা। গরম পানি লাগবে ?

না। মা, বোয়ালটায় বেশি করে কাঁচামরিচ দিও। তরকারিতে কাঁচামরিচের গন্ধ এত ভালো লাগে। কাগজি লেবুর গাছটা কি আছে মা ?

আছে।

তরকারিতে লেবুর কয়েকটা পাতা দিয়ে দিও, আলাদা ঘ্রাণ হবে।

আর কিছু ?

ধনিয়া পাতা দিও।

লাবুসের মা ফোড়ল দিয়ে ছেলের গায়ে সাবান ডলছেন। ছেলে চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো বসে আছে। লাবুসের মা'র মনে হচ্ছে, রোদে বৃষ্টিতে ছেলের গায়ের রঙের কোনো সমস্যা হয় নি। রঙ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

মনে করে দাড়ি কামাবি।

আচ্ছা।

এতদিন পরে কী মনে করে ফিরলি ?

স্বপ্ন দেখে মন অস্থির হয়েছে, এইজন্যে ফিরেছি।

কী স্বপ্ন দেখলি ?

হরিকাকাকে দেখলাম। উনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, এক্ষণ বাড়ি যা। এক্ষণ বাড়ি না গেলে মায়ের দেখা পাবি না। আমি ভেবেছিলাম দেখব তুমি মৃত্যুশয্যায়।

লাবুসের মা বললেন, দেখলি তো আমি ভালোই আছি। এখন কী করবি, আবার চলে যাবি ?

লাবুস শব্দ করে হাসল, যেন তার মা মজাদার কোনো কথা বলেছেন।

লাবুসের মা সেই দিন সন্ধ্যায় লাবুসের কোলে মাথা রেখে হঠাৎ করেই সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন।

ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। লক্ষণ ভালো না। খনা বলেছেন— 'যদি বর্ষে আগনে, রাজা যান মাগনে।' এখন অঘ্রাণ মাস। বৃষ্টির কারণে ধুম করে শীত নেমে গেছে। মাওলানার বাড়ির উঠানে বৃষ্টির পানি। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টি ধরে এসেছিল, এখন আবার জোরে নেমেছে। পানি বরফের মতো বিঁধছে। শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে।

বৃষ্টি মাথায় করে এক লোক মাওলানার উঠানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পায়ে গামবুট। মাথায় ছাতা। ছাতায় বৃষ্টি মানছে না। লোক গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, মাওলানা সাহেব আছেন ?

কেউ জবাব দিল না। তবে ঘরে মানুষ আছে বোঝা যাচ্ছে। দুটা কামরাতেই বাতি জ্বলছে। লোক বারান্দা থেকে উঠানে উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন।

মাওলানা সাহেব আছেন ?

দরজা সামান্য ফাঁক করে যমুনা উত্তর দিল, উনি বাড়িতে নাই।

তোমার নাম যমুনা ?

যমুনা ভীত ভঙ্গিতে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। লোক বললেন, আমি তোমাকে চিনি। তোমার কথা শুনেছি। মাওলানা সাহেব আমার পরিচিত। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও। তোমার ভয়ের কিছু নাই।

যমুনা বলল, আপনার পরিচয় ?

পরিচয় জানতে চাও, না নাম জানতে চাও ? একেক সময় একেক নাম নিয়ে চলাফেরা করি। তোমাকে মূল নামটাই বলি। আমার নাম জীবনলাল। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। আমাকে কি চিনেছ ?

চিনেছি। আপনি ভিতরে আসেন।

আমাকে গা মোছার গামছা দাও। শুকনা কাপড় দাও। যে ঠাণ্ডা লেগেছে ঠাণ্ডায় মারা যাব। আমার সঙ্গে চা পাতা আছে। চা বানাতে পার ?

না।

জটিল রান্না না। গরম পানিতে পাতা ছেড়ে দেবে। পানিতে যখন রঙ ধরবে তখন ছেঁকে দিবে। চিনি দুধ থাকলে দিতে পার। না থাকলেও ক্ষতি নাই।

যমুনা অতি দ্রুত ব্যবস্থা করল। মাওলানার লম্বা পিরান এবং পায়জামা পরে জীবনলাল চৌকিতে বসে রইলেন। তাঁর সামনে মাটির মালশায় কাঠকয়লার আগুন। জীবনলাল আগুনে পা সেঁকছেন। তাঁর হাতে গ্লাসভর্তি চা। শেষ মুহূর্তে তিনি চায়ে আদা দিতে বলেছেন। আদার সুঘ্রাণ আসছে।

জীবনলাল বললেন, অতি আরামদায়ক অবস্থা। কিন্তু মাওলানা কোথায়?

যমুনা বলল, উনি তাঁর স্ত্রীকে স্নান করাতে নিয়ে গেছেন।

বিবাহ করেছেন না-কি?

না। উনার মাথায় সামান্য দোষ হয়েছে। উনার ধারণা বিবাহ করেছেন। তাঁর স্ত্রী আছে। স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেন। মাঝে মাঝে রাতে স্ত্রীকে স্নান করাতে নদীতে নিয়ে যান।

আজও নদীতে নিয়ে গেছেন?

হুঁ।

অনেক রকম পাগলের কথা শুনেছি, এরকম শুনি নাই।

যমুনা বলল, বড়ই দুঃখী মানুষ। অনেকরাত পর্যন্ত জেগে থাকেন, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন।

জীবনলাল বললেন, উল্টাও হতে পারে। হয়তো উনি আনন্দে আছেন। কল্পনার স্ত্রী বাস্তবের চেয়ে ভালো হবার কথা।

যমুনা বলল, আপনি কি রাতে এখানে থাকবেন?

না।

খাবেন না?

না। রাতে শশাংক পালের বাড়িতে খাব। এবং রাতেই চলে যাব। যমুনা তুমি বলো— আমাকে দেখতে কি একজন মাওলানার মতো লাগছে?

যমুনা বলল, লাগছে। আপনার দাড়ি আছে, মাওলানার পোশাক পরেছেন।

ঘরে কি সুরমা আছে? সুরমা থাকলে চোখে সুরমা দেব।

সুরমা আছে। আতরও আছে।

যমুনা সুরমা এবং আতর এনে দিল। জীবনলাল বললেন, আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার স্ত্রী হিসেবে তুমি বোরকা পরে যাবে। কোথায় যাবে সেটা বলব না।

যমুনা বলল, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আমি কেন যাব ? পরিষ্কার করে বলেন।

জীবনলাল হাই তুলতে তুলতে বললেন, পরিষ্কার করে বলতে পারব না। আমি সুরেনের একটা পত্র নিয়ে এসেছি। পত্র পড়লেই বুঝতে পারবে। তুমি যদি রাজি থাক, আমি ভোর রাতে রওনা হব।

যমুনা হতভম্ব গলায় বলল, কার চিঠি এনেছেন ?

জীবনলাল বললেন, সুরেনের। সুরেনকে চেনো না ? এই নাও চিঠি। অন্য ঘরে নিয়ে পড়। আমার সামনে পড়তে হবে না। চিঠি শেষ করে আমাকে আরেক গ্লাস চা দিও।

যমুনা সুরেনের চিঠি নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেছে। তার হাত-পা কাঁপছে। বুক ধড়ফড় করছে। মনে হচ্ছে, সে যে-কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। চিঠিটা পড়তে পারবে না। জগতে এত বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে!

সুরেন লিখেছে—

যমুনা,

তুমি জানো না আমি বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছি। নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তবে তোমার সব খবর পেয়েছি। যে ভয়াবহ সময় তুমি পার করেছ তা সমস্তই জানি। তখন কিছুই করতে পারছিলাম না। যে মাওলানা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে আমার প্রণাম। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তাহলে আমি অবশ্যই ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করব।

তোমাকে সাধারণ নিয়মে বিবাহ করার অনুমতি আমি আমার পিতা-মাতা এবং জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কাছ থেকে পাব না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ব্রাহ্মমতে তোমাকে বিয়ে করব। বিশ্বাস করো, অতীতে তোমার জীবনে কী ঘটেছে তা আমার মাথায় নাই। কোনোদিন থাকবেও না। বিয়ের পর আমরা দুইজনেই দেশমাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গ করব। তুমি জীবনলালের সঙ্গে চলে আসবে। বন্দে মাতরম।

সুরেন

একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি মানুষ কতবার পড়ে ? বেশ কয়েকবার। যমুনা একবারই মাত্র চিঠিটা পড়ল এবং চিঠি মুঠিবদ্ধ করে বৃষ্টির মধ্যে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল। তার শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড জ্বর আসছে। কোনোকিছুই সে স্পষ্ট দেখতে পারছে না।

হরিচরণের কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে যমুনা বসে আছে। মনে মনে বলছে, হরিকাকু, আমার জীবন যে এরকম হবে আমি জানতাম। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সুরেনের চিঠি আপনাকে দেখানোর জন্যে আমি নিয়ে এসেছি। যমুনা কবরের দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে হাঁটু গেড়ে আছে। তার মাথার দীর্ঘচুল মাটিতে লুটাচ্ছে। তার শরীরে অঝোর ধারায় বৃষ্টির পানি পড়ছে। সে ঠিক করেছে, ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত সে এইভাবেই থাকবে। একচুলও নড়বে না।

মাওলানা ঘরে ফিরেছেন। জীবনলালের সঙ্গে আগ্রহের সঙ্গে গল্প করছেন। জীবনলাল বললেন, যমুনা মেয়েটা হঠাৎ করে কোথায় চলে গেল ? ডেকেও পাচ্ছি না। তার কাছে আরেক গ্লাস চা চেয়েছিলাম।

মাওলানা বললেন, সে তার ভাবির সঙ্গে গল্প করতেছে। মেয়েদের নিজেদের অনেক কথা থাকে।

আপনি আপনার স্ত্রীকে নদীতে স্নান করিয়ে এনেছেন ?

জি জনাব। হঠাৎ শখ করেছে নদীতে স্নান করবে। মেয়েদের ছোটখাটো শখ মেটানো উচিত। এতে নবিয়ে করিম (দঃ) খুশি হন।

ভাই, কিছু মনে করবেন না। আপনার তো খুব ভালো চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

মাওলানা বললেন, আমার চিকিৎসা হওয়ার প্রয়োজন নাই জনাব। আমার শরীর ভালো আছে। শশাংক বাবুর চিকিৎসা দরকার, উনি বিরাট কষ্টে আছেন।

সবাইকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

মাওলানা বললেন, আপনার কথায় সামান্য ভুল আছে। এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা কোনো পাপ করেন নাই। কিন্তু কঠিন কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহপাকের অনেক ইচ্ছাই বুঝা মুশকিল। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অতি সীমিত। একটু বসেন, আপনার ভাবি সাহেব আমাকে ডাকে।

আমি কিন্তু কোনো ডাক শুনি নাই।

চুড়ির শব্দ করে ডেকেছে। মুখে কিছু বলে নাই। মেয়েদের গলার স্বর পরপুরুষের শোনা নিষেধ বলেই কথা বলে নাই।

জীবনলাল বললেন, বৌদি কী বলেন, শুনে আসুন।

মাওলানা চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হলেন। হাসিমুখে বললেন, আপনার ভাবি সাহেব আপনাকে খানা খেতে বলেছেন। আয়োজন সামান্য। আলুভর্তা। ডিমের সালুন। বেগুন দিয়ে ডিমের সালুন সে ভালো রান্না করে।

জীবনলাল বললেন, বৌদির রান্না আমি আরেকদিন এসে খেয়ে যাব। আমাকে এখন শশাংক পালের বাড়িতে যেতে হবে। উনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। খাওয়া-দাওয়া উনার ওখানেই করব।

আপনার ভাবি সাব মনে কষ্ট পাবেন।

আপনি বুঝিয়ে বলবেন। ভালো কথা, আমি আপনার জন্যে একটা উপহার এনেছি।

কী উপহার ?

আপনাকে বলেছিলাম, ভাই গিরিশের বাংলা কোরান শরীফ আপনাকে দেব। নিয়ে এসেছি।

আলহামদুলিল্লাহ। কী বলেন! আপনার মনে ছিল ? আমি নিজে ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি ভুলি নাই। ভাই আমি উঠি। আপনি যমুনা মেয়েটিকে খুঁজে বের করুন। সকালে সে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে। তার অতি নিকট একজন তাকে গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মমতে তারা বিবাহ করবে।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

শশাংক পালকে দেখে জীবনলাল সত্যিকার অর্থেই দুঃখিত হলেন। জড় পদার্থের মতো একজন মানুষ। সমস্ত শরীরে পানি এসেছে। চোখ ঘোলাটে। কথাবার্তা সম্পূর্ণ এলোমেলো। ক্ষণে ক্ষণে মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। জীবনলাল বললেন, আমাকে চিনেছেন ?

শশাংক পাল বললেন, কেন চিনব না ? আপনি বিশিষ্ট চিকিৎসক। আমার চিকিৎসার জন্যে এসেছেন। ঠিকমতো চিকিৎসা করেন। পয়গাম পাবেন সোনার মোহর।

আমার নাম জীবনলাল। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়।

নামে কিছু যায় আসে না। আপনার পরিচয় আপনার চিকিৎসায়। বৃক্ষকে জিজ্ঞাস করা হলো, বৃক্ষ তোমার নাম কী ? বৃক্ষ বলল, ফলেন পরিচয়তে। অর্থাৎ ফলে পরিচয়। আপনার বেলাতেও তাই— আপনার পরিচয় চিকিৎসায়। চিকিৎসা কখন শুরু করবেন ?

আগে রোগ নির্ণয় করি, তারপর চিকিৎসা।

অতি সত্য কথা। তবে রোগ নির্ণয়ের কিছু নাই। আমার রোগের নাম মৃত্যুরোগ। মৃত্যুরোগের চিকিৎসা নাই এইটাও জানি। শুধু ব্যবস্থা করে দেন একবেলা যেন আরাম করে খেতে পারি। জামাইপছন্দ চালের পোলাও, ঝাল দিয়ে রান্না কচ্ছপের ডিম, মুরগি মোসাল্লাম। ভরপেট খাব। তারপর তেঁতুলের টক খাব জামবাটিতে এক বাটি। তেঁতুলের টকে জিরাবাটা দিতে হবে। সামান্য গোলমরিচ। গৌরীপুরের মহারাজার বাড়িতে একবার খেয়েছিলাম। স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

জীবনলাল বললেন, আপনার কি ধনু শেখের কথা মনে আছে ?

শশাংক পাল বললেন, কেন মনে থাকবে না! উনি বিশিষ্ট ব্যক্তি— খান সাহেব।

এখন আরো বিশিষ্ট হয়েছেন। এখন তিনি খান বাহাদুর। বলুন মারহাবা।

শশাংক পাল বললেন, মারহাবা।

উনার পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়েছিল। গ্যাংগ্রিন আরাম হয়েছে। এখন তিনি ঠ্যাং কাটা খান বাহাদুর।

শশাংক পাল আনন্দিত গলায় বললেন, আপনি উনার চিকিৎসা করেছেন ? আপনি তো মহাশয় ব্যক্তি। আমার চিকিৎসা শুরু করেন। আমার ধারণা আমার উদরি রোগ হয়েছে। যে চিকিৎসক খান সাহেব ধনু শেখকে আরোগ্য করেছে সে আমাকেও পারবে।

জীবনলাল বললেন, যত কঠিন রোগই আপনার হোক আপনাকে কিন্তু কাবু করতে পারে নাই। অন্যের জায়গা জমি দখল করে আরামে বাস করছেন। এই বিষয়সম্পত্তির মালিক কে বলুন তো দেখি ?

শশাংক পাল বললেন, মালিক কেউ না। মানুষ সামান্য দিন ভোগ করতে আসে। কেউ ভোগ করতে পারে কেউ পারে না। যার জমি তারই থাকে।

কথা মন্দ বলেন নাই। জীবনের শেষ পর্যায়ে সবাই ভালো ভালো কথা বলে।

শশাংক পাল বললেন, ভালো ভালো কথা বলে না। সাধারণ কথাই বলে। অন্যদের শুনতে ভালো লাগে।

জীবনলাল বললেন, আপনি কিন্তু আমাকে ঠিকই চিনেছেন। চিনেও না চেনার ভান করেছেন। মৃত্যুর কাছাকাছি সময়েও আপনার বুদ্ধি ঠিক আছে। সচরাচর এরকম দেখা যায় না। এখন বলুন আমাকে চিনেছেন না ?

হুঁ। আপনার বন্ধু শশী মাস্টার। তার কি ফাঁসি হয়েছে ?

হয়েছে।

শশাংক পাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মানুষটা ভালো ছিল। নিজের মনে গান করত, নিশি রাতে কলের গান বাজাত। জীবনের আনন্দ কিছুই দেখল না। ফাঁসিতে ঝুলে পড়ল। ভালো কথা, আপনি কি আমাকে শাস্তি দিতে এসেছেন ?

জীবনলাল বললেন, যে শাস্তি আপনি পাচ্ছেন তাই যথেষ্ট।

শশাংক পাল বলল, শুনে আরাম পেয়েছি। আপনাকে দেখে কলিজা নড়ে গিয়েছিল। ভাবলাম ধনু শেখ যেমন গুলি খেয়েছে, আমিও খাব।

জীবনলাল বললেন, আমার ক্ষুধা পেয়েছে। খাবারের আয়োজন করেন।

অবশ্যই। অবশ্যই খাওয়ার আয়োজন করব। সপ্ত ব্যঞ্জন থাকবে। নিজে খেতে পারি না তাতে কী। অন্যের খাওয়া আগ্রহ করে দেখি। কী খেতে চান বলেন ? কচ্ছপের ডিম খাবেন ? সংগ্রহ করে রেখেছি।

নিরামিষ খাব।

বিধবার খাবার খেয়ে কী করবেন ? এখনো হজমের ক্ষমতা যখন আছে— আরাম করে খান। যখন হজমের ক্ষমতা চলে যাবে তখন ঘাস লতাপাতা খাবেন।

জীবনলাল খেতে বসেছেন। আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন শশাংক পাল। যেন অতি আনন্দময় দৃশ্য দেখছেন। শশাংক পাল বললেন, খবরাখবর কিছু বলেন, আপনার কাছ থেকে শুনি। গান্ধিজি না-কি ডিগবাজি খেয়েছেন ?

জীবনলাল বললেন, ডিগবাজি খেয়েছেন কি-না জানি না, তবে অহিংস আন্দোলন থেকে উনার মন উঠে গেছে।

এটা ভালো না খারাপ ?

সময় বলবে ভালো না খারাপ।

আরেকটা যুদ্ধ নাকি হবে ?

হতে পারে। মানুষ যুদ্ধ পছন্দ করে। মুখে বলে শান্তি শান্তি। পছন্দ করে যুদ্ধ। তবে আনন্দের কথা, হিটলার সাহেব রাশিয়ার স্তালিনের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। এরা কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনো দিন যুদ্ধ করবে না।

বাহ্ ভালো তো।

দুই পররাষ্ট্র সচিব চুক্তিতে দস্তখত করেছেন। জার্মানির পক্ষে রিবেনট্রোপ, রাশিয়ার পক্ষে মলোটভ। চুক্তি সইয়ের দশদিনের মধ্যে দুই দেশ পোলান্ড আক্রমণ করে পোলান্ড ভাগাভাগি করে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগল বলে।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আমরা কার পক্ষে থাকব ?

আমরা থাকব জাপানের সম্রাট হিরোহিতের পক্ষে। নেতাজির তাই ইচ্ছা। এশিয়ানরা থাকব এশিয়ানদের সঙ্গে।

শশাংক পাল বললেন, অবশ্যই। শরীরটা সুস্থ থাকলে আমি যুদ্ধে চলে যেতাম। সবই দেখা হয়েছে, যুদ্ধ দেখা হয় নাই। যুদ্ধ দেখার মধ্যেও মজা আছে। কী বলেন ?

জীবনলাল হেসে ফেললেন।

শশাংক পাল বললেন, খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন ?

পেয়েছি।

ধূমপান করবেন ? ভালো তামাক আছে। মেশক-এ-আম্বুরী।

জীবনলাল বললেন, ধূমপান করব না। আপনার আতিথেয়তায় আনন্দ পেয়েছি। আমি আপনাকে বিশেষ এক চিকিৎসার কথা বলতে পারি। চিকিৎসাটা করে দেখতে পারেন। রেইন ফরেস্টের পিগমী জাতীয় মানব গোষ্ঠীর কেউ কেউ জীবনের শেষ চিকিৎসা হিসেবে এই চিকিৎসা করেন।

শশাংক পাল আগ্রহ নিয়ে বললেন, চিকিৎসাটা কী বলুন। যত অর্থ ব্যয় হয় হবে। চিকিৎসা করব। টাকা এখন আমার কাছে তেজপাতা।

জীবনলাল বললেন, এই চিকিৎসায় কোনো খরচ নাই। আপনাকে একটা স্বাস্থ্যবান গাছ খুঁজে বের করতে হবে। তারপর নগ্ন অবস্থায় এই গাছ জড়িয়ে ধরতে হবে। বারবার বলতে হবে— হে বৃক্ষ, তুমি আমার রোগ গ্রহণ করে আমাকে রোগমুক্ত কর।

কতবার বলতে হবে?

এর কোনো হিসাব নাই। দিনের পর দিন বলতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যেও গাছের স্পর্শ থেকে দূরে থাকা যাবে না। কোনো খাদ্য খাওয়া যাবে না। পারবেন?

পারব। নগ্ন হওয়া লজ্জার বিষয়। মরতে বসেছি, এখন আর লজ্জা কী? আসছি নেংটা, যামু নেংটা। আপনি এখনি শুয়ে পড়বেন? আসুন আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি। রাতে আমার ঘুম হয় না। আগে মদ্যপান করে ঘুমাতাম, এখন মদ্যপানও করতে পারি না। আফসোস।

জীবনলাল বললেন, আমি রাতে থাকব না, চলে যাব। মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। জহির নামে কেউ যদি আসে তাকে বিষয়সম্পত্তি সব বুঝিয়ে দেবেন।

শশাংক পাল বললেন, অবশ্যই। অবশ্যই। মা কালীর চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলাম।

আমি কিন্তু আবার আসব।

যতবার ইচ্ছা আসেন। কোনো সমস্যা নেই। শশাংক পাল সারাজীবন এক কথা বলে।

হরিচরণের কবরের পাশে সকাল থেকেই জবুথবু হয়ে এক লোক বসে আছে। তার পা নগ্ন, চোখ রক্তাভ। মাথার চুল উসকু খুসকু। তার গায়ে হলুদ রঙের চাদর। চাদরের প্রায় সবটাই মাটিতে। কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে আছে।

মসজিদের নতুন মাওলানা দৃশ্যটা লক্ষ করছেন। তিনি একসময় এগিয়ে এলেন। কঠিন গলায় বললেন, তুই কে?

চোখ তুলে তাকাল। জবাব দিল না।

বোবা কালা না-কি? তোর নাম কী?

লাবুস।

তোর নাম লাবুস ? হিন্দু ?

মুসলমান।

দেখি চার কলেমা বল। শুনে দেখি মুসলমান কি-না। খৎনা হয়েছে ?

লাবুস বলল, তুই কে ?

মাওলানা করিম হতভম্ব। বদমাইশ তুই তুই করছে। এত বড় বেয়াদবি এর আগে তার সঙ্গে কেউ করে নাই। মাওলানা করিম বললেন, এখানে বসে আছিস কী জন্যে ?

আমার ইচ্ছা।

আমি জুম্মাঘরের ইমাম। আমার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বল।

তুই আগে আমার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বল। আদবের সঙ্গে কথা বল।

মাওলানা করিম বললেন, তুই তো বিরাট বেয়াদব। তোকে আগে কখনো দেখি নাই। তুই কোন গ্রামের ?

লাবুস বলল, আরেকবার আমারে তুই করে বললে টান দিয়ে তোর লুঙ্গি খুলে ফেলব।

কী বললি ?

কী বলেছি তুই শুনেছিস। আমি বলেছি আরেকবার আমাকে তুই বললে আমি টান দিয়ে তোর লুঙ্গি খুলব। তারপরেও তুই করে বলেছিস। এখন লুঙ্গি খোলার টাইম।

লাবুস উঠে দাঁড়াল। গায়ের চাদর খুলে পাশে রাখল। মাওলানা করিম আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। বোঝাই যাচ্ছে এই লোক পাগল। পাগলকে বিশ্বাস নাই। মাওলানা করিম উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন না। পেছনে তাকালে দেখতেন তাকে কেউ অনুসরণ করছে না। লাবুস আগের জায়গাতেই বসে আছে। মাটিতে ফেলে দেয়া চাদর এখন তার গায়ে।

মাওলানা করিম সোহাগগঞ্জ বাজারের কাছাকাছি এসে থামলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। এখন তিনি লজ্জার মধ্যে পড়েছেন। অনেকেই তাকে দৌড়াতে দেখেছে। তাদের মধ্যে নানান প্রশ্ন জাগবে। কী উত্তর দেবেন ? তাঁর লুঙ্গি খুলে ফেলবে এই কথা তো বলা যাবে না। তাঁর এখন অনেক ইজ্জত। লোকজন তাঁকে মানে। খুৎবার সময় যে কঠিন

বক্তৃতা দেন তা শোনে। দোজখের বর্ণনা তাঁর মতো কেউ দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর সবচে' বড়গুণ দোজখের বর্ণনা দিতে দিতে ভয়ে অস্থির হয়ে কেঁদে ফেলা। নকল কান্না না। আসল কান্না। এই দৃশ্য বান্ধবপুরের কেউ আগে দেখে নি। তাঁর নাম ফাটছে। জুম্মাবারে দূর দূর থেকে লোকজন নামাজ পড়তে আসছে।

প্রথমবারের মতো তিনি উরসের আয়োজনও করছেন। উরস হবে মোহাম্মদ আহম্মদ সাহেবের (হরিচরণ) নামে। তিনি স্বপ্নে পেয়েছেন কবরে শায়িত এই ব্যক্তি অনেক বড় মর্যাদার আসন পেয়েছেন। উরসের তারিখ পড়েছে ২ ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার। উরস উপলক্ষ্যে বড় বড় আলেমরা আসবেন। বয়ান হবে। পাক কোরানের তফসির করা হবে। খানা চলবে সারাদিন। রাত বারোটা এক মিনিটে আখেরি মোনাজাত হবে। মোনাজাত তিনি নিজে পরিচালনা করবেন।

যে মাওলানা অতি অল্পসময়ে বান্ধবপুরে এমন মর্যাদার আসনে চলে গেছেন তিনি লুঙ্গি খুলে ফেলার ভয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন এটা ভেবে মাওলানার চোখে পানি আসার মতো হলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, পবিত্র উরসের দিনে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বদমায়েশটাকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যা সে বাকি জীবন মনে রাখবে।

হলুদ চাদর গায়ে অচেনা এক লোক হরিচরণের বাগানে ঘুরঘুর করছে। শশাংক পালের বিরক্তির সীমা রইল না। বাগানে বাইরের লোক যেন না ঢুকে এমন নিষেধ দেয়া আছে। তারপরেও হুট হাট করে লোকজন কীভাবে ঢুকে? শশাংক পাল লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। কঠিন গলায় বললেন, নাম কী?

লাবুস।

বাগানে ঘুরঘুর কর কেন? কী চাও? মতলব কী?

কিছু চাই না। আমার কোনো মতলব নাই।

শশাংক পাল বললেন, ফালতু কথা বলবা না। চেহারা দেখেই বোঝা যায় তুমি মতলব নিয়া আসছ। পিতার নাম কী?

সুলেমান।

শশাংক পাল কিছুক্ষণ পিটপিট করে লোকটির দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, তোমার আসল নাম কি জহির?

লোকটি বলল, একসময় নাম জহির ছিল। এখন লাবুস।

লাবুস নামই ভালো। সবেরে এই পরিচয় দিবা। জহির পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নাই। তা বাবা তুমি দেশান্তরী ছিলা, সেইটাই তো ভালো ছিল। আবার কেন এসেছ ?

একটা কাজ সমাধা করার জন্যে এসেছি। কাজ সমাধা করে চলে যাব।

ভালো, খুবই ভালো। যাতায়াতের খরচ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। কোনো অসুবিধা নাই। তা বাবা কী কাজ সমাধা করার জন্যে আসছ ? আপত্তি না থাকলে তুমি আমারে বলো।

আমি আমার মাকে খুন করতে আসছি। তার নাম জুলেখা।

শশাংক পাল বললেন, তাকে চিনি। ভালোমতো চিনি। তাকে খুন করার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক। আমি তার পুত্র হলে আমিও এই কাজ করতাম। সে বান্ধবপুরে নাই। কলিকাতায় থাকে। কলিকাতায় গিয়া খোঁজ নাও। রাহাখরচ আমি দিতেছি।

আপনি কেন দিবেন ?

খুশি হয়ে দেব। তোমার পিতার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই দাবিতে দিব। তাছাড়া আমার শরীর খারাপ। দুই একদিনের মধ্যে জংলি এক চিকিৎসা শুরু করব। মরি না বাঁচি নাই ঠিক। কিছু দান খয়রাত এই কারণে করতে মন চায়। তোমারে দুইশ' টাকা দেই।

এত টাকা!

আচ্ছা যাও, আরো বাড়ায়া দিলাম। আড়াইশ'। তুমি আজই রওনা দিয়ে দাও।

ফাল্গুন মাসের দুই তারিখ মহা ধুমধামে উরশ শুরু হয়েছে। লালসালুর কাপড় দিয়ে পুরো অঞ্চল ঘিরে দেয়া হয়েছে। শত শত আগরবাতি জ্বলছে। দূর থেকে আতরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মঞ্চ করা হয়েছে। মঞ্চে দু'জন মাওলানা বসে আছেন। তৃতীয় একজন মাওলানার আসার কথা, তিনি এখনো এসে পৌছান নি।

শিন্নি গ্রহণ করার আলাদা জায়গা করা হয়েছে। গরু শিন্নি দেয়া নিষেধ (হরিচরণ নাকি স্বপ্নে এরকম নির্দেশই দিয়েছেন) বলেই খাসি, মুরগি, হাঁস

আসছে। একজন একটা মহিষ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মহিষের বিষয়ে কী করা হবে সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। প্রচুর লোকজন জড়ো হয়েছে, আরো আসছে।

হরিচরণের বাড়ির সামনেও কিছু লোকজন জড়ো হয়েছে। কারণ শশাংক পাল অদ্ভুত চিকিৎসা শুরু করেছেন। তার ধারণা এই চিকিৎসায় ফল হবে।

শশাংক পাল নগ্ন হয়ে হরিচরণের বাড়ির সামনের শিউলি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে আছেন। তিনঘণ্টা পার হয়ে গেছে। দর্শনার্থীরা ব্যাপার-স্যাপার দেখে কিছুটা ভীত। সাহস করে কেউ কাছে আসছে না। শশাংক পাল সবাইকে ধমকাচ্ছেন— ভাগো। ভাগো। নেংটা মানুষ এর আগে কোনোদিন দেখো নাই? বদের দল।

মওলানা ইদরিসও দেখতে গেলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল। আহা বেচারা! তিনি ক্ষীণস্বরে বললেন, একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে হয় না?

শশাংক পাল ধমকে উঠলেন, ঢাকাঢাকি চলবে না, জংলি চিকিৎসার এইটাই দস্তুর।

মাওলানা বললেন, কিছু আরাম কি বোধ হচ্ছে?

শশাংক পাল বললেন, এখনো কিছু বুঝতে পারছি না। বিষ পিঁপড়ায় কামড়াচ্ছে, এর একটা উপকার থাকতেও পারে।

বৃষ্টি হলে কী করবেন?

ভিজতে হবে, কিছু করার নাই। বদ জংলিগুলা এই চিকিৎসা বের করেছে। থাপড়ায়া এদের দাঁত ফেলে দেয়া দরকার ছিল।

শশাংক পাল চোখ বন্ধ করলেন। কথা বলে নষ্ট করার সময় তার নেই। গাছের কাছে প্রার্থনায় যেতে হবে। হে বৃক্ষ! আমাকে রোগমুক্ত কর।

নগ্ন একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা লাগছে। মাওলানা অন্যদিকে তাকিয়ে বসে আছেন। মানুষটার জন্যে তার হঠাৎ করে বড় মায়া লাগছে।

সন্ধ্যার আগেই বৃষ্টি নামল। শশাংক পাল ভিজছেন। মাওলানাও ভিজছেন। শশাংক পাল মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, আপনার ঘটনা কী? আপনি কেন ভিজতেছেন? যান, বাড়িতে যান।

মাওলানা তারপরেও বসে রইলেন।

রাতের অন্ধকারে ঝুপঝুপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কে একজন মাওলানা ইদরিসের বাড়িতে ঢুকেছে। কালো বোরকায় তার শরীর ঢাকা। মুখ খোলা, তবে মুখ ছাতায় ঢাকা। মহিলা বাড়িতে উঠে বাতি জ্বালাল। উঠানে রাখা কলসির পানিতে পায়ের কাদা মুছতে মুছতে নিচু গলায় গাইল—

যমুনায় জল নাই গো
জল নাই যমুনায়
আইজ রাধা কোনবা গাঙে যায়।

মহিলা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে এসেছেন। তিনি পুঁটলি খুলে নতুন শাড়ি বের করলেন। শাড়ির রঙ কমলা। তিনি আয়নায় নিজেকে দেখে সামান্য হাসলেন। আর তখনি ছপছপ শব্দ তুলে উঠানে মাওলানা এসে দাঁড়ালেন। অভ্যাস মতো ডাকলেন, বউ!

বাড়ির ভেতর থেকে পরিষ্কার জবাব এলো, কী ?

মাওলানা চমকে উঠলেন। চমকে উঠার কোনো কারণ নেই। স্ত্রী ঘরে আছে, ডাকলে সে তো জবাব দেবেই। কিন্তু...

মাওলানা বললেন, বৌ একটা ঘটনা ঘটেছে।

'কী ঘটনা ?' বলে বাড়ির ভেতর থেকে জুলেখা বের হয়ে এলো। সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, ভেতরে আসেন, বলেন ঘটনা কী ? মন দিয়া শুনি।

মাওলানা অস্থির ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে। সমস্যাটা বুঝতে পারছেন না।

জুলেখা বলল, এইভাবে তাকায়া কী দেখেন ?

মাওলান বিড়বিড় করে বললেন, বউ, আমার মাথায় কী জানি হয়েছে।

জুলেখা বলল, আমি খবর পেয়েছি। এখন আমি আপনার সঙ্গে আছি। আপনার মাথা আমি ঠিক করে দিব। ইশ, কী ভিজাই না ভিজেছেন! গরম পানি করে দেই, সিনান করেন।

মাওলানা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

সময় সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ, ১৯৩৯, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জার্মানির বিরুদ্ধে। পৃথিবী অপেক্ষা করছে আর এক মহাযুদ্ধের জন্যে।

মানবজাতি অপেক্ষা পছন্দ করে না। তারপরেও তাকে সবসময় অপেক্ষা করতে হয়। ভালোবাসার জন্যে অপেক্ষা, ঘৃণার জন্যে অপেক্ষা, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা, আবার মুক্তির জন্যে অপেক্ষা।

শশাংক পাল যেমন গাছ জড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করেন, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফাঁসির দড়ির দিকে তাকিয়ে বিপ্লবীরাও অপেক্ষা করেন। অপেক্ষাই মানবজাতির নিয়তি।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

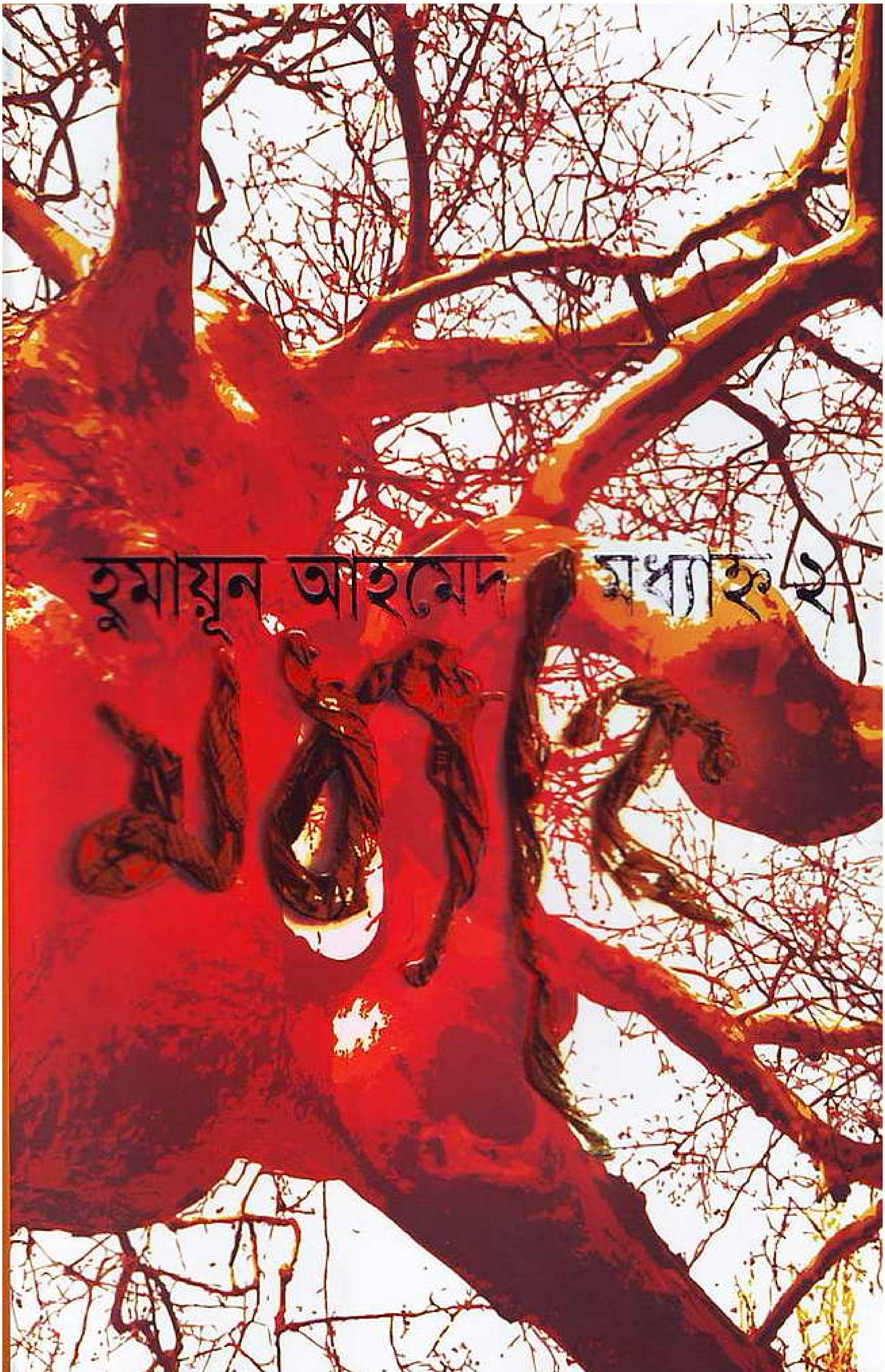
হুমায়ূন আহমেদ
মধ্যাহ্ন ২

মধ্যাহ্ন রচনায় যারা নানান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ইন্টারনেট নামক আধুনিক প্রযুক্তিকে। অনেক তথ্য সেখান থেকে পেয়েছি। তবে আমি ঐতিহাসিক না, একজন গল্পকার। আমার প্রথম ঝোঁক গল্প বলার দিকে। দ্বিতীয় ঝোঁকও গল্পে। ইতিহাস যেটুকু না আনলেই নয় ততটুকু এনেছি।

উপন্যাসের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখার অতি বিরক্তিকর কাজটি শাওন করেছে। তাকে ধন্যবাদ। পুত্র নিষাদ কয়েকবারই পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে আমাকে রাগানোর চেষ্টা করেছে। রাগ করতে পারি নি। তাকেও ধন্যবাদ লেখার সময় আশেপাশে থাকার জন্যে।

ধন্যবাদ পাঠকদের, যারা আগ্রহ নিয়ে মধ্যাহ্নের প্রথম খণ্ড পড়েছেন। তাদের আগ্রহের কারণেই দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে শুরু করেছিলাম।

হুমায়ূন আহমেদ
দখিন হাওয়া, ধানমণ্ডি

বোবায় ধরা নামের একটি জটিল ব্যাধি আমার আছে। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মনে হয় বিকট দর্শন জন্তুর মতো কয়েকটি অতিপ্রাকৃত প্রাণী আমার বুকে বসেছে। গলা চেপে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। আতংকে অস্থির হয়ে আমি চিৎকার করতে থাকি। তখন একটা কোমল স্পর্শ আমার কপালে পৌঁছে। গভীর মমতায় একজন বলে, 'এই তো আমি আছি।' আমার ঘুম ভাঙে, আমি স্বাভাবিক হই।

মমতাময়ী শাওনকে।

প্রকাশকের কথা

'দিন যায়, ক্ষণ যায়,/সময় কাহারো নয়,/বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির'— সময় সম্পর্কে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই বলেছেন কবিতায়। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, সময়ের একটি চিহ্ন রয়েছে; রূপ রয়েছে। এক-একটি যুগে, শতাব্দীতে সময়ের নানা চেহারা আমরা দেখতে পাই। যে শতাব্দীটি আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, সেই সময়ের সঙ্গে এই সময়ের কি ফারাক নেই? অবশ্যই রয়েছে। মানুষের যাপিত জীবন, চারপাশের প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতার মধ্যেই সময়ের ফারাকটি টের পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছিল ইংরেজ শাসিত অখণ্ড ভারতবর্ষ, হিন্দু-মুসলমানের তীব্র দ্বন্দ্ব, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের লড়াই। আবার এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, দেশভাগ— কত কিছুই না সংঘটিত হয়েছে! সেই সময়কে উপজীব্য করে এই সময়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তবে একটি কথা, বিশাল ক্যানভাসের এই উপন্যাসে সময়ের ছাপ পাওয়া গেলেও, ইতিহাসের রেখাপাত ঘটলেও, ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য ছিল— গল্প বলা; সেই সময়ের মানুষের কথা বলা।

'মধ্যাহ্ন'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য পাঠকের কাছ থেকে আমরা চিঠি ও ইমেইল পেয়েছি। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ও টেলিফোনে তাদের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড কবে প্রকাশিত হবে সে-বিষয়ে সবার গভীর আগ্রহ লক্ষ করেছি। 'মধ্যাহ্ন'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মাজহারুল ইসলাম

কলিকাতা সমাচার পত্রিকায় মৎস্যকন্যা বিষয়ে একটা খবর ছাপা হয়েছে। প্রথম পাতায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা সংবাদ। পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি অরুণাভ বিশ্বাস জানাচ্ছেন—

জীবিত মৎস্যকন্যা ধৃত

(অরুণাভ বিশ্বাস প্রেরিত)

> কালীগঞ্জে গঙ্গার মোহনায় একটি মৎস্যকন্যা জীবিত অবস্থায় ধীবরদের জালে ধৃত হয়। মৎস্যকন্যাকে এক নজর দেখিবার জন্যে শত শত লোক কালীগঞ্জে জমায়েত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে জানা যায়, মৎস্যকন্যার চুল সোনালি, চক্ষের রঙও সোনালি। গাত্রবর্ণ নীলাভ। ধৃত হইবার পর হইতেই সে ক্রমাগত তাহার বাম হস্ত নাড়িতেছিল এবং দুর্বোধ্য ভাষায় বিলাপের মতো ধ্বনি করিতেছিল। তাহার চোখ হইতে ঈষৎ বাদামি বর্ণের অশ্রু নির্গত হইতেছিল। ধৃত হইবার দুই ঘণ্টার মধ্যে অঞ্চলের কিছু বিশিষ্টজনের প্ররোচনায় তাহাকে হত্যা করা হয়। অসমর্থিত এক সংবাদে জানা যায় যে, মৎস্যকন্যার মাংস আহার করিলে চিরযৌবন লাভ হয় এই বিশ্বাসে মৎস্যকন্যাকে কাটিয়া তাহার মাংস অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। এই বিষয়ে পুলিশি মামলা হইয়াছে। পুলিশের উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি নিয়া পর্যালোচনা করা হইয়াছে এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই বর্বর কর্ম করিয়াছেন, তাহারা বর্তমানে পলাতক।

কলিকাতা সমাচার বান্ধবপুরে আসে না। সুলতান মিয়া নামে একলোক পত্রিকা নিয়ে উপস্থিত হলো। শুধু পত্রিকা না, সে মৎস্যকন্যার দুই পিস মাংসও

না-কি এনেছে, এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ল। সুলতান মিয়া নতুন লঞ্চ কোম্পানি লক্ষ্মী নেভিগেশনে বাবুর্চির কাজ করে। সোহাগগঞ্জ বাজারের হোটেলে মাঝেমধ্যে রাত কাটায়। তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ধূর্ত চোখ। হাত-পা সরু। হাঁটে কুঁজো হয়ে। তার থুতনিতে এক গোছা দাড়ির কারণে তাকে দেখায় আলাদিনের চল্লিশ চোরের এক চোরের মতো। লঞ্চ-স্টিমারের বাবুর্চিরা বিনয়ী হয়, সে উদ্ধত প্রকৃতির।

সুলতান মিয়া মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে এসেছে শুনে শশাংক পাল তাকে ডেকে পাঠালেন। একজীবনে তিনি নানান ধরনের মাংস খেয়েছেন। মৎস্যকন্যার মাংস খাওয়া হয় নি।

শশাংক পালের এখন শেষ সময়। সারা শরীর ফুলে উঠেছে। শরীরে সার্বক্ষণিক ব্যথা। সেই ব্যথা ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে। কালো পিঁপড়ায় কামড়ালে ব্যথা খানিকটা কমে। শশাংক পালের নিজের লোক সুলেমানের প্রধান কাজ হচ্ছে, কালো পিঁপড়া ধরে এনে শশাংক পালের গায়ে ছেড়ে দেয়া। পিঁপড়া ছাড়ার পর পর শশাংক পাল কাতর গলায় বলেন, কামড় দে বাবারা। কামড় দে। তোদের পায়ে ধরি। জমিদার শশাংক পাল তোদের পায়ে ধরছে। ঘটনা সহজ না। ঠিকমতো কামড় দে, পিরিচে মধু ঢেলে তোদের খেতে দিব। আরাম করে মধু খাবি।

পিঁপড়াদের খাবারের জন্যে পিরিচে সত্যি সত্যি মধু ঢেলে রাখা হয়। বিচিত্র কারণে পিঁপড়ারা মধু খাওয়ার কোনো আগ্রহ দেখায় না। শশাংক পাল নিজের গায়ে মধু মেখে দেখেছেন। পিঁপড়ারা তাঁর সারা শরীরে হাঁটে, মধু মাখা অংশের ধারেকাছে যায় না।

কালো পিঁপড়া কামড়ালে ব্যথা কমে, এই তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন গাছ-চিকিৎসা করতে গিয়ে। গাছ-চিকিৎসায় পুরুষ্টু কোনো একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকতে হয় এবং মনে মনে বলতে হয়— 'হে বৃক্ষ! তুমি আমার রোগ তোমার শরীরে ধারণ করে আমাকে রোগমুক্ত কর।' রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত গাছ জড়িয়ে থাকার নিয়ম। প্রবল বৃষ্টি এবং গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ার কারণে আট ঘণ্টার মধ্যেই শশাংক পাল বিশেষ এই চিকিৎসার ইতি ঘোষণা করেন। লাভের মধ্যে কালো পিঁপড়ায় কামড়ালে ব্যথা কমে এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

সুলতান মিয়া খবর পেয়ে শশাংক পালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে সরাসরি তাকাতে পারছে না, কারণ শশাংক পাল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পাটিতে শুয়ে আছেন। শীতলপাটির উপর কলাপাতা বিছানো। একজন নিমগাছের ডাল

দিয়ে তাকে বাতাস দিচ্ছে। নিমপাতার হাওয়া শরীরের জন্যে উপকারী। শশাংক পাল কিছুক্ষণ আগে বমি করেছেন। মুখ ধোয়া হয় নি। বেশ কিছু পুরুষ্টু নীল রঙের মাছি মুখের চারপাশে উড়াউড়ি করছে। নিমপাতার হাওয়ার কারণে মুখে বসতে পারছে না। তারা হতোদ্যম হয়ে চলেও যাচ্ছে না। রবার্ট ব্রুসের ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

শশাংক পাল বললেন, শরীরে কাপড় রাখতে পারি না। শরীর জ্বালা করে। এই জন্যে ন্যাংটা হয়ে আছি। বুঝেছ?

সুলতান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শশাংক পাল বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিদেশী মানুষ। তুমি কি আমাকে চেনো?

সুলতান মিয়া আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমার সম্বন্ধে কী জানো অল্পকথায় বলো। সারমর্ম বলবা, ইতিহাস শুরু করবা না। ইতিহাস শোনার সময় আমার নাই। জীবনের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি। এখন ঝটপট বলো, আমি কে?

আপনি জমিদার শশাংক পাল।

একসময় জমিদার ছিলাম। আমার রক্ষিতা ছিল চারজন। এখন আমি ফালতু। শশাংক পাল, বালস্য বাল। হা হা হা।

শশাংক পাল হেঁচকি না ওঠা পর্যন্ত হাসলেন। অতি কষ্টে বললেন, লোকমুখে শুনেছি তুমি না-কি মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে এসেছ?

সুলতান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশাংক পাল বললেন, মাথা নাড়ানাড়ি বন্ধ। হ্যাঁ বলবা কিংবা না বলবা। মৎস্যকন্যার মাংস এনেছ?

হ্যাঁ।

কতখানি এনেছ?

দুই পিস। এক পিস বিক্রি করে দিয়েছি। আরেক পিস আছে।

মৎস্যকন্যার মাংস খেলে চিরযৌবন লাভ হয়, এটা কি সত্য?

জানি না। লোকে বলে।

তুমি নিজে খেয়েছ?

না।

এক পিস মাংস যে বিক্রি করেছ, কার কাছে বিক্রি করেছ? তার নাম ঠিকানা বলো।

গোয়ালন্দে এক লোকের কাছে বিক্রি করেছি। কাপড়ের ব্যবসা করে। নাম জানি না।

কত টাকায় বিক্রি করেছ ?

কত টাকায় বিক্রি করেছি সেটা আপনারে বলব না।

কেন বলবা না ?

সুলতান মিয়া চুপ করে রইল। শশাংক পাল বললেন, আমার আগের দিন থাকলে বেয়াদবির জন্যে তোমাকে ন্যাংটা করে মাটিতে পুঁতে ফেলতাম। যাই হোক, এখন বলো মাংস কোথায় পেয়েছ ?

কালিগঞ্জ থেকে এনেছি। যেখানে মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে সেখান থেকে এনেছি।

তার অর্থ কি এই যে, তুমি নিজ চোখে মৎস্যকন্যা দেখেছ ?

হুঁ।

শশাংক পাল ধমক দিয়ে বললেন, হুঁ আবার কী ? আদবের সঙ্গে বলো— দেখেছ কি দেখ নাই।

দেখেছি।

আমরা ছবিতে যেরকম দেখি সেরকম ?

সুলতান মিয়া অস্পষ্ট গলায় বলল, সেরকমই, তবে মুখ ছোট।

গাত্রবর্ণ কী ?

নীল।

তার বুকের সাইজ কী ? বাঙালি মেয়েদের মতো, না-কি বুকও মুখের মতো ছোট ?

খিয়াল নাই।

খিয়াল নাই মানে ? বুক দেখো নাই ? লজ্জা পেয়েছিলা ? মৎস্যকন্যা উদাম গায়ে পানিতে ঘুরে। সে তো শাড়ি দিয়া শরীর ঢাকে না। তারে নগ্ন দেখাই স্বাভাবিক।

সুলতান মিয়া বলল, আমি যখন দেখেছি তখন উড়না দিয়া তার বুক ঢাকা ছিল।

উড়না দিয়া বুক ঢাকার প্রয়োজন পড়ল কেন ?

সুলতান মিয়া বলল, অনেক ছোট ছোট পুলাপান ছিল, এইজন্যে ঢাকা হয়েছিল। মাতব্বররা ঢাকতে বললেন।

শশাংক পাল বললেন, তুমি বিরাট মিথ্যুক, এইটা তুমি জানো ? তুমি কিছুই দেখ নাই। সব বানায়ে বলতেছ। তুমি আছ টাকা কামানোর ধান্দায়। দুই পিস মাংস কোনখান থেকে যোগাড় করে সেটা বিক্রির ধান্দায় আছ। যে মাংস তুমি এনেছ আমার মন বলতেছে সেটা কুকুরের মাংস। তুমি এক ধান্দাবাজ, আমি তোমার চেয়ে বড় ধান্দাবাজ।

সুলতান মিয়া বলল, আপনার সঙ্গে কথা পাল্টাপাল্টি করব না। অনুমতি দেন আমি যাই।

শশাংক পাল বললেন, অনুমতি দিলাম না। তুমি যে ধান্দাবাজ এটা স্বীকার করে তারপর বিদায় হও।

সুলতান মিয়া স্বাভাবিক গলায় হাই তুলতে তুলতে বলল, আচ্ছা স্বীকার করলাম। এখন বিদায় দেন। আপনার সঙ্গে আমি বাহাস করব না। আপনি যেটা বলেন সেটাই সত্য।

আমার সঙ্গে বাহাস করবা না কেন ?

আমি কারোর সাথেই বাহাস করি না। আমার কাছে এক টুকরা মাংস আছে। দশ হাজার টাকা দাম। আপনে ইচ্ছা করলে খরিদ করতে পারেন।

শশাংক পাল বিস্মিত গলায় বললেন, দশ হাজার টাকা দাম ? তুই কস কী ? দশ হাজার টাকায় একজোড়া জীবন্ত মৎস্যকন্যা পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে যৌনকর্ম করা যায়।

সুলতান নির্বিকার গলায় বলল, পাওয়া গেলে খরিদ করেন। যৌনকর্ম করতে চাইলে করেন। আপনার বড় পুসকুনি আছে। পুসকুনিতে ছাড়েন। আমারে তুই তুকারি করবেন না, আমি আপনার কর্মচারী না।

শশাংক পাল নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। এই বদের বাচ্চার সঙ্গে কথা চালাচালির অর্থ হয় না। মূল প্রসঙ্গে যাওয়াই ভালো। তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, মাংস খাইতে হয় কীভাবে ? রান্না কইরা খাইতে হয়, না-কি কাঁচা খাইতে হয় ?

জানি না।

এক হাজার টাকা নগদ দিতে পারি। যদি পোষায় দিয়া যা। টাকা নিয়া যা।

সুলতান স্পষ্ট গলায় বলল, না। বলেই বের হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়াল না।

শশাংক পাল ধাঁধায় পড়ে গেলেন। সত্যি কি এর কাছে আসল বস্তু আছে ? চিরযৌবন সহজ ব্যাপার না। এর জন্যে রাজত্ব দিয়ে দেয়া যায়। রাজত্বের কাছে

দশ হাজার টাকা কোনো টাকাই না। তাছাড়া টাকা দিয়ে তিনি করবেনইবা কী? মৃত্যু মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি মাথা ঘুরাতে পারেন না বলে দেখতে পারেন না। এক পিস মৎস্যকন্যার মাংস খেলে চিরযৌবন না পাওয়া গেলেও রোগটা তো সারতে পারে।

বিষয়টা নিয়ে তিনি কি কারো সঙ্গে আলাপ করবেন? আলাপ-আলোচনা করার লোকও নাই। সব ধান্দাবাজ। সবাই আছে নিজের ধান্দায়। কাউকে বিশ্বাসও করা যায় না। মাওলানা ইদরিসকে খবর দিয়ে আনা যায়। সেও গাধা। গাধা মাওলানা। হাদিস-কোরানের বাইরে কিছুই জানে না। শশাংক পাল বিরক্ত গলায় ডাকলেন, সুলেমান! সুলেমান!

সুলেমান ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করে। দূর-দূরান্তে চলে যায়। সে এইসব বিষয় জানতে পারে। সুলেমানকে পাওয়া গেল না। জানা গেল কিছুক্ষণ আগে সে ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান সমস্যা হচ্ছে, দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিক্ষা না করলে পেটের ভাত হজম হয় না।

শশাংক পালের মুখে মাছি বসেছে। নিমপাতা দিয়ে হাওয়া করে মাছি তাড়াবার কেউ নেই। তিনি নিজে হাত দিয়ে তাড়াতে পারেন। তাতে লাভ কী? আবার এসে বসবে।

পুকুরঘাটে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। শুকনা পাতার ওপর হাঁটার শব্দ কানে আসছে। শরীর পুরোপুরি নষ্ট হওয়ায় একটা লাভ হয়েছে, কান পরিষ্কার হয়েছে। অনেক দূরের শব্দও শুনতে পান।

শশাংক পাল বললেন, হাঁটে কে? কাছে আস।

কেউ একজন এসে মাথার পেছনে দাঁড়াল। এমনভাবে সে দাঁড়িয়েছে যে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

শশাংক পাল বললেন, গাধার মতো মাথার পিছনে দাঁড়ায়েছ কেন? সামনে আস তোমারে দেখি।

সারা গায়ে চাদর জড়ানো একজন শশাংক পালের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

তুমি কে?

আমার নাম লাবুস।

সুলেমানের পুলা না?

জি।

শরীরে চাদর কেন ? দরবেশ হয়েছ ? এইখানে কী চাও ?

বাপজানের খোঁজে আসছি।

সে গেছে ভিক্ষায়। তুমি একটা কাজ কর, আরেকটা ঘোড়া জোগাড় কর। বাপ-বেটায় একসঙ্গে ঘোড়ায় চইড়া ভিক্ষা করবা। মনোহর দৃশ্য। হা হা হা।

লাবুস তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না একটি নগ্ন মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে সে কোনোরকম লজ্জা পাচ্ছে। শশাংক পাল বললেন, নিমের ডাল হাতে নাও। আমারে বাতাস কর। ঘণ্টা হিসাবে পয়সা পাইবা। ঘণ্টায় দুই পয়সা। রাজি আছ ?

লাবুস জবাব না দিয়ে নিমের ডাল দিয়ে বাতাস শুরু করল। ঘণ্টায় দুই পয়সা তার জন্যে যথেষ্ট। আজ সকাল থেকে সে কিছু খায় নি। সে বাবার কাছে এসেছিল দুপুরের খাবারের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি-না সেই খোঁজে।

নিমের ডালের হাওয়ায় আরাম লাগছে। মাছিগুলি যে তাড়া খাচ্ছে এই দৃশ্য দেখেও ভালো লাগছে। শশাংক পাল বললেন, মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে একজন যে বান্ধবপুর বাজারে এসেছে এই খবর জানো ?

লাবুস বলল, না।

হারামজাদা এক পিস মাংসের দাম চায় দশ হাজার টাকা। থাপড়ায়ে এর দাঁত ফেলা দরকার। তাকে থাপড়াতে পারবা ?

লাবুস জবাব দিল না। একমনে বাতাস করতে লাগল। শশাংক পাল বললেন, বাজারে তারে খুঁইজ্যা বাহির কর। তারপর তার দুই গালে দুই চড় দেও। প্রতি চড় এক টেকা হিসেবে দুই টেকা পাইবা। রাজি ?

লাবুস জবাব দিল না।

শশাংক পাল বললেন, কত বড় ধান্দাবাজ, কুকুরের মাংস নিয়ে এসে বলে মৎস্যকন্যার মাংস! আমার কাছে বেচতে চায়। ভাবছে কী ? এই মাংস খাওয়ার চেয়ে গু খাওয়া ভালো। ঠিক না ?

লাবুস বলল, ঠিক।

শশাংক পাল পরদিন দুপুর দু'টার সময় মৎস্যকন্যার মাংস খেলেন। কাঁচাই খেলেন। রান্না করলে যদি গুনাগুণ নষ্ট হয়ে যায় ! মাংস খাবার সময় সুলতান সামনে বসে রইল। লবণভর্তি মাংস— খাওয়ার সময় শরীর উল্টে যাবার মতো হলো। শশাংক পাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, নুনা ইলিশের মতো স্বাদ। এর কারণ কী ?

সুলতান বলল, মাংস যাতে নষ্ট হয়ে না যায় এর জন্যে নুন দিয়ে জারানো। চাবায়ে খাওয়ার দরকার কী! ওষুধের ট্যাবলেটের মতো গিলে ফেলেন। এটা তো ওষুধই।

অনেক কষ্টে শশাংক পাল মাংস গিললেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরে জ্বলুনি শুরু হলো। যেন কেউ নাগা মরিচ বেটে শরীরে মাখিয়ে দিয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর জ্বলুনি যে শশাংক পালের ইচ্ছা করছে নিজেই টান দিয়ে তার গায়ের চামড়া খুলে ফেলেন। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমাকে ধরাধরি করে পুসকুনির পানিতে ডুবায়ে রাখ। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে গো। সর্বাঙ্গ কেউ যেন আগুন দিয়ে পুড়াচ্ছে। হায় ভগবান, এ-কী শাস্তি!

তাঁকে পুকুরের পানিতে ডুবানো হলো। দুইজন দুই দিক থেকে হাত ধরে আছে। তিনি মাথা ভাসিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে মুখে পানির ছিটা দেয়া হচ্ছে। বান্ধবপুরের মানুষ পুকুরের চারদিকে জড়ো হলো। তাদের কৌতূহলের সীমা নাই। শশাংক পাল বললেন, দেখ মিনি মাগনার মজা। মৎস্যকন্যার মাংস খেয়ে আমি হয়েছি মৎস্যপুরুষ। পানিতে বাস করা শুরু করেছি। এমন মজা দেখবা না। কোনো সার্কাস পার্টিতেও এই মজা নাই।

সন্ধ্যাবেলা তিনি মাওলানা ইদরিসকে খবর দিলেন। ক্ষীণ গলায় বললেন, সবাই মজা দেখতে এসেছে, আপনি নাই, এটা কেমন কথা ? মজা ভালো লাগে না ?

মাওলানা বললেন, আপনি বিরাট যন্ত্রণার মধ্যে আছেন। মানুষের যন্ত্রণা দেখতে ইচ্ছা করে না।

এটা কী বললেন মাওলানা ? যন্ত্রণা দেখার মধ্যেই আনন্দ। অন্যের যন্ত্রণা হচ্ছে, আমার হচ্ছে না— আনন্দ না ?

মাওলানা জবাব দিলেন না। শশাংক পাল বললেন, আপনাকে ডেকেছি একটা অতি জরুরি এবং অতি গোপন কথা বলার জন্যে। খোশগল্প করার জন্যে ডাকি নাই।

মাওলানা বললেন, বলেন কথা। আমি আছি।

শশাংক পাল ক্ষীণ গলায় বললেন, কথাটা শুধু আপনারে বলব। দুইজন আমার হাত ধরে আছে। এখন বললে তারাও শুনবে। আমি চাই না তারা শুনুক। এই তোরা দুইজন আমাকে শুকনায় তোল। কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় হ। মাওলানার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর আবার পানিতে নামাবি।

শশাংক পাল তার অতি জরুরি গোপন কথা মাওলানাকে বলে শেষ করলেন। তাকে আবারো পানিতে নামানো হলো। মধ্যরাত থেকে তিনি বিকারগ্রস্তের প্রলাপ শুরু করলেন। অতি উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন—

তোমরা যারা আমার আশেপাশে আছ তারা শোন। মন দিয়ে শোন। স্বর্গ নরক সবই আছে। আমি অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিলাম। এখন আস্তিক। আমি ডান চোখে স্বর্গ দেখছি। একই সঙ্গে বাম চোখে নরক দেখছি। স্বর্গ সম্পর্কে এতদিন যা শুনেছি সবই ভুল। স্বর্গ তোমাদের সবার কল্পনার চেয়েও মনোহর। স্বর্গে যারা বাস করেন, তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভাসতে ভাসতে যান। নরকের কথা কিছু বলব না। নরক তোমাদের সবার কল্পনার চেয়েও ভয়ঙ্কর। ভগবান, আমাকে ক্ষমা কর। ভয়ঙ্কর নরকের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

বিকারগ্রস্তের মতো চিৎকার করতে করতেই শশাংক পালের মৃত্যু হলো।

বড়গাঙের পাশে নিমাই শ্মশান ঘাটে তার চিতার আয়োজন হলো। মুখাগ্নি করার কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুরোহিত বললেন, নিকট আত্মীয়ের অভাবে তাকে পিতৃসম জ্ঞান করতেন এমন কেউ মুখাগ্নি করতে পারেন।

মড়া পোড়ানো দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। পুরোহিতের কথাতে তাদের মধ্য থেকে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।

পুরোহিত বললেন, স্বধর্মের স্ববর্ণের যে-কেউ হলেই হবে। প্রয়োজনে নিম্নবর্ণের যে-কেউ আসতে পারেন। শাস্ত্রে এই বিধান রাখা হয়েছে।

কেউ এগিয়ে আসছে না। এদিকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। চৈত্র বৈশাখে ঝড়-বৃষ্টি হয়। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আজ বড় ধরনের ঝড় আসবে। বাতাস থমথমে।

পুরোহিত বললেন, কেউ কি আসবেন?

ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন বলল, অন্য ধর্মের কেউ কি এই কাজটা করতে পারেন?

আপনি কে?

আমি হাফেজ ইদরিস।

হ্যাঁ পারবেন।

সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শশাংক পালকে উপুড় করে শোয়ানো হয়েছে। তার মাথা উত্তরমুখী।

মাওলানা ইদরিস আগুন হাতে নিয়ে পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করছেন—

'ওঁ দেবাশ্চাগ্নিমুখা এনং দহন্তু!'

মন্ত্র পাঠের শেষে চিতা প্রদক্ষিণ শুরু হলো। পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, মাওলানা ইদরিস বিড়বিড় করে সেই মন্ত্র বলছেন—

'ওঁ কৃত্বা তু দুস্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম।
ধর্মাধর্মসিমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রানি দিব্যান লোকান ম গচ্ছাতি।'

'তিনি জ্ঞানত বা অজ্ঞানতাবশত অনেক দুষ্কৃত কাজ করেছেন। মানুষের মৃত্যু প্রাপ্য, প্রকৃতির এই বিধানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এই ব্যক্তির ধর্ম অধর্ম লোভ-মোহ সমাবৃত হয়েই মৃত্যু হয়েছে। এখন হে অগ্নিদেব, আপনি তাকে দহন করে দেবলোকে নিয়ে যান।'

মুখে আগুন দেয়ামাত্রই ঝড় শুরু হলো। বাতাস পেয়ে আগুন তেজি হলো। নামল বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতেও আগুন নিভল না। লোকজন সবাই বিদায় নিয়েছে। পুরোহিত এবং মাওলানা ইদরিস বসে আছেন। আধা টিন কেরোসিন বেচে গেছে। এই কেরোসিন পুরোহিতের প্রাপ্য। মাওলানার সামনে এই টিন নিয়ে যেতে তাঁর লজ্জা লাগছে। বিধর্মী মানুষ। নিশ্চয়ই জানে না বেঁচে যাওয়া সবকিছুই পুরোহিতের প্রাপ্য। সে হয়তো ভেবে বসবে লোভী পুরোহিত।

এককালের অতি প্রতাপশালী জমিদার শশাংক পালের মৃত্যু হলো ১২ই চৈত্র ১৩৪৭ সনে।

ইংরেজি ২৩ মার্চ ১৯৪০ সন। বিশেষ একটা দিন। ওই দিন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' ঘোষণা করেন। লাহোর প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ওঠে। লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। জার্মান আর্মি গ্রুপ সি বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে নেদারল্যান্ড আক্রমণ করেছে। অতি অল্প সময়ে তারা ফ্রান্সের গভীরে ঢুকে যায়। দুর্ভেদ্য মাজিনো লাইন কোনো কাজেই আসে না।

লন্ডনে চলতে থাকে টানা বিমান আক্রমণ। ব্রিটিশ সিংহ থমকে দাঁড়ায়। কারণ বোমা পড়ছে বাকিংহাম প্রাসাদে। যেখানে বাস করেন রানি এলিজাবেথ। রানিকে প্রাসাদ থেকে গোপন আবাসে সরিয়ে নেয়া হলো। কেউ জানে না কোথায় রানি। হঠাৎ হঠাৎ গোপন আবাস থেকে বের হন। ইংরেজের প্রিয় খেলা শিয়াল শিকারে বের হন। ঘোড়ায় চড়ে শিয়াল তাড়া করেন। আনন্দময় এই খেলাতেও তাঁর মনে বসে না। বড় অস্থির সময় কাটে।

ভারতবাসীরা যুদ্ধে কোন পক্ষ সমর্থন করবে ঠিক বুঝতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষে ভাগ হয়েছে। এক পক্ষ ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন করলে অন্য পক্ষ তা করতে পারে না। কোলকাতার মুসলমানদের কেউ কেউ অদ্ভুত স্লোগানও দিতে শুরু করেছে—

কানমে বিড়ি
মু মে পান
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

এই লড়াই কার বিরুদ্ধে ? ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে, না-কি হিন্দুদের বিরুদ্ধে ?

রাতে মাওলানা খেতে বসেছেন। তাঁর স্ত্রী জুলেখা সন্তানসম্ভবা। পিঁড়িতে বসতে কষ্ট হয় বলে স্বামীর খাবার সময় সে পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। খাবার সময় গল্পগুজব মাওলানা পছন্দ করেন না। খাওয়া হচ্ছে ইবাদত। ইবাদতের সময় গল্পগুজব চলে না। তারপরেও মাঝেমধ্যে মনের ভুলে জুলেখা দু'একটা প্রশ্ন করে ফেলে। আজ যেমন করল। কৌতূহলী গলায় বলল, জমিদার শশাংক বাবু আপনাকে যে গোপন কথাটা বলেছে সেটা কী ?

ইদরিস বললেন, গোপন কথা তোমাকে কেন বলব ?

জুলেখা বলল, আমি আপনার স্ত্রী এইজন্যে বলবেন।

ইদরিস বললেন, তুমি আমার স্বভাব জানো। এই কাজ আমি কখনো করব না।

জুলেখা বলল, গোপন কথা কি জমিজমার বিলি ব্যবস্থা নিয়ে ?

মাওলানা বললেন, না। এই বিষয়ে তুমি আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করবা না।

অন্য কোনো বিষয়ে কি কিছু বলব ?

বলো।

আপনি নামাজ কালাম ছেড়ে দিয়েছেন কেন ? লোকমুখে শুনলাম শশাংক পালের মুখাগ্নি করেছেন। আপনি তাঁর কে ?

মাওলানা জবাব দিলেন না। তার কপালে কুঞ্চন রেখা দেখা দিল।

জুলেখা নিচু গলায় বলল, আমি আপনার সঙ্গে বাস করতে আসার পরই আপনি নামাজ কালাম ছেড়েছেন। নিজেকে আমার দোষী মনে হয়।

ইদরিস বললেন, কে দোষী কে নির্দোষী সেই বিচার আল্লাহপাক করবেন। এইসব নিয়া চিন্তা করবা না।

লোকে বলে আপনার মাথা না-কি পুরাপুরি খারাপ হয়েছে। এটা কি সত্যি ?

ইদরিস বললেন, আমি বাস করি তোমার সাথে। আমার মাথা খারাপ হলে সবের আগে তুমি বুঝবা।

জুলেখা বলল, রাতে আপনি ঘুমান না। উঠানে মোড়ার উপর বসে থাকেন।

চিন্তা করি। এইজন্যে ঘুমাই না। মানুষ ঘুমের মধ্যে চিন্তা করতে পারে না। চিন্তা করতে হয় জাগ্রত অবস্থায়।

কী নিয়া চিন্তা করেন ?

সেটা তোমারে বলব না।

কেন বলবেন না ? কেউ তো আপনারে বলে নাই— চিন্তার বিষয় নিয়া তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবা না। কেউ তো আপনারে নিষেধ করে নাই।

ইদরিস চাপা গলায় বললেন, নিষেধ করেছে।

জুলেখা আগ্রহ নিয়ে বলল, কে নিষেধ করেছে ?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাওলানা খাওয়া শেষ করে হাত ধোয়ার জন্যে বারান্দায় চলে গেলেন। বারান্দায় কলসিভর্তি পানি এবং লোটা রাখা আছে। মাওলানা বারান্দায় এসেই ডান পায়ে মেঝেতে কয়েকবার বাড়ি দিলেন। মাস চারেক হলো বাড়িতে একটা সাপ দেখা যাচ্ছে। বিশাল শঙ্খচূড়। বাস্তুসাপের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না। বাস্তুসাপ গৃহস্থের জন্যে মঙ্গল এবং কল্যাণ নিয়ে আসে। তাছাড়া জুলেখার সন্তান হবে। এই সময়ে কোনো জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। জুলেখা পিতলের একটা বাটিতে প্রতিদিন সাপের জন্যে দুধ রেখে দিচ্ছে। সাপকে কখনো দুধ খেতে দেখা যায় নি। তবে বাটির দুধ থাকছে না। কেউ একজন খেয়ে নিচ্ছে। সাপের কারণে খরচ বেড়েছে। সারারাত খাটের নিচে হারিকেন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। যুদ্ধের কারণে কেরোসিনের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। বাজারে বলাবলি হচ্ছে কয়েকদিন পর এক ফোঁটা কেরোসিনও পাওয়া যাবে না। সব কেরোসিন চলে যাচ্ছে ফৌজিদের কাছে। তারা সারাগায়ে কেরোসিন মেখে বনেজঙ্গলে যুদ্ধ করে। কেরোসিন মাখার কারণে সাপখোপ পোকামাকড় তাদের কাছে আসে না।

মাওলানা উঠানে তার নির্দিষ্ট জায়গায় মোড়ার ওপর পা তুলে বসেছেন। চিন্তা এখনো শুরু করেন নি। জুলেখা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পান নিয়ে তাঁর কাছে আসবে। তিনি পান চিবাতে চিবাতে চিন্তা শুরু করবেন। তাঁর আজ রাতের চিন্তার বিষয় ঠিক করা আছে। শশাংক পালের যন্ত্রণা দেখে চিন্তাটা মাথায় এসেছে। তিনি অতি সাধারণ একজন মানুষ হয়েও অন্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে

পারেন না। পরম করুণাময় আল্লাহপাক কীভাবে তাঁর সৃষ্ট জগতের যন্ত্রণায় নির্বিকার থাকেন! অনন্ত নরকে তাঁর সৃষ্ট প্রাণী মানুষ জ্বলতে পুড়তে থাকবে, আর তিনি থাকবেন নির্বিকার? তাহলে কি তিনি এমন একজন যিনি যন্ত্রণাবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? তাই যদি হয়, তাহলে তো তিনি আনন্দবোধ থেকেও মুক্ত। সেরকমই কিছু হবে। সূরা এখলাসে তিনি বলেছেন, 'ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফু আন আহাদ।' যার অর্থ আমার সমকক্ষ কেহই না। মাওলানা মনে করেন— এই অনুবাদ ঠিক না। অনুবাদটা হবে— 'আমি অন্য কাহারো মতো নই'।

পান নেন।

ইদরিস পান নিলেন। জুলেখা হাতে করে পিঁড়ি নিয়ে এসেছে। সে মাওলানার পাশে পিঁড়ি রেখে পিঁড়িতে বসতে বসতে বলল, আজ রাতে আমিও আপনার মতো চিন্তা করব।

মাওলানা আগ্রহ নিয়ে বললেন, কী নিয়া চিন্তা করবা?

আমার মেয়েটারে নিয়া চিন্তা করব।

তোমার যে মেয়ে হবে এটা তুমি ক্যামনে জানো? ছেলেও তো হইতে পারে। পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে এই রহস্য আল্লাহপাক ভেদ করেন না। জন্মের পরে তিনি রহস্য ভেদ করেন।

জুলেখা বলল, আমার যে মেয়ে হবে এইটা আমি জানি। তাকায়া দেখেন, আমার চেহারা অনেক সুন্দর হয়েছে। এর অর্থ জানেন?

না।

এর অর্থ আমার মেয়ে হবে। মেয়ের মা সুন্দরী, ছেলের মা বান্দরী।

মাওলানা জবাব দিলেন না। ঝড়বৃষ্টির শেষে চৈত্র মাসের মেঘশূন্য আকাশ। এত বড় চাঁদ উঠেছে। নিশ্চয়ই পূর্ণিমা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে জোছনা গলে গলে পড়ছে। কী অপূর্ব দৃশ্য! শশাংক পাল এই দৃশ্য আজ দেখতে পারছেন না। কিংবা কে জানে, এরচে'ও অনেক সুন্দর দৃশ্য তিনি এখন দেখছেন। আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করেছেন। হয়তো তিনি তাকে বলেছেন— পৃথিবীতে শেষ দিনগুলি তোর অনেক কষ্টে গেছে। এখন আয় আরাম কর। তোকে দিলাম চিরযৌবন।

জুলেখা মিষ্টি করে ডাকল, মীরার বাপ!

মাওলানা চমকে উঠে বললেন, কী বললা?

জুলেখা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, আপনারে মীরার বাপ বলে ডাকলাম। আমি আমার মেয়ের নাম রাখব মীরা।

হিন্দু নাম?

নামের কোনো হিন্দু মুসলমান নাই। নাম নামাজ রোজা করে না, পূজা করে না। নাম মানুষের একটা পোশাক। পোশাকের কি কোনো ধর্ম থাকে?

ইদরিস বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমার ভালো বুদ্ধি।

জুলেখা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি আমার ভালো বুদ্ধি। মানুষ আমার রূপটা শুধু দেখে, বুদ্ধি দেখে না। আপনি দেখেছেন, আমার ভালো লাগল।

ইদরিস বললেন, আরেকটা পান খাব।

জুলেখা বলল, পান দিতেছি। তার আগে একটা কথা বলি, মন দিয়া শুনেন। শশাংক পাল আপনারে একটা গোপন কথা বলেছে, আপনি যেটা আমারে বলেন নাই। আমার একটা গোপন কথা আছে, সেটা আপনারে এখন বলব।

বলো।

আমার মেয়েটার জন্মের পর আমি আপনারে ছেড়ে চলে যাব।

মাওলানা অবাক হয়ে বললেন, কেন?

জুলেখা স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার কারণে আপনি বিরাট বিপদে পড়েছেন। সমাজে পতিত হয়েছেন। নামাজ কালাম ছেড়েছেন। মাথা খারাপের দিকে যাইতেছেন। আমি আপনারে মুক্তি দিব।

মেয়েটাকে কি নিয়ে যাবে?

না। তাকে আপনার কাছে দিয়া যাব। আপনি মেয়েটারে ভালো মানুষ হওয়া শিখাইবেন। আমি চাই আমার মেয়ে আপনার মতো ভালো মানুষ হোক।

জুলেখার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। গাল ভেজা। ভেজা গালে চাঁদের আলো চকচক করছে। মাওলানা বিস্মিত হয়ে বললেন, কাঁদতেছ কেন?

জুলেখা সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে বলল, আর কাঁদব না। বলেই সে ফিক করে হাসল। মাওলানা মুগ্ধ হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর স্ত্রী যে পৃথিবীর অতি রূপবতীদের একজন এটা তাঁর মনেই থাকে না। হঠাৎ হঠাৎ বুঝতে পারেন। তখন তাঁর বড় বিস্ময় লাগে। পবিত্র কোরান শরিফে বেহেশতের আয়তচক্ষু হুরদের বর্ণনা আছে। তারা কি জুলেখা নামের এই মেয়ের চেয়েও সুন্দর? আল্লাহপাক যখন বলেছেন তখন অবশ্যই সুন্দর। কিন্তু সেই সৌন্দর্য কী রকম? কাকে আমরা সৌন্দর্য বলি? ফুল সুন্দর লাগে কেন? পাতাকে ফুলের মতো সুন্দর লাগে না, অথচ ফুলকে লাগে। ফুলের গন্ধ আছে এইজন্যে কি? গন্ধ ছাড়াও তো ফুল আছে। সেই ফুলও তো সুন্দর।

জুলেখা বলল, কী চিন্তা করেন ?

মাওলানা জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। সেই চন্দ্রও সুন্দর লাগছে। সুন্দর তাহলে কী ?

জুলেখা বলল, গান শুনবেন ?

মাওলানা বললেন, না। গানবাজনা নিষেধ আছে।

নিষেধ থাকলেও শুনেন। আপনারে গান শুনাইতে ইচ্ছা করতেছে। বেহেশতে হুরদের গান শুনবেন। দুনিয়াতে আমি শুনাব। তখন তুলনা করবেন।

জুলেখা, গান শুনব না।

আপনে চন্দ্র দেখতেছেন। আমি চন্দ্র নিয়া গান করব।

বলেই জুলেখা গান শুরু করল।

ও আমার চন্দ্রসখারে
তোর কারণে হইলাম দিওয়ানা
ও আমার চন্দ্রসখারে
মিছামিছি হইছি দিওয়ানা।

আকাশের চাঁদের দিকে আরো একজন তাকিয়ে আছে। তার নাম লাবুস। সে বসে আছে লঞ্চঘাটায়। মাঝরাতে ভেঁপু বাজিয়ে লক্ষ্মী নেভিগেশন কোম্পানির শেষ লঞ্চ গোয়ালন্দ থেকে আসে। দূরের লঞ্চটাকে মনে হয় ঝাড়বাতি। ঝাড়বাতিটা আস্তে আস্তে লঞ্চের আকৃতি নেয়। দেখতে ভালো লাগে।

আজকের দিনটা লাবুসের ভালো কেটেছে। দুপুরে খাওয়া না হলেও সন্ধ্যায় ভরপেট খেয়েছে। খাওয়ার আয়োজন শশাংক পালের বাড়িতে। শ্মশানযাত্রীদের জন্যে খিচুড়ির আয়োজন ছিল। খিচুড়ি খেতে কেউ আসে নি।

লাবুস কলাপাতা নিয়ে বসেছে। বাবুর্চি কলাপাতায় খিচুড়ি ঢালতে ঢালতে বলল, শ্মশানযাত্রীর খাওয়া খায় মুসলমানে! এর নাম কলিকাল।

লাবুস বলল, অভাবের কোনো হিন্দু মুসলমান নাই।

বাবুর্চি বলল, কথা কইস না। মুখ বন্ধ কইরা খা। যত পারস খা। পাঁচ সের চাউলের খিচুড়ি। সব নষ্ট।

লাবুস মুখ বন্ধ করেই খেয়ে গেল। তিন-চারদিনের খাবার একসঙ্গে খেয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা থাকলে সে খেত। তাহলে আগামী কয়েকদিন তাকে আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হতো না। মানুষ হবার প্রধান সমস্যা, সে জরুরি

কোনো জিনিসই জমা করে রাখতে পারে না। দিনের খাবার দিনে খেতে হয়। দিনের ঘুম দিনে ঘুমাতে হয়। খাওয়া এবং ঘুম কোনোটিই জমা রাখা যায় না।

লঞ্চ ভোঁ দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁকের ভেতর থেকে তাকে দেখা যাবে। আজ আকাশে থালার মতো চাঁদ। চাঁদের আলো এবং লঞ্চের আলো মিলেমিশে কী সুন্দর দৃশ্যই না হবে! সুন্দর দৃশ্য দেখার আকুলতা লাবুসকে ব্যাকুল করল।

তার মতো আরো একজন ব্যাকুল হলেন। তিনি বহুদূর দেশ আমেরিকায় বাস করেন। তাঁকে বলা হয় 'জঙ্গলের কবি'। নাম রবার্ট ফ্রস্ট। তিনি জঙ্গলের আলোছায়ায় হেঁটে বেড়ান। এবং প্রায়ই বলেন, অদ্ভুত সুন্দর এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর প্রেমিকের কলহের মতো কলহ।

I had a lover's quarrel with the world.
And were an epitaph to be my story
I'd have a short one ready for my own.
I would have written of me on my stone;
I had a lover's quarrel with the world.

বান্ধবপুর বাজারে এককড়ি সাহার চালের আড়ত। তিনি সামান্য পুঁজি দিয়ে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের কারণে এখন রমরমা অবস্থা। ধান-চালের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। আরো বাড়বে— এরকম গুজব বাতাসে ভাসছে। সব চাল না-কি মিলিটারিরা কিনে নিবে। পাউরুটি খেয়ে যুদ্ধ করা যায় না। ভাত খেয়েও যুদ্ধ হয় না। ভাতে ঘুম পায়। তারপরেও মিলিটারিদের জন্যে রাতে ভাতের ব্যবস্থা। রাতে ভাত খেয়ে তারা আরামে ঘুমায়। দিনে যুদ্ধ শুরু হয়। দেশের চাল সব সরকার কিনছে। এদিকে আবার বার্মা মুলুক থেকে চাল আসা বন্ধ। জাপানিরা বার্মা দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকবে। নাক-চ্যাপটা মগগুলিকে শায়েস্তা করবে। এটা একটা আশার কথা।

এককড়ি সারাদিন ক্যাশবাক্স নিয়ে আড়তে বসে থাকেন। তাঁর মন প্রফুল্ল থাকলেও চোখেমুখে গভীর বিষণ্ণতা ফুটিয়ে রাখেন। ব্যবসা ভয়ঙ্কর খারাপ যাচ্ছে। যুদ্ধের কারণে তিনি ধনে-প্রাণে মারা পড়বেন— এই ধরনের কথা বলতে পছন্দ করেন। কথা বলার জন্যে সবসময় লোক পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার দিকে অনেকেই আসে। যুদ্ধের খবর শুনতে আসে। এককড়ির নামে প্রতিদিন *কলিকাতা সমাচার* পত্রিকা আসে। দিনেরটা দিনে আসে না, দু'দিন পরে আসে। তাতে সমস্যা কী? খাবার দু'দিনে বাসি হয়, খবর কখনো বাসি হয় না। সবাইকে সেই পত্রিকা পড়ে শোনানো হয়। পড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী। তাঁর গলা উঁচু এবং সুরেলা। বিভিন্ন পূজা পার্বণে তিনি সুরেলা গলায় মাথা দুলিয়ে যখন ব্রতকথা পাঠ করেন, তখন ভক্তিমতি হিন্দু নারীদের চোখে আবেগে পানি আসে।

'বিদেশে গেল পতি,
        সে হতে সাবিত্রী সতী
দিবা রাতি করিছে রোদন
        পতির বিরহে তার
দেহ হলো চর্ম্মসার,
        ছয় জায়ে করিছে গঞ্জন।'

কলিকাতা সমাচার এককড়ি প্রথম পড়েন। যে কাগজটা খরচপাতি করে আনায় সে-ই প্রথম পড়বে এটাই নিয়ম। এককড়ি সময় নিয়ে পড়েন। খবরের কাগজ পাঠ যারা শুনতে এসেছে তাদের আগ্রহ এবং কৌতূহল বাড়ানোর জন্যে দু'একটা মন্তব্য করেন। দু'একটা শিরোনাম গলা খাঁকারি দিয়ে নিজেই পড়েন।

ইংল্যান্ডে বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ
ব্রিটিশ সিংহ কম্পমান

ফ্রান্সের গভীরে অপ্রতিরোধ্য হিটলার

অপেক্ষমাণ জনতার একজন বলে বসল, হিটলার বাবাজি দেহি ফ্রান্সের গুয়া মাইরা দিছে।

এককড়ি চোখের চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, অশ্লীল কথা বলবা না দীননাথ।

দীননাথ বিস্মিত হয়ে বলল, 'অশ্লীষ' কথা কোনটা বলছি! সত্য কথা বলছি। হিটলার সবেরেই গুয়া মারতাছে— এটা সত্য কথা, 'অশ্লীষ' না।

গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর কাছে মূল কাগজ চলে এসেছে। তিনি কয়েকবার কেশে, পানি খেয়ে আয়োজন করে পাঠ শুরু করেছেন। শ্রোতাদের চোখ আগ্রহ এবং উত্তেজনায় চকচক করছে। দূরদেশের যুদ্ধ তাদের স্পর্শ করছে না। হিটলার নামে দুর্ধর্ষ একজন সবাইকে নাস্তানাবুদ করছে, ভাবতেই আনন্দ।

গৌরাঙ্গ পড়ছেন— 'একদিনে ৭০ বার বোমা হামলা। চার্চিলের মাথায় হাত।' পড়তে পড়তে গৌরাঙ্গ নিজেও মাথায় হাত দেন। হতাশ ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকান, যেন তিনি নিজে চার্চিল। মাথায় বোমা বর্ষণ চোখের সামনে দেখছেন। শ্রোতারা বড়ই আমোদ পায়।

বান্ধবপুরের লোকজন আগে কখনো হিটলারের নাম শোনে নি। এখন এই নাম চলে আসছে নিত্যদিনের আলোচনায়। যাদের ছেলেসন্তান হচ্ছে, তারা সন্তানের নাম রাখছে— হিটলু কিংবা হিটু। হিটলারের সঙ্গে মিল রেখে নাম।

খবরের কাগজ পড়া শেষ হয়েছে। শ্রোতারা যে যার বাড়িতে চলে গেছে। এককড়ি হারিকেন নিভিয়ে দিয়েছেন। কেরোসিনের সাশ্রয় করতে হবে। দাম যেভাবে বাড়ছে, কিছুদিন পর এই বস্তু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বাইরে চাঁদের আলো আছে। হারিকেন না জ্বালালেও চলে। আধো অন্ধকারে এককড়ি দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। গলা নামিয়ে বললেন, চাল কিনা শুরু কর। দাম কিছু বেশি হলেও কিনবা। বড় নৌকা নিয়ে ভাটি অঞ্চলের দিকে যাও। সেখানে ধান চাল দুইই সস্তা।

কর্মচারীদের একজন বলল, কর্তা, কিনা শুরু করব কবে ? পঞ্জিকাতে শুভ দিন দেখে শুরু করা উচিত না ?

এককড়ির জন্যে তামাক সাজানো হয়েছে। তিনি তামাক টানতে টানতে বললেন, শ্রীগণেশের জন্যে সব দিনই শুভ। তারপরেও চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজার পরে শুরু কর। এককড়ি তামাক টানতে লাগলেন।

বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের সূচনা শুরু হলো। ভয়াবহ এই মন্বন্তরে বঙ্গদেশে ত্রিশ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। বিশ্বযুদ্ধের পাওনা এভাবেই তাদের শোধ করতে হয়। মহান ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অশনি সংকেত'।

বঙ্গদেশের মানুষ এই ধরনের বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে এর আগেও একবার গিয়েছিল। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড ক্লাইভ। তার সময়ের মন্বন্তরে (ছিয়াত্তুরের মনন্তর) বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী মৃত্যুবরণ করে। তাদের মৃত্যু কখনোই শ্যাম সমান ছিল না।

জুমা মসজিদের বর্তমান ইমাম মাওলানা করিম এশার নামাজ শেষ করে ঘরে ফিরছেন। পাকা পুলের কাছে এসে মাওলানা থমকে দাঁড়ালেন। পাকা পুলের রেলিংয়ের ওপর লম্বা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে সাদা চাদর। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষ হলে মূর্তির হাত-পা নড়ত। বাতাসে গায়ের চাদর নড়ত। সেরকম কিছুই হচ্ছে না, মূর্তি পাথরের মতো স্থির।

করিম আয়াতুল কুরশি পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন। পাকা পুল জায়গাটা খারাপ। পুলের কাছেই বিরাট যে তেঁতুলগাছ সেখানে ছায়ামূর্তিরা থাকে। অনেকেই দেখেছে। তিনি আজ প্রথম দেখলেন। তাঁর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এলো। একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে ? শেষ পর্যন্ত করলেন না। জিন-ভূতদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা বিপদজনক। তখন তারা পিছু নেয়।

মাওলানা করিম দ্বিতীয়বার আয়াতুল কুরশি পড়ে হাততালি দিলেন। হাততালির শব্দ যতদূর যাবে জিন-ভূতদের তারচে'ও দূরে যাবার কথা। ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল না। হাততালির শব্দে ফিরে তাকাল। করিম নিজের অজান্তেই ভীত গলায় বলে ফেললেন, তুই কে ?

আমি লাবুস।

এখানে কী করিস ?

কিছু করি না।

পুলের উপরে দাঁড়ায়ে আছস কী জন্যে ? মানুষরে ভয় দেখানোর জন্যে ? আমি যদি আজ থাবড়ায়া তোর দাঁত না ফেলছি। বদমাইশ! পুলের উপর থেকে নাম বললাম।

লাবুস জবাব দিল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে শীতল গলায় বলল, আপনি মাওলানা ইদরিসকে গত জুম্মাবারে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। কেন দিলেন ?

করিম বললেন, তোর কাছে জবাবদিহি করব না-কি হারামজাদা ? সে কাফেরের কাজ করেছে বলে কাফের ফতোয়া দিয়েছি। হিন্দুর মুখাগ্নি করেছে। খবর রাখস না ?

লাবুস বলল, লাশের মুখে আগুন দিয়েছে। লাশের আবার হিন্দু-মুসলমান কী ? লাশ নামাজ কালাম পড়ে না। মন্দিরে ঘণ্টাও বাজায় না।

বাপরে বাপ! জ্ঞান ফলায়। দেওবন্দের প্রিন্সিপাল স্যার আসছেন। হারামজাদা, তুই জানস না ইদরিস এক বেশ্যামাগির সাথে সংসার করতেছে ? মাগির পেটও বাঁধায়ে ফেলেছে।

জুলেখা লাবুসের মা। করিমের কঠিন কথাতে লাবুসের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে আগের মতোই শান্ত গলায় বলল, মাওলানা ইদরিসকে কাফের বলার কারণে আজ আমি আপনাকে শাস্তি দিব। এমন শাস্তি যে জনমে ভুলবেন না। যতদিন বাঁচবেন ইয়াদ থাকবে।

করিম থমকে গেলেন। বদমাইশটার কথা বলার ধরন ভালো না। ছুরি চাক্কু চালাবে কি-না কে জানে ! লাবুসের হাতে অবশ্যি ছুরি চাক্কু কিছু দেখা যাচ্ছে না। বদমাইশটা চাদরের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারে। মনে হয় তাই করেছে। চৈত্র মাসের গরমে গায়ে চাদর থাকার কথা না।

করিম বললেন, কী শাস্তি দিবি ?

লাবুস বলল, আমি আপনেরে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিব। ন্যাংটা অবস্থায় দৌড়াতে দৌড়াতে আপনি ঘরে যাবেন। আপনার স্ত্রী দরজা খুলে দেখবে ন্যাংটা ইমাম।

এই হারামজাদা! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

লাবুস রেলিং থেকে নামতে নামতে বলল, মাথা খারাপ হয় নাই।

করিম উল্টাদিকে দৌড় দেবেন কি-না বুঝতে পারছেন না। এই হারামজাদা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। এর বেশি কিছু না। এইসব ক্ষেত্রে ভয় পেতে নাই। ভয় পেলেই হারামজাদা বুঝতে পারবে, আরো লাই পাবে।

লাবুস করিমের দিকে এগুচ্ছে। ছোট ছোট পা ফেলে এগুচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। করিম দ্রুত ভাবছেন, এখনো দৌড় দেয়ার সময় আছে। তবে দৌড় দেয়াটা হবে বিরাট বোকামি।

লাবুস বলল, পাঞ্জাবিটা খুলে আমার হাতে দেন।

করিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে যাচ্ছে। উদম গায়ে বাজারের ভেতর দিয়ে যাওয়াও লজ্জার ব্যাপার। তারপরেও কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবেন— অতিরিক্ত গরমের কারণে পাঞ্জাবি খুলে রেখেছেন। কথা মিথ্যাও হবে না। আজ অতিরিক্ত গরম পড়েছে। পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

করিম পাঞ্জাবি খুলে লাবুসের হাতে দিতে দিতে বললেন, পাঞ্জাবি নিয়ে বাড়িত যা। অপরাধ যা করেছিস তার ক্ষমা নাই। তবে আজ আর কিছু বলব না। কোনো একদিন ফয়সালা হবে।

লাবুস বলল, এখন লুঙ্গি খুলে আমার হাতে দেন।

কী বললি?

একবার তো বলেছি। আবার বলি, লুঙ্গি খুলে আমার হাতে দেন। নিজে না দিলে আমি টান দিয়া খুলব।

করিমের হাত-পা জমে গেল। তাঁর কান দিয়ে মনে হচ্ছে ধোঁয়া বের হচ্ছে। চোখ ঝাপসা।

মেঘের ভেতর থেকে চাঁদ বের হয়েছে। ফকফকা চাঁদের আলো। করিম দুই হাতে লজ্জা ঢেকে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লাবুসের হাতে মাওলানার লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। লাবুস সহজ গলায় বলল, বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে পারবেন না। বাজারে হরিনাম জপ হচ্ছে। নদীর পাড় দিয়ে চলে যান। কেউ দেখবে না।

বাজারের দিক থেকে বিড়ি টানতে টানতে কে যেন আসছে। দূর থেকে বিড়ির আগুনের ওঠা-নামা দেখা যাচ্ছে। করিম রাস্তা ফেলে নদীর পাড়ের দিকে দৌড় দিলেন। রাত তেমন বেশি হয় নি। ঘাটের নৌকার মাঝিরা নিশ্চয়ই জেগে আছে। তাদের কেউ-না-কেউ অবশ্যই দেখবে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ভালো। রাত গভীর হলে বাড়ি ফিরবেন। জঙ্গলে বসে থাকারও হাজার সমস্যা আছে। সাপখোপের সমস্যা। অতিরিক্ত গরমে তারা সবাই গর্ত থেকে বের হয়েছে। পালপাড়ার এক বৌ গত বুধবার দুপুরে সাপের কামড়ে মারা গেছে। কচুর লতির সন্ধানে সে জঙ্গলে ঢুকেছিল। কচুগাছের নিচে হাত দেয়া মাত্র সাপ ঠোকর দিল। আল্লাহ্ মাবুদ জানে— তাঁর কপালে সাপের হাতে মৃত্যু আছে কি-না।

করিমের বাড়ি বাজারের শেষপ্রান্তে। তিনি বছরখানেক আগে ভাটি অঞ্চলের এক মেয়ে বিয়ে করেছেন। মেয়ের বয়স অল্প। কিশোরীর মায়া তার চোখ-মুখ থেকে যায় নি। তার নাম শরিফা। সে উঠানে হারিকেন জ্বালিয়ে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে। বাজারে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা হচ্ছে। উঠান থেকে মোটামুটি শোনা যায়। শরিফার শুনতে ভালো লাগছে। যদিও পরের ধর্মকথা শোনা ঠিক না। পাপ হয়। শরিফার প্রায়ই মনে হয় মুসলমানদের মধ্যে গানবাজনা করে ধর্মকথা বলার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো।

গৌরাঙ্গের মিষ্টি গলার সঙ্গে মৃদঙ্গের বাড়ি, শরিফা আগ্রহ নিয়ে শুনছে।

কহিব তোমাকে আমি পূজার বিষয়।
সওয়া সের আটা কিংবা আতপের গুঁড়ি।
কাঁচা দুগ্ধ সওয়া সের, কলা সওয়া কুড়ি।
সওয়া সের ইক্ষুগুড় সেবার প্রমাণ।
সওয়া সের গুয়া লাগে, সওয়া কুড়ি পান।
সওয়া সের সওয়া মন যে যেরূপে পারে
মুদ্রা যদি থাকে তবে নানা উপাচারে—

বেড়ার বাইরে কে যেন গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকল, ইমাম সাহেব বাড়ি আছেন?

শরিফা চমকে উঠল। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। কথা না বললে মানুষটা উঠানে ঢুকে পড়তে পারে, সেটা আরো বিপদের।

ইমাম সাহেব বাড়ি ফিরেন নাই?

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, না।

পুরুষকণ্ঠ বলল, মা! আমার নাম লাবুস। ইমাম সাহেবের কিছু জিনিস আমার কাছে। যদি অনুমতি দেন উঠানে রেখে যাই।

যে পুরুষ 'মা' সম্বোধন করেছে তাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া যায়। শরিফা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। দরজার আড়াল থেকে বলল, রেখে যান।

লাবুস উঠানে ঢুকল। যুবা পুরুষের গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ভিনদেশের কোনো রাজপুত্র পথ ভুলে চলে এসেছে। শরিফার মনে হলো, এমন রূপবান পুরুষ সে তার জীবনে দেখে নি। আর এই যুবা পুরুষটার কী অদ্ভুত নাম— লাবুস।

শরিফা আর কথা বলবে না ঠিক করে রাখার পর বলল, আপনি হিন্দু না মুসলমান?

আমি মুসলমান। মা, আসসালামু আলায়কুম।

শরিফা বিব্রত গলায় বলল, ওয়ালাইকুম সালাম।

লাবুস বলল, মা, আমি সারাদিন খাই নাই। খুবই ক্ষুধার্ত। ঘরে কিছু কি আছে ? চিড়া, মুড়ি, একটা কিছু হলেই হবে।

আপনি দাওয়ায় জলচৌকিতে বসেন। খাওয়া আনতেছি। কলসিতে পানি আছে। হাত-মুখ ধোন।

লাবুস বলল, আপনাকে মা ডেকেছি— আমাকে তুমি করে বলবেন।

শরিফা অতি দ্রুত খাওয়ার ব্যবস্থা করল। গরম ভাত। খলিসা মাছের ঝোল, পাট শাক, ডাল।

বারান্দায় পাটি পেতে খাওয়ার নিখুঁত আয়োজন। পাতে লবণ দেয়া, কাগজি লেবুর টুকরা, কাঁচামরিচ, একটা বাটিতে পাতে খাওয়ার ঘি।

শরিফা দরজার আড়াল থেকে ক্ষীণ গলায় বলল, আয়োজন কিছুই নাই, আমি শরমিন্দা। তোমারে দাওয়াত দিলাম। একদিন আসবা। পোলাও করব, মুরগির কোরমা করব।

লাবুস মাথা কাত করে বলল, জি আচ্ছা।

খাওয়া শেষ করে লাবুস উঠানে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহপাক, আমাকে আমার নতুন মা যে যত্নের সঙ্গে খানা দিয়েছেন, তাঁকে সারাজীবন যেন কেউ না কেউ এরকম যত্ন করে খাওয়ায়।

অদ্ভুত এই দোয়ার কথা শুনে শরিফার চোখে পানি এসে গেল।

আহারে বেচারা, ঘরে কিছুই ছিল না, তারপরেও কত তৃপ্তি করে খেয়েছে। কী সুন্দর করে দোয়াটা করেছে ! প্রিয়জন কেউ কি এর নাই ? সে কি পথে পথে না খেয়ে ঘুরে ?

তোমার পরিচয় কী ?

আমার কোনো পরিচয় নাই।

পরিচয় থাকবে না এটা কেমন কথা! আমারে মা ডেকেছ, খুশি হয়েছি। তোমার আসল মা কে ?

আমার কোনো মা নাই। এখন আমারে বিদায় দেন, আমি যাই।

কলাপাতায় শরীর ঢেকে ইমাম করিম কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে গভীর রাতে ফিরলেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। শরীর কাঁপছে। হতভম্ব শরিফা বলল, আপনার কী হয়েছে ?

করিম বিড়বিড় করে বললেন, আগে গোসলের পানি দেও। গামছা দেও। জিনের হাতে পড়েছিলাম। জীবনসংশয় হয়েছিল। অনেক কষ্টে জানে বাঁচছি।

কন কী আপনি ?

করিম বলল, তুমি কি ভাবছ মিথ্যা বলতেছি ? যা বলতেছি সবই সত্য। জিনের নাম খোররম। সে থাকে কোহকাফ নগরে। এশার নামাজের পর বাড়ি ফিরতেছি, সে আমার পিছু নিছে। কখনো থাকে পিছে, কখনো চইলা আসে সামনে। তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সূরায়ে জিন পাঠ শুরু করলাম— এইখানে হইল সমস্যা।

কী সমস্যা ?

ভয়ের কারণে মাঝখানে আমার দোয়া বিস্মরণ হলো। 'ওয়া আন্না জনান না আললান তাকুলাল ইনসু' পর্যন্ত পড়েছি, তারপর আর কিছু মনে আসে না। মাথা গেল আউলায়া, তখন জিন আইসা আমারে চাইপা ধরল। টান দিয়া নিয়া গেল জঙ্গলায়। পাছড়াপাছড়ি কামড়াকামড়ি।

কী সর্বনাশ!

একসময় জ্ঞান হারাইলাম। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি ন্যাংটা হইয়া কাদার মধ্যে শোয়া। জানে যে বাঁচছি এইজন্য আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া।

ভয়ঙ্কর এই কথা শোনার পর শরিফা লাবুসের কথা চেপে গেল। সে যে ইমাম সাহেবের পাঞ্জাবি-লুঙ্গি দিয়ে গেছে, এটাও তো একটা রহস্য। আচ্ছা এমন কি হতে পারে— লাবুস নামে যে এসেছে, সে-ই জিন খোররম ? মানুষের বেশ ধরে এসেছে। তাকে মা বলে ডেকেছে। খাওয়া-দাওয়া করেছে। অনেক রাত পর্যন্ত শরিফা জেগে রইল। একসময় সে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো, জিন খোররমের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে। মানুষ এত সুন্দর হয় না। মানুষ এত গরমে চাদর গায়ে রাখে না। শরিফার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। পাশেই তার স্বামী অঘোরে ঘুমাচ্ছে। শরিফার ইচ্ছা করছে স্বামীকে ডেকে তুলে জিন খোররমের সাথে তার দেখা হওয়ার গল্পটা করে।

লাবুস ভালো ঝামেলায় আছে। অনাহারের ঝামেলা। এত বেলা হয়েছে, এখনো খাবারের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। দুপুরে মাওলানা ইদরিসের বাড়ির কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলো। ওই বাড়িতে তার মা জুলেখা থাকে। মায়ের সঙ্গে দেখা করার তার কোনো ইচ্ছা নেই।

সে রওনা হলো জংলার কালীবাড়ির দিকে। দেবীকে ভোগ হিসেবে কেউ কেউ হঠাৎ একটা দু'টা পয়সা ছুড়ে দেয়। একবার এখান থেকেই একটা এক আনি পেয়েছিল।

কালীবাড়িতে কোনো পয়সা-কড়ি পাওয়া গেল না। কেউ একজন কলাপাতায় ক্ষীর দিয়ে গেছে। দুনিয়ার পিঁপড়া ক্ষীরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পিঁপড়ার খাওয়া দেখে সে জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গলে বুবি গাছে (লটকন) পাকা বুবি আছে। যত ইচ্ছা খাওয়া যায়। সমস্যা একটাই, বুবি খেলে ক্ষুধা যায় না, বরং আরো বাড়ে। সে জঙ্গলে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল। জংলি কিছু কলাগাছ আছে। আঙুলের মতো ছোট ছোট কলা ধরেছে। এই কলা সে আগেও খেয়ে দেখেছে— তিতা এবং ভয়ঙ্কর কষটা। জোর করে খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবল বমিভাব হয়।

জঙ্গলের মাঝখানে জলা জায়গায় হুটপুট শব্দ হচ্ছে। লাবুস সেদিকে এগিয়ে গেল। কেউ বরশি পুঁতে রেখেছে, সেখানে মাছ ধরা পড়েছে। প্রায় দুই হাত লম্বা এক বোয়াল। বর্শি ছেঁড়ার প্রাণান্ত চেষ্টায় সে ক্লান্ত। লাবুস বোয়ালটা ডাঙ্গায় তুলল। আগুনে পুড়িয়ে খেলে ভালো হবার কথা। আগুন জ্বালাবার কোনো সরঞ্জাম তার কাছে নেই। মাছটা কাঁচা খাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। যদিও তার মনে হচ্ছে, সে চোখ বন্ধ করে কাঁচা খেতেও পারবে। জংলি মানুষরা তো একসময় কাঁচা মাছ খেত। তাদের সমস্যা না হলে তার হবে কেন?

আগুনের উদ্দেশ্যে লাবুস জংলা থেকে বের হলো। তার চাদরের নিচে বোয়াল মাছ লুকানো। আগুন পাওয়া কঠিন হবে। যুদ্ধের বাজারে দেয়াশলাইয়ের দাম তিনগুণ হয়েছে। লাবুস বাজারের দিকে হাঁটা ধরল। দেয়াশলাই জোগাড় হবে কি-না বুঝতে পারছে না। কেউ তাকে মাগনা দেয়াশলাই দেবে না। হিন্দু পাইস হোটেলের সামনে থমকে দাঁড়াল। রান্নার কী সুন্দর গন্ধ আসছে! পাইস হোটেলের মালিক নিবারণ বলল, দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া থাকবি না।

লাবুস বলল, কর্তা, ভাত খাব।

নিবারণ বলল, ভাত যে খাবি পয়সা আছে?

লাবুস বলল, পয়সা নাই। একবেলা খাওয়ার বিনিময়ে এই মাছটা আপনারে দিব।

লাবুস চাদরের নিচ থেকে মাছ বের করল। বোয়াল মাছের প্রাণশক্তি ভালো। সে এখনো জীবিত। কানকো নড়ছে।

নিবারণ বলল, খেতে বস। বাইরে বসে খাবি। মুসলমানের ভিতরে ঢোকা নিষেধ। অন্যের খাওয়া নষ্ট হয়। যা কলাপাতা কেটে নিয়ে আয়।

সবুজ কলাপাতায় ধবধবে সাদা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। ঝিঙা দিয়ে রাঁধা লাবড়া, সঙ্গে মলা মাছের ঝোল। খেতে খেতে লাবুসের মনে হলো, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ভরপেট খাওয়ায়। এইজন্যেই হয়তো বেহেশতে খাওয়া-খাদ্যের বর্ণনায় এত জোর দেয়া হয়েছে।

লাবুসের কলাপাতার ভাত শেষ হয়েছে। সে হাত গুটিয়ে বসে আছে, তার দৃষ্টি পাচক বামুনের দিকে।

নিবারণ বলল, অ্যাই এরে আরো ভাত দে, ডাল দে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে কেউ আমার দোকান থেকে উঠবে, এটা ঠিক না। এতে অন্নপূর্ণা অসন্তুষ্ট হন।

লাবুস যখন খাচ্ছিল, তখনি বেঙ্গল নেভিগেশনের লঞ্চে করে ধনু শেখ বান্ধবপুরের ঘাটে এসে নামেন। পা কাটা যাবার পর এই প্রথম তিনি নিজ গ্রামে এসেছেন। যে লঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে আগে তিনি চোখ বন্ধ করে নামতেন, আজ সেই সিঁড়ি দিয়ে তাকে কোলে করে নামানো হচ্ছে। কী লজ্জার কথা! দুনিয়ার মানুষও জড়ো হয়েছে লঞ্চঘাটে। যেন তারা জীবনে কখনো এক ঠ্যাং-এর মানুষ দেখে নাই। সব বদের দল। ধনু শেখের ইচ্ছা করছে দু'নলা বন্দুক দিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করেন, যাতে ভয়ে লোকজন ছুটে পালায়। তিনি নিরিবিলিতে নামতে পারেন।

ধনু শেখকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে চেয়ারের হাতলে বাঁশ বেঁধে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতি বিরক্তি নিয়ে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। চারজন মিলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হয়েছে পাল্কির মতো। পাল্কির ভেতরে বসে থাকা মানুষ দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

চেয়ারের পেছনে পেছনে বালক-বালিকার বিশাল এক বাহিনী। ধনু শেখের লোকজন ধমক ধামক দিয়েও এদের দূর করতে পারল না। এমন মজার দৃশ্য তারা অনেক দিন দেখে নি। যতক্ষণ দেখা সম্ভব ততক্ষণ তারা দেখবেই।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, খামাকা পিছে পিছে না এসে স্লোগান দে। বল, খান বাহাদুর ধনু শেখ জিন্দাবাদ।

শিশুরা মহাআনন্দে জিন্দাবাদ দিতে লাগল। এত আমোদ তারা অনেক দিন পায় নি।

রাত আটটার মতো বাজে। বান্ধবপুরের বেশির ভাগ মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। ধনু শেখ জেগে আছেন। তিনি এখনো রাতের খাওয়া খান নি। রান্নাবান্নার আয়োজন

হচ্ছে। রাতে তিনি মাছ খান না। তাঁর জন্যে খাসি জবেহ্ হয়েছে। কোলকাতায় খাসির মাংস বলে যা পাওয়া যায়, সবই পাঁঠা। হাজার মসলা দিলেও মাংস থেকে গন্ধ যায় না।

ধনু শেখের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল না। পা কাটা যাবার পর সামান্য মদ্যপান শুরু করেছেন। জাহাজে করে কোম্পানির লোকজনের জন্যে বিলাতি বোতল আসে। নানা যন্ত্রণা করে তিনি সেখান থেকে বোতল সংগ্রহ করেন। মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে ভাবেন, ইংরেজ জাতি কত উন্নত। এরা যখন মদ বানায়, সেই মদও উন্নত। আমরা এখনো পড়ে আছি ধেনু মদে। এতই দুর্গন্ধ যে নাক চাপা দিয়ে খেতে হয়।

ধনু শেখ লাবুসকে খবর দিয়ে এনেছেন। সে অনেকক্ষণ থেকে ধনু শেখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধনু শেখ কয়েকবার তার দিকে তাকিয়েছেন, কিছু বলেন নি। নিজের মনে ডাবের পানি মেশানো 'জিনে'র বোতলে চুমুক দিয়েছেন। এইবার তিনি কথা শুরু করলেন—

তোমার নাম লাবুস ?

হ্যাঁ।

হুঁ হ্যাঁ করছ কেন ? আদব লেহাজ ভুলেছ ? কার সঙ্গে কথা বলতেছ বিস্মরণ হয়েছ ? আমি খান বাহাদুর। আদবের সঙ্গে কথা বলবা। বলো জি।

জি।

সুলেমানের পুত্র ?

জি।

সুলেমান কোথায় ?

উনি ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে গেছিলেন, আর ফিরেন নাই।

ধনু শেখ আনন্দিত গলায় বললেন, ঘোড়ায় যেতে যেতে ইউরোপে চলে গেছে কি-না খোঁজ নাও। দেখা গেল যুদ্ধের মধ্যে পড়েছে। হা হা হা।

লাবুস বলল, আপনি কী জন্যে আমাকে ডেকেছেন ?

ধনু শেখ ভুরু কুঁচকে বললেন, এত তাড়া কী জন্যে ? তুমিও কি ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষায় বের হবে ? গায়ে চাদর কেন ? গরমের মধ্যে চাদর, ঘটনা কী ?

লাবুস চুপ করে রইল।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, প্রশ্ন করলে জবাব দিবা। আল্লাহ্পাক বোবা বানালে তুমি বোবা। নিজ থাইকা বোবা সাজবা না। গায়ে চাদর কেন ?

লাবুস বলল, আমার কাপড় নাই, চাদর দিয়া নিজেরে ঢাইকা রাখি।

ধনু শেখ চারমিনার সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সিগারেট ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, বাপের মতো ভিক্ষায় বাইর হও নাই কেন ? পিতা ভিক্ষুক পুত্রও ভিক্ষুক। ভিক্ষুক বংশ।

লাবুসের দৃষ্টি তীক্ষ্ম হলো। সে কিছু বলল না। এই মানুষটা শশাংক পালের মতো কথা বলছে। খুবই আশ্চর্যের কথা, কিছু কিছু মানুষ একইভাবে চিন্তা করে। তাদের পরিণতিও হয় একই।

ধনু শেখ বললেন, তোমাকে বিশেষ কারণে ডেকেছি। রসালাপ করার জন্যে ডাকি নাই। রসালাপ করতে হয় অল্পবয়সি মেয়েছেলের সাথে। বুঝেছ ?

বুঝেছি।

হরিচরণের বিশাল বিষয়সম্পত্তি, সব তিনি যে তোমারে দানপত্র করে দিয়েছেন সেটা জানো ?

না।

দানপত্রের মূল কপি আমার কাছে আছে। দানপত্র নিয়া যাও— মুফতে যে জিনিস পেয়েছ ভোগ কর। তার আগে সাবান ডলে ভালোমতো গোসল কর। টাকা দিতেছি— জামাকাপড় কিনো।

ধনু শেখ একশ' রুপির একটা নোট বের করলেন। লাবুস সহজ ভঙ্গিতে নোট হাতে নিল। ধনু শেখ উদার গলায় বললেন, রাতে আমার সঙ্গে খানা খাবে। পোলাও খাসির মাংস।

এত বড় একটা ঘটনা জানার পরেও একটা ছেলে এত নির্বিকার কেন ধনু শেখ ভেবে পেলেন না। পাগল না তো ! সুস্থ মাথার মানুষ হলে আনন্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত।

লেখাপড়া কিছু জানো ?

অল্প জানি।

যুদ্ধ যে চলতেছে এইটা জানো ?

শুনেছি।

কার সাথে কার যুদ্ধ ?

জার্মানি আর জাপানের সাথে সারা দুনিয়ার যুদ্ধ।

আমরা ভারতবাসী কার সাথে আছি ?

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে।

উনি কোথায় ?

উনি ইংরেজের হাতে বন্দি।

যুদ্ধে কে জিতবে ?

কেউ জিতবে না, তবে হিটলার হারবে। জাপানে দুইটা বড় বোমা পড়বে। জাপান হারবে।

ধনু শেখ বললেন, জাপানে দুইটা বড় বোমা পড়বে তোমাকে কে বলেছে ? চার্চিল সাব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন ?

লাবুস বলল, আমি অনেক কিছু চোখের সামনে দেখি।

ধনু শেখ বললেন, তুমি তো বিরাট পীর হয়েছ। শরীরে নাই কাপড়, পেটে নাই ভাত। কিন্তু পীর কেবলা।

লাবুস শান্ত গলায় বলল, এখন তো ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

ধনু শেখ রাগী গলায় বললেন, ব্যবস্থা কে করেছে ? আমি, না-কি হরিচরণ ?

লাবুস জবাব দিল না। ধনু শেখ হঠাৎ লক্ষ করলেন, নোংরা চাদর গায়ে যে যুবক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সে অসম্ভব রূপবান একজন। মদের ঝোঁকে এরকম দেখছেন ? বেশি তো খাওয়া হয় নি। মাত্র তিন গ্লাস।

তুমি নিশ্চয়ই বিবাহ কর নাই ?

জি-না।

আমার কন্যাকে বিবাহ করবা ? তার নাম আতর। আমার মতো তার ঠ্যাং কাটা না। সে ভালো মেয়ে।

লাবুস পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো। তার ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস। ধনু শেখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এই ছেলে সত্যি সত্যি হেসে ফেললে তাকে রাম ধোলাই দিতে হবে। বেয়াদবির শাস্তি।

ধনু শেখের নিজের ওপরই রাগ লাগছে। হুট করে এই ফকিরের পুলাকে মেয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেললেন ? দেশে কি সুপাত্রের অভাব হয়েছে ? তিনি বুঝতে পারছেন যা করেছেন সবই মদের ঝোঁকে করেছেন। এই বস্তু খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ধনু শেখ বললেন, খাম্বার মতো সামনে দাঁড়ায়া থাকবা না। বিদায়।

লাবুস বলল, রাতে আপনার সঙ্গে খানা খেতে বলেছিলেন।

ধনু শেখ বললেন, যা বলেছিলাম ফিরায়ে নিলাম। খান বাহাদুর ধনু শেখ ভিক্ষুকের সাথে খানা খায় না। সামনে থেকে যাও।

লাবুস ঘর থেকে বের হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনু শেখ তার সন্ধানে লোক পাঠালেন। তাঁর কাছে মনে হলো, একবার যখন খানা খাওয়াবেন বলে কথা দিয়েছেন তখন কথা রাখা উচিত।

রাত দু'টা বাজে। মাওলানা ইদরিস উঠানে বসে আছেন। উঠানে আলো নেই। আকাশে মেঘ থাকায় চাঁদ বা নক্ষত্রের কোনো আলোও নেই। তাঁর চারদিকে ঘন অন্ধকার। ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভেতর থেকে হারিকেনের সামান্য আলো আসছে। ইদরিস তাকিয়ে আছেন আলোর দিকে। তাঁর মন সামান্য বিষণ্ন। শশাংক পালের বিষয়ে একটা কথা শোনা যাচ্ছে। সে না-কি মরে ভূত হয়েছে। অনেকেই শ্মশানঘাটে তাকে দেখেছে। নগ্ন অবস্থায় নদীর পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে। কাউকে দেখতে পেলে দুঃখিত গলায় বলে, এইটা কী করলা ? একজন মুসলমানরে দিয়া আমার মুখাগ্নি করাইলা ? এই কারণে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছি। গয়ায় পিণ্ডিদানের ব্যবস্থা কর। আমারে উদ্ধার কর।

গয়ায় পিণ্ডিদানের বিষয়টা কী ইদরিস জানেন না। যারা জানে তারাও এই বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিবে বলে মনে হয় না। পিণ্ডি দেওয়ার কাজটা কি কোনো মুসলমান্ন করতে পারে ? পারলে তিনি করতে রাজি আছেন। সমস্যা একটাই, গয়াকাশি যাবার মতো অর্থসংস্থান তাঁর নেই। তবে তাঁর ধারণা, মুখাগ্নির মতো পিণ্ডিদানের ব্যবস্থাটাও হিন্দুদের করতে হবে। তাঁকে দিয়ে হবে না।

গয়াকাশি না গেলেও মাওলানাকে একবার বগুড়ার মহাস্থানগড়ে যেতে হবে। শশাংক পাল মৃত্যুর আগে তাকে এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেখানে ললিতা নামে এক মেয়েকে খুঁজে বের করে বলতে হবে— বান্ধবপুরের এক সময়ের জমিদার বাবু শশাংক পাল তোমার পিতা। জীবিত অবস্থায় এই খবর তিনি তোমাকে দিতে পারেন নাই বলে তিনি বিশেষ লজ্জিত। তিনি তোমার জন্যে কিছু উপহার রেখে গেছেন। দশটা সোনার মোহর। বিশেষ একটা জায়গায় মাটিতে গর্ত করে পোঁতা।

জুলেখা দরজায় এসে দাঁড়াল। হাই তুলতে তুলতে বলল, একটু ভিতরে আসবেন ? খাটের নিচে সাপ। সাপটা বিদায় করেন।

খাটের নিচে অন্যসব দিনের মতো হারিকেন জ্বলছে। আলোয় সাপ আসে না— এই কথা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে হারিকেনের কাছেই সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মাওলানা হাততালি দিয়ে বললেন, অ্যাই যা। যা !

সাপটা মাথা তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ মাওলানাকে দেখে আবার মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়ল। জুলেখা বলল, সাপ খেদানির কোনো দোয়া জানেন না ? দোয়া পড়েন।

মাওলানা বললেন, খোদার কালাম নিয়া ঠাট্টা-তামাশা করবা না।

জুলেখা বলল, অন্য ব্যবস্থা নেন। লাঠি দিয়া মারেন।

মাওলানা বললেন, না। সে আমার কোনো ক্ষতি করে নাই। আমি তারে মারব কী জন্যে ?

যখন ক্ষতি করব তখন কিন্তু আর উপায় থাকব না। এইটা শঙ্খচূড় সাপ। এর বিষ নামানি কোনো ওঝার পক্ষেও সম্ভব না।

মাওলানা সাপ খেদানোর চেষ্টা আরেকবার করলেন। শলার ঝাড়ু দিয়ে কয়েকবার সাপের খুব কাছাকাছি বাড়ি দিলেন। সাপের কোনো ভাবান্তর হলো না। মাথা উঁচু করে সে একবার মাওলানাকে দেখল, আরেকবার জুলেখাকে দেখে আগের মতো মাথা নামিয়ে ফেলল। মাওলানা বা জুলেখা দু'জনের কেউ তখন জানে না এই শঙ্খচুড় সাপটা ডিম পাড়ার জন্যে খাটের নিচটা বেছে নিয়েছে। তাকে এখান থেকে সরানো এখন অসম্ভব।

ধনু শেখ খেতে বসেছেন। খাটে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার সাজানো হয়েছে। লাবুস তাঁর সঙ্গেই বসেছে। কালিজিরা চালের পোলাও, খাসির মাংস। বাটিভর্তি পেঁয়াজ দেয়া হয়েছে। খাদিমদার আছে দু'জন। একজন লাবুসের প্লেটে খাবার দিচ্ছে, আরেকজন ধনু শেখকে দেখছে।

লাবুস মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। তার গায়ে নকশাতোলা পাঞ্জাবি। পায়জামা পাঞ্জাবিতে লাবুসকে সত্যিকার অর্থেই রাজপুত্রের মতো লাগছে। ধনু শেখ খানিকটা বিচলিত বোধ করছেন। কেন করছেন তাও বুঝতে পারছেন না। তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার নাম কী বলেছিলা বিস্মরণ হয়েছি। আরেকবার বলো।

লাবুস।

পিঁয়াজ নিয়া খাও। মুসলমানদের জন্যে পিঁয়াজ খাওয়া দুস্তর। কারণ পিঁয়াজ মুসলমান। রসুন হিন্দু। বুঝেছ ?

হুঁ।

একবার তো বলেছি হুঁ হাঁ করবা না। এখন তোমাকে আদবকায়দা শিখতে হবে। কারণ তুমি এখন রইস আদমি।

লাবুস বলল, রইস আদমির দোষ-ত্রুটি লাগে না। দোষ-ত্রুটি গরিবের জন্য।

তোমাকে এইসব কে শিখায়েছে ? তোমার ভিক্ষুক পিতা ?

আমার যা শিখার আমি নিজে শিখেছি। আমার কোনো শিক্ষক নাই।

ধনু শেখ বললেন, আমারে শিক্ষক মানতে পার। আমি অনেক কিছু জানি যা তুমি জানো না। সোহ্‌রাবর্দীর নাম শুনেছ ?

জি-না।

তিনি এখন আমাদের নেতা। আমি তাঁর নাম দিয়েছি কাটাকুটি নেতা।

কেন ?

কারণ তিনি গোপনে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা বলেন। তাঁর মন্ত্র হিন্দু কমাও।

মুসলমান কমাও, এই মন্ত্র কি কেউ বলে ?

সব হিন্দু নেতাই মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে বলে।

গান্ধিজি কি বলেন ?

গান্ধিজি চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে গান্ধিপোকার মতো 'পাদ' দেন। তখন সব জ্বলেপুড়ে যায়। হা হা হা।

লাবুস খাওয়া বন্ধ করে ধনু শেখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁর হাসি অবিকল শশাংক পালের হাসি। মানুষটা চলে গেছে, কিন্তু তার হাসি রেখে গেছে।

ধনু শেখ বললেন, হিন্দু মারতে হবে এটা মাথার মধ্যে রাখবা। হিন্দু না মারলে পাকিস্তান কায়েম হবে না। হিন্দু মারলে ইংরেজ সরকার তোমাকে কিছুই বলবে না। কী জন্যে কিছু বলবে না জানো ?

জানি না।

ইংরেজ চায় আমরা নিজেরা মারামারি করি। আমরা মারামারি করলে তারা থাকবে নিরাপদ। তখন ক্ষুদিরামরা তাদের মারবে না। এখন বুঝেছ যে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা আমার আছে ? কী হলো, খাওয়া শেষ ?

জি জনাব খাওয়া শেষ।

লাবুস হাত না ধুয়েই উঠানে নেমে গেল। ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টিতেই হাত ধোয়া হয়ে যাবে। লাবুস ভিজতে ভিজতে হরিচরণের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। পাকা পুলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। খালে পানি বেড়েছে, শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। শুনতে ভালো লাগছে। শব্দের মধ্যেও ভালো মন্দ আছে। কিছু শব্দ শুনতে ভালো লাগে, কিছু শব্দ শুনতে খারাপ লাগে। এর কারণ কী ? আল্লাহপাক মানুষকে যেমন ভালো এবং মন্দতে ভাগ করছেন— জগতের সবকিছুকেই তাই করেছেন ? এ তাঁর কেমন লীলা ?

বৈশাখের শুরু। ভোরের আলো ভালোমতো ফোটে নি। আকাশ মেঘলা বলে চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে। আকাশের মেঘ কিছুটা মনে হয় নিচেও নেমে এসেছে। জায়গায় জায়গায় গাঢ় কুয়াশা। বৈশাখ মাসের সকালে কুয়াশা পড়ে না। আজ পড়েছে।

হরিচরণের কবর এবং তার চারপাশ কুয়াশার মধ্যে পড়েছে। দূর থেকে আবছাভাবে বাঁধানো কবর এবং কবরের পাশের আমগাছটা চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে কেউ একজন কবরের ওপর মস্ত ছাতা মেলে ধরে আছে।

কবরের ঠিক মাথার কাছে আমগাছ কেউ লাগায় নি। আপনাআপনি হয়েছে। এবং অতি দ্রুত বিশাল বৃক্ষের রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর এই গাছে মুকুল আসে না। দু'বছর পর পর আসে। এই বছর ঝাঁকিয়ে মুকুল এসেছে। গাছের ডালভর্তি সুতা। সবার ধারণা কোনো কিছুর জন্যে আমগাছে সুতা বেঁধে প্রার্থনা করলে তা মিলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে নিজের মাথার চুল বাঁধতে হয়।

আমগাছের কাণ্ডে হাত রেখে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে তার নাম শিবশংকর। কোলকাতায় জাপানিরা বোমা ফেলবে এমন এক গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর শিবশংকরের বাবা মনিশংকর ছেলেকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আতঙ্কে বাস করার কোনো মানে হয় না। শিবশংকরকে নিয়ে এমনিতেই তিনি আতঙ্কে থাকেন। তার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাচ্ছে না। অসুখবিসুখ লেগেই থাকছে। শিবশংকরের সঙ্গে তিনি গোপীনাথ বল্লভ নামের একজনকে পাঠিয়েছেন। গোপীনাথ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। যোগ ব্যায়াম ভালো জানেন। যোগ ব্যায়ামের ওপর তাঁর একটা বই আছে। বইয়ের নাম— 'যোগ ব্যায়াম, নিরোগ শরীর'।

গোপীনাথ বল্লভের দায়িত্ব শিবশংকরের স্বাস্থ্য ঠিক করে দেয়া। এই কাজটা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। তাঁর নির্দেশেই সূর্য ওঠার আগে শিবশংকরকে উঠতে হয়। খালিপায়ে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর একঘণ্টা হাঁটতে হয়। হাঁটার পর পাঁচ মিনিট বজ্রাসন এবং পাঁচ মিনিট শবাসন করতে হয়। আসনের পর

ভরপেট পানি খেয়ে গলায় আঙুল দিয়ে সেই পানি বমি করে উগরে ফেলতে হয়। এই পদ্ধতির নাম পাকস্থলী ধৌতকরণ।

ধৌতকরণ শেষ হবার পর এক কাপ চিরতার পানি এবং মধু দিয়ে মাখিয়ে এক কোয়া রসুন খেতে হয়। রসুন খাবার পর আবার পাঁচ মিনিটের জন্যে শবাসন।

জটিল নিয়মকানুন। শিবশংকর প্রতিটি নিয়ম নিখুঁতভাবে পালন করে। তার প্রকৃতিটাই এমন যে, সে যা করে নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করে। যেন তাকে গণিতের একটা সূত্র দেয়া হয়েছে। তাকে থাকতে হবে সূত্রের ভেতরে। তবে পায়ে শিশির মাখানোর একটা পর্যায়ে সে হরিচরণের কবরের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রণামের ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আমগাছটার চারদিকে চক্কর দেয়। এই চক্কর দেয়ার মধ্যেও সে অংক নিয়ে এসেছে। ফিবোনাচ্চি রাশিমালায় চক্কর। প্রথম দিনে এক চক্কর, দ্বিতীয় দিনে এক চক্কর। তৃতীয় দিনে ২ বার, চতুর্থ দিনে ৩ বার।

ফিবোনাচ্চি রাশিমালা হলো, ১ ১ ২ ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১ ... । এই রাশিমালায় যে-কোনো সংখ্যা আগের দু'টি সংখ্যার যোগফল। শিবশংকর আজ ১৩ সংখ্যায় পড়েছে। আমগাছ ঘিরে সে চক্কর দিচ্ছে। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখলেন মাওলানা ইদরিস। তিনি কাছে এসে অবাক হয়ে বললেন, কে ?

শিবশংকর জবাব দিল না। যন্ত্রের মতো ঘুরতে লাগল। তের প্রদক্ষিণ শেষ করে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমার নাম শিবশংকর।

তুমি মনিশংকর বাবুর ছেলে ? কেমন আছ বাবা ?

ভালো আছি।

গাছের চারদিকে ঘুরছ কেন ?

এম্নি। কাকু, আপনি ভালো আছেন ?

ভালো আছি বাবা। আমাকে চিনেছ ?

কেন চিনব না! এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলেন ?

নদীর ঘাটে গিয়েছিলাম। এম্নি গিয়েছিলাম, কোনো কাজে না।

শিবশংকর অস্পষ্ট গলায় প্রায় বিড়বিড় করে বলল, প্রতিটি মানুষের কাজকর্মের ত্রিশভাগ অর্থহীন।

মাওলানা বললেন, কথাটা ভালো বলেছ তো। তবে কিছু মানুষের জন্যে এটা ঠিক না। হরিচরণ বাবু জীবনে কখনো অর্থহীন কাজ করেন নি।

শিবশংকর বলল, আপনি তো তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেন নি। কাছ থেকে দেখলে হয়তোবা জানতেন তাঁর জীবনের ত্রিশভাগ কাজ অর্থহীন।

তুমি পড়াশোনা কী করছ ?

কলেজে ভর্তি হয়েছি।

মেট্রিকে তো খুব ভালো করেছিলে। স্বর্ণপদক পেয়েছিলে। মনিশংকর বাবু এই উপলক্ষে সবাইকে খানা দিলেন। তোমারও আসার কথা ছিল।

হঠাৎ শরীর খুব খারাপ করল, আসতে পরলাম না। আমার শরীর ভালো না। প্রায়ই অসুখবিসুখ হয়।

হরিচরণ বেঁচে থাকলে তোমার কারণে আনন্দ পেতেন। তিনি যে তোমার অসুখ ভালো করেছিলেন, এটা কি তোমার মনে আছে ?

শিবশংকর নিচু গলায় বলল, মনে আছে। তবে তিনি আমার অসুখ সারান নি, এই ক্ষমতা মানুষের নাই। আমি ভালো হয়েছি আপনাআপনি। মানুষের শরীরে নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাই কাজ করেছে।

মাওলানা বললেন, বাবা যাই ?

শিবশংকর দুই হাত জোড় করে মাথা খানিকটা নিচু করে বলল, নমস্কার।

হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি এই আদব দেখায় না। মুসলমানরাও দেখায় না। বিধর্মী কাউকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে না। তিনি নিজে বলতে কোনো বাধা দেখেন না। 'আসসালামু আলাইকুম'-এর অর্থ— তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাড়ছে। কেন বাড়ছে তিনি জানেন না। উড়া উড়া শোনা যাচ্ছে— মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশ হবে, হিন্দুদের জন্যে আলাদা দেশ। মুসলমানের দেশে কোনো হিন্দু থাকতে পারবে না। মন্দির থাকতে পারবে না। সব মন্দির শুদ্ধ করে মসজিদ বানানো হবে। হিন্দু দেশেও একই ব্যবস্থা। তবে তাদের ব্যবস্থা আরেকটু জটিল। হিন্দুরাজ্যে ভাগ ভাগ থাকবে— এক ভাগে ব্রাহ্মণ, আরেক ভাগে ক্ষত্রিয় ...। শুধু অস্পৃশ্যদের জন্যে আলাদা দেশ হবে। অস্পৃশ্যরা সেই দেশে থাকবে। সেই দেশের নামও না-কি ঠিক হয়েছে 'হরিজন দেশ'। নামটা দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধি। তিনি হবেন হরিজন দেশের রাজা।

গত কয়েকদিন ধরে জুম্মাঘরের টিনের ছাদে একটা শকুন বসছে। এটা ভালো লক্ষণ না। অতি অশুভ লক্ষণ। কে জানে বান্ধবপুর হয়তো হিন্দুরাজ্যে পড়বে। তারা মসজিদটাকে মন্দির বানিয়ে ফেলবে। সন্ধ্যাবেলায় মসজিদ থেকে আজানের শব্দ আসবে না। কাঁসার ঘণ্টার শব্দ আসবে।

মাওলানা ইদরিস অবেলায় খেতে বসেছেন। চারটা প্রায় বাজে। আসরের নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। আসরের আজান পড়ে গেলে আর খাওয়া যাবে না। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ। এই সময়ে কেয়ামত হবে বলেই খাওয়া-খাদ্যে মন না দিয়ে শেষ বিচারের কথা ভেবে বিষণ্ণ থাকার বিধান আছে। সেই সময় সূর্য নেমে আসবে মাথার এক হাতের মধ্যে। শরীর থেকে ঝরনার মতো ঘাম বের হবে। মানুষ নিজের ঘামের সমুদ্রে ডুবে যাবে। 'ইয়া নফসি! ইয়া নফসি!' বলার ফুরসতও পাবে না।

আজ খানা খেতে এত দেরি হবার কারণ খাওয়া জোগাড় হয় নি। এখন যে জোগাড় হয়েছে তাও বলা যাবে না। কুরানি দিয়ে নারকেল কুরিয়ে এক প্লেট নারকেল এবং লবণ মাখানো দু'টা শসা নিয়ে মাওলানা বসে আছেন। পাশে এক গ্লাস পানি। আলাদা একটা পিরিচে সামান্য লবণ এবং এক টুকরা কাগজি লেবু। লেবু থেকে সুন্দর গন্ধ আসছে। তিনি নিয়মমাফিক প্রথমেই চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্পাককে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বললেন, 'হে গাফুরুর রহিম! তুমি যে তোমার বান্দাকে ভুলে যাও নাই এতেই আমি খুঁশি। তুমি বান্দার রিজিকের ব্যবস্থা করেছ, এই জন্যে বান্দার আনন্দের সীমা নাই।'

মাওলানা বিসমিল্লাহ্ বলে লবণ জিভে ছোঁয়ালেন। নবী-এ-করিম (দঃ) জিভে লবণ ছুঁইয়ে খাওয়া শুরু করতেন। প্রতিটি বিষয়ে নবীকে অনুসরণ করা সব মুসলমানের কর্তব্য। তাঁর খাবার সময় জুলেখা সামনে থাকে। আজ জুলেখা নেই। সে পাশের ঘরে কী যেন করছে— খুটখাট শব্দ আসছে। মাওলানা ডাকলেন, জুলেখা!

জুলেখা সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখ কঠিন। একটু আগে সে যে কেঁদেছে, এটা বোঝা যায়। গালের পানির দাগ শুকিয়ে আছে। মাওলানা বললেন, অতি তৃপ্তি সহকারে খানা খাচ্ছি।

জুলেখা বলল, আপনার মুখে রুচি বেশি— যাই দিব তাই তৃপ্তি নিয়া খাবেন। আমপাতা সিদ্ধ করে দিলে আমপাতা খেয়েও বলবেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।

মাওলানা বললেন, আজকের খাওয়া নিয়া তুমি মনঃকষ্টে আছ, এইটা বুঝতে পারতেছি। মনঃকষ্টে থাকবা না— আল্লাহ্পাক নারাজ হবেন।

নারাজ হবেন কেন ?

কারণ তিনি রিজিকের মালিক। তাঁর ঠিক করে দেয়া রিজিক দেখে মন খারাপ করলে তিনি নারাজ হবেন না ?

জুলেখা তীব্র গলায় বলল, নারাজ হলে হবেন। আমি মনে কষ্ট নিয়া থাকব।

মাওলানা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তুমি যে মনঃকষ্টে থাকবা এইটাও কিন্তু তার বিধান। তিনি সূরা বনি ইস্রাইলে বলেছেন, 'আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব।' তুমি যে মনে কষ্ট পেয়েছ, এইটাও তোমার গলার হারে লেখা ছিল বলেই পেয়েছ।

জুলেখা বলল, আমি যদি আজ সন্ধ্যায় আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, সেটাও কি গলার হারে লেখা ?

মাওলানা বললেন, তুমি কোথায় যাবে ?

আমি আগে যে প্রশ্ন করেছি তার জবাব দেন।

মাওলানা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি যা করবে সবই তোমার ভাগ্যে লেখা।

জুলেখা বলল, আমি আপনারে ফালায়া চইলা গেলে আপনি রাগ করতে পারবেন না। এইটা আমার ভাগ্যে লেখা ছিল।

মাওলানা শসায় কামড় দিলেন। জুলেখা তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। সে যে চলে যাবার কথা বলছে— এটা কতটুক সত্যি তাও বুঝতে পারছেন না। পোয়াতি অবস্থায় অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক চিন্তা মাথায় আসে। বিচিত্র সব কাজ করতে ইচ্ছা করে। জুলেখার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ব্যাপারটা এরকম কিছুই হবে। সে যাবে কোথায় ? তার যাবার জায়গা কই ?

জুলেখা বলল, বেশ কিছু দিন ধরে আমি ঠিকমতো খাওয়া-খাদ্য করতে পারতেছি না। কারণ ঘরে খাওয়া নাই। পেটের সন্তানটার জন্যে আমার ভালো খানা দরকার। এই সন্তান আমার অনেক কষ্টের। এর অযত্ন হইতে আমি দিব না। সেই জন্যেই আপনারে ছেড়ে যাব।

মাওলানা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কই যাবে ? খাওয়া-খাদ্য কে তোমারে দিবে ?

জুলেখা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আল্লাহপাক দিবেন, তবে অন্যের মাধ্যমে দিবেন।

অন্যটা কে ?

সেটা আপনার জানার প্রয়োজন নাই।

মাওলানার মুখে খাওয়া এখন রুচছে না। খাওয়া ফেলে উঠে পড়তেও পারছেন না। এতে রিজিকের অসম্মান হয়। আল্লাহপাক রিজিকের অসম্মান পছন্দ করেন না। রিজিকের অসম্মান এক অর্থে তাঁরই অসম্মান।

জুলেখা বলল, একটা সোনার নাকফুল আর আটটা রুপার চুড়ি বিছানার উপর রেখেছি। খাওয়া শেষ করে এগুলি নিয়া বাজারে যাবেন। বিক্রি করে চাল, ডাল, তেল কিনবেন।

মাওলানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা। তিনি এখন নিশ্চিত হয়েছেন জুলেখা কোথাও যাবে না। তিনি শশার ওপর কাগজি লেবুর রস দিলেন। শশায় কামড় দিলেন। কী স্বাদ ! আল্লাহ্‌পাকের মহিমা। সামান্য শশায় তিনি বেহেশতি খানার স্বাদ দিয়েছেন।

বান্ধবপুর বাজারে বিরাট উত্তেজনা। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু পালিয়ে গেছেন। ইংরেজ সরকার তাকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। অসংখ্য গোরা পুলিশ বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা মাছিরও যেখানে পালাবার উপায় নেই, সেখানে একজন জলজ্যান্ত মানুষ কীভাবে পালাবে ? এই অসাধ্য নেতাজি সাধ্য করেছেন। পুলিশের এখন মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। গোলগাল চেহারার যাকেই পাচ্ছে তাকেই ধরছে। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাস করছে, 'তুম নেতাজি হ্যায় ?'

মাওলানা ইদরিস অবাক হয়েই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, নেতাজিটা কে ? উনার পরিচয় কী ?

যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে বিরক্ত হয়ে বলল, নেতাজিরে চিনেন না, আপনি থাকেন কই ? জঙ্গলে ?

মাওলানা বিব্রত বোধ করছেন। অনেককে তিনি চিনেন। জিন্নাহ্ সাবকে চিনেন, মহাত্মা গান্ধিকে চিনেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে চিনেন। নেতাজির নাম এই প্রথম শুনছেন। তিনি যে অতি ক্ষমতাধর ব্যক্তি এটাও বোঝা যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় এককড়ির দোকানে খবরের কাগজ পাঠ হয়। প্রথমবারের মতো মাওলানা খবরের কাগজের পাঠ শোনার জন্যে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পত্রিকা পাঠক গৌরাঙ্গ বললেন, আজকের কাগজের পুরা পাতা গরম খবরে ভর্তি। এত গরম যে, কাগজে হাত দিলেই হাতে ফোসকা পড়ে যাবে। গৌরাঙ্গ কাগজের গরম কমানোর জন্যে ক্রমাগত কাগজে ফুঁ দিচ্ছেন। শ্রোতারা খুবই আমোদ পাচ্ছে। গৌরাঙ্গ বললেন, কোনটা রেখে কোনটা পড়ি ? যুদ্ধের খবরটা পরে পড়ব। গান্ধিজিরও গরম খবর আছে। উনি ডিগবাজি খেয়েছেন।

গান্ধিজির ডিগবাজি

হিটলারের বোমারু বিমানের আক্রমণে লন্ডন নগরী

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় গান্ধিজি মনক্ষুণ্ন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশদের ধ্বংস করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আমি চাই না।

শ্রোতাদের ভেতর থেকে বিস্ময়ের ধ্বনি উঠল। একজন বলল, গান্ধিজি ইংরেজের পয়সা খেয়েছেন। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

আরেক শ্রোতা বলল, সারাজীবন বলেছে রাম রাম, এখন বলে টেঁ টেঁ। যুদ্ধের খবর শুনি, গান্ধিজি শুইন্যা লাভ নাই। নেতাজি পালায়া কোথায় গেছেন এই বিষয়ে কিছু আছে? এখন আমাদের ভরসা নেতাজি। গান্ধি দিয়া কাম হবে না। শুদ্রের পুলার গালে চুমা দিয়া স্বরাজ আনা যায় না।

গৌরাঙ্গ বললেন, বড় খবর আছে। সবের শেষে পড়ব।

মাওলানা ইদরিস পুরো কাগজ শুনে বাড়ি ফিরে দেখলেন, জুলেখা ঘরে নেই। সন্ধ্যার পর পুকুর থেকে পানি আনার জন্যে আগে পুকুরে যেত। শরীর ভারী হবার পর যাওয়া বন্ধ করেছে। তারপরও মাওলানা পুকুর ঘাটে খোঁজ নিতে গেলেন। সেখানেও জুলেখাকে পাওয়া গেল না।

জুলেখা বাড়িঘর সুন্দর করে গুছিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে দু'টা আগরবাতির কাঠি জ্বালিয়েছে। কাঠি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধ আছে। মন শান্ত করার জন্যে মাওলানা দরুদ পাঠ শুরু করলেন। একাগ্রচিত্তে দরুদ পড়লে অশান্ত মন শান্ত হয়। উন্মাদ রাগ গলে পানি হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। চাল ডাল তেল নুন এখন ঘরে আছে। ইচ্ছা করলেই খিচুড়ি বসাতে পারেন। তাঁর সেই ইচ্ছা করছে না। তিনি নৌকাঘাটায় গেলেন। জুলেখা নৌকা নিয়ে কোথাও গেলে ঘাটের মাঝিরা বলতে পারত। মাঝিরা কেউ কিছু বলতে পারল না।

লাবুস হরিচরণের বাড়িতে থাকতে শুরু করেছে। প্রথম দিন সে একাই ছিল, দ্বিতীয় দিনে একজনকে চাকরি দেয়া হলো। সে মহা উৎসাহে কাজে লেগেছে। তার নাম হাদিস উদ্দিন, মধ্যবয়স্ক ছোটখাটো মানুষ। পোলিওর কারণে একটা পা অশক্ত। সে চলে লেংচাতে লেংচাতে। বাজারে তাকে ডাকা হতো ব্যাঙউদ্দিন। কারণ সে নাকি ব্যাঙের মতোই লাফিয়ে চলে। এই পর্যন্ত তার জীবন কেটেছে ওস্তাদ চোর দরবার মিয়ার সাগরেদি করে। বছরখানেক ধরে দরবার মিয়া নিখোঁজ বলে সে কর্মশূন্য। বাজারে এর-তার দোকানের বারান্দায় তার খেয়ে না-খেয়ে দিন কাটছিল। চোরের সাগরেদকে কেউ চাকরি দেয় না।

লাবুস দিয়েছে। সে কয়েকবারই লাবুসকে বলেছে, আর কাউকে লাগবে না। কাজ যা আছে আমি একাই পারব। আমার হাত দশটা। দুইটা দেখা যায়। বাকি আটটা দেখা যায় না।

হাদিস উদ্দিন লোকটি আসলেই কাজের। সে ঘরদুয়ার মোটামুটি গুছিয়ে ফেলেছে। উঠানে কোমর সমান ঘাস গজিয়েছিল। ঘাস কাটা হয়েছে। টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে পড়ে ছিল। সেতাবনগর থেকে টিউবওয়েলের কারিগর এনে কল সারিয়েছে। হাদিস উদ্দিন রান্নাবান্নাতেও দক্ষ। সে লাবুসকে প্রথমদিনই বলেছে, আপনে খাইতে বসবেন চটি জুতা হাতে নিয়া। খাইতে গিয়া যদি দেখেন লবণ হয় নাই, কোনো একটা পদ খারাপ হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে চটি জুতা দিয়া গালে বাড়ি দিবেন। ভালো হইলে কিছু বলার নাই, খারাপ হইলে চটি জুতা।

লাবুস পুকুরঘাটে বসে আছে। সে সন্ধ্যা থেকেই বসে আছে। এখন রাত আটটা। আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ছবি পড়েছে পুকুরে। সুন্দর লাগছে দেখতে। কোনো বাতাস নেই বলে পুকুরের পানি নড়াচড়া করছে না। লাবুস যেখানে বসেছে, সেখান থেকে আকাশের চাঁদ এবং পুকুরের চাঁদ দু'টাকেই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত লাগছে। আশেপাশে কোথাও কেয়া ফুল ফুটেছে। তার তীব্র সুবাসও নাকে এসে লাগছে।

হাদিস উদ্দিন লাবুসের পাশে ফর্সি হুক্কা রাখতে রাখতে বলল, ছোটকর্তা, তামুক খান।

লাবুস বলল, আমি তামাক খাই না।

হাদিস উদ্দিনের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সিন্দুক ঘাঁটতে গিয়ে হুক্কার সন্ধান সে আজ সকালেই পেয়েছে। সারা দুপুর তেঁতুল দিয়ে ঘষে ঘষে রুপার হুক্কা ঝকঝকে করা হয়েছে। এক ফাঁকে তামাক টিক্কা আনতে তাকে বাজারে যেতে হয়েছে। সবচে' ভালো তামাকই এনেছে। মেশকে আম্বুরী। তার ওস্তাদ দরবার মিয়া এই তামাক খুব পছন্দ করতেন।

হাদিস বলল, হুক্কা নিয়া যাব ? না-কি একটা টান দিয়া দেখবেন ঘটনা কী ? ভালো লাগতেও পারে।

টান দিব না।

খানা কখন খাবেন ছোটকর্তা ?

দেরি আছে। আরেকটা কথা, তুমি আমাকে ছোটকর্তা ডাক কেন ? বড়কর্তাটা কে ?

হাদিস বলল, আপনিই বড়কর্তা। বয়স কম বলে ছোটকর্তা বলি। আপনি নিষেধ করলে আর ছোটকর্তা বলব না।

নিষেধ করছি না। তোমার যা ইচ্ছা ডাকবে।

হাদিস ছোট্ট একটা মিথ্যা কিছুক্ষণ আগে বলেছে। সচরাচর মিথ্যা কথা সে বলে না। তার কাছে বড়কর্তা দরবার মিয়া। আর কাউকে বড়কর্তা ডাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

হাদিস ইতস্তত করে বলল, দুইটা মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলব ?

বলো।

এই বাড়িতে যে একটা গুপ্তঘর আছে আপনি জানেন ?

লাবুস বলল, জানি। হরিকাকু আমাকে দেখিয়েছিলেন। কোলে করে গুপ্তঘরে ঢুকেছেন। সিন্দুকের ভিতর দিয়ে গুপ্তঘরে যেতে হয়। তুমি সন্ধান কীভাবে পেয়েছ ? সন্ধান পাওয়ার তো কথা না।

হাদিস আগ্রহের সঙ্গে বলল, সিন্দুকে কী আছে দেখতে গেছি, জিনিসপত্র নামাইতেছি— হঠাৎ দেখি সিন্দুকের নিচের তক্তার এক কোনায় একটা আংটা। আংটা টান দিতেই সিন্দুকের তালা খুলে গেল— দেখলাম এক সুরঙ্গ।

সুরঙ্গের ভিতরে ঢুকেছিলা ?

না।

ঢুক নাই কেন ?

আপনারে নিয়া ঢুকব, এইজন্যে ঢুকি নাই।

ও আচ্ছা। এখন তুমি যাও।

রাতে কি সুরঙ্গে ঢুকবেন ? ঢুকলে মশাল জ্বালাই। সাপখোপ থাকতে পারে।

রাতে ঢুকব না।

আগামীকাল দিনে কি ঢুকবেন ?

আগামীকালেরটা আগামীকাল চিন্তা করব। আর শোন, আজ রাতে আমি খাব না।

ক্ষুধা হয় নাই ?

ক্ষুধা হয়েছে, কিন্তু খাব না। উপাস দিব।

হাদিস বিস্মিত হয়ে বলল, কেন খামুকা উপাস দিবেন ?

লাবুস বলল, একসময় খাওয়া ছিল না, উপাস দিছি। এখন খাওয়া থাকা সত্ত্বেও উপাস দিব। দুই উপাসের মধ্যে পার্থক্য কী দেখব।

হাদিসের ভুরু কুঁচকে গেল। তার ক্ষীণ সন্দেহ হলো, ছোটকর্তার মাথায় ফর্টিনাইন আছে। মাথা ফর্টিনাইন লোকের সাথে কাজ করা মুশকিল। তারা চলে ঝোঁকের মাথায়। তার ওস্তাদ দরবার মিয়ার মাথার মধ্যেও ফর্টিনাইন ছিল। কোনো চোর পূর্ণিমার রাতে চুরিতে বের হয় না। তার ওস্তাদ বের হতেন। হাসি মুখে বলতেন, আন্ধাইরে চুরি করব কোন দুঃখে ?

লাবুস হাদিস উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার এখানে কাজ নেয়ার আগে তুমি তো অনেকদিন বাজারে ছিলে।

জি।

তোমার জানামতে বাজারে কেউ কি আছে যে প্রায়ই অভাবের কারণে না খেয়ে থাকে ?

একজন আছে। রামায়ণ পাঠ করে— শ্রীনাথ। কাজকর্ম পায় না। পেরায়ই এক দুই বেলা না খায়া থাকে। কী জন্যে জানতে চান ?

এম্নি। তুমি এখন যাও।

রাতে সত্যই খাবেন না ?

না।

এইখানে কতক্ষণ বইসা থাকবেন ?

বুঝতে পারছি না।

চাঁদ অনেক ওপরে উঠে গেছে। লাবুস একই সঙ্গে দু'টা চাঁদ এখন আর দেখতে পারছে না। কেয়া ফুলের গন্ধ এখনো আছে। গন্ধ তীব্র হয়েছে। লাবুসের মনে হলো, একসঙ্গে কয়েক'শ কেয়া ফুল ফুটেছে।

ছোটকর্তা তাকে চলে যেতে বলেছেন। হাদিস চলে যায় নি। একটু দূরে শিমুলগাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে সে ওস্তাদ। বড়কর্তা দরবার মিয়া তাকে লুকিয়ে থাকার কৌশল শিখিয়েছেন। হাতেকলমে শিখিয়েছেন।

ল্যাংড়া, মন দিয়া শোন কী বলি। সাদা রঙ থাইকা একশ হাত দূরে থাকবি। সাদা রঙ দূর থাইকা দেখা যায়। সাদা রঙের কাপড় গেঞ্জি সব 'নট'। লুকায়া যখন থাকবি হাসবি না। হাসলে দাঁত বাইর হবে, দূর থাইকা দাঁত দেখা যাবে। বুঝছস ?

বুঝছি।

চোখ কখনো পুরা খুলবি না। পিটপিট কইরা দেখবি। কী জন্যে বল দেখি ?

জানি না বড়কর্তা।

আরে গাধা, চোখে সাদা অংশ আছে। দূর থাইকা চোখের সাদাও দেখা যাবে। জন্তু জানোয়ারের দিকে নজর কইরা দেখবি। তারার চোখে কোনো সাদা অংশ নাই। কী জন্যে বল দেখি?

জানি না বড়কর্তা।

এক জন্তু যেন আরেক জন্তুরে দূর থাইকা না দেখে এই জন্যে এমন ব্যবস্থা। দেখলে একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়বে।

বাহ্।

গাছের আড়ালে যখন লুকাবি ঘাপটি মাইরা বইসা থাকবি না। দুই হাতে গাছ জড়ায়ে শরীর মিশায়ে থাকবি। তোর সামনে দিয়া লোক যাবে তোরে দেখবে না। ভাববে গাছের গুড়ি।

হাদিস এখন অবশ্যি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে নেই। গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে। পুরনো দিনের কথা ভাবছে। বড়কর্তার সঙ্গে কী সুখের সময়ই না কেটেছে! সেইসব দিন কি আর আসবে? এই বাড়িতে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস। সুরঙ্গের ভেতরে কী আছে কে জানে। জিনিসপত্রের সব হিসাব সে চোখে চোখে রাখছে। বইয়ের কাপড় দিয়ে মোড়ানো এক পোয়া ওজনের একটা কৃষ্ণমূর্তি পেয়েছে। সে সরিয়ে ফেলেছে। তার ধারণা জিনিসটা সোনার। ওস্তাদ দরবার মিয়া থাকলে অন্ধকারেও মূর্তি হাতে নিয়ে বলতে পারতেন জিনিসটা সোনার না রুপার, নাকি তামার। সে বুঝতে পারছে না। বুঝতে হলে স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে যেতে হবে। লোক জানাজানি হবে। কী দরকার, তাড়াহুড়োর কিছু নাই। ওস্তাদ দরবার মিয়া বলতেন— এক কদম ফেলে যে এক মিনিট চিন্তা করে দ্বিতীয় কদম ফেলবে সে-ই দুনিয়ার সবচে' বড় দৌড়বিদ।

পুকুরে ধুপ করে শব্দ হলো। মাছে ঘাই দিল বলে মনে হয়। হাদিস গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ভয়ে এবং আতঙ্কে বসে গেল। ঘাটের সিঁড়িতে দু'জন মানুষ পাশাপাশি বসে আছে। দুইজন একই ব্যক্তি— ছোটকর্তা লাবুস। এতে কোনো ভুল নাই। হাদিস চোখ বন্ধ করে তিনবার বলল, 'আল্লাহু শাফি! আল্লাহু কাফি'। জিন-ভূতের ব্যাপার হলে এখন চোখ মেললে কিছু দেখবে না। হাদিস চোখ মেলল। এখনো দুজনকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় দুজনেরই ছায়া পড়েছে ঘাটে। সেই ছায়াও দেখা যাচ্ছে। দু'জন যে একই দিকে তাকিয়ে আছে তাও না। একজন তাকিয়ে আছে পুকুরের দিকে, অন্যজন পাকাবাড়ির দিকে।

হাদিসের দমবন্ধের মতো হলো। বুকে ব্যথা শুরু হলো। সে দু'হাতে বুক চেপে ধরে নিজের অজান্তেই কাঁপা গলায় ডাকল, ছোটকর্তা! দু'জনই একসঙ্গে তাকাল তার দিকে। একজন মিলিয়ে গেল। অন্যজন রইল।

লাবুস বলল, কিছু বলবে?

হাদিস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ঘরে চলেন ছোটকর্তা। কী কারণে জানি ভয় লাগতেছে।

লাবুস উঠে দাঁড়াল। ঘরের দিকে রওনা হলো। হাদিস এখনো গাছের আড়াল থেকে বের হতে পারছে না। তার হাত-পা জমে গেছে।

রাত অনেক হয়েছে। বান্ধবপুর জামে মসজিদের ইমাম করিম সাহেব তাঁর বাড়ির উঠানে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটু দূরে মাটিতে যে বসে আছে তার আসল নাম মজনু। লোকে তাকে ডাকে মজু গুণ্ডা। যদিও কেউ তাকে কখনো গুণ্ডামি করতে দেখে নি। মজু গুণ্ডা অতি বলশালী ব্যক্তি, বিশাল শরীর। সেই তুলনায় মাথা অস্বাভাবিক ছোট। চোখ বড় বড়। চোখের সাদা অংশ সবসময় লাল থাকে।

মজুর হাতে বিড়ি। সমীহ করে প্রতিবারই মাথা ঘুরিয়ে বিড়িতে টান দিচ্ছে। প্রতিবার বিড়িতে টান দেয়ার আগে খাঁকারি দিয়ে থুথু ফেলছে।

করিম মজু গুণ্ডাকে ধর্মকথা শোনাচ্ছে। মজু গুণ্ডাকে দেখে মনে হচ্ছে সে আগ্রহ নিয়ে ইমাম সাহেবের কথা শুনছে।

মজু!

জে বলেন।

সবচে' বড় সোয়াবের কাজ কী জানো? কাফের মারা। ধর তুমি নামাজ কালাম পড় না। রোজা রাখ না। জুম্মার নামাজে সামিল হও না। তারপরেও একজন কাফের তুমি ধ্বংস করলা। তোমার হাতে বেহেশতের দরজার চাবি চইলা আসল। সেই চাবি দিয়া তুমি নিজেই বেহেশতের দরজা খুলবা। সত্তুরজন হুর এবং ত্রিশজন গেলমান গেটের বাইরে সোনার সিংহাসন নিয়া তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তুমি ঢোকা মাত্র তারা গোলাপজলের পানি দিয়া তোমাকে গোসল করাবে। রেশমি কাপড় পরায়ে সিংহাসনে বসাবে। বাদ্যবাজনা করে নিয়ে যাবে। বুঝেছ?

হুঁ।

অন্য ধর্মের কাফেরের চেয়ে নিজ ধর্মে যদি কেউ কাফের থাকে সেই কাফের ধ্বংস করার সোয়াব দশগুণ বেশি। কারণ একটাই— অন্য ধর্মের কাফের ইসলামের যে ক্ষতি করবে, ইসলাম ধর্মের ভেতরে থাকা কাফের তার চেয়ে দশগুণ বেশি ক্ষতি করবে।

মজু গুণ্ডা এক দলা থুথু ফেলে বলল, কারে খুন করতে হবে বলেন। এত প্যাচাল পাড়ার দরকার নাই। নগদ একশ' টেকা দিবেন। কার্য সমাধা করে দিব। কাকপক্ষীও জানবে না। কার্য সমাধা হওয়ার পরে আমি দুইমাস বাইরে থাকি। এই দুই মাসের খরচ আলাদা।

করিম অবাক হয়ে বললেন, মানুষ খুন করার কথা আসল কী জন্যে ? আমি তোমাকে পাপ-পুণ্যের বিষয়ে কথা বলতেছি।

মজু উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, যাই। টাকার জোগাড় যদি হয় খবর দিয়েন।

মজু রওনা দিয়েছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। করিম হতাশ গলায় বললেন, একশ' পারব না। এত টাকা আমার নাই। পঞ্চাশে কি সম্ভব ?

না।

ধর পঞ্চাশ এখন দিলাম। তুমি কার্য সমাধা করলা। তারপরে ধীরে সুস্থে যখন যা পারি তা দিয়া একশ' পুরা করলাম।

মজু আবারো থুথু ফেলে মুখ মুছতে মুছতে বলল, পুরা টেকা জোগাড় কইরা খবর দিবেন। দুই মাসের রাহাখরচ আলাদা। খুন হবে নগদ। টেকাও দিবেন নগদ।

করিম উঠানে বসে আছেন। মজু গুণ্ডার দেখাদেখি তার মুখেও ক্রমাগত থুথু জমছে। হারামজাদা লাবুসটাকে শাস্তি না দিয়ে তিনি বেহেশতে গেলেও শান্তি পাবেন না। এই হারামজাদার কারণে তাঁকে ন্যাংটা হয়ে দৌড়াতে হয়েছে। শুরুতে ভেবেছিলেন ঘটনা কেউ দেখে নি। ঘাটের দুই একজন মাঝি যে দেখেছে এই বিষয়ে তিনি এখন নিশ্চিত। লোকজন আড়ালে তাকে 'ন্যাংটা মাওলানা' ডাকে। এই অপমান সহ্য করার মানুষ তিনি না। করিমের মুখে আবার থুথু জমেছে। তিনি ঠিক মজু গুণ্ডার মতোই থুথু ফেললেন। মানুষ অনুকরণ প্রিয়।

শরিফা ঘরের ভেতর থেকে ডাকল, ভিতরে আসেন। ঘুমাইবেন না ?

করিম বিরক্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না। শরিফা এগিয়ে গেল।

করিম বললেন, তোমারে তখন ঘর থাইকা বাইর হইতে নিষেধ করছি না ?

শরিফা বলল, উঠানে কেউ নাই, আপনি একা। একটা কথা জিজ্ঞাস করব ?

কর।

কিছুদিন যাবৎ দেখতাছি আপনি পেরেশান। কী হইছে ?

করিম ইতস্তত করে বললেন, জিন খোররম বড় ত্যক্ত করতেছে। তার কারণে পেরেশান।

আবার দেখা পাইছেন ?

হুঁ।

ভালো কোনো মাওলানার কাছ থাইকা তাবিজ আইনা পরেন।

আমার চেয়ে বড় মাওলানা এই অঞ্চলে কে আছে ?

শরিফা বলল, নিজের তাবিজ সবসময় নিজের জন্য কাজ করে না। মাওলানা ইদরিসের কাছ থাইকা তাবিজ নেন। শুনেছি তিনি সুফি মানুষ।

করিম বিরক্ত গলায় বলল, শোনা কথায় কান দিবা না। ইদরিস বিরাট বদ। এক নষ্টামাগিরে নিয়া কিছুদিন সংসার করছে। সেই মাগি পেট বাধায়া এখন আছে নটিবাড়িতে। সন্তান খালাস কইরা আবার পুরান ব্যবসা শুরু করব।

আপনারে কে বলছে ?

কেউ বলে নাই, আমি জানি।

শরিফা বলল, কেউ না বললে আপনি কেমনে জানবেন ? আপনি কি গেছিলেন নটিবাড়িতে ?

করিম স্ত্রীর স্পর্ধা দেখে অবাক হলেন। তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি শরিফা এই ধরনের কথা বলতে পারে। তার রাগ চরমে উঠে গেলেও রাগ দ্রুত কমালেন। সহজ গলায় বললেন, তুমি বিরাট বেয়াদবি করেছ। যাই হোক, ক্ষমা করলাম। এমন বেয়াদবি আর করবা না। ভাত দাও।

মাওলানা খেতে বসেছেন। শরিফা সামনে বসে গরম ভাতে পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। আজকের আয়োজন ভালো। করিমের পছন্দের পাবদা মাছ। হাওরের লালমুখা বড় পাবদা। ঝোল ঝোল করে রান্না। শরিফা পাতের এক কোনায় আদা সরিষা বাটা দিয়া রেখেছে। তরকারির সাথে এই জিনিস মিশিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগছে। করিম বলল, তুমি রান্দা শিখেছ ভালো। এই বিষয়ে কোনো ভুল নাই। রান্দা কার কাছে শিখেছ ? শাশুড়ি আম্মার কাছে ?

শরিফা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আগ্রহের সাথে বলল, আচ্ছা জিন কি ভাত-মাছ খায় ? মিষ্টি খাইতে পছন্দ করে, এইটা আমি শুনেছি। ভাত-মাছ খায় ?

জানি না।

জিন খোররমের সাথে সাক্ষাৎ হইলে মনে কইরা জিজ্ঞাস কইরা জানবেন।

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি কি তারে দাওয়াত কইরা খাওয়াইবা ? খামাখা কথা বলো।

শরিফা চুপ করে গেল। তার খুব ইচ্ছা করছিল জিন খোররমের সাথে তার যে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই ঘটনাটা বলে। রূপবান এক যুবকের বেশ ধরে সে এসেছে। নিজের নাম সে খোররম বলে নাই। অন্য কী যেন বলেছে। এখন মনে নাই। তাকে সে মা বলেছে। পাটিতে বসে খানা খেয়েছে। এত বড় একটা ঘটনা কাউকে বলার উপায় নাই।

খাওয়া শেষ করে করিম পান মুখে দিলেন। শরিফা বলল, এত বড় পাবদা মাছ আমি কই পাইলাম জিজ্ঞাস করলেন না ?

করিম পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, তোমার ভাইজান পাঠাইছেন। হাওরের মাছ আর কে পাঠাবে!

ধরেছেন ঠিক। ভাইজান নিজেই এসেছিলেন। পাঁচ মিনিট বসেন নাই। লঞ্চ ধরতে দৌড় দিয়েছেন। উনি যাবেন কইলকাতা। ছবিঘরে ছবি দেখবেন।

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি তোমার ভাইরে বললা না ছবিঘরে ছবি দেখা বিরাট গুনার কাজ ?

বলি নাই। ভাইজান আমারে কিছু টাকা দিয়া গেছে। মাছের ব্যবসায় বিরাট লাভ করেছে এইজন্যে।

কত টাকা দিয়েছেন ? সত্য কথা বলবা, তোমার টাকা নিয়া আমি পালায়া যাব না।

একশ' টেকা।

করিম চমকে উঠলেন। সেই চমক শরিফার চোখে পড়ল না।

তোমার ভাইয়ের মন ভালো। একশ' টেকা ভইনরে দিয়েছে সহজ কথা না। তবে শহর বন্দরে গিয়া টাকা নষ্ট করা ঠিক না। অর্থ সঞ্চয়ের জিনিস, অপচয়ের জিনিস না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

শরিফা বলল, শয়তান আমার ভাইয়ের ভাই হইলে সম্পর্কে আমিও শয়তানের ভইন। আর আমারে বিবাহের কারণে আপনে শয়তানের দুলাভাই। হি হি হি।

করিম কঠিন গলায় বললেন, এইগুলা কেমন কথা ?

তামাশা করলাম।

স্বামী নিয়া তামাশা করবা না। স্বামী তামাশার বিষয় না।

স্বামী কিসের বিষয় ?

ভক্তি শ্রদ্ধার বিষয়। হিন্দু মেয়ের সবই খারাপ। একটা শুধু ভালো গুণ। তাদের পতিভক্তি। হিন্দু মেয়েরা দিন কীভাবে শুরু করে জানো ? স্বামীর পা ধোয়া পানি খাইয়া।

শরিফা বলল, এখন থাইকা আমিও আপনের পা ধোয়া পানি খাব।

তার প্রয়োজন নাই।

অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সকালবেলা এক বালতি পানি আইন্যা দিব। আপনে পা ডুবায়ে দিবেন। সারাদিন আমি এই বালতির পানি খাব। দুপুরে এই পানি দিয়া গোসল করব।

অনেক রঙ্গ তামাশা হইছে। এখন যাও, পান আন। পান খাব।

স্ত্রীর উল্টাপাল্টা কথায় করিম যথেষ্টই বিরক্ত। তবে তিনি বিরক্তির প্রকাশ দেখালেন না। তাঁর মাথায় সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা।

শ্রীনাথ লাবুসের অধীনে চাকরি নিয়েছেন। নায়েব সর্দার জাতীয় কাজ। আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা। খাজনার কাগজপত্র ঠিক রাখা। শ্রীনাথের জন্যে ঘর দেয়া হয়েছে। শ্রীনাথ শর্ত দিয়েছেন, তাঁর ঘরে কোনো মুসলমান ঢুকবে না। মুসলমানের রান্না কোনো খাবারও তিনি খাবেন না। স্বপাক আহারের ব্যবস্থা।

লাবুস সব শর্ত মেনে নিয়েছে। শ্রীনাথ বললেন, আপনি আমাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। দিনের পর দিন উপবাস করতে হয়েছে। অন্নকষ্ট থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমি একদিন তার প্রতিদান দিব।

লাবুস বলল, আচ্ছা।

হাদিস উদ্দিন নামে যাকে আপনি চাকরি দিয়েছেন, তার বিষয়ে কি আপনি কিছু জানেন ?

না।

সে বিরাট বড় চোর দরবার মিয়ার শিষ্য। হাদিস উদ্দিন নিজেও বিরাট চোর। তাকে আপনার বিদায় করা প্রয়োজন। আমার পরামর্শ এই মুহূর্তে তারে বিদায় করবেন।

লাবুস বলল, হাদিস উদ্দিনের কারণে আমি আপনাকে চাকরি দিয়েছি। আপনার উপবাসের কষ্টের কথা সে-ই আমাকে বলেছিল।

শ্রীনাথ বললেন, সে আমার উপকার করেছে। এখন আমি আপনার অধীনের কর্মচারী। আমি আপনার স্বার্থ দেখব। তারটা না।

লাবুস বলল, আমার স্বার্থ দেখার প্রয়োজন নাই। আপনি থাকবেন আপনার মতো, সে থাকবে তার মতো। এই বিষয়ে আলোচনা এইখানেই শেষ।

আপনি কিন্তু বিপদ নিয়া বাস করতেছেন।

ঠিক আছে করলাম। এখন আপনি আমাকে হিড়ম্বা রাক্ষসের কাহিনীটা বলেন।

কী বলব?

একদিন দূর থেকে আপনার গলায় রামায়ণ পাঠ শুনেছিলাম। বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। আপনার কণ্ঠস্বর মধুর।

শ্রীনাথ বললেন, হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পাঠ শোনা অন্য ধর্মের মানুষদের জন্যে নিষিদ্ধ। যে পাঠ করবে তার পাপ হবে, যে শ্রবণ করবে তারও পাপ।

তাহলে থাক।

তবে মুখস্থ বিদ্যা থেকে পাঠ করায় দোষ নাই। গ্রন্থ সঙ্গে না থাকলে ঠিক আছে।

শ্রীনাথ পাঠ শুরু করলেন—

নিদ্রা যায় নিরুপমা   সুবদনী ঘনশ্যামা
এ রামা   তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গম বনে,   নিদ্রা যায় অচেতনে,
নাহি জানো   রাক্ষস আলয়।।
তিলেক নাহিক ভর,   যেন আপনার ঘর
অতিশয় দেখি দুঃসাহস।
এই বন অধিকারী,   পাপ আত্মা-দুরাচারী
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস।।

প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে বলেই সে তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষকে নানান রহস্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠায়। সারাজীবন প্রতিটি মানুষ তার রহস্যের খেলা খেলে। প্রকৃতি দাড়িপাল্লায় মেপে সবাইকে সমান রহস্য দেন না। কাউকে বেশিমাত্রায় দেন, যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়া এই মেধাবী মানুষটির চেহারা রাজপুত্রের মতো। সম্মোহনী ক্ষমতার জন্যেই হয়তোবা গান্ধিজির চেয়েও উঁচুস্থানে আসীন। কংগ্রেসের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। প্রকাশ্যে এই কথা বহুবার বলেও যখন কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্যে ভোটে দাঁড়ান, তিনি ভোটে জিতেন। গান্ধিজি অসহায় বোধ করেন। কারণ তাঁর সমর্থিত প্রার্থী সিতারামাইয়া বিশাল ব্যবধানে পরাজিত।

সুভাষচন্দ্র অতি রহস্যময় মানুষ হলেও তাঁর চিন্তাভাবনায় কখনো রহস্য ছিল না। তাঁর এককথা— ইংরেজ আপনা-আপনি ভারত ছেড়ে যাবে সেই চিজ না। গান্ধিজির সত্যাগ্রহ কিংবা অনশনে তারা টলবে না। বিপ্লবীদের এদিক-ওদিক খুটখাট গুলিবোমাতেও কিছু হবে না। ভারতকে স্বাধীন করতে হলে সশস্ত্র বিপ্লবের ভেতর দিয়ে তা করতে হবে। অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র। সুভাষচন্দ্র বসু নিজেকে এবং জাতিকে দুর্বল ভাবতে অভ্যস্ত না।

কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে পৌছল। তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে নতুন রাজনৈতিক দল করলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক যোগ দিলেন তাঁর সাথে। শেরে বাংলাও চাচ্ছিলেন অখণ্ড ভারত। মুসলিম লীগের সঙ্গে এই কারণেই তাঁর বনছিল না।

সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড ইংরেজ সরকারের মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তাদের মাথায় বিশ্বযুদ্ধের ঝামেলা, এই ঝামেলায় সুভাষচন্দ্র বসুর রণহুঙ্কার অসহ্য বোধ হবারই কথা। ইংরেজ তাঁকে গৃহবন্দি করল। তিনি পালিয়ে গেলেন (১৭ জানুয়ারি, সন ১৯৪১)। প্রথমে গেলেন আফগানিস্তান। সেখান থেকে ছদ্মবেশে রাশিয়া, রাশিয়া থেকে জার্মানি।

জার্মানির চ্যান্সেলর হিটলার এই বাঙালির কথাবার্তায় মুগ্ধ। কী তেজ! হিটলারের শত্রু ইংরেজ, এই যুবকের শত্রুও ইংরেজ। একে অবশ্যই সাহায্য করা যায়। সুভাষচন্দ্র বসু সাহসী এক প্রস্তাব করে বসলেন। যে সব ভারতীয় সৈনিক জার্মানদের হাতে বন্দি হয়েছে, তাদের নিয়ে তিনি এক সৈন্যদল গঠন করবেন। এবং এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত বিজয়ের উদ্দেশে রওনা হবেন।

হিটলার প্রস্তাবে রাজি হলেন। বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের মুক্তি দেয়া হলো। তারা হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিল।

এদিকে মালয়ে কাকতালীয় এক ঘটনা ঘটল। জাপানিদের তাড়া খেয়ে ব্রিটিশ বাহিনী দ্রুত পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করছে। তাদের নাস্তানাবুদ অবস্থা। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন মোহন সিং। হঠাৎ তাঁর মাথায় এলো ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পালিয়ে না গিয়ে জাপানি সেনাদের হাতে ধরা দেয়া। তাদের রাজি করিয়ে বন্দি ভারতীয়দের নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এই যুদ্ধ হবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ। জাপান রাজি হয়ে গেল। ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের তুলে দিল মোহন সিং-এর হাতে। মোহন সিং ৪৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য নিয়ে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী।

আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর এক সদস্য সিপাহি বৃন্দাবন পাল। তার বাড়ি বান্ধবপুরে। বৃন্দাবন পালের বাবা আনন্দ পাল জানতেন, ছেলে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছে। হলুদ জাপানিরা ছেলেকে অমানুষিক যন্ত্রণা করছে। যুদ্ধক্ষেত্রে খাবারের অভাব হলে জাপানিরা না-কি প্রায়ই বন্দিদের মেরে তাদের কলিজাও খাচ্ছে। তিনি জাপানিদের ধ্বংস কামনা করে মন্দিরে জোড়া পাঠা বলি দিলেন। পটপরিবর্তনের খবর তিনি জানতেন না।

হলুদ জাপানিরা আমাদের বন্ধু হয়ে গেছে, নেতাজি জার্মান ইউ বোটে করে জাপানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ঠিক হয়েছে জাপানের সেনাবাহিনী এবং মোহন সিং-এর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী একসঙ্গে বার্মা আক্রমণ করে বাংলা ভূখণ্ডের দিকে আসতে থাকবে।

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে। আজাদ হিন্দ বাহিনীও পিছিয়ে নেই। তারাও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে।

এদিকে খবর রটেছে জার্মানির বিজ্ঞানীরা ভয়াবহ এক বোমা বানানোর কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। বোমার নাম অ্যাটম বোমা। সামান্য অ্যাটমের ভেতর না-কি লুকিয়ে আছে দৈত্য। সেই দৈত্যকে বের করে আনার চেষ্টা।

আমেরিকানরা গুপ্তচরদের এই খবরে বিচলিত। সত্যি কি এমন কিছু ওরা ঘটাতে যাচ্ছে? জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা পদার্থবিদ্যার রথি-মহরথিদের আশ্রয় এখন আমেরিকা। অ্যাটম বোমার গবেষণায় তারা এগিয়ে আসতে পারেন, তবে তার জন্যে রাষ্ট্রের সাহায্য দরকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বুঝাতে হবে যে, অ্যাটম বোমার মতো মারণাস্ত্র প্রয়োজন। বুঝানোর দায়িত্ব নিলেন পদার্থবিদ্যার গুরুদেব আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি নিজে শুধু যে দায়িত্ব নিলেন তা-না, তিনি পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী মানুষদেরকে দিয়েও রুজভেল্টকে বোঝানোর চেষ্টা চালালেন। মহাশান্তির জন্যে প্রয়োজন মহাঅশান্তি অ্যাটম বোমা।

আইনস্টাইনের কারণেই হয়তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শান্তির প্রয়োজনে অ্যাটম বোমা বানানো উচিত বলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে অনুরোধ করে চিঠি পাঠালেন। আমেরিকায় শুরু হলো দৈত্য বানানোর প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার নাম— ম্যানহাটন প্রজেক্ট।

ম্যানহাটন প্রজেক্টে অ্যাটম বোমা বানানো চলতে থাকুক, আমরা ম্যানহাটন থেকে ফিরে আসি বান্ধবপুরে। সেখানে কার্তিক মাস। দিন শুরু হচ্ছে ঘন কুয়াশায়। এই বৎসর কুয়াশার একটু বাড়াবাড়ি আছে। এক-এক দিন এমন কুয়াশা হয় যে, একহাত সামনের মানুষও দেখা যায় না। ভরদুপুরে আকাশের দিকে তাকালে যে সূর্য দেখা যায় তা চাঁদের মতো। কুয়াশা সেই সূর্যের তেজ কেড়ে নিয়েছে।

এমনই এক কুয়াশার মধ্যদুপুরে মাওলানা ইদরিস টিউব কল থেকে খাবার পানি নিয়ে ফিরছেন। বাড়ির উঠানে পা দিয়েই শুনলেন বিড়াল কাঁদছে। শোবার ঘরের ভেতর থেকে বিরামহীন বিড়ালের কান্না ভেসে আসছে— মিয়াঁউ মিয়াঁউ মিয়াঁউ। তাঁর বাড়ি কুকুর-বিড়ালশূন্য। তিনি কুকুর-বিড়াল খুবই অপছন্দ করেন। কুকুর অপছন্দ করেন, কারণ আমাদের নবী (দঃ) কুকুর অপছন্দ করতেন। এই যুক্তিতে বিড়াল তাঁর পছন্দ করার কথা। কারণ নবীজির পছন্দের প্রাণী বিড়াল। কিন্তু মাওলানা ইদরিস কুকুরের চেয়েও বেশি অপছন্দ করেন বিড়াল।

মাওলানা বিরক্ত মুখে কিছুক্ষণ উঠানে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ঢুকলেন। পলকহীন চোখে তাঁকে বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকতে হলো। বিছানার ঠিক মাঝখানে কাঁথা দিয়ে পুঁটলির মতো করে জড়ানো একটা শিশু। তার দু'পাশে দু'টা বালিশ। তার মাথার কাছে ফিডিং বোতলে এক বোতল দুধ। শিশু হাত-পা ছুড়ছে এবং কাঁদছে ওয়াঁউ ওয়াঁউ। কান্নার এই শব্দকেই মাওলানা বিড়ালের মিয়াঁউ মিয়াঁউ ভাবছিলেন।

ইদরিস গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, জুলেখা! জুলেখা! কেউ জবাব দিল না। তবে শিশুটি কান্না থামিয়ে দিল। মাওলানা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। পৃথিবী এবং বেহেস্ত দুই জায়গাতেই সবচে' সুন্দর বস্তু ফুল। ফুল যত সুন্দরই হোক সে হাসতে পারে না, কাঁদতে পারে না। মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে বদলাতে পারে না। সেই অর্থে অবশ্যই মানবশিশু ফুলের চেয়ে সুন্দর। মাওলানা বললেন, এই! এই!

শিশুটি হাত নাড়ল। তার চোখ ঘন কালো এবং গরুর চোখের মতো বড়। চোখের মণিতে আলোছায়ার খেলা। মাওলানা বললেন, নাম কিগো?

শিশু এবার পা নাড়াল।

মাওলানা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ছেলে না মেয়ে? প্রশ্নটিতে শিশু সম্ভবত অপমানিত বোধ করল। সে কাঁদতে শুরু করল। তার গলার স্বর এবার আগের চেয়েও উঁচুতে।

তার কি ক্ষিধে লেগেছে? ফিডিং বোতল মুখে ধরলে কি খাবে? দুধ কি বিছানায় শুইয়েই মুখে ধরবেন? না-কি আগে তাকে কোলে নিয়ে মুখে ধরবেন? কচি শিশুরা মাছের মতো পিচ্ছিল হয় বলে তাঁর ধারণা। কোলে নিতে গেলে পিছলে পড়ে যাবে না তো! তিনি তাঁর এই দীর্ঘজীবনে কখনো কোনো শিশু কোলে নিয়েছেন এরকম মনে করতে পারলেন না। আহারে, বেচারা হাত-পা নেড়ে কী কান্নাই না কাঁদছে!

মাওলানা বিসমিল্লাহ বলে অনেক আয়োজন করে শিশু কোলে নিলেন। তার মুখের সামনে ফিডিং বোতল ধরামাত্রই তার কান্না থামলো। সে চুকচুক করে দুধ টানছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়ছে না-কি? সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে দুধ খাওয়ানো কি বন্ধ করে দেবেন? সেটাই তো যুক্তিযুক্ত। ঘুমের মধ্যে কেউ খাদ্য গ্রহণ করে না। মানবসন্তান কেন করবে?

পবিত্র কোরান পাঠ করার সময় মাওলানা যেভাবে দোলেন এখনো তিনি মনের অজান্তে সেভাবেই দুলছেন। শিশুটির দিকে তাকিয়ে মিল দিয়ে দিয়ে বিচিত্র সব কথা বলে যাচ্ছেন—

এই বাবু!
দুধ খাবু?
মজা পাবু?
কই যাবু?
এই বাবু!
তুমি হাবু।
এবং হাবা
মজা পাবা

কই যাবা ?
বনে যাবা ?
বনে বাঘ।
ও আল্লা
বাবুর কী রাগ!

মাওলানার কথাবার্তা মনে হয় শিশুটির পছন্দ হচ্ছে। দুধ খেতে খেতেই সে হাসল। মাওলানা অস্পষ্ট গলায় বললেন, আহারে ! আহারে !! মাওলানার চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি গভীর আবেগে বললেন, হে রাব্বুল আলামিন, হে গাফুরুর রাহিম! তোমার প্রতি নাদান বান্দা ইদরিসের সালাম।

সন্ধ্যার মধ্যে অনেকেই জেনে গেল জুলেখা তার কন্যাসন্তানকে মাওলানার বাড়িতে ফেলে চলে গেছে। মাওলানা মহাবিপদে পড়েছেন। মাওলানা নিজে থাকেন একবেলা খেয়ে। সেই খাওয়াও সবদিন জোটে না। বাচ্চাটাকে খাওয়াবেন কী ?

কয়েকজন আগ্রহ করে বাচ্চা দেখতে গেল। দূর থেকে দেখল, কাছে গেল না, কোলেও নিল না। এই শিশু অপরূপ রূপবতী হলেও সে মূর্তিমান পাপ ছাড়া কিছু না। তাকে দূর থেকে দেখা যায়, কোলে নেয়া যায় না।

জুলেখা এক বোতল দুধ রেখে গিয়েছিল। সন্ধ্যার আগেই সেই দুধ শেষ হয়ে গেল। বাচ্চা কাঁদতে শুরু করল। তার জন্যে খাবার কীভাবে জোগাড় করবেন মাওলানা ভেবে পেলেন না। তাকে বাড়িতে রেখে খাবারের সন্ধানে কোথাও যাওয়া যাবে না। তিনি যেখানেই যান, তাকে কোলে নিয়েই যেতে হবে। বাচ্চাটার জন্যে কাঁথা দরকার, কাপড় দরকার। সেসবইবা কোথায় পাবেন ? বাচ্চা ঘনঘন পিসাব করছে। কাপড় বদলাতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে মাওলানা তাকে নিজের একটা পাঞ্জাবি দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন। বাবু সেই পাঞ্জাবিও ভিজিয়ে ফেলেছে। মাওলানা অস্থির বোধ করলেন। সর্বপ্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব পরম করুণাময় আল্লাহপাকের। নিম্নশ্রেণীর প্রাণের জন্যে তা একশ' ভাগ সত্যি। প্রতিটি পিঁপড়ার খাবারের ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। মানুষকে তিনি অস্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন বলে তার খাবার তাকেই সংগ্রহ করতে হয়।

ক্ষুধায় অস্থির হয়ে শিশু খুবই কাঁদছে। মাওলানার চোখ দিয়েও পানি পড়ছে। তাঁর মন বলছে, আল্লাহপাক তাঁকে জটিল এক পরীক্ষায় ফেলেছেন। এই পরীক্ষা থেকে তিনি কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন বুঝতে পারছেন না। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই তাঁকে বের হতে হবে। দেরি করা যাবে না।

উঠানে লণ্ঠন হাতে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ইদরিস বাচ্চা কোলে নিয়ে বারান্দায় এসে দেখেন লাবুস।

লাবুস বলল, বোনকে দেখতে এসেছি। তার নাম কী ?

মাওলানা বললেন, নাম জানি না। তার মা কী নাম রেখেছে বলে যায় নাই। তবে তার ইচ্ছা ছিল মেয়ে হলে নাম রাখবে মীরা।

লাবুস বলল, বোনকে আমার কোলে দিন।

বাচ্চা কাঁদছিল। লাবুসের কোলে উঠে কিছুক্ষণের জন্যে তার কান্না থামল। সে কৌতূহলী হয়ে নতুন মানুষটাকে দেখছে। লাবুস বলল, আমি আমার বোনের নাম রাখলাম পুষ্পরানি।

মাওলানা বললেন, তুমি কি এর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে ? এ ক্ষুধায় অস্থির হয়েছে।

লাবুস বলল, আমি সব ব্যবস্থা করেই আপনাকে নিতে এসেছি।

কী ব্যবস্থা করেছ ?

লাবুস বলল, একটা মেয়ে রেখেছি যে পুষ্পরানির দেখাশোনা করবে। আমার বোনের যা যা লাগবে তার সব ব্যবস্থা করেছি।

মাওলানা বললেন, ব্যবস্থা করেছি, ব্যবস্থা করেছি— এমন কথা বলবা না। এতে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহপাক। তোমার মাধ্যমে করেছেন।

লাবুস বলল, আমার ভুল হয়েছে। এখন আমার সঙ্গে চলেন।

মাওলানা বললেন, আল্লাহপাকের হিসাব সাধারণ মানুষের বোঝা সম্ভব না। আমি বাচ্চাটাকে কী খাওয়াব কী পরাব ভেবে খুব অস্থির হয়ে ছিলাম। কাঁদতে ছিলাম। আমার একবারও মনে হয় নাই যে, আল্লাহপাক সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

পুষ্পরানি আবার কাঁদতে শুরু করেছে। লাবুস পুষ্পরানিকে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে রওনা হয়েছে। হারিকেন হাতে নিয়ে মাওলানা আগে আগে যাচ্ছেন। আয়াতুল কুরসি পড়তে পড়তে যাচ্ছেন। ছোট শিশুদের দিকে ভূত-প্রেতের নজর থাকে বেশি। সেই শিশু যদি রূপ নিয়ে আসে তাহলে সমস্যা আরো বেশি হয়। জিনরা সুন্দর মানবশিশু তাদের দেশে নিয়ে যেতে আগ্রহী থাকে বলে তিনি শুনেছেন। মানুষ জিনের বাচ্চা পালতে পারে না, কিন্তু জিন মানুষের বাচ্চা পালতে পারে— এটাও এক রহস্য। জগৎ রহস্যময়।

জামে মসজিদের ইমাম করিম সাহেবের স্ত্রী শরিফা আজ সারাদিন অভুক্ত। এমন না যে ঘরে খাবার নাই। খাবার আছে, কিন্তু সে খেতে পারছে না। ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া তার একশ' টাকা চুরি গেছে। চুরি কখন হয়েছে সে অনেক চিন্তা

করেও বের করতে পারছে না। গত রাতে চুরি হয়েছে এটা পরিষ্কার। তবে চোর একশ' টাকা ছাড়া আর কিছুই নেয় নি। টাকাটা সে রেখেছিল অতি গোপন জায়গায়— শুকনা বড়ুই-এর হাঁড়িতে। টাকার ওপর শুকনা বড়ুই বিছানো। চোর এই গোপন জায়গা থেকে টাকা বের করে নিয়ে গেল কীভাবে কে জানে !

শরিফা ঘটনাটা তার স্বামীকে বলতে পারছে না। তার ধারণা ঘটনা শুনলেই তার স্বামী খুব রাগ করবেন। স্বামীর কাছ থেকে ধমক বা কড়া কথা শুনতে তার একেবারেই ভালো লাগে না। একবার ধমক শুনলে তার কয়েকদিন মন খারাপ থাকে। শরিফা আজ সারাদিনই একমনে পাঠ করেছে— 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।' কারো মৃত্যুসংবাদ শুনলে এই দোয়া পাঠ করতে হয়, আবার কিছু হারিয়ে গেলে এই দোয়া পড়লে হারানো বস্তু ফিরে আসে। এই দোয়া পড়ে সে একবার তার হারিয়ে যাওয়া সোনার নাকফুল খুঁজে পেয়েছিল। উঠান ঝাড়ু দিতে সে শলার ঝাড়ু নিয়ে উঠানে গেছে। হঠাৎ দেখে রোদ পড়ে ঝাড়ুর ভেতর কী যেন ঝকমক করে উঠল। নাকফুল ঝাড়ুর শলায় আটকে ছিল।

রাতে খেতে বসে করিম বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ ? চোখ-মুখ শুকনা। জ্বর উঠেছে ?

শরিফা বলল, শরীর ঠিক আছে।

কোনো বিষয় নিয়া কি চিন্তাযুক্ত ?

আপনারে নিয়া চিন্তাযুক্ত।

করিম ভুরু কুঁচকে বললেন, আমারে নিয়া কী চিন্তা ?

শরিফা বলল, জিন খোররম যে আপনারে ত্যক্ত করতেছে এই নিয়া চিন্তা।

করিম বললেন, এইসব নিয়া তুমি চিন্তা করবা না। আমার সমস্যা আমি সমাধান করব। এর মধ্যে সমাধান কিছুটা হয়েছে— মসজিদ থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বন্ধন দিয়েছি। ভূত-প্রেত-জিন-পরী এইটুক রাস্তায় আর আসবে না।

বন্ধন দেওনের পরে তার আর দেখা পান নাই ?

দুই দিন দেখেছি— জংলায় হাঁটতেছে, রাস্তায় উঠতে পরে নাই। চেষ্টা নিয়েছে, পারে নাই।

শরিফা বলল, একবার বন্ধন দিলে কতদিন থাকে ?

চন্দ্র তারিখ হিসাবে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে বন্ধন দিলে পূর্ণিমা পর্যন্ত থাকে। যাই হোক, কথা চালাচালি বন্ধ। খাওয়া হলো ইবাদত। ইবাদতের সময় কথা বলা যায় না।

শরিফা বলল, ইবাদতের জন্য পুণ্য আছে না ?

করিম বললেন, অবশ্যই আছে।

শরিফা বলল, যে শুকনা মরিচভর্তা দিয়া ভাত খাইতেছে তার পুণ্য বেশি, না-কি যে দশ পদ পোলাও-কোর্মা খাইতেছে তার পুণ্য বেশি ?

করিম বললেন, মরিচভর্তা দিয়া যে খাইতেছে তার পুণ্য অনেক অনেক বেশি।

শরিফা বলল, আমার মনে হয় যে দশ পদ দিয়া খাইতেছে তার পুণ্য বেশি। আরাম কইরা মনের আনন্দে সে খাইতেছে বইলাই পুণ্য বেশি। শুকনা মরিচভর্তা দিয়া যে খাইতেছে সে বেজার হইয়া খাইতেছে।

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, যা জানো না তা নিয়া বাহাস করবা না।

আচ্ছা আর করব না।

বারান্দায় পাটি দেও, জায়নামাজ দেও। আজ রাতে ঘুমাব না। সারারাত ইবাদত বন্দেগি করে কাটাব। ফজরের নামাজ শেষ করে ঘুমাতে যাব।

কেন ?

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন কী ? ইবাদত বন্দেগি করে রাত কাটানোর মধ্যে কোনো কেন নাই। ইবাদত বন্দেগি না করার মধ্যে কেন আছে।

রাত মন্দ হয় নাই। বাজারের কোলাহল বন্ধ হয়েছে। রাত বারোটায় গোয়ালন্দ থেকে শেষ লঞ্চ আসে। সেটাও চলে এসেছে। করিম বারান্দায় জায়নামাজে বসে আছেন। তাঁর হাতে তসবি। জায়নামাজের এক কোনায় কেরোসিনের কুপি। কুপির লাল আলো করিমের মুখে পড়েছে। করিমকে ভীত দেখাচ্ছে। তিনি বারবারই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। আজ একটা বিশেষ রাত। তিনি মজুকে একশ' টাকা দিয়েছেন। মজু বলেছে, সে যেভাবেই হোক আজ রাতেই কার্য সমাধা করে খবর দিয়ে যাবে। তখন তাকে আরো পঁচিশ টাকা দিতে হবে। করিমের পাঞ্জাবির পকেটে পঁচিশ টাকা আছে।

মজু এখনো আসছে না। সে কখন কার্য সমাধা করবে তাও তাঁকে বলে নি। এখন মনে হচ্ছে কার্য সমাধা হবে শেষরাতে। দরজায় খুট করে শব্দ হলো। করিম বিরক্ত হয়ে তাকালেন।

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, আপনি কি সত্য সত্যই সারারাত জাগবেন ?

দরজার ফাঁক দিয়ে শরিফাকে দেখা যাচ্ছে। করিম অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। রাগী গলায় বললেন, ঘুমাইতে যাও, ইবাদত বন্দেগি করতেছি। এই সময় ত্যক্ত করবা না।

শরিফা ঘুমুতে গেল। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে না আসা পর্যন্ত সে একমনে হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার দোয়া পড়তে লাগল। ভাইজানের দেয়া একশ'টা টাকায় কত কিছুই সে কিনতে পারত।

লাবুস তার বোনের সব ব্যবস্থা ভালোমতোই করেছে। বাগদি পাড়ার এক মেয়েকে আনিয়েছে। তার বয়স ষোল-সতেরো। নাম কালী। কালীর নিজের একমাস বয়েসি মেয়ে গতকাল মারা গেছে। মৃত সন্তানের শোকে সে কাতর। পুষ্পরাণীকে সে লাবুসের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে নিল। বিস্মিত গলায় বলল, হা ভগবান, আমার তুলসির চেহারার মতো চেহারা। হেই মুখ হেই চউখ। একটাই বেশকম— তুলসি ছিল কালা, আর এ চাঁদের মতো ফকফইক্যা।

কালী পুষ্পরানিকে শাড়ির আঁচলের আড়ালে নিয়ে নিয়েছে। পুষ্পরানি চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। কালীর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এই অশ্রু আনন্দের না বেদনার কে বলবে ?

মাওলানা ইদরিস লাবুসের কাছে হিন্দু মেয়ের বুকের দুধ খাওয়া নিয়ে ক্ষীণ আপত্তি তুললেন। লাবুস বলল, দুধের কোনো হিন্দু-মুসলমান নাই। হিন্দু-মুসলমান মানুষের চিন্তায়। দুধের চিন্তার শক্তি নাই।

লাবুসের কথায় মাওলানা হকচকিয়ে গেলেন। ধর্ম নিয়ে এইভাবে তিনি কোনোদিন চিন্তা করেন নি। এই দিকে চিন্তা করা যেতে পারে।

পাকা দালানের দক্ষিণের সর্বশেষ ঘরটায় মাওলানার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। খাটে জাজিমের বিছানা। বিছানায় ফুলতোলা চাদর। খাটের পাশের টেবিলে কাসার জগভর্তি পানি, একটা কাসার গ্লাস। সবই ঝকঝক করছে।

হাদিস উদ্দিন মাওলানাকে খুবই খাতির-যত্ন করছে। গোসলের জন্যে গরম পানি করে দিয়েছে। মাওলানার সঙ্গে সে কলঘরে সাবান এবং 'ফোড়ল' নিয়ে ঢুকেছে, গায়ে সাবান ডলে দিবে।

মাওলানা বললেন, বাবা, আমি অন্যের সেবা নেই না। আমার নবীজি অন্যের সেবা নিতেন না। আমিও নেই না।

হাদিস বলল, আপনে তো নবী না। আপনে কেন সেবা নিবেন না ?

মাওলানার সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে তাঁর মাথায় আধাবালতি গরম পানি ঢেলে সাবান দিয়ে গা ডলা শুরু করল।

গোসল সেরে মাওলানা ঘরে ঢুকতেই সে হুক্কা নিয়ে উপস্থিত। মাওলানা বললেন, আমি তামাক খাই না।

হাদিস উদ্দিন বলল, খান না, আইজ খাইবেন। শরীর আরাম চায়। এইটা শরীরের একটা আরাম।

মাওলানা হুক্কায় টান দিলেন। তামাকটা ভালো লাগছে না, কিন্তু গুড়ুক গুড়ুক শব্দটা কানে মধুর হয়ে বাজছে।

হাদিস উদ্দিন বলল, খানা কখন খাইবেন বইলেন। ভাত বসাব। ধোঁয়া উঠা ভাত খাওয়ার আলাদা মজা। খিচুড়ি খাইতে চাইলে বলবেন, খিচুড়ি রানব।

মাওলানা বললেন, লাবুস যা খায় তাই খেতে দিও। সে যখন খাবে আমিও তার সাথে খাব।

ছোটকর্তা তো রাইতে কিছু খায় না।

কেন ?

জানি না কেন। উনার হিসাব বোঝা বড়ই কঠিন। অনেক রাইত পর্যন্ত ঘাটলায় বইসা থাকে। এক রাইতে দেখি জঙ্গলায় হাঁটতাছে।

এখন সে কোথায় ?

ঘাটলায় বসা। তাঁর বিষয়ে আরেকটা কথা আছে। সময় সুযোগ হইলে আপনারে বলব।

এখনই বলো।

জে-না, এখন বলব না। গোপন একটা বিষয়। হুজুর, পায়ে একটু তেল দিয়া দেই ?

মাওলানা বললেন, না-না, পায়ে হাত দিও না।

হাদিস উদ্দিন তেল মাখানো শুরু করল। বাটিতে করে তেল সে সঙ্গে করে নিয়েই এসেছে।

শ্বেতপাথরের ঘাটলায় লাবুস বসে আছে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। আকাশে প্রচুর মেঘ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। তখন যে খুব একটা আলো হচ্ছে তা-না। কারণ আজও ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে চাদর গায়ে মজু আসছে। চাদরের নিচে শার্টের বুক পকেটে সে একটা ক্ষুর নিয়ে এসেছে। তবে ক্ষুর সে ব্যবহার করবে না। ক্ষুর ব্যবহার করলেই চিৎকার শুরু হবে। এই ধরনের মৃত্যুর আগে মানুষ ভয়ঙ্কর চিৎকার করে। মজু ঠিক করেছে, সে পেছন থেকে গলা চেপে ধরবে। শব্দ করার কোনো সুযোগই মানুষটা পাবে না। মজু চাদরের আড়াল থেকে হাত বের করল। থাবার মতো বলশালী লোমশ হাত। দেখতেই ভালো লাগে। মজু বিড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল। সে ছাতিম গাছের নিচে দাঁড়াবে। সেখান থেকে বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

মজু খবর নিয়েই এসেছে যে লাবুস নামের মানুষটা অনেক রাত পর্যন্ত পুকুরঘাটে বসে থাকে। আজও সে বসে আছে এটা মজুর জন্যে ভালো। কাজ সহজ হয়ে গেছে। কুয়াশাটাও আজ ভালো সুবিধা দিচ্ছে। সব হচ্ছে

হিসাবমতো। মজু ছাতিম গাছের নিচে চলে এলো। তার দৃষ্টি লাবুসের দিকে। হঠাৎ সেই দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। মজু দেখছে, একজন লাবুস বসে নেই, দু'জন বসে আছে। সিঁড়ির দুই ধাপে দু'জন।

মজু চোখ বন্ধ করল। তাকে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে। সে বুঝতে পারছে তার চোখে ধান্ধা লেগেছে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় চোখে এ ধরনের ধান্ধা লাগে। মজু জানে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে খোলার পরপরই ধান্ধা কেটে যাবে। সে দেখবে মানুষ একটাই বসে আছে।

সে চোখ খুলল। মানুষ এখনো দু'জন। যে দৃশ্য সে দেখছে তা চোখের ধান্ধা না, অন্যকিছু। অন্যকিছুটা কী সে বুঝতে পারছে না। মজুর মন বলছে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক না। তাকে চলে যেতে হবে। এখনই যেতে হবে। মজু অনেক চেষ্টা করেও পা নাড়াতে পারল না। তার মনে হচ্ছে পায়ের প্রতিটি মাংসপেশি সীসার মতো হয়ে গেছে। সে কি চিৎকার করে সাহায্যের জন্যে কাউকে ডাকবে ?

ছাতিম গাছের নিচে কে ?

দু'জন মানুষের একজন কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে। একজন শুধু আছে। সে তাকিয়ে আছে মজুর দিকে। তাকে একটা প্রশ্ন করেছে। তাকে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

আপনি কে ?

আমার নাম মজু। আমি লঞ্চঘাটে কুলির কাম করি।

এত রাতে এখানে কী ?

মজু জবাব দিল না। লাবুস বলল, আপনার সঙ্গে একটা ক্ষুর আছে। ক্ষুর নিয়ে কেন এসেছেন ?

মজু এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। ক্ষুর তার পকেটে। সে গায়ে একটা চাদরও দিয়েছে— এই মানুষটার ক্ষুরের কথা জানার কোনোই কারণ নেই।

লাবুস বলল, যান বাড়িতে যান।

মজু রওনা হলো। পা ফেলতে এখন আর তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

ইমাম করিমের স্ত্রী শলার ঝাড়ু দিয়ে উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। করিম সারারাত ইবাদত বন্দেগি করে এখন শুয়ে ঘুমাচ্ছে। মনে হয় দুপুর পর্যন্ত ঘুমাবে। শরিফার মাথায় গোপন এক ইচ্ছা কিলবিল করছে। বোরকা পরে কিছুক্ষণের জন্যে সে কি বের হবে ? মূলসড়ক পাশে রেখে জংলার ভেতর দিয়ে চলে যাবে। হরিচরণ বাবুর

কবরের (যার বর্তমান নাম মোহম্মদ আহম্মদ) পাশের আমগাছে মাথার এক গাছি সুতা বেঁধে বলবে— আল্লাহ্পাক দয়া কর। একশ' টাকার নোটটা পাওয়ায়ে দাও।

যেতে আসতে বেশি সময় লাগার কথা না। এর মধ্যে করিমের ঘুম ভাঙলে খুব সমস্যা হবে না। সে বলবে খাওয়ার পানি আনতে গিয়েছিল। বান্ধবপুরে দু'টা টিউবকল। একটা মুসলমানদের জন্যে, একটা হিন্দুদের জন্যে।

হিন্দু টিউবকলটা ঘরের কাছে। মুসলমান টিউবকল একটু দূরে। পানি আনতে দেরি হতেই পারে। উঠান ঝাট অসমাপ্ত রেখেই শরিফা অতি দ্রুত ঘরে ঢুকে বোরকা পরল। এলুমিনিয়ামের কলসি হাতে বের হয়ে গেল।

বনের ভেতর দিয়ে পথ। শরিফা ঝড়ের গতিতে যাচ্ছে। তার ভয় ভয় করছে, আবার ভালোও লাগছে। মনে হচ্ছে তার বয়স কমে গেছে। শরীর নিয়ে বিব্রত থাকার মতো বয়সও হয় নি। ইচ্ছা করলেই সে বোরকা খুলে ফেলতে পারে।

শরিফা আমগাছের ডালে সুতা বাঁধল। চোখ বন্ধ করে বলল, আল্লাহ্পাক, দয়া কর। আমি দরিদ্র মেয়েমানুষ। ভাইজান আমাকে আদর করে একশ'টা টাকা দিয়েছেন। কতকিছু কিনব শখ করে আছি। তুমি টাকাটা মিলায়ে দাও।

সুতা বেঁধে শরিফা ফিরছে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকেই সে বোরকার মাথার পর্দা সরিয়ে দিল। জঙ্গলাভর্তি গাছপালা। গাছপালার সামনে পর্দা করার কিছু নাই।

মা, এখানে কী করেন?

শরিফা চমকে উঠল। বাঁদিকে শিমুল গাছের নিচে লাবুস দাঁড়িয়ে আছে। শরিফার উচিত দ্রুত বোরকার পর্দা ফেলে দেয়া। কিন্তু তার হাত-পা কেমন শক্ত হয়ে গেছে।

মা, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি লাবুস। এক রাতে আপনি আমাকে আদর করে খানা দিয়েছিলেন।

শরিফা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি যাই। আমি যাই।

লাবুস বলল, আমি আপনাকে জংলা পার করায়ে দেই?

শরিফা বোরকার পর্দা ফেলে দিয়ে ভীত গলায় বলল, লাগবে না লাগবে না।

শরিফা দৌড়াচ্ছে। যে-কোনো সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে এমন অবস্থা।

বাড়ির উঠানে ঢুকে শরিফা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়ি সুনসান। করিমের ঘুম এখনো ভাঙে নি। ঘুম ভাঙলে সে শরিফাকে না দেখে চিন্তিত হয়ে উঠানে বসত।

শরিফা ঘরে ঢুকল। করিম চাদর গায়ে ঘুমাচ্ছে। শরিফা বোরকা খুলে উঠানে এসে অসমাপ্ত ঝাড়ু শুরু করল। কলাপাতার বেড়ার ওপাশ থেকে কেউ একজন গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, ইমাম সাহেব আছেন ? উনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শরিফা জবাব দিল না। জবাব দেবার অর্থ পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা।

বেড়ার ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো, আমার নাম মজু। ইমাম সাহেব একটা কাজে আমাকে একশ' টাকা দিয়েছিলেন। কাজটা হয় নাই। আমি টাকাটা ফেরত দিব। এখনই ফেরত দিতে হবে। আমি লঞ্চে উঠব। কইলকাতা যাব।

শরিফা দাঁড়িয়ে আছে। একশ' টাকার কথা উঠেছে। ব্যাপারটা কী ? করিম একশ' টাকা কোথায় পেয়েছে ?

মজু বলল, আপনে বাড়ির ভিতরে যান। আমি উঠানে টাকা রাইখা যাব। জলচৌকির উপর রাখব।

শরিফা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। তার বুক ধ্বক ধ্বক করছে। ঘটনাটা কী ?

জলচৌকির ওপর পাথর চাপা দেয়া নোটটা যে শরিফার এই বিষয়ে শরিফা নিশ্চিত। নোটের এক কোনায় হলুদের দাগ। গাছে চুল বাঁধায় কাজ হয়েছে। আল্লাহ্পাক শরিফার টাকা শরিফাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে এখন শরিফার মনে হচ্ছে কাজ না হলেই ভালো হতো। কিছু জিনিস গোপন থাকাই ভালো।

শরিফা!

শরিফা চমকে তাকাল। ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠেছে। তার গলায় বিরক্তি।

ফজর ওয়াক্ত পার হয়েছে, তুমি আমারে ডাকলা না— এটা কেমন কথা! তুমি নিজে কি নামাজ পড়েছ ?

পড়েছি।

নিজে ঠিকই পড়লা, আমারে ডাকলা না ?

আপনে সারা রাইত জাগনা ছিলেন এই জন্যে ডাকি নাই।

বিরাট অন্যায় করেছ শরিফা। বিরাট অন্যায়। তাড়াতাড়ি অজুর পানি দেও।

করিম অজু করছেন। শরিফা জলচৌকিতে বসা করিমের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে চোখ ফেরাতে পারছে না। এই মানুষটা তার একশ' টাকা চুরি করেছে ? এই মাওলানা মানুষ। তার স্বামী। হাদিস কোরান জানা স্বামী। তাকে কি শরিফা সরাসরি প্রশ্ন করবে ? না-কি চুপ করে থাকবে ?

করিম অজুর শেষে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, কী দেখো ?

আপনারে দেখি।

আমারে দেখার কী আছে?

শরিফা বলল, আইজ আপনারে সুন্দর লাগতেছে। চেহারায় নুরানি ফুটছে। আপনারে একটা প্রশ্ন করব। নামাজের আগে করব না পরে করব বুঝতেছি না।

কর, এখনই কর। আর একটা কথা, সব সময় মাথার মধ্যে প্রশ্ন নিয়া ঘুরবা না। বলো প্রশ্নটা কী?

শরিফা বলল, হাদিস কোরান মতে চুরির শাস্তি কী?

হাদিস কোরান মতে চুরির শাস্তি ভয়ঙ্কর। প্রথমবার যে চুরি করবে তার ডান হাত কেটে ফেলতে হবে। তারপরেও চুরি করলে বাম হাত।

আপনার ডান হাত কাটা গেলে আপনে চলবেন কীভাবে?

কী বললা?

শরিফা চুপ করে রইল। করিম বলল, একশ' টাকা হারায়া তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন আমারে চোর ভাবতেছ। আল্লাহপাক এই কারণে তোমারে কঠিন শাস্তি দিবেন। শাস্তি থেকে বাঁচার একটাই পথ। তওবা করা। আমার সঙ্গে তিনবার বলো— তওবা আস্তাগফিরুল্লা।

তওবা আস্তাগফিরুল্লার।

আবার বলো তওবা আস্তাগফিরুল্লা।

শরিফা আবার বলল, তওবা আস্তাগফিরুল্লা। বলতে বলতে সে কী মনে করে হেসে ফেলল। মাওলানা ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, হাসো কেন? কিছুই বুঝলাম না, এখানে হাসির কী আছে!

শরিফা বলল, আমার হারানো টাকা আমি খুঁজে পেয়েছি, এইজন্যে মনের আনন্দে হাসতেছি। এই দেখেন টাকা। এক কোনায় হলুদের দাগ।

শাড়ির আঁচল খুলে শরিফা টাকা বের করেছে। মেলে ধরেছে।

টাকা কই পাইলা?

আপনে একজনেরে টাকাটা দিয়েছিলেন, সে ফিরত দিয়া গেছে।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি এইসব কী বলতেছ?

টাকা আপনে আমার বরই-এর হাঁড়ি থাইকা চুরি করেন নাই?

কী বলো তুমি!

শরিফা ঠান্ডা গলায় বলল, আপনে নামাজ শেষ কইরা স্থির হয়া বসেন। আমি আপনের হাত কাটব। কুড়াল দিয়া এক কোপ দিব।

নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ।

নাউজুবিল্লাহ বইলা লাভ নাই। আমি সত্যি হাত কাটব। বিসমিল্লাহ বইল্যা এক কোপ দিব।

হঠাৎ শরিফার হাসি পেয়ে গেল। মানুষটা ভয় পেয়েছে। মনে হয় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছে তার হাত কাটা যাবে। শরিফার সামান্য মায়াও লাগছে।

করিম বলল, শরিফা তুমি পাগল। আমি পাগল স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করব না। আমি ঠান্ডামাথায় পশ্চিমমুখী হইয়া তোমারে তালাক দিতেছি। তালাক তালাক তালাক।

শরিফা বিড়বিড় করে বলল, আমারে তালাক দিলেন ?

হ্যাঁ দিলাম। শুনতে না পাইলে আরেকবার বলতেছি— তালাক তালাক তালাক। শুনেছ ?

শুনেছি।

শরিফা বড় করে নিঃশ্বাস নিল। সে ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছে। চারপাশে কী ঘটেছে বুঝতেও পারছে না। গরম বোধ হচ্ছে। কপাল ঘামছে। ইচ্ছা করছে দিঘির ঠান্ডা পানিতে গলা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে।

করিম বলল, আমি যে তোমারে তালাক দিয়েছি এটা কি বুঝেছ ?

বুঝেছি।

খোরপোষের টাকা এখন দিতে পারব না। ধীরে সুস্থে দিব। হাতে টাকা নাই।

আচ্ছা।

আমি এখন বেগানা পুরুষ। আমার দিকে এইভাবে তাকাবা না। মাথায় ঘোমটা দাও। ঘরে যাও। ভাটির দেশে তোমারে পাঠাইবার ব্যবস্থা নিতেছি। ভাই বেরাদরের সঙ্গে থাকবা।

আমি কোনোখানে যাব না। এইখানেই থাকব।

অসম্ভব।

করিম জায়নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজ দ্রুত শেষ করে খোঁজ নিতে হবে ঘটনা কী ঘটেছে। কিছুক্ষণ আগে তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এই নিয়ে তার মনে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আপদ বিদায় করতে হবে। কেরায়া নৌকায় করে বদ মেয়েটাকে বাপের দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। ভাগ্য ভালো মেয়েটার পেটে সন্তান নাই। সন্তান থাকলে ইদ্দতের সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হতো।

শরিফা কাঁদছে। শব্দ করে কাঁদছে। করিম নামাজে মন দিতে পারছেন না।

শিবশংকরের শরীর কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। দুপুরের দিকে নিয়ম করে জ্বর আসছে। সন্ধ্যার পর পর জ্বর সেরে যাচ্ছে। তাকে কুইনাইন মিকচার দেয়া হচ্ছে। অতি তিক্ত সেই মিকচার সে পেটে রাখতে পারছে না। খাওয়ার পর পর বমি হয়ে যাচ্ছে। শিবশংকরের স্বাস্থ্য শিক্ষক গোপীনাথ বল্লভ ভালো দুশ্চিন্তায় আছেন। শিবশংকরকে নিরম্বু উপবাসের বিধান দিয়েছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস। উপবাসে শরীরের বিষ নষ্ট হয়। শিবশংকরের শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে বলে তাঁর ধারণা।

শিবশংকর উপবাস করে যাচ্ছে। খাদ্যে এমনিতেই তার রুচি নেই। উপবাস তার জন্যে ভালো। সে জ্বরের সময়টা চাদর গায়ে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছে। হাতের কাছে বইপত্র রাখছে। পড়তে ইচ্ছা করলে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। চামড়ায় বাঁধানো একটা খাতাও তার আছে। মাঝে মাঝে খাতায় ডায়েরির মতো লেখা লিখছে।

এক দুপুরে জ্বরের প্রবল ঘোরে সে খাতায় লিখল—

সাধনা = ফসল

সাধনা + প্রার্থনা = ফসল

কাজেই প্রার্থনা = ০

এর অর্থ প্রার্থনা মূল্যহীন। শিবশংকরের ধারণা হলো সে বিরাট এক আবিষ্কার করেছে। অংক দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, প্রার্থনা হলো শূন্য। মূল্যহীন। সে তার আবিষ্কারের কথা গোপীনাথকে বলল। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, তুমি বিকারের ভেতর আছ। জ্বরের কারণে এই বিকার তৈরি হয়েছে। তিনি শিবশংকরকে পাকস্থলী ধৌত করার বিধান দিলেন। বিকারের কেন্দ্রবিন্দু পাকস্থলী। পাকস্থলী ধৌত করার অর্থ বিকার ধৌত করা।

গোপীনাথের পাকস্থলী ধৌত করার পদ্ধতিটা জটিল এবং কষ্টকর। এক জগ লেবু মেশানো পানি পুরোটা খেয়ে ফেলতে হবে। ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট বসে থাকতে হবে। তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে পাকস্থলীর পুরো পানি ফেলে দিতে হবে।

শিবশংকর কষ্টকর এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। কোনোরকম আপত্তি করছে না। পাকস্থলী ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় তার বিকার যে দূর হচ্ছে তা না। বরং আরো বাড়ছে। শিবশংকর তার আবিষ্কারের বিষয়টা চিঠি লিখে দু'জনকে জানিয়েছে। একজন তার বাবা মনিশংকর। অন্যজন বিখ্যাত মানুষ— শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনিশংকর পুত্রের চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছেন। তিনি পুত্রের মানসিক অবস্থা নিয়ে যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তা তাঁর চিঠিতে বোঝা যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন—

বাবা শিবশংকর,

তোমার পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিত এবং চিন্তিত হইয়াছি। তোমাকে একা রাখা ঠিক হয় নাই। তোমার আশেপাশে আমার থাকা উচিত ছিল। আমি নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত বলিয়া তাহা পারি নাই। ইহা আমার ব্যর্থতা। তুমি প্রমাণ করিয়াছ প্রার্থনা = ০, কিন্তু বাবা আজ তুমি যে বাঁচিয়া আছ তার মূলে আছে প্রার্থনা। তোমার আরোগ্য সাধনের সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন হরিচরণ বাবু প্রার্থনার মাধ্যমে তোমার জীবন রক্ষা করেন। এই কাহিনী বান্ধবপুরের সকলেই জানে। তুমিও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অবগত আছ।

এখন আমার আদেশ, তুমি মাথা হইতে এই ধরনের উদ্ভট এবং ক্ষতিকর চিন্তা পরিত্যাগ করিবে এবং কায়মনে পাপচিন্তার জন্যে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

গোপীবাবুর কাছে শুনিলাম তোমার শরীর ভালো যাইতেছে না। আমি বিশেষ চিন্তাযুক্ত। মন্ত্রপূত একটি শক্তিকবজ পাঠাইলাম। ভক্তি সহকারে গলায় ধারণ করিবে। যেন অন্যথা না হয়।

ইতি তোমার চিন্তাযুক্ত পিতা
শ্রী মনিশংকর

রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চিঠির জবাব এলো না। শিবশংকর তা আশাও করে না। বড় মানুষদের কাছে সবাই চিঠি লেখে। এত চিঠির জবাব দেয়া সম্ভব না।

মন্ত্রপূত মাদুলির গুণেই হোক কিংবা পাকস্থলী ধৌতকরণ চিকিৎসার কারণেই হোক শিবশংকরের রোগ খানিকটা সেরেছে। পালা জ্বর বন্ধ হয়েছে।

সে আগের মতো ঘুরতে বের হচ্ছে। হরিচরণের কবরের পাশে বেড়ে ওঠা আমগাছের চারদিকে রুটিন করে ঘুরছে। এই কাজটা করতে কেন জানি তার ভালো লাগে। নিজেকে তখন ইলেকট্রন মনে হয়। ইলেকট্রন যেমন অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে সেও সেরকম ঘুরছে। আমগাছটা যেন নিউক্লিয়াস। প্রোটন এবং নিউট্রন।

বেলা কম হয় নি, দশটার ওপরে বাজে। শিবশংকর আমগাছের চারদিকে ঘুরছে। তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কারণ ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে। এই বৎসরটা মনে হয় কুয়াশার বছর। শ্রাবণ মাস শুরু হয়েছে। টানা বৃষ্টি হবার কথা। তার বদলে কুয়াশা। কথায় আছে— 'মেঘের দিনে কুয়াশা, রাজকপালও ধুয়াশা।' বড় কোনো দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।

শিবশংকর নিজের মনে আছে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছে, I am Mr. Electron. হঠাৎ সে শুনল অতি মিষ্টি সুরে কেউ যেন কথা বলল, আপনার কী হয়েছে ?

শিবশংকর দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার ভেতর থেকে কিশোরী এক মেয়ে বের হয়ে এলো। মেয়েটির পরনে ঘাগড়া জাতীয় পোশাক। মাথায় ঘোমটার মতো করে দেয়া ওড়না। মেয়েটির গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। বড় বড় চোখ। চোখের মণি ঘন কৃষ্ণবর্ণ। মুখ গোলাকার। নাক সামান্য চাপা। কুয়াশার ভেতর মেয়েটাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীর মতো। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটা মুসলমান। মেয়েটা আবার বলল, আপনার কী হয়েছে ?

শিবশংকর বিব্রত গলায় বলল, কিছু হয় নাই তো।

চক্কর দিচ্ছেন কেন ?

এম্নি। এটা আমার খেলা।

মেয়েটি বলল, ছোট বাচ্চারা এরকম খেলে। আপনি কি ছোট বাচ্চা ?

শিবশংকর বলল, তুমি বান্ধবপুরের ?

মেয়েটি বলল, আমার নাম আতর। আমি ধনু শেখের মেয়ে।

কোলকাতায় থাকো ?

হুঁ। জাপানিরা বোমা ফেলবে এইজন্যে চলে এসেছি।

স্কুলে পড় ?

হুঁ। বেগম রোকেয়ার স্কুলে।

কোন ক্লাসে ?

ক্লাস এইট।

তুমি ছাত্রী কেমন?

ভালো না। ক্লাস সেভেনে একবার ফেল করেছি।

আমেরিকা কে আবিষ্কার করেছেন জানো?

জানি। কলম্বাস।

শুধু কলম্বাস বলা ঠিক না। বলা উচিত ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ভাস্কো দা গামা কে জানো?

জানি না। আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন? আপনি কি বেলারানি?

বেলারানি কে?

বেলারানি আমাদের ইংরেজি আপা। শুধু প্রশ্ন করেন। কেউ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে বলেন, You goat. আমরা উনাকে কী ডাকি জানেন? আমরা ডাকি মিসেস গোটরানি। তাঁর একটা ছেলে আছে। হাবাগোবা। নাম অক্ষয়। আট বছর বয়স। একদিন স্কুলে নিয়ে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, এই তোর নাম কী? সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, অততয় বাবু।

শিবশংকর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। কী সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে মেয়েটা কথা বলে যাচ্ছে। যেন শিবশংকর তার অনেক দিনের চেনা কেউ। মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গিটাও কী সুন্দর! হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। অভিনয়ও করছে। তোতলামির অভিনয় করে কী সুন্দর বলল— অততয় বাবু।

শিবশংকর বলল, তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞেস করলে না।

আতর বলল, আমি সবাইকে চিনি। আপনাকেও চিনি। আপনি মনিশংকর চাচার ছেলে শিবশংকর। আপনি গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন। হয়েছে না?

হয়েছে।

আমি এখন যাই। অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি। আল্লাহ্ আমাকে পাপ দিবে।

শিবশংকর তাকিয়ে আছে। আতর নামের মেয়েটা ছোট ছোট পা ফেলে দ্রুত যাচ্ছে। শিবশংকরের কাছে মনে হলো, হাঁটার মধ্যেও এই মেয়ের নাচের ভঙ্গি আছে। মেয়েটির ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যে সে চোখ ফেরাতে পারল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার জন্যে তার একটু লজ্জাও লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে বান্ধবপুরের সবাই তাকে দেখছে।

ধনু শেখ অনেক বেলায় নাশতা খেতে বসেছেন। বাটিভর্তি মুরগির মাংস এবং চালের আটার রুটি। তাঁর হজমের সমস্যা হচ্ছে। যা খান কিছুই হজম হয় না। বুক জ্বালাপোড়া করে। কবিরাজি চিকিৎসা চলছে। কোলকাতার কবিরাজ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী মিশ্র ঠাকুর চিকিৎসা করছেন। গুরুপাক খাবার সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছেন। নিষেধ মানা ধনু শেখের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

ধনু শেখ খেতে বসেছেন উঠানের জলচৌকিতে। চায়ের কাপে ওষুধ তৈরি করা আছে। খাওয়া শেষ করেই ওষুধ খাবেন। ওষুধ খালিপেটে খাওয়ার কথা। তিনি এই নিয়ম মানেন না। তাঁর মতে ওষুধ হচ্ছে ওষুধ। ওষুধের আবার খালিপেট ভরাপেট কী? যত ফালতু বাত।

নাশতার মাঝখানে আতর উঠানে উপস্থিত হলো। ধনু শেখ বললেন, কই ছিলি?

আতর বলল, বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বান্ধবপুরে বেড়ানোর কী আছে?

অনেক কিছুই আছে। নদী আছে, জঙ্গল আছে, পুকুর আছে।

একা কোনোখানে যাবি না।

একা তো যাই নাই। দুইজন সঙ্গে নিয়ে গেছি।

ধনু শেখ বিস্মিত হয়ে বললেন, দুইজন কে?

আতর নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, কান্ধের দুই ফেরেশতা নিয়ে গেছি। একজনের নাম কেরামন, আরেকজনের নাম কাতেবিন। ঠিক আছে না বাবা?

ধনু শেখ হতাশ গলায় বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে বলা ছাড়া তাঁর উপায়ও নেই। তিনি তাঁর এই মেয়েকে অত্যধিক স্নেহ করেন। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে একজনই বেঁচে আছে। মা মরা মেয়ে। মেয়ের মা বেদানা গত বৎসর হঠাৎ করে মারা গেছে। ধনু শেখ বিনা কারণে কাউকে এভাবে মারা যেতে দেখেন নি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে পান মুখে দিয়ে শুয়েছে। শোবার আগে দাসীকে বলেছে, আইজ আরামের ঘুম দিব। কেউ যেন না ডাকে। মশারি ফেলে দিও। দিনেরবেলা মশা যখন ত্যক্ত করে তখন খুব খারাপ লাগে। রাতের মশা সহ্য করা যায়। দিনের মশা না।

দাসী মশারি খাটাতে গিয়ে দেখে, মুখভর্তি পান নিয়ে বেদানা মরে পড়ে আছে।

মায়ের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে আতর দুইদিন দুই রাত কিছুই মুখে দেয় নি। পানি পর্যন্ত না। তৃতীয় দিনে সে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। ধনু শেখকে

বলল, বাবা, মা পরকালে খুব ভালো জায়গায় স্থান পেয়েছেন। সুখী এবং পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে এখন তাঁর যোগাযোগ। এখন আর তাঁকে নিয়ে মনে কষ্ট পাওয়ার কিছু নাই। ধনু শেখ বিস্মিত হয়ে বললেন, তোকে বলেছে কে ?

আতর স্বাভাবিক গলায় বলল, মা বলে গেছেন।

ধনু শেখ জানেন এইসব কল্পনার কথা। মৃতমানুষ কখনো কিছু বলে যায় না। তাদের কিছু বলার ক্ষমতা থাকলে জীবিত মানুষদের সারাক্ষণ মৃতদের কথা শুনতে হতো। তারপরেও মেয়ের মনের শান্তির জন্যে তিনি বলেছেন, খুবই ভালো সংবাদ দিলা মা। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্। বান্ধবপুরের ইমাম করিমকে পত্র দিতেছি, সে যেন মসজিদে মিলাদ এবং তবারুকের আয়োজন করে।

মাওলানা ইদরিসের মেয়ে মীরার বয়স তের মাসের কয়েকদিন বেশি। এই বয়সে শিশুরা বাবা, মা, পানি... এরকম অনেক কথা বলে। মীরা একটি শব্দ ছাড়া কোনো কথাই বলে না। সে শব্দটা হলো— রাম। ইদরিসের মনে এই নিয়ে খুবই কষ্ট। এত শব্দ থাকতে তাঁর মেয়ে রামনাম শিখল কেন ? যখন তিনি বলেন, মীরা মা, বলো বাবা। বাবা। আমি তোমার বাবা। বলো বাবা।

মীরা বলে, রাম।

ইদরিস বড়ই বিরক্ত হন। ছোট্ট মীরা মনে হয় বাবার বিরক্তি ধরতে পারে। সে তার বাবাকে আরো বিরক্ত করার জন্য মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, রাম। রাম।

কালী বলে যে মেয়েটা মীরার দেখাশোনা করে তাকে ইদরিস জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি আমার মেয়েটার সামনে রামনাম নাও ? তাকে রাম বলা তুমি শিখায়েছ ?

কালী দুঃখিত হয়ে বলেছে, মুসলমান মেয়েরে আমি রামনাম কেন শিখাব বলেন ? আমার ধর্মভয় আছে না ?

মেয়েটা আপনাআপনি রাম ডাকা শুরু করল ?

তাই তো দেখি। বিরাট আশ্চার্য ব্যাপার।

মেয়ের 'রাম' ডাকার জন্যে মাওলানা ইদরিস যতটা দুঃখিত তারচেয়ে অনেক দুঃখিত হাদিস উদ্দিন। সে মীরার কানের কাছে ক্রমাগত বলে— মরা মরা মরা। রাম উল্টো করে মরা বলা। এতে যদি দোষ কাটে।

দোষ কাটে না। মীরা আরো বেশি করে বলে, রাম রাম। বলে আর হাসে। হাত-পা নাড়ে।

একজন মুসলমান মেয়ে জন্মের পর থেকে রামনাম জপ করছে, এই খবরটা বান্ধবপুরে ভালোই ছড়িয়েছে। অনেকের ধারণা মীরার ভেতর দেবী সীতা প্রকাশিত হয়েছেন। তিনিই স্বামী রামের নাম জপ করছেন। এয়োতি মেয়েরা তাদের শাঁখা এবং সিঁদুরের কৌটা মীরাকে দিয়ে ছুঁইয়ে নিচ্ছে। সবাই ভক্তিভরে মীরাকে কোলেও নিচ্ছে। অতি ভক্তিমতীরা মীরার পায়ে প্রণামের ভঙ্গিও করছে।

মীরার বিষয়ে কথাবার্তা শুনে তাকে দেখতে এসেছে শিবশংকর। মীরাকে কোলে নিয়ে শ্রীনাথ বাগানে হাঁটছিলেন। শিবশংকরকে দেখে মীরা কোলে ওঠার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। শিবশংকর তাকে কোলে না নিয়ে বলল, খুকি তোমার নাম কী ?

মীরা ফিক করে হেসে বলল, রাম।

শ্রীনাথ বাবু বললেন, বুঝলে শিবশংকর, এই মেয়ের মুখে রাম ছাড়া কোনো কথা নেই। তাকে যাই জিজ্ঞেস করো সে বলবে রাম। ভক্তিভরে বলে।

শিবশংকর বলল, কাকু, আমার ধারণা আপনি তাকে রামনাম শিখিয়েছেন।

শ্রীনাথ চোখ কপালে তুলে খড়খড়ে গলায় বললেন, এইরকম ধারণার কারণ কী ?

শিবশংকর বলল, আপনি রামভক্ত মানুষ। দিনরাত রামায়ণ পড়েন।

মুসলমান এই মেয়েকে রামায়ণ শিখায়ে আমার লাভ ?

আপনি পুণ্যের আশায় এই কাজ করেছেন। আপনি ভেবেছেন একটা মুসলমান মেয়েকে রামনাম শেখানোয় আপনার পুণ্য হয়েছে। পুণ্যের আশায় অশিক্ষিত মানুষরা অনেক অন্যায় করে।

তুমি আমাকে অশিক্ষিত বললা ?

আপনাকে বলি নাই। যারা অশিক্ষিত তাদের বলেছি।

আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ। তুমি কি জানো তোমার এই আচরণের জন্যে আমি যদি পৈতা ছুঁয়ে অভিশাপ দেই তুমি গলায় রক্ত উঠে মারা যাবে।

শিবশংকর স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনি অযথাই আমার ওপর রাগ করছেন। তারপরেও আপনি যদি অভিশাপ দিতে চান দিতে পারেন। অভিশাপ হলো শূন্য। আমি অংক দিয়ে প্রমাণ করতে পারি।

শ্রীনাথ রাগে থরথর করে কাঁপছেন। শিবশংকর স্বাভাবিক গলায় বলছে—

জীবন = মৃত্যু

জীবন + অভিশাপ = মৃত্যু

কাজেই অভিশাপ = ০

শ্রীনাথ বললেন, তোমার পিতা বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তার ছেলে হয়ে তুমি কুলাঙ্গার হয়েছ। তোমার মুখদর্শনও পাপ।

শিবশংকর চলে এলো। আজ তার মন খুব ভালো, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ তার মতো নগণ্য একজন মানুষের চিঠির জবাব দিয়েছেন। চিঠি পড়ে শিবশংকর লজ্জার মধ্যে পড়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ তার চিঠি পড়ে ভেবেছেন যে, শিবশংকর গুরুগম্ভীর বয়স্ক কোনো মানুষ। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ভবদীয় শিবশংকর,
>
> আপনার পত্র হস্তগত হইয়াছে। আপনি অংকের মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন প্রার্থনা সমান শূন্য। আপনার অংকে কিছু কৌশল আছে। কৌশল মানেই ফাঁকি। ভগবান ফাঁকির উর্ধ্বে। আপনি যে সাধনার কথা বলিয়াছেন সেখানেও কিন্তু প্রার্থনা জড়িত। প্রার্থনা বাদ দিয়া সাধনা হয় না।
>
> ইতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
> জোড়াসাঁকো

শিবশংকরের খুব ইচ্ছা চিঠিটা সবাইকে পড়ায়। পড়াবার মতো কাউকে সে পাচ্ছে না। এই চিঠির মর্ম উদ্ধার সবার পক্ষে সম্ভব না। তবে তার ধারণা আতর মেয়েটা হয়তো চিঠির গুরুত্ব বুঝতে পারবে। মেয়েটার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না এটাই সমস্যা। রোজ ভোরে আমগাছের চারদিকে চক্কর দেবার সময় তার মনে হয় এই বুঝি কুয়াশার ভেতর দিয়ে আতর এসে দাঁড়াবে। তাকে দেখে ঠোঁট চেপে হাসবে। শিবশংকর ঠিক করেছে সাতদিন সে অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে দেখা না হলে চলে যাবে ধনু শেখের বাড়িতে।

ধনু শেখ স্নানপর্বের আগে গায়ে রসুন ভেজানো সরিষার তেল মাখছিলেন। এই অবস্থায় খবর পেলেন মনিশংকরের ছেলে শিবশংকর এসেছে। সে আতরের সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুব না-কি জরুরি। ধনু শেখের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি শিবশংকরকে উঠানে ডেকে পাঠালেন।

তুমি শিবশংকর?

শিবশংকর হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমার মেয়ে আতরকে চেন?

চিনি।

কীভাবে চেন?

তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে।

কী কথা হয়েছে?

নানান বিষয়ে কথা হয়েছে।

তার সঙ্গে তোমার প্রয়োজনটা কী?

তাকে আমি একটা চিঠি পড়তে দিব।

ধনু শেখের হতভম্ব ভাব কাটছে না। বরং বাড়ছে। তিনি চাপা গলায় বললেন, আতর বাড়িতে আছে। তবে তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। তুমি আর কখনো এ বাড়িতে আসবেও না।

শিবশংকর বলল, আচ্ছা।

ধনু শেখ বলতে চাচ্ছিলেন, এ বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি তোমাকে দেখি তাহলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। কঠিন কথাটা বলতে পারলেন না। মনিশংকরের ছেলেকে এমন কথা বলা যায় না। মনিশংকর বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে তাকে তার পুত্রের কর্মকাণ্ড অবশ্যই জানানো উচিত। তিনি ঠিক করলেন, আজ দিনের মধ্যেই মনিশংকরকে চিঠি দিয়ে সব জানাবেন। এই সঙ্গে আতরকেও সাবধান করে দিতে হবে।

আতরের বিষয়ে তিনি খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন। মেয়েটা এমন একটা কাণ্ড করেছে যার কাছে শিবশংকরের সঙ্গে আলাপের ঘটনা কিছুই না। তিনি শুনেছেন আতর নৌকা নিয়ে রঙিলা নটিবাড়ি দেখতে গিয়েছিল। এই বিষয়ে আতরের সঙ্গে এখনো কথা হয় নাই। কীভাবে কথা বলবেন বুঝতে পারছেন না বলেই কথা হয় নাই। আতরকে বান্ধবপুরে আনাটাই ভুল হয়েছে। যে কর্মকাণ্ড সে করছে তারচেয়ে কোলকাতায় থেকে জাপানিদের বোমা খাওয়াও অনেক ভালো।

ধনু শেখ ডাকলেন, আতর মা কোথায়?

ঘর থেকে আতর বের হলো না। আতরের দাসী হামিদা বের হলো। হামিদার চেহারা রাক্ষসের মতো। দাঁত উঁচু। মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ নষ্ট। সেই নষ্ট চোখ অক্ষিকোটর থেকে সামান্য বের হয়ে আছে।

অবিবাহিতা অতি রূপবতী কন্যাদের জন্যে কুৎসিতদর্শন দাসী রাখতে হয়। হামিদাকে এই কারণেই রাখা হয়েছে।

হামিদা ঘোমটা দিয়ে তার নষ্ট চোখ ঢেকে বলল, আম্মা বাড়িতে নাই।

ধনু শেখ বললেন, কই গেছে?

ইমাম করিম সাহেবের বাড়িতে গেছেন।

করিম সাহেবের বাড়িতে কেন ?

উনার পরিবারের সাথে আম্মার ভাব হইছে। পেরায়ই ঐ বাড়িতে যায়।

তুমি তার সঙ্গে যাও নাই কেন ?

আম্মা আমারে নিয়া কোনোখানে যায় না।

ধনু শেখ বললেন, আতর রঙিলা বাড়িতে গিয়েছিল, এটা কি সত্য ?

সত্য না।

সত্য না হলে কেন আমার কানে এমন কথা আসছে ?

জানি না কেন আসছে।

তুমি ইমাম করিমের বাড়িতে যাও। আতরকে নিয়া আস।

জি আচ্ছা।

ধনু শেখ বললেন, জি আচ্ছা বলে দাঁড়ায়া আছ কেন! যাও।

হামিদা চলে গেল। ধনু শেখ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ হামিদা। সে ধনু শেখের জীবনে বড় ধরনের এক সমস্যা তৈরি করেছে। এই মেয়েটির চেহারা যত কুৎসিত তার কণ্ঠস্বর ততটাই মধুর। সে যখন কথা বলে ধনু শেখের শুনতে ভালো লাগে। ধনু শেখের মনে হয়, মেয়েটিকে পর্দার আড়ালে রেখে তিনি তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতে পারবেন। কেন এরকম মনে হয় তিনি নিজেও জানেন না। হামিদা কি কোনো তুকতাক করেছে ? সম্ভাবনা আছে। দাসীশ্রেণীর মেয়েরা তুকতাকে পারদর্শী। হামিদাকে বিদায় করে দেয়াটাই সবচে' ভালো বুদ্ধি। সমস্যা একটাই, আতর হামিদাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। অনেক রাত জেগে তার সঙ্গে গল্প করে। ধনু শেখ শুনেছেন, এমনও হয়েছে— গল্প করতে করতে তারা রাত পার করে দিয়েছে। এটাও কোনো ভালো কথা না। দাসীর সঙ্গে এত কী গল্প! দাসী হলো দাসী। আতরের বিয়ে হলে হামিদা আতরের সঙ্গে আতরের শ্বশুরবাড়িতে যাবে। হামিদার বাকি জীবন কাটবে সেখানে। আতরের স্বামী যদি চায় দাসীর গর্ভেও সন্তান জন্মাতে পারবে। সেই সন্তানরা কোনো সম্পত্তির অংশ পাবে না। বাবাকে বাবা ডাকতে পারবে না। তারা বাবার সংসারে কামলা খাটবে। এইটাই নিয়ম। অনেকে এই নিয়মে ভুল খুঁজে। ধনু শেখ কোনো ভুল দেখেন না। নিয়ম সমাজের ভালোর জন্য আসে। মন্দের জন্য আসে না।

আতর গল্প করছে শরিফার সঙ্গে। গল্পের বিষয়বস্তু রঙিলা নটিবাড়ি। আতর সেখানে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ছিল। সে কী দেখে এসেছে তারই গল্প। শরিফা বলল, তোমার খুবই সাহস।

আতর বলল, ঠিকই বলেছেন, আমার অনেক সাহস।

তোমার বাবা এই ঘটনা জানেন না ?

না। আর জানলেই কী ? উনি আমারে কি শাস্তি দিবে ? আমারে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা উনার নাই। বাপজান আমারে ভয় পায়।

ভয় পায় ?

হুঁ। বাপজান ভাব দেখায় সে খুব সাহসী। আসলে ভীতু। বেজায় ভীতু।

শরিফা ইতস্তত করে বলল, রঙিলা বাড়িতে কী দেখলা ?

আতর বলল, দিনেরবেলা গিয়েছিলাম। কিছুই দেখি নাই। সুন্দর সুন্দর মেয়ে— হাসতেছে, গল্প করতেছে। একজন আরেকজনের চুল বানতেছে।

ইমাম ইদরিস সাহেবের স্ত্রী জুলেখা না-কি রঙিলা বাড়িতে থাকেন ? উনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

না। উনি রঙিলা বাড়িতে থাকেন না। উনি কলিকাতা থাকেন। তাঁর গানের নতুন রেকর্ড হবে, এইজন্যে গিয়েছেন। আপনি কি রেকর্ডে উনার গান শুনেছেন ?

শুনি নাই। শুনতে ইচ্ছা করে।

আতর বলল, শুনতে ইচ্ছা করলে আমি শুনাব।

তোমার কাছে কি কলের গান আছে ?

কলিকাতার বাড়িতে আছে। আমি আনাব।

কবে আনাবা ?

খুব শিগগির আনাব। এখন আমি যাই।

আচ্ছা যাও, আবার আসবা।

আতর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করব। যদি মনে কিছু না নেন।

শরিফা বলল, মনে কিছু নিব না। যা ইচ্ছা জিজ্ঞাস কর।

আপনার স্বামী আপনাকে তালাক দিয়েছেন। তারপরেও আপনি স্বামীর ঘরে বাস করেন। এটা কেমন কথা

শরিফা বলল, আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভাই আমারে রাখে নাই। আমার কোনোখানে যাওয়ার জায়গা নাই। ইমাম সাব আমারে আবার বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন। উনি দয়া করেছেন।

বিবাহ কবে ?

ধর্মে নিয়ম আছে উনি বিবাহ করার আগে আমারে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে হবে। এরে বলে 'হিল্লা' বিবাহ। আমারে কেউ হিল্লা বিবাহ করতে রাজি

না বইলা দেরি হইতেছে। তবে আমি একঘরে থাকলেও আলাদা থাকি। উনার সঙ্গে কথা বলি না। পর্দার মধ্যে থাকি। ভইন, আর কিছু জিজ্ঞাস করবা ?

না।

আতরের মন খারাপ হয়ে গেল। শরিফা হাসিখুশি মেয়ে, এখন কেমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। আতরের নিজেরও কাঁদতে ইচ্ছা করছে। এরকম তার প্রায়ই হয়। নিজের দুঃখে না, অন্যের দুঃখে তার কাঁদতে ইচ্ছা করে।

যে সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে হিল্লা বিবাহ কঠিন বিষয় ছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের যুগে ভারতবর্ষের মুসলমানরা কঠোরভাবে ধর্মের নিয়মকানুন পালন করতেন না। ধর্মকর্মে ঢিলাঢালা ভাব ছিল। অনেক হিন্দুয়ানী ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ভক্তিভরে দেবদেবীকে নমস্কার করতেন। তাদের কাছে পারলৌকিক এবং ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা জানাতেন। দেবদেবীদের নাম দিয়ে ছেলেমেয়েদের নামও রাখতেন। যেমন—

নারায়ণ শেখ
গোকুল মোল্লা
কালী বানু

মুসলমান মেয়েরা শাঁখা পরতেন, কপালে সিঁদুর দিতেন। মুসলমান বাড়িতে থাকত তুলসি মঞ্চ। সেখানে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালানো হতো।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি মৌলানা এনায়েত আলী এবং মৌলানা কেরামত আলি ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। তাদের ধর্ম প্রচার আন্দোলনের নাম 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া'। এই নামের অর্থ— মোহাম্মদের পথ।

তরিকায়ে মোহম্মদীয়া আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল ফরায়েজী আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূচনা করেন শরীয়তুল্লাহ। ফরায়েজী আন্দোলন মোহাম্মদ (দঃ)-এর শিক্ষার চেয়ে কোরানের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিল। তাদের মতে মুসলমানদের সব বাদ দিয়ে কোরানের ফরজ আঁকড়ে ধরতে হবে।

ফরায়েজী আন্দোলন এবং তার পরে পরে হানাফি মোস্তাহাবের কট্টরপন্থী আন্দোলনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সহজিয়া ভাব দূর হয়ে গেল।

তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহের ব্যাপারে কোরান শরীফ 'হিল্লা বিবাহ' উল্লেখ করেছে, কাজেই হিল্লা বিবাহ হতে হবে। এর মধ্যেও মনগড়া অনেক নিয়মকানুন তৈরি হয়ে গেল। যেমন, যিনি তাঁর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে আবার বিবাহ

করতে চান তিনি তার ইচ্ছার কথা জুম্মার নামাজের পর সমস্ত মুসল্লিদের জানাবেন। যাতে মুসল্লিদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই বিয়েতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। গোপনে কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়া যাবে না।

পবিত্র কোরান শরীফে এ জাতীয় কোনো নিয়মকানুন নেই। সূরা বাকারায় (আয়াত ২৩০) আল্লাহ্‌পাক বলছেন—

> And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. Then if he (the other husband) divorced her it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah.
>
> অনুবাদ : M Pickthall

> তারপর যদি সে ঐ স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ্ করেছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। তারপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয় তবে তাদের আবার মিলনে কারও কোনো দোষ নেই, যদি দুজনে ভাবে যে তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে।
>
> অনুবাদ : মুহাম্মদ হাবিবুর রহ্‌মান

এক জুম্মার নামাজে খুৎবা পাঠের পর ইমাম করিম শরিফার হিল্লা বিবাহের কথা বললেন। মুসল্লিদের মাঝে গুঞ্জন দেখা গেল। এ ধরনের ঘটনা বান্ধবপুরে এর আগে ঘটে নি। করিম বললেন, তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিজের বাড়িতেই আমি রেখেছি। বাধ্য হয়ে রেখেছি। তবে তার মুখ দর্শন করি না। সে আলাদা ঘরে থাকে। তার হিল্লা বিবাহের পর আমি ইনশাল্লাহ্ আবার তাকে বিবাহ্ করব। আমি একটা ভুল করেছি। আল্লাহ্‌পাকের কাছে ভুলের জন্যে ক্ষমা চাই। আমি আমার স্ত্রীকে খুব ভালো পাই। সে ভালো মেয়ে। এখন তার জন্যে আমার মন কান্দে।

কথা বলতে গিয়ে ইমাম করিমের গলা ভারী হয়ে গেল। তার চোখে পানিও এসে গেল। পাগড়ির কোণা দিয়ে তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, যদিও আল্লাহ্‌পাক তালাক বৈধ করেছেন, তারপরেও তাঁর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। অপছন্দের কাজ বলেই তিনি যেসব দম্পতি তালাকের পর পুনর্বিবাহ্ করতে চায় তাদের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। হিল্লা বিবাহ্ এইরকম এক শাস্তি।

জুম্মাবার উপলক্ষে একজন মসজিদে খিচুড়ি সিন্নি দিয়েছিল। করিম সেই খিচুড়ি খানিকটা খেয়ে মসজিদে শুয়ে থাকলেন। বাড়িতে গেলেন না। ঠিক করলেন আছর, মাগরিব এবং এশার নামাজ শেষ করে বাড়িতে যাবেন। আজকাল বাড়িতে যাবার বিষয়ে তিনি আগ্রহ বোধ করেন না। যখন কাজকর্ম থাকে না তখন হাদিস কোরান পড়ে সময় কাটাতে চেষ্টা করেন। কোনো কিছুতেই মন বসে না। প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করেন। অস্থিরতার কারণও তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট না। শরিফাই কারণ এটা ঠিক, তবে কোন অর্থে? শরিফাকে মাথা থেকে সম্পূর্ণ দূর করে তিনি দেশ থেকে আরেকটা মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারেন। এটাই করা উচিত। কিন্তু সেই মেয়ে তো শরিফার মতো হবে না। রং ঢং জানবে না। মজা করে কথা বলবে না। যদিও সারাক্ষণ হাসি মশকরা শোভন না।

ইমাম করিম সাহেব কি মসজিদে?

কে?

আমি ইদরিস।

কী চান?

দু'টা কথা বলব।

করিম বিরক্ত হয়ে বের হলেন।

কী বিষয়ে কথা বলতে চান?

তালাক বিষয়ে।

করিম বললেন, তালাক বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

ইদরিস বিনীত গলায় বললেন, হাফেজি পরীক্ষা দিতে আমি কিছুদিন দেওবন্দে ছিলাম। সেখানে বড় বড় আলেমদের তালাক বিষয়ে আলোচনা শুনেছি।

কী শুনেছেন?

নবীজির এক হাদিস আছে যেখানে তিনি বলেছেন, কেউ যদি পর পর তিনবার তালাক দেয় তা এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। এক তালাকের পর ইদ্দতকাল পার করতে হবে। ইদ্দতের পর দ্বিতীয় তালাক আসতে হবে। তারপর আবার ইদ্দতকাল পার করতে হবে। কাজেই আপনি যে তালাক দিয়েছেন তা হয় নাই। আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঘরসংসার করতে পারেন। তাকে হিল্লা বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

করিম বললেন, যে বিষয় জানেন না সে বিষয়ে কথা বলবেন না। অন্য মাজহাবের লোকজন এরকম কথাবার্তা বলে। আমরা হানাফি মাজহাবের। এই

মাজহাবে আমার তালাক বৈধ হয়েছে। আপনি কোরান শরীফ মুখস্থ করে বসে আছেন। জানেন না কিছুই।

ইদরিস বললেন, জি, কথা সত্য।

ধর্ম নিয়া আপনার কোনো কথাবার্তা বলাই উচিত না। আপনি বিবাহ করেছিলেন এক বেশ্যা মেয়েকে। শুনেছি আপনার যে মেয়ে হয়েছে সে না-কি দিনরাত হিন্দু দেবদেবীর নাম বলে।

ইদরিস বললেন, সে শুধু রাম বলে, আর কিছু না।

রামই বা কেন বলবে ? যাই হোক, সেটা আপনার ব্যাপার। এখন বিদায় হন। ধর্ম হাদিস কোরান এইসব নিয়া আর কোনো দিন আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না।

মাওলানা ইদরিস মন খারাপ করে চলে এলেন। মীরার জন্যে তাকে এখন ভালো যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। বান্ধবপুরের বাইরে থেকেও হিন্দু মেয়েরা মীরাকে দিয়ে শাঁখা সিঁদুর ছোঁয়াতে আসছে। মীরার ডান পা ডুবানো পানি খেলে না-কি অনেক অসুখ সারছে। বিশেষ করে এই পানি শূলবেদনায় অব্যর্থ। ভক্তজনের কাছে মীরার পা ভেজানো পানি বিতরণ করার দায়িত্ব শ্রীনাথ নিজের কাঁধে নিয়েছেন। এই পানি খাবার নিয়মও আছে। পূর্ণিমা এবং অমাবশ্যার রাত ছাড়া খাওয়া যাবে না। পানি খাবার পর আর কোনো খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। এইসব নিয়মকানুন তিনি না-কি স্বপ্নে পেয়েছেন। স্বপ্নে সাদা কাপড়ে সমস্ত শরীর এবং মুখ ঢাকা এক মহিলা এসে বলেছেন, শ্রীনাথ, তুই আমার সেবায়েত। কেউ যদি পা ভেজানো পানি চায় তুই দিবি এবং রোজ একবার আমার কানে শাঁখের শব্দ শুনাবি। শ্রীনাথ কিছুদিন হলো শাঁখ বাজাতে শুরু করেছেন। যখন তখন বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠছে।

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। লাবুস পুকুরঘাটে বসে আছে। আজ হঠাৎ শীত পড়েছে। উত্তরী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই হাওয়ার স্থানীয় নাম পাগলা হাওয়া। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গারো পাহাড় ডিঙিয়ে এই হাওয়া এসে শীত নামায়। কিছু সময়ের জন্যে মনে হয় শীতকাল। প্রকৃতি ভ্রান্তি তৈরি করে। লাবুস বসে আছে খালি গায়ে। অসময়ের শীত গায়ে লাগাতে তার ভালো লাগছে। লাবুসের সামনে হুক্কা। হুক্কায় তামাক পুড়ছে। লাবুস তামাক খায় না। হাদিস উদ্দিন তারপরেও নিয়ম করে হুক্কা জ্বালিয়ে লাবুসের সামনে রাখছে। হাদিস উদ্দিনের ধারণা কোনো একদিন মনের ভুলে ছোটকর্তা হুক্কার নলে টান দিয়ে বসবেন। আস্তে আস্তে অভ্যাস ধরে যাবে।

তার ওস্তাদ দরবার মিয়া আয়েশ করে তামাক খেতেন। গভীর রাতে হুক্কা টানার গুড়ুক গুড়ুক শব্দ শোনা যেত। সেই শব্দ আধো-ঘুম আধো-জাগরণে শোনার আনন্দই আলাদা। হাদিস উদ্দিন ছোটকর্তার কাছ থেকেও এটা আশা করে।

লাবুসের পাশের সিঁড়িতে শ্রীনাথ এসে বসলেন। হঠাৎ শীত নামায় তিনি কাবু হয়ে পড়েছেন। চাদর গায়ে দিয়েছেন। কানঢাকা টুপি পরেছেন। তারপরেও শীত যাচ্ছে না।

লাবুস বলল, কিছু বলবেন ?

শ্রীনাথ বললেন, একটা বিষয়ে আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। সকলের স্বার্থে আপনি আশা করি অনুমতি দিবেন। আমি একটা মন্দির দিতে চাই।

কী দিতে চান ?

মন্দির। মন্দিরের নাম মীরা মায়ের মন্দির।

ও আচ্ছা।

এই মন্দিরে কোনো মূর্তি থাকবে না। মীরা মায়ের ছবি থাকবে।

ও আচ্ছা।

আপনি কি অনুমতি দিয়েছেন ? আপনি অনুমতি না দিলেও মন্দির আমাকে দিতেই হবে। আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি। মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমাকে বলেছেন, আমি হেথায় হোথায় ঘুরে বেড়াই, আমার ভালো লাগে না। তুই আমার থাকার একটা জায়গা করে দে।

আপনি সত্যি স্বপ্নে দেখেছেন ?

অবশ্যই। যদি মিথ্যা বলে থাকি যেন আমার শরীরে কুষ্ঠ হয়। সারা অঙ্গ গলে গলে পড়ে।

লাবুস বলল, মিথ্যা আপনি বলেন নাই। সত্যি বলেছেন। এরকম স্বপ্ন আপনি দেখেছেন। মানুষ যা চিন্তা করে স্বপ্নে তাই আসে। স্বপ্নের কোনো মূল্য নাই। আমি আমার এখানে আপনাকে মন্দির বানাতে দিব না। মীরাকে নিয়ে যে ঝামেলা আপনি করছেন সেই ঝামেলাও আপনাকে আর করতে দিব না। মীরা আমার বোন। সৎ বোন। আমার যিনি মা, মীরারও তিনি মা। আপনি জানেন না ?

জানি।

লাবুস হঠাৎ খানিকটা উৎসাহিত হয়ে বলল, মন্দির আমি বানাতে না দিলেও আপনি কিন্তু মন্দির বানাবেন। বড় মন্দির, পাকা দালান। মন্দির বানানোর টাকা আপনি কোথায় পাবেন আমি জানি না। তবে বানাবেন।

শ্রীনাথ বললেন, কীভাবে জানলেন ?

আমি মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের কিছু জিনিস চোখের সামনে দেখি। কীভাবে দেখি জানি না, কিন্তু দেখি। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। এখন যান।

শ্রীনাথ বললেন, মন্দির কবে নাগাদ বানাব ?

লাবুস বলল, দিন-তারিখ বলতে পারব না। আমি ঘটনা দেখি। দিন-তারিখ দেখি না।

শ্রীনাথ ইতস্তত করে বললেন, অন্য একটা বিষয়ে আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করব ?

করুন।

আপনাদের ধর্মে হিল্লা বিবাহ বলে একটা ব্যাপার আছে। সেই বিবাহ কি শুধু মুসলমানের সঙ্গে হতে হবে ? অন্য কোনো ধর্মের পুরুষের সঙ্গে হবে না ?

লাবুস বলল, আমি জানি না। নিয়ম থাকলে আপনি কি রাজি হতেন ?

শ্রীনাথ জিভে কামড় দিয়ে বললেন, রাম রাম! এটা কী বললেন ?

লাবুস বলল, আপনার মনে গোপন ইচ্ছা আছে বলেই বললাম। গোপন ইচ্ছা না থাকলে এরকম প্রশ্ন করতেন না। পুরুষমাত্রই লোভী। এখন আপনি আমার সামনে থেকে যান। আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন ?

না। আমি কারো উপর বিরক্ত হই না।

ইমাম করিম খেতে বসেছেন। তাকে খাবার দেয়া হয়েছে উঠানে। দরজার পাশে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শরিফা তদারকি করছে। ইমাম ডাকলেন, শরিফা।

শরিফা হাতের পাখা দিয়ে দরজায় বাড়ি দিল। এর অর্থ সে শুনছে। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ। তবে আকারে ইঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়। এতে দোষ হয় না।

করিম বললেন, আজ তোমার হিল্লা বিবাহের কথা প্রকাশ্যে বলেছি। মনে হয় অতি দ্রুত ব্যবস্থা হবে। এরপর আগের মতো সংসার করতে পারব। তোমার জন্যে সারাক্ষণ আমার মন কান্দে। তোমারে যে এতটা পছন্দ করতাম আগে বুঝি নাই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ ? ক্ষমা করলে পাখা দিয়া দুটা বাড়ি দেও।

শরিফা দু'টা বাড়ি না, সে ঠুক ঠুক করে ক্রমাগত বাড়ি দিয়েই যেতে লাগল। এর অর্থ কী করিম বুঝতে পারছে না। শরিফাকে দেখতে পেলে করিমের ভালো লাগত। শরিফার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

করিম বললেন, শরিফা কী বলতে চাও বুঝি না তো। মুখে কথা বলো। অসুবিধা নাই।

শরিফা চাপা গলায় বলল, আমি হিল্লা বিবাহ্ করব না।

চাও কী তুমি ?

আপনারে নিয়া দূরদেশে পালায়া যাব। যেখানে কেউ আমারে চিনব না। আমি যে আপনের তালাকি বউ কেউ জানব না।

কোন দূরদেশে যাইতে চাও ?

আসাম।

করিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আসামে গেলে কেউ জানব না তা ঠিক আছে। কিন্তু আল্লাহপাক তো জানবেন। না-কি তোমার ধারণা উনিও জানবেন না ?

শরিফা চুপ করে গেল। করিম অনেক রাত পর্যন্ত তার ফোঁপানো শুনল।

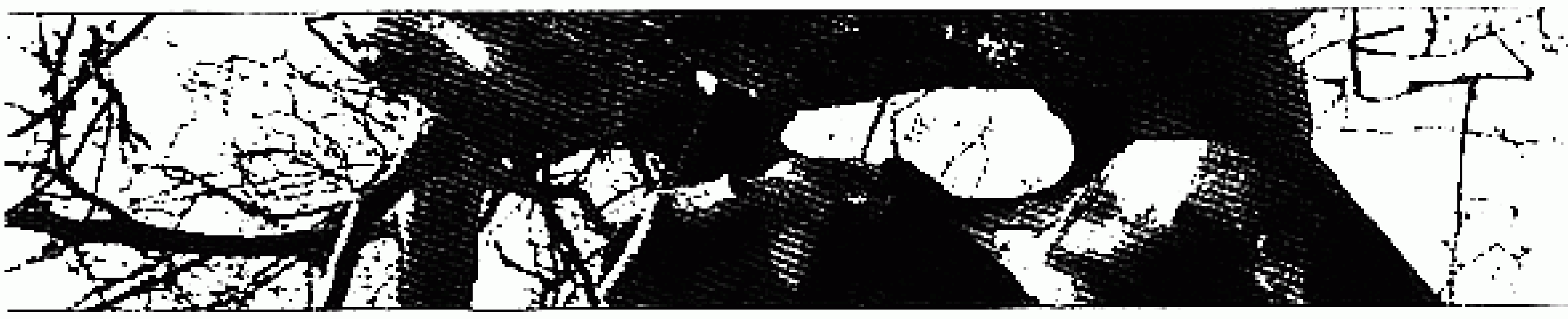

৩০ জুলাই ১৯৪১ সন। সকাল ন'টা। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা ভালো না। তিনি অসহায় এবং অস্থির বোধ করছেন। তাঁকে বড় বড় ডাক্তাররা ঘিরে আছেন। বিধান রায় এসেছেন, নীলরতন সরকার এসেছেন। বিখ্যাত শৈলচিকিৎসক মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন।

মোহনলাল একটা অপারেশন করতে চাচ্ছেন। তিনি নিশ্চিত যে, অপারেশন কবির জন্য মঙ্গলজনক হবে।

বিধান রায় রাজি না। তিনি বলছেন, আমার মন সায় দিচ্ছে না।

মোহনলাল বললেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান মন দিয়ে চলে না। অপারেশন না করা ভুল হবে।

বিধান রায় তারপরেও জেদির মতো বলছেন, না।

রবীন্দ্রনাথ ইশারা করলেন যেন একজন কেউ খাতা-কলম নিয়ে বসে। তাঁর মাথায় কবিতা এসেছে। নিজের হাতে লেখার সামর্থ্য নেই। তিনি মুখে মুখে বলবেন, কেউ একজন লিখবে। তিনি ক্ষীণ স্বরে লাইনগুলি বলছেন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করছেন, যেন শ্রুতিলিখনে ত্রুটি না হয়। এমন হতে পারে যে, তিনি শুদ্ধ করার সময় পাবেন না। জীবনের সর্বশেষ রচনায় ভুল থেকে যাবে।

তোমার সৃষ্টির পথ

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী!
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে!
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে-ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন করলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই অপারেশন হলো। রবীন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করলেন, আর খুললেন না। ২২শে শ্রাবণ দুপুর বারোটা দশ মিনিটে তিনি এমন এক ভুবনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন যে ভুবনকে তিনি তাঁর রচনায় গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতিকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন একশ' বছর। তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশ নামের যে রাষ্ট্রের জন্ম হলো সেই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতটিও তাঁর রচনা।

ধনু শেখ পালকি নিয়ে পাখি শিকারে বের হয়েছেন। হাওরে শীতের হাঁস নেমেছে। দেশান্তরী পাখির মাংস তিনি খান না। বহুদূর দেশ থেকে উড়ে আসে বলে এদের পাখা শক্ত, মাংসও শক্ত। মাংসে বালি বালি স্বাদ বলে এইসব বিদেশী পাখির আরেক নাম বালিহাঁস। এত ঝামেলা করে বালি খাওয়ার কোনো মানে হয় না। ধনু শেখ হরিয়াল শিকারে বের হয়েছেন। হরিয়াল ঘুঘু সাইজের পাখি। গায়ের রঙ সবুজ মেশানো হলুদ। এই পাখি বটগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। বটফল খায়। অন্যসব পাখি মাছ খায়, শামুক ঝিনুক খায়। হরিয়ালের খাদ্য ফল বলেই এর মাংস অতি সুস্বাদু। মাখনের মতো নরম।

ধনু শেখের সঙ্গে যাচ্ছেন ইমাম করিম। গুলিবিদ্ধ পাখিকে তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে জবেহ্ করবেন, তখনি শুধু মাংস হালাল হবে।

পালকির দরজা খোলা। ইমাম দরজার পাশে আছেন। ধনু শেখ গল্প করছেন। ইমামকে হ্যাঁ হুঁ দিতে হচ্ছে। বড় মানুষদের সঙ্গে গল্পগুজবের কিছু নেই। বড় মানুষরা গল্প করবেন অন্যরা শুধু হুঁ দিবে। ধনু শেখের গন্তব্য তিন বটের মাঠ। বান্ধবপুর থেকে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে। যেতে সময় লাগে। তিন বটের মাঠে বটগাছের সংখ্যা কিন্তু তিন না, চার। এই চার বটগাছ চক্রাকারে বড় হয়েছে। অতি দর্শনীয় ব্যাপার।

ধনু শেখ বললেন, বটগাছের সংখ্যা চার। কিন্তু নাম তিনবটের মাঠ। কারণ কী ইমাম?

করিম বলল, জানি না জনাব।

ধনু শেখ বললেন, জগতের বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর একটাই— জানি না। আফসোস। তুমি কখনো তিনবটের মাঠে গিয়েছ?

জি-না।

বড়ই সৌন্দর্য। ভাদ্র মাসে সেই মাঠে হাওরের পানি উঠে। চারটা বটগাছের মাথা শুধু দেখা যায়। আর কিছু না। এই দৃশ্য একবার যে দেখবে সে ভুলবে না। পানির উপরে বটগাছের মাথা। সেই মাথায় কিচিরমিচির করছে হরিয়াল। এক গাছ থেকে উড়ে অন্যগাছে বসছে। মনে হয় বেহেশতেও এত সুন্দর দৃশ্য নাই।

করিম বললেন, বেহেশতের সৌন্দর্য বুঝার ক্ষমতা মানুষের নাই জনাব। পৃথিবীর সৌন্দর্য একরকম, বেহেশতের সৌন্দর্য অন্যরকম।

তাও ঠিক। বেহেশতে তো যেতে পারব না। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা দেখাই আমার জন্যে যথেষ্ট। এখন বলো, তোমাকে এত চিন্তাযুক্ত লাগছে কেন?

করিম জবাব দিল না।

ধনু শেখ বললেন, মনে ফুর্তি রাখা আমাদের কর্তব্য। মাসে কমপক্ষে একবার রক্ত দর্শন করলে মনে ফুর্তি আসে। মেয়েছেলেদের মনে ফুর্তি থাকে বেশি, কারণ তারা প্রতি মাসে একবার রক্ত দেখে। আমাদের পুরুষদের এই সুবিধা নাই বিধায় আমাদের পশুপাখি শিকার করতে হয়। পশুপাখির রক্ত দেখতে হয়। বুঝেছ?

জি।

তোমার স্ত্রীর হিল্লা বিবাহের কিছু কি হয়েছে?

এখনো হয় নাই।

কিছুই বুঝলাম না! কেন কেউ আগায়া আসতেছে না? শুনেছি তোমার স্ত্রী রূপবতী, বয়সও অল্প।

করিম জবাব দিলেন না। ধনু শেখ বললেন, মন দিয়া শোন কী বলি। আমি এক রাতের বিবাহে রাজি আছি। তোমার একটা উপকার হবে এইজন্যেই রাজি। এই বিবাহ হৈচৈ আমোদ-ফুর্তির বিবাহ না। একরাতের মামলা। বিবাহ তো তুমি নিজেই পড়াতে পার। ঠিক না?

জি।

পাখি শিকারের পর পালকি নিয়া তোমার বাড়িতে যাব। তুমি বিবাহ পড়াবে। পালকিতে বউ নিয়া আমি আমার ঘরে যাব। পরের দিন সকালে পালকি দিয়া কন্যা তালাক দিয়া ফেরত পাঠাব। তুমি নিজের স্ত্রী ফেরত পাইবা। সুখে ঘরসংসার করবা। ঠিক আছে?

করিম জবাব দিল না। হরিয়াল শিকারে ধনু শেখ কেন তাকে নিয়ে এসেছেন তা এখন স্পষ্ট হয়েছে। ধনু শেখ বললেন, চুপ করে আছ কেন বুঝলাম না। এমন কোনো নিয়ম কি আছে যে যার সঙ্গে হিল্লা বিবাহ হবে তার ঠ্যাং থাকতে হবে? লুলা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হবে না।

এরকম কোনো নিয়ম নাই।

তাহলে তো তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মুখ ভোঁতা করে রাখছ কেন? হাসো। স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হবে এইজন্যে মন খারাপ? এক রাতের মামলা।

তিনবটের মাঠের বটগাছ দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। চারদিকে খোলা প্রান্তর, মাঝখানে হঠাৎ ঝুড়ি নামানো চারটা বিশাল বটগাছ। হরিয়াল পাখির ঝাঁক এক গাছ থেকে আরেক গাছে যাচ্ছে, এই দৃশ্য এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

ধনু শেখ বললেন, আমি শুনেছি বিসমিল্লাহ্ বলে যদি গুলি করে পাখি মারা হয় তাহলে সেই পাখি হালাল।

ভুল শুনেছেন। পশুপাখি শিকার কিংবা যুদ্ধের শুরু বিসমিল্লাহ্ বলে করা যাবে না।

তাহলে যুদ্ধ শুরু করব কীভাবে ?

তখন বলতে হবে 'আল্লাহ্ আকবর'। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।

ধনু শেখ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, তুমি কি তাবিজকবচ দিতে পার ? যদি পার আমার মেয়ে আতরকে একটা তাবিজ দিবা। তার ঘুরাফিরা রোগ হয়েছে। এইখানে ওইখানে ঘুরে। কোনো একদিন জিন-ভূতের নজরে পড়বে। আমি অস্থির থাকি।

আমগাছের নিচে শিবশংকর বসে আছে। তার সামনে আতর। আতরের হাতে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে বড়ই ভর্তা। ঢেঁকিতে বড়ই কুটে ঝাল কাঁচামরিচ দিয়ে তাকে এই ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে হামিদা। ভর্তাটা খেতে এতই ভালো হয়েছে যে শিবশংকরের জন্যে খানিকটা নিয়ে এসেছে। আতর নিশ্চিত ভোরবেলায় আমগাছের কাছে এলেই শিবশংকরের দেখা পাওয়া যাবে।

শিবশংকর বলল, আমি বড়ই ভর্তা, আম ভর্তা এইসব খাই না।

আতর বলল, খান না কেন ?

ঝাল দেয়া হয় এইজন্যে খাই না। আমি কাঁচামরিচ খেতে পারি না।

আশ্চর্য তো!

আশ্চর্যের কিছু নাই। অনেকেই অনেক কিছু খেতে পারে না। তুমি কি জানো ভারতবর্ষে কাঁচামরিচ ছিল না ?

সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি। তারা তরকারি ঝাল করত আদা দিয়ে আর গোলমরিচ দিয়ে।

কাঁচামরিচ কোত্থেকে এসেছে ?

পর্তুগীজরা নিয়ে এসেছে। শুধু কাঁচামরিচ না, তারা আলু এনেছে। এই দেশে আগে আলু ছিল না। তুমি আলু খাও ?

হুঁ। তবে আমার পছন্দ কাঁঠালের বিচি। আচ্ছা, কাঁঠালও কি পর্তুগীজরা এনেছে ?

না।

আতর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ইশ কাঁঠাল যে কেন পর্তুগীজরা আনল না!

শিবশংকর বিস্মিত হয়ে বলল, পর্তুগীজরা কাঁঠাল আনলে কী হতো?

আতর বলল, আমার ভালো লাগত।

কেন?

জানি না কেন।

শিবশংকর বলল, এক টুকরা কাগজ আর একটা কলম হাতের কাছে থাকলে তোমাকে মজার একটা জিনিস দেখাতাম।

আতর চোখ উজ্জ্বল করে বলল, কী দেখাতেন?

প্রমাণ করতাম যে, এক সমান দুই।

এক সমান দুই হবে কেমনে?

এখানেই তো মজা।

আতর বলল, আমি একটা কাঠি নিয়ে আসি, আপনি মাটিতে লিখে দেখান।

আতর কঞ্চি নিয়ে এসেছে। শিবশংকরের পাশে উবু হয়ে বসেছে। শিবশংকর উৎসাহ নিয়ে আঁকাআঁকি করছে। আতর দেখছে মুগ্ধচোখে।

মনে কর,

$$x = y$$

এখন আমি উভয়পক্ষকে y দিয়ে গুণ করলাম। তাহলে কী হবে?

$$xy = y^2$$

এখন আমি উভয়পক্ষ থেকে x^2 বাদ দিলাম। তাহলে কী হবে?

$$xy - x^2 = y^2 - x^2$$

এসো এখন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি। তাহলে কী হবে?

$$x(y-x) = (y-x)(y+x)$$

এখন উভয়পক্ষকে $(y-x)$ দিয়ে ভাগ দেব।

$$\frac{x(y-x)}{(y-x)} = \frac{(y-x)(y+x)}{(y-x)}$$

কাটাকুটি করার পর কী থাকবে?

$$x = y+x$$

যেহেতু y এবং x সমান

$$x = x+x$$
$$x = 2x$$

এখন x দিয়ে ভাগ দিলে হবে

$$1 = 2$$

শিবশংকর আনন্দিত গলায় বলল, আতর, বুঝতে পেরেছ ? এক সমান দুই যে প্রমাণ করলাম।

আতর বলল, না।

খুব সহজ অংক, তুমি বুঝতে পারলে না কেন ?

বুঝতে না পারলে আমি কী করব ?

তোমার তো বুদ্ধি কম।

আতর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনারও বুদ্ধি কম।

শিবশংকর বলল, কেন বলছ আমার বুদ্ধি কম ?

আপনি কাঁচামরিচ খান না এইজন্যে আপনার বুদ্ধি কম। যারা কাঁচামরিচ খায় না তাদের বুদ্ধি কম হয়।

কে বলেছে ?

এটা সবাই জানে। আপনার বুদ্ধি কম এইজন্যে আপনি জানেন না। আপনি প্রমাণ করেছেন এক সমান দুই। আমি প্রমাণ করব আপনার বুদ্ধি নাই। করব ?

কর।

একটা পাখির নাম বলেন যার ঠ্যাং তিনটা।

এরকম পাখি সত্যিই আছে ?

আছে।

এ দেশের পাখি ?

হুঁ।

তুমি নিজে দেখেছ ?

হুঁ।

আমি জানি না।

আতর বলল, প্রমাণ হয়েছে না আপনার বুদ্ধি কম ?

পাখিটার নাম বলো।

আপনি অনুসন্ধান করে বের করেন।

আতর চলে যাচ্ছে। শিবশংকর মন খারাপ করে তাকিয়ে আছে। তার খুব ইচ্ছা করছে আতরকে বলে, তুমি যে পাখির কথা বলেছ সেই পাখি আসলে নাই। তারপরেও ধরে নিলাম এরকম পাখি আছে। ধরে নিলাম আমি বোকা। তুমি চলে

যেও না। আরো কিছুক্ষণ থাক। আমার সঙ্গে গল্প কর। আমি অনেক মজার মজার জিনিস জানি। সব তোমাকে বলব।

ধনু শেখ শরিফাকে বিবাহ করে স্ত্রী নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। শরিফা জড়সড় হয়ে আছে। অকারণে চমকে চমকে উঠছে। আতর তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করছে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। সহজ স্বাভাবিক গলায় বলেছে, কলিকাতা থেকে কলের গান আনায়েছি। আপনি কি গান শুনবেন ? জুলেখার একটা থাল আছে। একপিঠে উনার গান, অন্যপিঠে কৃষ্ণভানুর গান।

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, গান শুনব না।

আতর বলল, কাঁপতেছেন কেন ?

শরিফা বলল, ভয়ে কাঁপতেছি। খুব ভয় লাগতেছে আতর।

আতর সহজ গলায় বলল, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছেন, একজীবনে অনেকবার ভয় পাবেন। মেয়ে হয়ে জন্মানোর এটা শাস্তি।

ধনু শেখ প্রচুর মদ্যপান করে এক রাতের স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমুতে গেলেন। জড়ানো গলায় বললেন, বৌ শরিফা, তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। ঠ্যাংওয়ালা স্বামীর সঙ্গে সংসার করলা, আবার ঠ্যাং ছাড়া স্বামীর সাথেও সংসার করলা। হা হা হা।

শরিফা আতঙ্কে এবং ভয়ে শিউরে উঠল।

ফজরের নামাজ পড়েই করিম ধনু শেখের বাড়িতে চলে এসেছে। ধনু শেখ ঘুম থেকে উঠলেন দুপুরবেলায়। করিমকে বাংলাঘরে ডেকে পাঠালেন। দরাজ গলায় বললেন, প্রচুর মদ্যপান করে রাতে শুয়েছি। শুয়েই ঘুম। স্ত্রীর সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা, আদর-সোহাগ কিছুই হয় নাই। কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ আর তালাক দিব না। তালাক ফালাক যা হবার কিছুদিন পরে হবে।

করিম বলল, এসব কী বলেন ?

ধনু শেখ গলা উঁচিয়ে বললেন, কী বলি মানে ? তোমার সঙ্গে কি দলিল করেছি যে একদিন পরে স্ত্রী তালাক দিব ? বলো কোনো দলিল করেছি ?

করিম হতভম্ব গলায় বলল, আমি শরিফার সঙ্গে কথা বলব।

ধনু শেখ বললেন, অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাও, এটা কেমন কথা ? পর্দাপুষিদা বিস্মরণ হয়েছ ? যাও বিদায় হও। অনেক ত্যক্ত করেছ, আর না।

ধনু শেখ বাংলাঘর ছেড়ে অন্দরের দিকে রওনা দিলেন। তাঁকে উৎফুল্ল এবং আনন্দিত মনে হচ্ছে। পাখির মাংস রাতে খাওয়া হয় নি। রেঁধে রাখা হয়েছে।

পাখির মাংস বাসি করে খাওয়া নিয়ম। এখন লুচি এবং পাখির মাংস দিয়ে নাশতা করবেন এটা ভেবেও ভালো লাগছে। স্ত্রীর জন্যে শাড়ি গয়নার ব্যবস্থা করতে হবে। নয়া বৌ'র ফকিরনীর মতো বেশভূষা থাকবে কেন? গলা হাত খালি দেখতেও খারাপ। নেত্রকোনায় লোক পাঠানো দরকার, লাল শাড়ি কিনে আনবে। বৌ মানুষকে লাল শাড়ি ছাড়া মানায় না।

গত দু'দিন ধরে মীরা চুপচাপ। তার মুখে রামনাম নেই। সে কোনো শব্দও করছে না। শ্রীনাথ বিব্রত অবস্থায় আছেন। মীরাকে দেখতে আসা দর্শনার্থীদের বলছেন, মা কুপিত হয়েছেন। কারো ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

নয়া বাজার থেকে বড় বাড়ির এক বৌ এসেছে মীরাকে দিয়ে কপালে সিঁদুর দেয়াতে। বৌটির নাম সরজুবালা। বারবার তার গর্ভ নষ্ট হচ্ছে। যদি মীরাকে দিয়ে সিঁদুর দেয়ালে গর্ভ রক্ষা হয়। মীরার হাতে সিঁদুরের কৌটা দেয়া মাত্র সে কৌটা দূরে ফেলে দিল। শ্রীনাথ হাহাকার করে উঠলেন, যা ভেবেছি তাই। দেবী কুপিত। পূজার ব্যবস্থা করতে হবে। দেবীর রাগ কমাতে হবে। সরজুবালা নামের বৌটি কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

মীরার দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন পুরুষ— এককড়ি সাহা। যুদ্ধের কারণে তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেপে উঠেছে। চালের দাম এতটা বাড়বে তিনি চিন্তাও করেন নি। বার্মা থেকে চাল আসা বন্ধ এটা ঠিক। দেশের চাল গেল কোথায়? এককড়ি খবর পেয়েছেন কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ভুখা মানুষের না-কি ঢল নেমেছে। তারা ভাত চায় না। তাদের একটাই আকুতি— একটু ফ্যান দেন। অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় না ফ্যানও পাওয়া যাবে। ঘরে ভাত রান্না হলে তবেই না ফ্যান হবে।

এককড়ি চাল ভালোই মজুদ করেছেন। বাড়ির একটি গোলা আগেই পূর্ণ করেছেন। তাড়াহুড়া করে বানানো দ্বিতীয় গোলাটিও পূর্ণ। ঠিক কত চাল আছে হিসাব না থাকলেও পাঁচশ মণের বেশি ছাড়া কম হবে না। এককড়ি এখন ঝুঁকেছেন কেরোসিন, সাবান এইসবের দিকে। অভাব আসে মিছিল করে। চালের অভাবের সঙ্গে এখন যুক্ত হবে অন্য অভাব। তেল, সাবান, কাপড় কিছুই পাওয়া যাবে না। নুনের মতো সামান্য জিনিসও না। ব্যবসার এমন সুযোগ সব সময় আসে না। সুযোগ হঠাৎ হঠাৎ আসে। সুযোগের ব্যবহার করতে হয়। এককড়ি সুযোগের ব্যবহার করছেন। কোলকাতার ছোটবাজারে তাঁর দোকান আছে। সেখানে চাল এবং কাপড় মজুদ করছেন। বিশ্বাসী লোকজন সেই দোকান দেখছে। তারপরেও এককড়ি দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। রাতে ভালো ঘুম

হয় না। চোখ বন্ধ হলেই নানান দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে। স্বপ্নগুলির কোনো আগামাথা নাই।

একরাতে স্বপ্ন দেখলেন কোলকাতার ছোটবাজারের কাপড়ের গুদাম লুট হয়েছে। শত শত মানুষ কাপড় নিয়ে নিচ্ছে। তারা সবাই নগ্ন, কিন্তু কেউ কাপড় গায়ে দিচ্ছে না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এককড়ি হতভম্ব হয়ে বললেন, এই তোমরা করছ কী ? তারা বলল, হুদা কাপড় খাইতে পারি না গো। লবণ দেন, লবণ দিয়া খাই। স্বপ্নে অস্বাভাবিক ব্যাপার খুবই স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। তিনি এক ধামা লবণ এনে তাদের সামনে রাখলেন। তারা সবাই লবণের ধামার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বপ্নের পরের অংশ আরো ভয়াবহ। এক চশমা পরা বুড়ো লবণ মাখিয়ে এককড়ির গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া শুরু করল। এককড়ি দৌড়ে পালাতে গেলেন, শত শত মানুষ তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করল। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত আর চোখের পাতা এক করতে পারলেন না।

এ ধরনের বিকট স্বপ্ন প্রতি রাতে দেখলে মন দুর্বল হয়। এককড়ির বেলাতে তাই ঘটেছে। তিনি ঠিক করেছেন রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। মন্দিরে রোজ পূজা হবে। এই দুই দেবদেবী তাঁকে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তিনি এসেছেন বিষয়টা নিয়ে শ্রীনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে। মীরার জন্যে তিনি রুপার পায়ের মল নিয়ে এসেছেন। লোকজন বলাবলি করছে— এই মেয়েতে দেবী প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনা যদি সত্যি সেরকম হয় তাহলে ছোট্ট দেবীকে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন।

এককড়ি শ্রীনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, তোমাকে একটা কাজ দিব শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ জোড়হস্ত হয়ে বলল, ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ তো আমারে দিয়ে হবে না কর্তা। নিষেধ আছে।

নিষেধ কে করেছে ?

বললে বিশ্বাস করবেন না। এইজন্যে বলব না।

এককড়ি বললেন, বিশ্বাস যাব না কেন ? তুমি অনেক দিনের বিশ্বাসী মানুষ।

শ্রীনাথ চাপা গলায় বলল, দেবী সীতা স্বয়ং বলেছেন। তিনি বলেছেন, দিনরাত রাম-সীতা নাম জপবি। অন্যকিছু মনে স্থান দিবি না। এখন তাই করি।

এই বিষয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলব। আমি মন্দির বানাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মন্দিরে দিনরাত নামজপ হবে। তোমার পরামর্শ দরকার।

মন্দির কার হবে ? রামমন্দির হলে বিবেচনা করতে পারি।

আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব। আগে আলোচনা পরে সিদ্ধান্ত।

এককড়ি ফিরে যাবার আগে লাবুসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লাবুস এখন অঞ্চলের বিশিষ্টজন। বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয়।

লাবুস শ্বেতপাথরের ঘাটে বসে ছিল। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ আগে পাঁচটা বিমান পাখির মতো ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেছে। সবার সামনে একটা, বাকি চারটা পেছনে। মানুষ শুধু যে পাখির মতো উড়তে শিখেছে তা-না, পাখির স্বভাবও আয়ত্ব করেছে।

লাবুস, ভালো আছেন? আমাকে চিনেছেন? আমি এককড়ি।

আপনাকে চিনেছি। বসুন। তামাক খেলে খান। হাদিস উদ্দিন রোজ আমাকে তামাক বানিয়ে দিয়ে যায়। আমি খাই না। তারপরেও দেয়। আপনি ইচ্ছা করলে খেতে পারেন। আমি নলে মুখ দেই নাই।

এককড়ি বললেন, নলে মুখ দিলেও অসুবিধা নাই। মহাবিপদে কোনো হিন্দু মুসলমান নাই। সব সমান। দেশের এখন মহাবিপদ। চূড়ান্ত অভাব। শুনেছি কলিকাতার রাস্তায় এখন ফ্যানের জন্যে মিছিল। আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন?

আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না।

আমি জানি। আমার কাছে কাগজ আসে। *কলিকাতা সমাচার*। আপনি যদি চান কাগজ পড়ার পর আপনার কাছে পাঠায়ে দিব।

লাবুস বলল, পাঠাতে হবে না।

এককড়ি তামাক টানতে টানতে বললেন, ঠিকই বলেছেন, খারাপ সংবাদ যত কম জানা যায় ততই ভালো। এদিকে রাশিয়া তো শেষ। হিটলার স্টালিনগ্রাদ দখল করে বসে আছে। স্টালিনগ্রাদ দখল মানে রাশিয়া দখল। নাম শুনেছেন স্টালিনগ্রাদের?

জি-না।

বিরাট শহর। রাশিয়ার কলিজা। হিটলার সেই কলিজা চাবায়ে খেয়ে ফেলেছে। বাপকা ব্যাটা। রাশিয়ার যিনি প্রধান তাঁর নাম স্টালিন। হিটলারের নাম শুনেই তিনি এখন মুতে দিচ্ছেন। দিনের মধ্যে কয়েকবার তার কাপড় নষ্ট হয়।

ও আচ্ছা।

এদিকে আবার মরুভূমির শিয়াল শুরু করেছে হক্ক হুয়া।

বুঝলাম না।

হিটলারের সেনাপতি রুমেলকে আদর করে সবাই ডাকে মরুভূমির শিয়াল। শিয়ালের মতো বুদ্ধি, এই কারণে শিয়াল ডাকে। সে আফ্রিকা খেয়ে ফেলেছে। চার পাঁচ মাসের মামলা, দেখবেন সারা পৃথিবী চলে যাবে হিটলার বাবাজির দখলে।

লাবুস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, যাবে না।

এককড়ি বললেন, কী বললেন ?

হিটলার পরাজিত হবে।

আপনাকে কে বলেছে ?

লাবুস চুপ করে রইল। তাকে কেউ কিছু বলে নাই। কিন্তু সে জানে। কীভাবে জানে সেটা এক রহস্য। এই রহস্য নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করা দরকার। কার সঙ্গে আলাপ করবে ?

এককড়ি দুই দফা তামাক খেয়ে হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন। আজ তাঁর মন ভালো। মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। রাধাকৃষ্ণের মন্দির বানাবেন। রামমন্দিরে তাঁর পুষবে না। রাম কোনো কাজের দেবতা না। দুর্বল দেবতা। যে তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে না সে দেবতাদের মধ্যেই পড়ে না। মন্দিরের পেছনে একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা বের হয়ে যাবে। তা যাক। মন্দিরের জন্যে দেবদেবী তাঁকে রক্ষা করবেন। সবার রক্ষাকর্তা দরকার। ইউরোপের রক্ষাকর্তা হিটলার। তাঁর রক্ষাকর্তা রাধাকৃষ্ণ। তিনি ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

সন্ধ্যা অনেক আগে মিলিয়েছে। পুকুর থেকে ধোঁয়ার মতো বোনকা দিয়ে কুয়াশা উঠছে। লাবুস আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে। হঠাৎ হঠাৎ কিছু দৃশ্য খুব মনে লেগে যায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, কী সুন্দর ! কী সুন্দর !

মাওলানা ইদরিস মেয়েকে কোলে নিয়ে পুকুরঘাটে এসে বসলেন। লাবুস বলল, কিছু কি বলবেন ?

ইদরিস বললেন, আমি কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাব। তোমার বোনকে দেখেশুনে রাখবে।

লাবুস বলল, অবশ্যই রাখব। আপনি কোথায় যাবেন ?

বগুড়া যাব। মহাস্থান বলে একটা জায়গা। তুমি কি আমাকে হাতখরচ দিতে পারবা ?

পারব।

জমিদার শশাংক পালের কাছে আমি একটা ওয়াদা করেছিলাম। ওয়াদা রক্ষা করতে যাব। কী ওয়াদা জানতে চাও ?

না।

তোমার বিষয়ে হাদিস উদ্দিন কিছু অদ্ভুত কথা বলেছে।

কী কথা ?

সে একদিন সন্ধ্যায় দেখে পুকুরঘাটে দুইজন লাবুস বসে আছে।

লাবুস সহজ গলায় বলল, মানুষ অদ্ভুত কথা বলতে পছন্দ করে। সাধারণ জীবন তার পছন্দ না। এর মধ্যেও সে রহস্য নিয়ে আসতে চায় বলেই এইসব বলে।

ইদরিস বললেন, রহস্য সে কেন আনতে চায় ?

লাবুস বলল, যে জিনিস নাই তার জন্যে মানুষ থাকে ব্যস্ত। রহস্য বলে কিছু নাই, কিন্তু মানুষ রহস্য বিশ্বাস করে।

ইদরিস বলল, রহস্য নাই কথাটা ঠিক বললা না। মেরাজের সময় আল্লাহপাকের সঙ্গে নবীজির সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয় তার ষাটভাগ জাহেরী। চল্লিশভাগ বাতেনী। অর্থাৎ রহস্যের কথা।

লাবুস বলল, পুষ্পরানিকে নিয়া ভিতরে যান। তার ঠান্ডা লাগবে।

ইদরিস উঠে দাঁড়ালেন। লাবুস বলল, বগুড়া থেকে ফিরে আপনি অদ্ভুত একটা বিষয় দেখবেন। খুবই আনন্দ পাবেন।

ইদরিস অবাক হয়ে বললেন, কী দেখব ?

লাবুস বলল, আপনি দেখবেন পুষ্পরানি কথা বলা শুরু করেছে। সে দিনরাত কথা বলবে।

তুমি জানো কীভাবে ?

লাবুস হাসতে হাসতে বলল, এটা একটা বাতেনী কথা।

ধনু শেখ আজ মদ্যপান করেন নি। মদ্যপান করলে মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। ঘুম পায়। নয়া স্ত্রী পাশে নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে হয়। আজ রাতে তিনি এই সমস্যার ভেতর দিয়ে যাবেন না। ধনু শেখ বাংলাঘরে তামাক খাচ্ছেন। অতিরিক্ত জর্দা দিয়ে পান খাবার কারণে মাথা ঘুরছে। তিনি মাথার ঘূর্ণন কমানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। শরীরটা সুস্থ হলেই তিনি শোবার ঘরে যাবেন। শরিফাকে ডাকবেন। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নেবার জন্যে ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। কোলকাতার কারিগরকে দিয়ে গদিমোড়া চাকাওয়ালা চেয়ার বানানো হয়েছে।

ধনু শেখের মেজাজ বেশ খারাপ। তিনি খবর পেয়েছেন ইমাম করিম তাঁর বাড়ির সামনের কদম গাছের নিচে বিকাল থেকে বসে আছে। এখন রাত বাজে দশটা। হারামজাদা এখনো আছে। করিমকে তিনি ডেকে পাঠাবেন না-কি পাঠাবেন না এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। দেখা হলে অতিরিক্ত রাগারাগি

করে ফেলতে পারেন। কবিরাজ আশু ভট্টাচার্য তাঁকে রাগারাগি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর মাথার রগ না-কি দুর্বল হয়ে গেছে। বেশি রাগারাগি করলে রগ ছিঁড়ে মৃত্যুও হতে পারে।

ধনু শেখ মনে মনে তিনবার বললেন, আমি কোনো রাগারাগি করব না। আমি কোনো রাগারাগি করব না। আমি কোনো রাগারাগি করব না। তিন প্রতিজ্ঞার পর ধনু শেখ করিমকে ডেকে পাঠালেন।

কালো চাদর গায়ে দিয়ে করিম দাঁড়িয়ে আছে। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তার চোখ ডেবে গেছে। চোখের কোণে কালি। চোখ টকটকে লাল।

ধনু শেখ বললেন, শুনলাম সন্ধ্যা থেকে তুমি কদম গাছের গোড়ায় বসে আছ?

জি।

মসজিদের মাগরিবের নামাজ পড়ায়েছ?

না।

এশার নামাজ পড়ায়েছ?

না।

তোমার ইমামের চাকরি আমি নট করে দিলাম। মসজিদের জন্যে নতুন ইমাম আসবে।

করিম বলল, জনাব, শরিফার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

ধনু শেখ হুকায় লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমার কোনো পুত্রসন্তান নাই। মন বলতেছে এইবার পুত্রসন্তান হবে। পুত্রসন্তান না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নাই।

বুঝলাম না। আপনি হিল্লা বিবাহ করেছেন।

হিল্লা ফিল্লা বুঝি না। বিবাহ করেছি এইটা বুঝি। তুমি বিদায় হও। আইজ রাইতের পরে আমার ঘরের আশেপাশে তোমারে যদি দেখি তোমার ঠ্যাং আমি ভেঙে দেব। শরিফার বর্তমান স্বামীর ঠ্যাং ভাঙা, আগের স্বামীরও ঠ্যাং ভাঙা। বিদায় হও।

ইমাম বাংলাঘর থেকে বের হলো, কিন্তু চলে গেল না। কদম গাছের নিচে বসে রইল। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। কিন্তু তার শীত লাগছে না। শরীর দিয়ে গরম ভাপ বের হচ্ছে। চাদরের নিচে করিমের হাতে ধারালো একটা ছুরি। আসরের নামাজের পর থেকেই সে ছুরি হাতে ঘুরছে।

শরিফা আতরের ঘরের রেলিং দেয়া খাটে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার গায়ে জরি বসানো লাল শাড়ি। ধনু শেখ এই শাড়ি নেত্রকোনা থেকে লোক পাঠিয়ে

আনিয়েছেন। তার গলায় চন্দ্রহার। হাতে বালা। পায়ে রুপার মল। গয়না সবই বেদানার, ধনু শেখের নির্দেশে আতর পরিয়ে দিয়েছে।

খাটের মাঝখানে কলের গান। আতর বলল, নয়া মা, গান দিব ? গান শুনবেন ?

শরিফা মাথা নাড়ল। মাথা নাড়া থেকে হ্যাঁ না কিছু বোঝা গেল না। আতর ঘুরন্ত রেকর্ডে পিন রাখল। গান শুরু হয়েছে। জুলেখার কিন্নর কণ্ঠ। যদিও রেকর্ডে লেখা 'চাঁন বিবির পল্লী গান'।

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়।
নিঠুর বন্ধুরে
বলেছিলে আমার হবে
মন দিয়াছি এই ভেবে
সাক্ষী কেউ ছিল না সেই সময়
সাক্ষী শুধু চন্দ্রতারা
একদিন তুমি পড়বে ধরা
ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়

শরিফা ফিসফিস করে বলল, কী সুন্দর গান!

আতর বলল, এই মেয়ে আমাদের অঞ্চলের কেউ চিন্তা করবে ?

শরিফা বলল, কেউ চিন্তা করবে না। তার সঙ্গে দেখা হইলে সামনে বসায়া দুইটা গান শুনতাম।

সত্যই দেখা করতে চান ?

শরিফা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আতর বলল, আমগাছে সুতা ঝুলায়া আসবেন, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আমি একটা সুতা ঝুলাইছি।

কী জন্যে ঝুলাইছ ?

আতর সামান্য ইতস্তত করে সহজ গলায় বলল, সুতা ঝুলাইছি যেন একজনের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। আমগাছের সুতা ছাড়া এই বিবাহ হবে না। আমার বাপজান যদি শুনে, গাঙ্গে ডুবায়া আমারে মাইরা ফেলবে।

শরিফা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

আতর বলল, আমি একটা হিন্দু ছেলেরে বিবাহ করতে চাই। তার নামের প্রথম অক্ষর শ। বলেন দেখি তালিব্য শ দিয়া কী নাম হয় ?

বলতে পারব না। আমি বাংলা লেখাপড়া জানি না। কোরান মজিদ পড়তে পারি। বাংলা পারি না।

শিখতে চান ?

না।

না কী জন্যে ?

মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে স্বামীর হায়াত কমে।

আমার বাপের হায়াত কমলে তো আপনার জন্য ভালো। উনি মানুষ মন্দ। আপনেরে কোনোদিন ছাড়বে না।

শরীফা তাকিয়ে আছে। আতর হালকা গলায় গল্প করছে। মেয়েটার গল্প শুনতে এত ভালো লাগছে। কেমন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কথা বলে।

আতর বলল, বাপজানরে বিবাহ কইরা আপনি কিন্তু বান্ধা পড়ছেন।

শরিফা বলল, আমারও সেইরকম ধারণা।

আতর বলল, এখন না ছাড়লেও কোনো একদিন ছাড়ব। যখন আপনের কোনোখানে যাওনের জায়গা থাকব না তখন ছাড়ব। তখন আপনের না থাকব ঘর, না থাকব খাওন। আমার বড় মার এই দশা। আমার বড় মা যে জীবিত আছে জানেন ?

না।

তাঁর নাম আমিনা। আমার এক সৎভাই আছে, তার নাম বাহাদুর। বড়ই সুন্দর।

আতরের গল্প শেষ হলো না। ধনু শেখ স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

ধনু শেখের মেজাজ খুবই খারাপ। তিনি পাঞ্জাবিতে সামান্য আতর দিয়েছিলেন। আতরের গন্ধে এখন গা গুলাচ্ছে। বমি আসি আসি করছে। মনে হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় আজও হবে না। বমি করে পালংক ভাসাবেন। বমির মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন। অতিরিক্ত মদ্যপান করলে এই অবস্থা হয়। আজ বোতল হাতে পর্যন্ত নেন নি। জর্দা দিয়ে পান খেয়েছেন। আতর মেখেছেন।

শরিফা পালংক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লাল শাড়িতে তাকে সুন্দর লাগছে। ধনু শেখ বমি চাপতে চাপতে বললেন, শাড়ি পছন্দ হয়েছে ?

শরিফা জবাব দিল না। ধনু শেখ বললেন, একটা জিনিস খেয়াল রাখবা। প্রশ্ন করলে উত্তর দিবা। উত্তর না দিলে চড় খাবা। শাড়ি পছন্দ হয়েছে ?

হইছে।

এখন শাড়ি খুইল্যা ফেল। মেয়েছেলের সৌন্দর্য শাড়ি পরায় না। শাড়ি না পরায়। বুঝেছ?

শরিফা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। ধনু শেখ হামাগুড়ি দিয়ে শরিফার কাছে এগিয়ে এলেন। শরিফার গালে আচমকা চড় বসিয়ে বললেন, প্রশ্ন করেছি জবাব দেও নাই, এইজন্যে চড় খাইলা। বুঝেছ?

বুঝেছি।

স্ত্রীকে স্বামী বরাবর হইতে হয়। আগে তোমার স্বামী ছিল মাওলানা, তুমি ছিলা মাওলানা। এখন তোমার স্বামী মদ খাউরা। তুমিও হবা মদ খাউরা। বুঝেছ?

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, বুঝেছি।

ধনু শেখ বলল, এক দুই চুমুক কইরা খাইলেই হবে। বোতল সাফা করতে হবে না। বোতল আমি সাফা করব। ঠিক আছে?

জি।

আইজ থাইকা শুরু হউক। তোমার ডাইন দিকের আলমিরাতে বোতল আছে। বোতল আন।

শরিফা বোতল আনতে রওনা হলো।

ধনু শেখ হুঙ্কার দিলেন।

অনেক আগে তোমারে ন্যাংটা হইতে বলছি। হও নাই। এখন হও। ন্যাংটা অবস্থায় বোতল আনবা। লজ্জা ভাঙা দরকার।

শরিফা থরথর করে কাঁপছে। গা থেকে শাড়ি খোলার চেষ্টা করছে। শাড়ি খুলছে না, আরো যেন পেঁচিয়ে যাচ্ছে।

ধনু শেখ বমি করছেন।

আতর চাঁন বিবির রেকর্ডটা আবার ছেড়েছে। সে ঝুঁকে আছে রেকর্ডের ওপর। গান শুনতে শুনতে এক চোখে পানি আসবে। এক ফোঁটা পানি রেকর্ডে পড়বে। গ্রামোফোনের পিন যখন অশ্রুভেজা জায়গাটা পার হবে তখন গান আরো মধুর লাগবে। ব্যাপারটা আতরের পূর্বপরীক্ষিত।

আতর এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে রেকর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। একই সময় ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শাল তাঁর ক্যাম্পে একটি রেকর্ড বাজাচ্ছেন। রেকর্ডে Waltz মিউজিক হচ্ছে। তিনি এক বোতল রেড ওয়াইন খুলেছেন। কর্ক খুলতে গিয়ে কিছু রেড ওয়াইন ছিটকে পড়েছে রেকর্ডে। তিনি গ্লাসে ওয়াইন ঢালতে ঢালতে বললেন, The wine will make the music sweeter.

তারিখ ৫ই নভেম্বর ১৯৪২ সন। মন্টোগোমারীর আনন্দের দিন। কারণ তাঁর হাতে পরাজিত হয়েছেন ট্যাংক যুদ্ধের কিংবদন্তি জার্মান ফিল্ড মার্শাল রোমেল। যুদ্ধ হয়েছে মিশরের আল আমিনে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মন্টোগোমারী জয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

রেডওয়াইনের গ্লাস উঁচু করে ধরে মন্টোগোমারী বললেন, রোমেলের সাহসের তারিফ করে একটা টোস্ট যদি করি খুব অন্যায় কি হবে?

উপস্থিত চারজন ব্রিগ্রেডিয়ারের ভেতর মাত্র একজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। মন্টোগোমারী বললেন, ঠিক আছে, নাম না হয় উচ্চারণ নাই করলাম। বলি শুধু সাহসের প্রতি সম্মান।

এবার তিনজনই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। মন্টোগোমারী বললেন, To the courage.

গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকির ঝনঝন শব্দ হলো।

অন্যদিকে জার্মান সেনাবাহিনী ঢুকে পড়েছে স্টালিনগ্রাদে। সোভিয়েত সৈন্যরা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। তাদের দিয়ে যুদ্ধ করানো যাচ্ছে না। সোভিয়েত নেতা স্টালিন কাপুরুষতার জন্যে ১৩ হাজার সোভিয়েত সেনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এই খবরে জার্মান জেনারেল এরিখ ভন ম্যানস্টেইন যথেষ্টই আনন্দ পেলেন। তিনি রাশিয়ান ভদকা দিয়ে টোস্ট করলেন। বললেন, To the cowards.

সাহস এবং কাপুরুষতার জন্যে একই সময় পৃথিবীর দুই প্রান্তে টোস্ট করা হলো।

মাওলানা ইদরিস মহাবিপদে পড়েছেন। কোনোদিন বগুড়ার মহাস্থান নামের জায়গা খুঁজে বের করতে পারবেন এরকম মনে হচ্ছে না। পদে পদে বিপদে পড়ছেন। খাওয়াখাদ্য নিয়েও সমস্যা। চারদিকে অভাব। ভাতের দোকান বেশির ভাগই বন্ধ। তাঁর খুঁতিতে টাকা আছে। টাকা দিয়েও খাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। কালীঘাটা নামে এক লঞ্চঘাটে নামার সময় তার ব্যাগ চুরি হয়ে গেল। তাকে একবস্ত্রে নামতে হলো। ব্যাগে কম্বল ছিল। রাত কাটত কম্বল মুড়ি দিয়ে। প্রচণ্ড শীতে এখন গায়ের পাঞ্জাবি সম্বল। কালীঘাটা থেকে এক্কা গাড়ি চলাচল করে। এক্কাওয়ালা তাকে উল্টোপথে নিয়ে গেল। জনমানবহীন এক বিরানভূমিতে নামিয়ে দিয়ে বলল, নাক বরাবর হাঁটেন। জঙ্গলা পাবেন। জঙ্গলা পার হবেন, মহাস্থান পাবেন।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেঁটে তিনি জঙ্গলা পার হলেন। মহাস্থান নামের এক কালীমন্দিরের দেখা পেলেন। মন্দিরের সেবায়েত ছোটখাটো মানুষ। মুখভর্তি জঙ্গুলে দাড়ি। দেখে মনে হয় মুসলমান। সে চাপা গলায় বলল, আপনে যাবেন বগুড়া। এটা রংপুর।

ইদরিস বললেন, এখন কী করব?

আপনি মুসলমান?

জি জনাব।

সঙ্গে টাকাপয়সা আছে?

আছে।

কত টাকা?

দুইশ টাকার সামান্য বেশি। পঁচিশ কিংবা ত্রিশ। গুনা নাই।

টাকা রেখেছেন কোথায়?

আমার খুঁতিতে বান্ধা আছে।

দেখি।

ইদরিস কোমরে বাঁধা কাপড়ের থলি বের করে টাকা দেখালেন। লোকটা টাকা দেখতে চাচ্ছে কেন এটা বুঝলেন না।

সেবায়েত বলল, আপনি বোকা কিসিমের মানুষ। আমি টাকা দেখতে চেয়েছি আপনি দেখালেন। কাজটা ঠিক হয় নাই। আপনি বলবেন, আমি ফকির মানুষ, টাকাপয়সা নাই।

টাকা তো আছে। মিথ্যা বলা ঠিক না। আপনি যখন বলেছেন তখন মিথ্যা বলব। বাঁচার জন্যে মিথ্যা বলায় দোষ নাই।

সেবায়েত বলল, খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

জি-না জনাব।

আমার বাড়িতে চলেন। খাওয়াদাওয়া করবেন। তারপরে দেখি কী করা যায়।

আপনার অনেক মেহেরবানি।

উঠানে বসে খাওয়াদাওয়া করবেন। মুসলমানকে বাড়িতে ঢুকাব না। এত বড় পাপ করতে পারব না।

ইদরিস বললেন, আপনার অনেক মেহেরবানি। আমাকে একটা চাদর কিনার ব্যবস্থা করে দেন। শীতে কষ্ট পাইতেছি।

চাদর পাবেন না। আশেপাশে দোকান নাই। থাকলেও সেখানে কাপড় নাই। বাড়িতে চলেন দেখি কাঁথা দেওয়া যায় কি-না। মেয়েছেলের ব্যবহারী কাঁথা গায়ে দিতে আপনাদের ধর্মে কি বাধা আছে?

জি-না জনাব, আপনার অনেক মেহেরবানি।

ভাত খাওয়াতে পারব না। দেশে ভাত নাই। মিষ্টি আলু সিদ্ধ খাবেন। নুন কাঁচামরিচ দিয়ে মিষ্টি আলু সিদ্ধ পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু।

জনাব, রিজিকের মালিক আল্লাহ্পাক। উনি যা নির্ধারণ করে দেন তাই খাওয়া লাগে। উনার কঠিন হিসাব, সেই হিসাবের বাইরে রাজা মহারাজাও যেতে পারেন না। আর আমি একজন নাদান মানুষ।

গ্রামের বাইরে ঝুপড়ি জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি। পাকাবাড়ি, তবে এখন ভগ্নদশা। বাড়িতে মনে হয় লোকজনও নাই। চারদিক সুনসান নীরব। বারান্দায় কুপি জ্বলছে। কুপির আলোয় অন্ধকার আরো বেড়েছে। অসুস্থ কোনো অতি বৃদ্ধা আছেন। তিনি ক্রমাগত কাশছেন। কাশির দমক একটু থামলেই বলছেন— যম কই রে। আয়। আমারে নিয়া যা। তোর চরণে ধরি।

ইদরিসের কয়েক বেলার নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা কাজা নামাজ শেষ করে খেতে বসলেন। বড় ঝকঝকে কাঁসার থালায় তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। শুধু যে মিষ্টি আলু তা না, গুড় মাখানো ছাতু এবং একটা কলাও আছে। মাওলানা বসেছেন উঠানের এককোণে। তার সামনে কুপি জ্বলছে। মাওলানা খাওয়া শেষ করে হাত তুলে মোনাজাত শুরু করলেন—

হে আল্লাহপাক। চরম অভাবের দিনে যারা আমাকে এত যত্ন করে খাইয়েছে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর। তোমার রহমতের দরজা তুমি এদের জন্যে খুলে দাও। গাফুরুর রহিম তুমি দয়া কর। এদের প্রতি দয়া কর।

কপালে চওড়া করে সিঁদুর দেয়া ঘোমটা পরা একটা মেয়ে মাওলানার সামনে দাঁড়াল। তার হাতে ফুলতোলা কাঁথা। মেয়েটা নরম গলায় বলল, কাঁথাটা গায়ে দেন। শীত অনেক বেশি।

মাওলানা বললেন, মা শুকরিয়া।

বৌটি গলা নামিয়ে বলল, এখন আমার কথা মন দিয়া শুনেন। সে আঙুল উঁচিয়ে বলল, তালগাছ কি দেখা যায় ?

মাওলানা মাথা নাড়লেন। অনেক দূরে কুয়াশার মতো তালগাছ দেখা যাচ্ছে।

দৌড় দিয়া তালগাছ পর্যন্ত যাবেন। সেখানে নদী পাবেন। নদীর নাম করতোয়া। নদী বরাবর দক্ষিণমুখী হাঁটবেন। সারারাত হাঁটবেন। থামবেন না। আমার স্বামী লোক খারাপ। আপনার সঙ্গে টাকাপয়সা আছে আপনি তাকে বলেছেন। সে লোক আনতে গেছে। টাকাপয়সা কেড়ে নিবে। আপনাকে মেরেও ফেলতে পারে। এই কাজ সে আগেও কয়েকবার করেছে। দাঁড়ায়া আছেন কেন ? দৌড় দেন।

মা, আপনার নাম ?

আমার নামে আপনার প্রয়োজন নাই। যা করতে বললাম করেন। হাতে সময় নাই।

নামটা বলেন মা। কোনো একদিন খাস দিলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করব।

আমার জন্যে দোয়া করতে হবে না। আমার স্বামীর জন্যে প্রার্থনা করবেন যেন সে ভালো হয়ে যায়। আমার স্বামীর নাম লক্ষণ দেওয়ান।

বৃদ্ধা মহিলা ঘরের ভেতর থেকে কাশতে কাশতে ডাকছে, ও বৌমা! ও বৌমা!

বৌটি কুপি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। মাওলানা দৌড়াতে শুরু করলেন। অচেনা অজানা বৌটির কথা ভেবে চোখে পানি আসছে। এখন অশ্রুবর্ষণের সময়। মেয়েটার জন্যে আল্লাহপাকের দরবারে খাস দিলে প্রার্থনা করতে হবে। মেয়ের

স্বামীর জন্যেও করতে হবে। স্বামীর নাম লক্ষণ দেওয়ান। আজকাল তাঁর নাম মনে থাকে না। এই নাম কি মনে থাকবে? লক্ষণ দেওয়ান, লক্ষণ দেওয়ান, লক্ষণ দেওয়ান। বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেই নফল রোজা রেখে এই কাজটা করবেন।

রাত দশটার মতো বাজে। শীতের রাত বলেই নিশুতি মনে হচ্ছে। বান্ধবপুর বাজারের সব ঘরের বাতি নেভানো। লঞ্চঘাটায় কিছু আলো আছে। লাবুস পাকা পুলের উপর বসে আছে। পুলের মাথায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ। গাছভর্তি জোনাকি পোকা একসঙ্গে জ্বলছে নিভছে। দেখতে সুন্দর লাগছে। একটি জোনাকি অন্য একটির সঙ্গে কথা কীভাবে বলে? আলোর সংকেতে? জোনাকি পোকাদের কথা বুঝতে পারলে কত কী জানা যেত।

গায়ে কালো কম্বল জড়িয়ে কে যেন এদিকেই আসছে। লাবুসকে দেখে সে জামরুল গাছের আড়ালে চলে গেল। লাবুস বলল, কে?

আমি করিম। ইমাম করিম।

গাছের পিছনে লুকায়ে আছেন কেন?

তোমাকে দেখে শরমিন্দা হয়েছি বিধায় লুকায়ে আছি।

শরমিন্দা হয়েছেন কেন?

আমি সবের কাছেই শরমিন্দা। যার স্ত্রী অন্যের দখলে সে তো শরমিন্দা হবে। এটা জগতের নিয়ম। স্ত্রী অন্যের সঙ্গে ঘুমায়, এই কষ্ট তুমি বুঝবা না। তুমি শাদি কর নাই।

জোর করে কেউ আপনার স্ত্রী দখল করে নাই।

তাও ঠিক। আমার কপাল মন্দ।

আপনি সামনে আসেন। একটা বিষয় নিয়া আলাপ করি।

করিম এগিয়ে এলেন। লাবুসের পাশে বসলেন।

লাবুস বলল, আপনার স্ত্রীকে আমি যে মা ডাকি এটা কি আপনি জানেন?

করিম বিস্মিত হয়ে বলল, না। তবে তার সঙ্গে তোমার যে দেখা হয়েছিল এই বিষয়টা জানি।

লাবুস বলল, একজন পুরুষ যেমন তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে একজন স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারে না? তাহলে আপনার স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিয়ে আপনার কাছে চলে আসতে পারেন।

স্ত্রীদের এই ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা শুধু পুরুষের। স্ত্রী যদি তালাক চায় তাকে তার স্বামীকে টাকাপয়সা দিয়ে কিংবা হাতেপায়ে ধরে মানাতে হবে যেন স্বামী তালাক দেয়। এটা সহি হাদিস। বোখারি শরিফ।

এটা কি ভুল না?

আসমানি কানুনের ভুল ধরা ঠিক না।

লাবুস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। করিম বললেন, আমি তোমার মা'কে একটা পত্র দিয়েছি। সেই পত্রে তাকে বলেছি পালায়া চলে আসতে। সে যদি পালায়া আসে তখন তারে নিয়া দূরদেশে চলে যাব। যেখানে কেউ তারে চিনে না। আমারেও চিনে না। আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করব।

পত্র কি পাঠায়া দিয়েছেন?

হুঁ। ধনু শেখের মেয়ে আতরের হাতে দিয়েছি। সে বলেছে পত্র পৌছায়ে দিবে। একটাই সমস্যা— তোমার মা বাংলা পড়তে জানে না।

আতর পড়ে শুনাবে।

করিম চুপ করে রইল। লাবুস বলল, শুনেছি ইমামের চাকরি আপনার চলে গেছে। নতুন ইমাম আসবে। আপনার এখন চলে কীভাবে?

করিম জবাব দিল না।

লাবুস বলল, আজ কি আপনার খাওয়া হয়েছে?

করিম এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। উঠে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে দ্রুত চলে গেল।

করিম যাচ্ছে ধনু শেখের বাড়ির দিকে। খুব কাছে সে যাবে না। দূর থেকে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে। ধনু শেখের শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। করিম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ জ্বালা করছে।

শরিফা মাথা নিচু করে খাটে বসে আছে। ধনু শেখ বসেছেন তার সামনে। দু'জনের হাতেই গ্লাস। ধনু শেখ যতবার বলছেন ততবারই শরিফা গ্লাস ঠোঁটে লাগাচ্ছে। শরিফা এমনভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

ধনু শেখ আদুরে ভঙ্গিতে ডাকলেন, শরিফা রানি।

জি।

এখন থেকে তোমারে ডাকব রানি। স্বামী আদর করে রানি ডাকে, এটা অনেক বড় ব্যাপার। বুঝেছ?

বুঝেছি।

চুমুক দাও। গ্লাস হাতে নিয়া বইসা থাকবা না। এইটা একটা ঢং। ঢং করবা না। ঢং আমার পছন্দ না।

শরিফা গ্লাসে চুমুক দিল।

ধনু শেখ বললেন, তোমার বিষয়ে আমার দিলখোশ হয়েছে। তোমারে নিয়া আমি কিছুদিনের জন্যে কলিকাতা যাব। ফুর্তির জায়গা দুনিয়াতে একটাই। কলিকাতা। বায়োস্কোপ দেখবা। বাইজি নাচ দেখবা। ঠিক আছে?

জি।

হাসিমুখে বলো ঠিক আছে। প্যাঁচার মতো মুখ কইরা কথা বলবা না। তুমি প্যাঁচা না। এক অক্ষরের কথা বলাও বন্ধ কর। তুমি টিকটিকি না যে সবকিছুতে বলবা— টিক টিক। এখন হাসিমুখে বলবা, আমি বাইজি নাচ দেখব।

শরিফা হাসিমুখে বলার চেষ্টা করল, আমি বাইজি নাচ দেখব। বলতে পারল না। মুখ আরো বিকৃত হয়ে গেল। ধনু শেখ এতেই সন্তুষ্ট হলেন। নেশাগ্রস্ত হয়ে তাঁর এমনই অবস্থা যে হাসি এবং কান্নার তফাৎ তিনি ধরতে পারলেন না।

ধনু শেখের মুখ দিয়ে লালা পড়ছিল। তিনি মুখের লালা মুছতে মুছতে বললেন, কলিকাতায় তোমার জন্যে ড্যান্স মাস্টার রেখে দিব। ড্যান্স মাস্টার তোমারে নাচ শিখাবে। ঘুংগুর পইরা তুমি নাচবা। ঝুমঝুম ঝুমাঝুম ঝুমঝুম। চুমুক দেও।

শরিফা চুমুক দিল।

ড্যান্স মাস্টারের কাছ থাইকা নাচ শিখার পর তুমি আমার সামনে ন্যাংটা নাচ নাচবা। স্বামীর সামনে ন্যাংটা নাচে অসুবিধা নাই। স্বামী যদি সুখী হয় তার জন্যে আলাদা সোয়াব। বুঝেছ?

জি।

আতর শরিফাকে চিঠি দেয় নি। চিঠি প্রসঙ্গে কিছু বলেও নি। সে শুধু বলেছে, আমার কাছে আপনার একটা জিনিস আছে। যেদিন লেখাপড়া শিখবেন সেদিন দিব। তার আগে না।

শরিফা লেখাপড়া শিখছে। আরবি পড়া সে খুব সহজে শিখে ফেলেছিল। বাংলা বড়ই কঠিন লাগছে।

জায়গাটার নাম কালীবাড়ি। মাওলানা ইদরিস সন্ধ্যাবেলা কালীবাড়ি পৌঁছলেন। শ্মশানের মতো জায়গা। লোকজন কিছু নেই। লঞ্চঘাটে একটা বাতি জ্বলছে। সব কেমন ভুতুড়ে লাগছে। রাতটা কোথাও কাটানো দরকার। মাওলানার হাঁটার অবস্থা নেই। পা ফুলে গেছে। পায়ের পাতায় ফোসকা পড়েছে। পায়ের কষ্টের চেয়েও ক্ষুধার কষ্ট প্রবল হয়েছে। ক্ষুধায় তিনি অবসন্ন। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে, কিন্তু ক্ষুধার কারণে ঘুম আসবে বলেও মনে হয় না। ভাত খেতে ইচ্ছা করছে।

থালাভর্তি গরম ভাত হলেই হবে। আর কিছু লাগবে না। ভাতের ওপর লবণ ছিটিয়ে খেয়ে ফেলবেন। ভাত খাওয়ার পর এক জগ পানি।

মাওলানা খাবারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। তবে রাতে থাকার ব্যবস্থা হলো। মসজিদে থাকবেন। পাকা মসজিদ। মেঝেতে পাটি বিছানো। মসজিদে তিনি একা না। একজন সঙ্গীও আছে। সঙ্গীর নাম সরফরাজ। সুন্দর চেহারা। গোলগাল মুখ। কানঢাকা টুপি পরে আছেন। তিনি যাবেন কোলকাতা। কালীবাড়িতে লঞ্চ বদল করতে হয়। রাতে কোথাও থাকার জায়গা না পেয়ে মসজিদে উঠেছেন।

সরফরাজ সঙ্গী হিসেবে ভালো। মাওলানাকে দেখে বললেন, আপনার পায়ের যে অবস্থা তিন-চার দিন নড়তে পারবেন না। ফোসকার চিকিৎসা না করলে পায়ে ঘা হয়ে যাবে। রাতে কিছু খেয়েছেন?

মাওলানা বললেন, জি-না জনাব।

আমার কাছে আখের গুড় আছে, খাবেন? দুর্ভিক্ষের কারণে দেশের অবস্থা এমন যে টাকা থাকলেও খাওয়া পাওয়া মুশকিল। আখের গুড় খেয়ে পানি খান, ক্ষুধা কমবে।

সরফরাজ গুড় বের করে দিলেন। নিজেই মাটির সরায় করে পানি এনে দিলেন। মাওলানা তৃপ্তি করে পানি খেয়ে বললেন, জনাবের এশার নামাজ কি পড়া হয়েছে? পড়া না হয়ে থাকলে আসুন দুই ভাই মিলে নামাজটা পড়ে ফেলি।

সরফরাজ বললেন, আমি মুসলমান না। যখন মসজিদে থাকার দরকার পড়ে তখন মুসলমান নাম নেই।

আপনি কোন ধর্মের?

আমি কোনো ধর্মেরই না। মহাত্মা কবীরের অনুসারী বলতে পারেন।* মহাত্মা কবীরের নাম শুনেছেন?

জি-না জনাব। আমি মূর্খ মানুষ।

মহাত্মা কবীর বলেছেন—

> পাথর পূজে হরি মেলে তো
> হাম পূজেঙ্গে পাহাড়।

অর্থ বুঝেছেন?

জি-না।

অর্থ হলো পাথর পূজা করে যদি ভগবান পাওয়া যেত তাহলে ছোট্ট পাথর পূজা না করে আমি পাহাড় পূজা করতাম। শুয়ে পড়ুন। আপনাকে খুবই কাহিল

* ধর্মগুরু। গুরু নানকের সমসাময়িক।

দেখাচ্ছে। নামাজ টামাজ যা পড়ার কাল পড়বেন। কাজা পড়ে ফেলবেন। তাছাড়া ভ্রমণের সময় নামাজের ব্যাপারে আপনাদের কিছু রেয়াত আছে না?

জি আছে।

তাহলে আর কথা কী। টেনে ঘুম দিন।

মাওলানা ইদরিস ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর গাঢ় ঘুম হলো। ফজরের ওয়াক্তে মুসল্লিরা এসে তাঁর ঘুম ভাঙাল। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন, কোমরের সঙ্গে বাঁধা খুঁনিটা নেই।

নিশিসঙ্গী কবীরভক্তও নেই। শরীর কাঁপিয়ে তার জ্বর এলো। ইদরিস মসজিদের বারান্দায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রইলেন। ভাগ্যকে দুষতে ইচ্ছা করছে। দুষতে পারছেন না। আল্লাহপাক বলেছেন, 'তুমি ভাগ্যকে দোষ দিও না। কারণ আমিই ভাগ্য।'

কালীবাড়ির মসজিদে তিনদিন তিন রাত প্রায় অচেতন অবস্থায় কাটালেন। চতুর্থদিনে মুসল্লিরা তাঁকে কোলকাতার এক লঞ্চে তুলে দিলেন। মসজিদে মরে পড়ে থাকার চেয়ে লঞ্চে মরে থাকুক।

মাওলানা লঞ্চের খোলা ডেকে শুয়ে আছেন। তাঁর মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে। ডেকের এক কোনায় বাদ্য বাজনার দল বসেছে। শীত কাটানোর জন্যে তারা গান করছে। গান জমছে না। বারবার তাল কাটছে। মূল গায়ক বড়ই বিরক্ত হচ্ছে।

> কালী, হলি মা রাসবিহারী
> নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
> বৃন্দাবনে এ এ এ এ...

লঞ্চ বড় নদীতে পড়ে খুব দুলছে। মাওলানার মনে হচ্ছে তিনি গড়িয়ে পানিতে পড়ে যাচ্ছেন। গানের দলের মূল গায়েনকে বললেন, বাবা, আমাকে একটু ধরেন। গায়েন তাঁর কথা শুনতে পেল না। সে কানে হাত দিয়ে লম্বা করে সুর টানল— বৃন্দাবনে এ এ এ।

রাত অনেক।

ধনু শেখ দলবল নিয়ে লাবুসের বাড়িতে এসেছেন। পাল্কিতে করে এসেছেন। পাল্কির ভেতরই বসে আছেন। তাঁর হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। তার সঙ্গীদের মধ্যে একজনের হাতে হ্যাজাক বাতি। হ্যাজাকের ঝকঝকে সাদা আলোয় লাবুসের বাড়ির উঠান আলোকিত। লাবুস এগিয়ে এলো। এত রাতে ধনু শেখের আসার কারণ সে বুঝতে পারছে না। নিশ্চয়ই বড় কোনো ঘটনা ঘটেছে।

কেমন আছ লাবুস ?

ভালো আছি।

সবকিছু কি ঠিকঠাক ?

জি ঠিকঠাক।

কোনোখানে বেতাল কিছু আছে ?

লাবুস বিস্মিত হয়ে বলল, না ! লাবুসের পাশে শ্রীনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হৈচৈ শুনে জেগেছেন। আচমকা ঘুম ভাঙায় ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছেন না।

ধনু শেখ বললেন, আমার স্ত্রী শরিফা কি তোমার বাড়িতে লুকায়ে আছে ?

জি-না।

হুট কইরা না বলবা না। চিন্তা ভাবনা কইরা বলো। তোমার এই বিশাল বাড়ির কোনো চিপায় চাপায় লুকায়া থাকতে পারে। ভালোমতো সন্ধান না কইরাই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। তুমি নিজে সন্ধান কর। আমার লোকজনও সন্ধান করবে।

জি আচ্ছা।

শরিফার সাথে আমার সামান্য মনকষাকষি হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এইসব হয়। সে রাগ করে বের হয়ে গেছে। বুঝেছ ?

জি। আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন ?

আমারে ভিতরে নেওয়া আরো ঝামেলা। কোলে কইরা নিতে হবে। তার প্রয়োজন নাই। যেখানে আছি ভালো আছি। তোমার এখানে কি তামাকের ব্যবস্থা আছে ? ব্যবস্থা থাকলে তামাক দিতে বলো।

হাদিস উদ্দিন তামাক সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। ধনু শেখ গুড়ুক গুড়ুক করে নল টানছেন। তামাকের ধোঁয়া চিন্তা পরিষ্কারক। ধনু শেখ হাদিস উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর নাম কী ?

হাদিস উদ্দিন।

লোকমুখে শুনি শশাংক পাল মরে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন। এই বাড়ির আশেপাশে তারে দেখা যায়। কথা কি সত্য ?

জি সত্য। ষোল আনা সত্য।

তুই কোনোদিন দেখেছিস ?

জে না।

তাহলে কীভাবে বললি ষোল আনা সত্য ?

শ্রীনাথ বাবু দেখেছেন।

শ্রীনাথটা কে ?

গোমস্তার কাজ করে।

সে কই ?

এতক্ষণ আপনার সামনেই ছিল, এখন ছোটকর্তার সঙ্গে অন্দরে গেছেন।

তারে ডাক দিয়া আন। ভূতের কী ঘটনা শুনি।

হাদিস উদ্দিন এক দৌড়ে অন্দরে ঢুকল। গভীর রাতে হঠাৎ এই কর্মব্যস্ততায় সে আনন্দ পাচ্ছে। ধনু শেখ আরাম করে হুক্কা টানছেন, এটাও তার জন্যে আনন্দের। ভালো জিনিসের মর্ম সবাই বুঝে না।

তোমার নাম শ্রীনাথ ?

জি।

চেহারা-ছবি তো ভালো না। শ্রীনাথ নাম না হয়ে বিশ্রীনাথ নাম হলে মানানসই হতো। হা হা হা।

নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে ধনু শেখ অনেকক্ষণ হাসলেন। শ্রীনাথ শুকনা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শশাংক পালের ভূত তুমি নাকি দেখেছ ?

আজ্ঞে দেখেছি।

কী দেখেছ গুছায়া বলো। তার আগে বলো কতবার দেখেছ ?

অনেকবার দেখেছি।

সর্বশেষ কবে দেখেছ ? কী দেখেছ ?

শ্রীনাথ গলা খাঁকারি দিয়ে গল্প শুরু করল। এ ধরনের গল্প বলতে সে খুবই পছন্দ করে। তবে আজ গল্প বলে আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। যারা ভূত বিশ্বাস করে না তাদের সঙ্গে ভূতের গল্প করে আরাম নেই। এরা হঠাৎ বেমাক্কা প্রশ্ন করে গল্প উলট-পালট করে ফেলে।

সন্ধ্যাবেলা আমি বাগানে গিয়েছি নিমের ডাল আনব। দাঁত মাজব। ডাল ভেঙেছি। কী কারণে যেন গাছের উপর চোখ গিয়েছে, দেখি সেখানে কে যেন বসে আছে।

গাছে কি শশাংক পাল বসা ?

জি। আমার দিকে তাকায়া আছেন, মুখে হাসি।

তুমি কী করলা ? ঝাঁকি দিয়া তারে গাছ থাইকা ফেললা ?

শ্রীনাথ গল্প বন্ধ করে দিল। এই মানুষকে ভূতের গল্প শোনানোর কোনো অর্থ হয় না। যে-কেউ গাছে ভূত দেখলে দৌড়ে পালাবে। গাছে ঝাঁকি দিয়ে ভূত মাটিতে ফেলবে না। ভূত তো ফল না যে ঝাঁকি দিয়ে গাছ থেকে ফেলতে হবে।

চুপ করলা কেন ? তারপর কী হলো বলো। শশাংক পালের ভূত কী করল ? গাছের উপর থেকে তোমার শরীরে পেসাব করে দেয় নাই তো ? শুনেছি অনেক দুষ্টভূত এই কাজ করে। পেসাব কি করেছে ?

শ্রীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না।

শরিফাকে পাওয়া গেল না। ধনু শেখ পাল্কি উঠাতে বললেন। এখন যাবেন রঙিলা বাড়িতে। নটিবাড়িগুলো সুন্দরী মেয়েদের পালায়া থাকার জন্যে ভালো জায়গা। বাড়ির মালেকাইন এদের আগ্রহ করে স্থান দেয়। গানবাজনা শিখিয়ে একসময় কাজে লাগিয়ে দেয়। নটিবাড়িগুলোতে মেয়ের অভাব কখনোই হয় না।

রঙিলা বাড়িতে যাবার পথে ধনু শেখের সঙ্গে করিমের দেখা হয়ে গেল। করিম লঞ্চঘাটে হাঁটাহাঁটি করছে। ধনু শেখ পাল্কি থামিয়ে বললেন, কে ? ইমাম করিম না ?

করিম উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রের মতো বলল, আসসালামু আলায়কুম।

ধনু শেখ বললেন, ওয়ালাইকুম। শরিফা যে পালায়ে গেছে এই খবর শুনছ ?

জি।

নটিবাড়িতে যাইতেছি তার সন্ধানে। যদি দেখি সে নটিবাড়িতে দাখিল হয়েছে তাহলে আর ফিরায়া আনব না। এটা দস্তুর না। আমোদ ফুর্তি করতে চাইলে তখন নটিবাড়িতে যাব। ইচ্ছা করলে তুমিও যাইতে পারবা। নটিবাড়ির মেয়েগুলার সুবিধা আছে। তারা একজনের বউ না। সকলের বউ। ভালো বলেছি না ?

করিম তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে। ধনু শেখ করিমের তীব্র চাউনি উপেক্ষা করে বললেন, শরিফা জঙ্গলেও লুকায়ে থাকতে পারে। জঙ্গলে লোক পাঠায়েছি। ইচ্ছা করলে তুমিও যেতে পার। ঘোষণা দিয়েছি, যে শরিফারে খুঁজে পাবে তার জন্যে তিনশ' টাকা পুরস্কার।

করিমের বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে। সে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। তার চোখের সামনে দিয়ে ধনু শেখের পালকি নটিবাড়ির দিকে যাচ্ছে। পাল্কি মাত্র দু'জন টানছে। বিশাল বপু ধনু শেখকে টানতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। এই প্রবল শীতেও তাদের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

শরিফা লুকিয়ে আছে ধনু শেখের বাড়িতে। সে আছে আতরের ঘরে রাখা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুকের ভেতরে। সিন্দুক তালাবন্ধ। চাবি আতরের ঘরের আলমারির ওপর। সিন্দুকের ওপর বিছানা করা। সেই বিছানায় ঘুমায় হামিদা। শরিফাকে

লুকিয়ে রাখায় হামিদার ভালো ভূমিকা আছে। হামিদা নৌকা ঠিক করে রেখেছে। সময় সুযোগ মতো নৌকা শরিফাকে ভাঁটির দিকে নিয়ে যাবে। ভাঁটি অঞ্চলে শরিফার দেশ। কেউ-না-কেউ তাকে আশ্রয় দিবে।

শরিফাকে লুকিয়ে রাখার অসীম সাহসী কাজটি আতর করেছে, কারণ শরিফা তার এই মেয়ের কাছে ধনু শেখের কর্মকাণ্ড সবই কাঁদতে কাঁদতে বলেছে। তাকে কোলকাতায় নিয়ে নাচ শেখানো হবে, তাকে স্বামীর সামনে নগ্ন নৃত্য করতে হবে এই তথ্যও গোপন করে নি।

আতর বলেছে, নয়া মা! বাপজানের কলিকাতা যাওয়ার আগেই আমি ব্যবস্থা নিব। আপনি চিন্তা নিয়েন না।

ধনু শেখের আগামীকাল ভোরেই কোলকাতা যাবার কথা। নিজের লঞ্চে করে যাবেন। কেবিনের ঘর ঝাড়পোছ করা হয়েছে। বিছানা বালিশ তোলা হয়েছে। তখনই আতর ব্যবস্থা নিয়েছে। ধনু শেখকে গিয়ে বলেছে, বাপজান, নয়া মা তো ঘরে নাই। লাবুস চাচার বাড়ির দিকে দৌড়ায়া যাইতে দেখেছি।

ধনু শেখ রঙিলা বাড়িতে। তাঁকে যত্ন করে রুপার বাটায় পান দেয়া হয়েছে। গোলাপ জলের হুক্কায় তামাক দেয়া হয়েছে। ধনু শেখ নিশ্চিত হয়েছেন রঙিলা বাড়িতে শরিফা নেই। তিনি ফিরে আসতে চাচ্ছেন। মালেকাইন তাকে ছাড়ছেন না। হাতজোড় করে বলেছেন, হুজুর এতদিন পর দয়া করেছেন। আজ রাতে আপনাকে ছাড়ব না। আপনার সম্মানে সারারাত গানবাজনা হবে। ভালো বিদেশী পানি আছে। এক চুমুক হলেও মুখে দিতে হবে। ধনু শেখ দোটানায় পড়ে গেছেন। মালেকাইন বলল, তের বছরের একটা মেয়ে নতুন এসেছে। ডানাকাটা পরী কেউ দেখে নাই, এই মেয়ে ডানাকাটা পরী।

মেয়ের নাম কী?

মেয়ের নতুন নাম এখনো দেওয়া হয় নাই। আপনি একটা নাম দেন।

আমি নাম দিলাম আঙুর।

ভালো নাম দিয়েছেন। তবে এই মেয়ে আঙুরের অধিক মিষ্ট। তারে কি আনব?

আনো।

শরিফাকে খুঁজতে আজ অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এখন বিশ্রাম দরকার।

হামিদা শরিফাকে বোরকা পরিয়ে নৌকায় তুলে দিয়েছে। ছইওয়ালা বড় নৌকা। চারজন মাঝি। এরা সারারাত নৌকা বেয়ে শরিফাকে সেতাবনগরে পৌঁছে দিবে। সেতাবনগরে শরিফার এক ফুফু আছেন। শরিফাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। আপাতত শরিফা সে বাড়িতেই থাকবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

নৌকার ছইয়ের দু'পাশ শাড়ি দিয়ে পর্দা দেয়া। ভেতরটা অন্ধকার। অন্ধকারে গুটিসুটি মেরে শরিফা বসে আছে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না সে মুক্তি পেয়েছে।

গভীর রাতে নৌকা হাওরের মুখে পড়ল। হাওর এখন শুকিয়ে গেছে। হাওরের মাঝখান দিয়ে মূল নদীতে সামান্য পানি। নৌকা থেমেছে। মাঝিরা বিড়ি খাচ্ছে। বিড়ির উৎকট গন্ধে শরিফার বমি আসছে। সবাই নৌকা থামিয়ে একসঙ্গে বিড়ি খাচ্ছে কেন শরিফা বুঝতে পারছে না। পর্দার ফাঁক দিয়ে শরিফা দেখল মাঝিদের একজন কুপি জ্বালাচ্ছে। শরিফা বলল, নৌকা থামা কেন ?

কুপি যে জ্বালাচ্ছে সে বলল, এত দূরের পথ যাব, আমরা চারজনে পাইছি মাত্র দশ টেকা। এইজন্য ঠিক করেছি আপনারে নিয়া আমরা রঙতামাশা করব। চিৎকার দিয়া লাভ নাই। কোনোদিকে জনমানুষ্যি নাই। আপোসে রঙতামাশা করলে আপনের ভালো আমরারও ভালো।

মাঝির কথা শেষ হবার আগেই পেছন দিকের পর্দা সরিয়ে একজন ঢুকে শরিফার মুখ চেপে ধরল। ভারী গলায় বলল, একজন আস, ঠ্যাং চাইপা ধর। ঠ্যাং দিয়া লাথি দিতে পারে। আরেকজন খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলল, আমি 'বুনি' চাইপা ধরব। ঠ্যাং ধরব কোন কামে। হি হি হি।

সারারাত রঙতামাশা করে তারা অচেতন শরিফাকে ফেলে গেল পরিত্যক্ত এক বিষ্ণুমন্দিরে। সেখান থেকে তার স্থান হলো রঙিলা নটিবাড়িতে।

মাওলানা ইদরিস শুয়ে আছেন শিয়ালদা রেলস্টেশনের প্লাটফরমে। তিনি একা না। তাঁর মতো আরো অনেকেই আছেন। এদেরকে আলাদা করা হয়েছে, কারণ এরা মারা যাচ্ছে।

হাসপাতালে রোগীর জায়গা নেই। স্বেচ্ছাসেবীরা কিছু সাহায্যের চেষ্টা করছে। সেই সাহায্য কোনো কাজে আসছে না। মাওলানাকে সকালবেলা একটা রুটি দেয়া হয়েছে। মাওলানা রুটি খান নি। রুটি তার পাশে পড়ে আছে, সেখানে পিঁপড়া উঠেছে। মাওলানা আছেন প্রবল ঘোরে। সারাক্ষণই তাঁর মনে হচ্ছে মাথার ভেতর দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে।

কংগ্রেসকর্মীরা সাহায্যে নেমেছে। ব্যাগে ওষুধপত্র নিয়ে এসেছে। তারা রোগীদের তালিকা তৈরির চেষ্টাও করছে। একজন খাতাকলম নিয়ে মাওলানার পাশে বসল।

আপনার নাম ?

ইদরিস। মাওলানা ইদরিস।

গ্রাম ? গ্রামের নাম বলুন।

বান্ধবপুর।

কী বললেন ? বান্ধবপুর ? জেলা কি ময়মনসিংহ ?

জি।

আপনি কি কোরানে হাফেজ ?

জি।

যমুনা নামের কাউকে চেনেন ?

জি-না জনাব।

যমুনার বিয়ে হয়েছিল সুরেন নামে একজনের সঙ্গে। ডাক্তার সুরেন। যমুনা বান্ধবপুরের মেয়ে। চিনেছেন ?

না। জনাব আমি আর কথা বলতে পারতেছি না। আমারে ক্ষমা দেন।

মাওলানা ইদরিস প্রবল ঘোরে তলিয়ে গেলেন। ঘোর ভাঙলো অনেক পরে। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন একটা মেয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে আছে। মেয়েটা ব্যাকুল গলায় বলল, কাকু, আমাকে চিনেছেন ?

চিনেছি।

বলুন তো আমি কে ?

তুমি ললিতা। বগুড়ার।

ভালো করে আমাকে দেখে তারপর বলুন। আমি ললিতা না।

তুমি জমিদার শশাংক পালের মেয়ে ললিতা। মা কেমন আছ ? তোমার পিতা শশাংক পালের ইন্তেকাল হয়েছে।

যমুনা বলল, কাকু, আমি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। যখন আমার কোনো আশ্রয় ছিল না তখন আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

ইদরিস ক্ষীণ স্বরে বললেন, কাঁদছ কেন ললিতা ?

কাকু, আপনাকে এই অবস্থায় দেখে কাঁদছি।

মাওলানা চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মাথার ভেতর দিয়ে আবার ট্রেন চলাচল শুরু করেছে। একটা না, অনেকগুলো ট্রেন একসঙ্গে চলছে। ট্রেনগুলো আবার লঞ্চ ইস্টিমারের মতো ভোঁ ভোঁ শব্দে ভেঁপু বাজাচ্ছে।

যমুনার বাড়ি বাগবাজারে। দু'কামরার একতলা বাড়ি। ছোট্ট বারান্দা। বারান্দায় যমুনা আগ্রহ করে অনেক ফুলের টব রেখেছে। প্রতিটি ফুলের টবে মাধুরীলতা। এই ফুল যমুনার খুব পছন্দ। সুরেন মাধুরীলতা বলে না। সুরেন বলে যমুনা লতা।

বাড়ির দু'টি কামরার একটি যমুনা আলাদা করে রেখেছে। সেখানে তরুণ এক কংগ্রেস কর্মী থাকেন। মানুষের সেবা করার জন্যে এই মানুষটা সবসময় ব্যস্ত হয়ে থাকেন। যমুনা তাকে বড়দা ডাকে। যমুনার বড়দা লেখালেখি করেন। তিনি লেখেন মেঝেতে বসে। তাঁর সামনে থাকে মাড়োয়ারিদের ক্যাশবাক্সের মতো ছোট্ট টেবিল। যমুনা তরুণ এই লেখকের লেখার জন্যে পশমের একটি আসন নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছে।

এই ঘরের খাটে মাওলানা ইদরিসকে শোয়ানো হয়েছে। যমুনার বড়দা বললেন, আমার ঘর বেদখল হয়ে গেল।

যমুনা বলল, বড়দা! পৃথিবীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে উনি একজন।

পৃথিবীটাকে এত ছোট করে দেখা কি ঠিক ?

যমুনা বলল, পৃথিবী যত বড়ই হোক, উনি পৃথিবীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে একজন। উনার অবস্থা ভালো না। সুরেন বলেছে শ্বাসতন্ত্রে জটিল সংক্রমণ হয়েছে। বড়দা, আমি উনাকে এদেশের সবচে' বড় ডাক্তার দেখাতে চাই। তুমি বিধানচন্দ্র রায়কে নিয়ে আসবে

সর্বনাশ উনাকে কীভাবে আনবে

যমুনা বলল, কীভাবে আনবে আমি জানি না। তোমাকে আনতে হবে।

বাংলার কিংবদন্তি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রোগী দেখতে এসেছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, রোগীর ঘরে পা দেয়া মাত্র তিনি রোগ ধরতে পারেন। রোগীর গা থেকে আসা গন্ধ তাঁকে রোগ বলে দেয়

বিধানচন্দ্র বললেন, রোগীর অবস্থা ভালো না। নিশ্চয় রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। রোগীর দু'টা বুকেই নিউমোনিয়া, একইসঙ্গে প্রবল ম্যালিরিয়ার সংক্রমণও হয়েছে। নিউমোনিয়ার চিকিৎসা আগে হওয়া দরকার। কিন্তু আমি ম্যালেরিয়াকে আগে ধরব। রোগীকে গরম পানিতে শুইয়ে রাখতে হবে।

যমুনা বলল, উনি বাঁচবেন ?

বিধানচন্দ্র বললেন, মা, তুমি বিধানচন্দ্রকে এনেছ ? রোগী না বাঁচলে বিধানচন্দ্রের মান কি থাকে ?

মাওলানা ইদরিস তাকিয়ে আছেন। তাঁর গায়ে কম্বল। খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে কম্বলের ওপর। মাওলানা কিছুক্ষণ রোদ দেখলেন, তারপর দৃষ্টি ফেরালেন ঘরের মেঝের দিকে। সেখানে কৃশকায় কৃষ্ণবর্ণের এক যুবক মাটিতে

আসন করে এই শীতে খালি গায়ে বসেছে। তার গায়ের পৈতা ঝকঝক করছে। যুবক একমনে লিখে যাচ্ছে। একসময় এই যুবক লেখা থেকে চোখ তুললেন। তখনি মাওলানা ইদরিসের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো।

যুবক বললেন, আজ কি একটু ভালো বোধ করছেন ?

মাওলানা বললেন, জি জনাব। আপনার নাম ?

আমার নাম তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কী লিখছেন ?

একটা উপন্যাস লিখছি। উপন্যাসের নাম 'গণদেবতা'। *ভারতবর্ষ* নামে একটা পত্রিকা আছে সেখানে ধারাবাহিকভাবে বের হয়।

মাওলানা বললেন, আমি গল্প-উপন্যাস কোনোদিন পাড়ি নাই। হাদিস কোরান পড়েছি। কী লিখেছেন একটু পড়ে শুনাবেন ?

তারাশংকর বললেন, অবশ্যই।

> সোঁ সোঁ শব্দে প্রবল ঝড়। ঝড়ে চালের খড় উড়িতেছে, গাছের ডাল ভাঙিতেছে। বিকট শব্দে ওই কার টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই নামিল ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি। দেখিতে দেখিতে চারদিক আচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বর্ষণ। আঃ পৃথিবী যেন বাঁচিল। ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়ায় ভিজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠিতে লাগিল।

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার কমিটির দুর্ভাগ্য, তারা বাংলার এই ঔপন্যাসিকের খোঁজ বের করতে পারেন নি। তাদের পুরস্কারের খাতায় এই মহান কারিগরের নাম উঠে নি।

হে মহান বিশ্ব ঔপন্যাসিক! আপনি 'মধ্যাহ্নে'র এক সামান্য লেখকের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা গ্রহণ করুন।

'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্যে তারাশংকর ১৯৬৬ সনে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান।

এককড়ি ভোরবেলার কনকনে ঠান্ডায় পুকুরে মাথা ডুবিয়ে স্নান করেছেন। কোমরে লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে সাদা ধুতি পরে জলচৌকিতে বসেছেন। তাঁর পাশে অবিনাশ ঠাকুর হাতে ঘণ্টা নিয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। অবিনাশ ঠাকুর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ করেন। চোখ বন্ধ করে উপনিষদ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করেন। দাঁত না থাকার কারণে কথাগুলি জড়িয়ে যায়। মন্ত্র অদ্ভুত শোনায়।

> ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমাথা বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম। মাইহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেহস্তু।
>
> আমার সমস্ত অঙ্গ যেন পুষ্ট হয়। তার সঙ্গে আমার প্রাণবায়ু, বাকশক্তি, দৃষ্টি, শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও যেন শক্তিশালী হয়। ব্রহ্মার কথাই উপনিষদ বলে।

এককড়ির সামনে পিতলের থালা। থালায় জবাফুল, কিছু ধান, আম এবং বটের পাতা। লোকজন আসছে, কৌতূহলী হয়ে দেখছে। ছেলেমেয়েরা সকাল থেকেই ভিড় করে আছে। বান্ধবপুরে ছড়িয়ে গেছে— এককড়ি জোড়া পাঁঠা বলি দেবেন। সবাইকে পাঁঠার মাংস ভাগ করে দেয়া হবে।

মেয়েরা দলে দলে আসছে। এককড়ির বৃদ্ধা মা অনেক দূরে সাদা থান পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়ের দল দেখলেই খনখনে গলায় চিৎকার করছেন। সাবধান, বিধবারা কেউ কাছে যাবা না। সাবধান, বিধবারা দূরে। এককড়ির মা নিজেও বিধবা। তিনিও উৎসবে থাকতে পারছেন না।

আজকের উৎসবের কারণ এককড়ির মন্দির বানানো হচ্ছে। নেত্রকোণা থেকে রাজমিস্ত্রি এসেছে। তারা আজ মধ্যদুপুর থেকে ইট গাঁথা শুরু করবে। প্রথমে তৈরি হবে দেবীর মঞ্চ। মঞ্চে দেবী স্থাপনা হবে সন্ধ্যায়। এরপরেই শুরু

হবে দেয়াল গাঁথা। মধ্যদুপুর লগ্ন শুভ। অবিনাশ ঠাকুর ছক এঁকে বের করেছেন। এই বিশেষ সময়ে মঙ্গল কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাবে। অতি শুভ সময়।

মন্দির নির্মাণের যাবতীয় দেখাশোনা শ্রীনাথ করছেন। তাঁর আগ্রহের কোনো সীমা নাই। রামমন্দির হচ্ছে না, রাধাকৃষ্ণের মন্দিরই হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি শ্রীনাথ লাবুসের বাড়ি থেকে চাদরে জড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি এটাকে অপরাধ মনে করছেন না। দেবদেবী মুসলমান বাড়িতে অনাদরে অবহেলায় পড়ে ছিলেন। এখন পূজা পাবেন।

রাধাকৃষ্ণের এই মূর্তি হরিচরণের পরিবার পূজা করতেন। অষ্টধাতুর মূর্তি। চোখ ফেরানো যায় না এত সুন্দর।

মূর্তিটি যে চুরি গেছে লাবুসকে এই খবর দেয়া হয়েছে। খবর দিয়েছে হাদিস উদ্দিন। হাদিস উদ্দিন উত্তেজিত এবং দুঃখিত।

ছোটকর্তা, আমি হইলাম ওস্তাদ দরবার মিয়ার সাগরেদ। আমার চোখের সামনে জিনিস চুরি গেল। আমি কিছু বুঝলাম না। এই খবর শুনলে দরবার মিয়া আমার মুখে 'ছেপ' দিবেন।

লাবুস বলল, দরবার মিয়া যেহেতু শুনছেন না কাজেই তোমাকে মুখে ছেপ মাখতে হবে না।

আইজ না শুনলেন, কোনো একদিন তো শুনবেন। তখন কী উপায় হবে?

লাবুস বলল, একটা কিছু উপায় নিশ্চয়ই হবে। শান্ত হও।

ঘরের এমন দামি একটা জিনিস চুরি যাবে, আপনি কিছুই বলবেন না?

লাবুস বলল, চুরি তো যায় নাই। চোখের সামনেই থাকবে। মূর্তি দেখে সবাই আনন্দ পাবে।

হাদিস উদ্দিন বলল, কই আমি তো কোনো আনন্দ পাইতেছি না। আমার তো শইল জ্বইল্যা যাইতেছে। কপাল দিয়া গরম ভাপ বাইর হইতেছে।

লাবুস হাই তুলতে তুলতে বলল, সময়ে জ্বলুনি কমবে। এখন সামনে থেকে যাও।

সন্ধ্যাবেলা ধুমধামের সঙ্গে দেবীমূর্তি মঞ্চে স্থাপিত হলো। দেবীকে নৈবেদ্য দেয়া হলো। ভক্তরা প্রসাদ পেলেন। প্রায় সারারাত নামজপ হলো। ভোরবেলা দেখা গেল কে বা কারা মূর্তি চুরি করে নিয়ে গেছে। শুধু যে মূর্তি চুরি করেছে তা-না, যেখানে মূর্তি ছিল সেখানে এক তাল কাদা রেখে গেছে। কাদার ওপর দু'টা কাঁচকলা পাশাপাশি বসানো।

হাদিস উদ্দিনকে সকাল থেকেই খুব উৎফুল্ল দেখা গেল। সে নামাজ রোজার ধার ধারে না, কিন্তু সেদিন দুপুরে সে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে মসজিদে জোহরের নামাজ পড়তে গেল। মসজিদে নতুন ইমাম সাহেব এসেছেন। শ্যামগঞ্জের আলীম পাশ বিরাট মাওলানা, নাম মোহম্মদ সিদ্দিক। নতুন ইমাম কেমন তা জানা প্রয়োজন।

মোহম্মদ সিদ্দিকের বয়স অল্প। সুন্দর চেহারা। গলার স্বর মিষ্টি। সমস্যা একটাই— তাঁর দাড়ি নেই। ইমাম সাহেবের দাড়ি না থাকলে কীভাবে হবে? ইমামের চাকরি দিতে গিয়ে ধনু শেখ থমকে গেলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, দুনিয়ার ইসলামি পাশ দিয়া বইসা আছ, তোমার দাড়ি কই?

ইমাম মাথা নিচু করে বলল, আমাদের বংশে দাড়ি নাই জনাব।

দাড়ি ছাড়া মাকুন্দা ইমাম লোকজন মানবে কেন?

সিদ্দিক বিনীত ভঙ্গিতে বলল, দাড়ি রাখা সুন্নত। নবীজির দাড়ি ছিল। যাদের দাড়ি হয় না তারা এই সুন্নত পালন করতে পারে না। এছাড়া আর কোনো সমস্যা নাই।

ধনু শেখ বললেন, সমস্যা যে নাই সেটা তুমি বলতেছ। সমস্যা তোমার না। সমস্যা আমার। লোকজন বলবে, ধনু শেখ ইচ্ছা কইরা মাকুন্দা নিয়া আসছে। যাই হোক, এসে যখন পড়েছ থাক। মুসুল্লিরা কেউ আপত্তি তুললে সঙ্গে সঙ্গে বিদায়।

আপত্তি তুলবে না।

আগ বাড়ায়া কথা বলবে না। আপত্তি তুলবে না তুমি জানো কীভাবে?

ইমাম সিদ্দিক চুপ করে রইল। ধনু শেখ বললেন, খাওয়া থাকা আমার বাড়িতে। বেতন দশ টাকা।

ঠিক আছে জনাব। তবে আপনার বাড়িতে থাকব না। রাতে মসজিদে থাকব।

মসজিদে কেন থাকবে?

আমি রাতে ইবাদত বন্দেগি করি। মসজিদে থাকা আমার জন্যে ভালো।

ধনু শেখ বললেন, তোমার জন্যে ভালো হলে ভালো। থাক মসজিদে, তবে সাবধানে থাকবা। এই মসজিদের কিছু দোষ আছে।

কী দোষ?

এই মসজিদের ইমামদের কিছুদিন পরই মাথা নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম ইদরিস ছিল। মাথা হয়ে গেল পুরাপুরি নষ্ট। বাজারের এক মেয়েছেলে বিবাহ

করল। এখন যে সে কোথায় আছে কেউ জানে না। তারপরে আসল করিম। বিরাট মাওলানা। সে এখন আধাপাগল হয়ে ঘুরতেছে। খবর পেয়েছি নিচুজাতের সঙ্গে এখন তার উঠাবসা। তারা চোলাই মদ বানায়, সেই মদ খায়া সে শুনেছি এইখানে সেইখানে পড়ে থাকে।

উনার কথা শুনেছি।

ধনু শেখ উগ্র গলায় বললেন, তার কথা শুনলে আমার কথাও নিশ্চয়ই শুনেছ? তার তালাক দেয়া স্ত্রীর সাথে আমার যে বিবাহ হয়েছিল এটা শুনেছ?

জি।

সেই মেয়ে যে রঙিলা নটিবাড়িতে থাকে, এটা শুনেছ?

সিদ্দিক মাথা নিচু করে ফেলল। ধনু শেখ বললেন, মাথা নিচা করলা কেন? তোমার স্ত্রী তো নটিবাড়িতে নাই। শাদি করেছ?

জি-না।

আচ্ছা এখন সামনে থেকে যাও। মিজাজ খারাপ হয়ে গেছে। আরেকটা কথা, আতর মাইখা আমার কাছে আসবা না। আতরের গন্ধে আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়।

জোহরের নামাজ পড়তে মুসুল্লি এসেছে মাত্র একজন— হাদিস উদ্দিন। জোহর কাজকর্মের সময়। নামাজি মানুষ এমনিতেই কম আসে। তাছাড়া নতুন ইমাম এসেছে, পাঞ্জেগানা নামাজ আবার শুরু হয়েছে— এই খবর এখনো সবার কাছে পৌঁছে নি।

নামাজ শেষ করে সিদ্দিক হঠাৎ বলল, জনাব, আপনার সঙ্গে যে আল্লাহপাকের দেখা হয়েছিল এটা কি আপনার স্মরণে আছে?

হাদিস উদ্দিন হতভম্ব হয়ে বলল, এটা কী বললেন?

সিদ্দিক হাসিমুখে বলল, না জেনে বলি নাই। জেনে বলেছি।

হাদিস বলল, আপনের মাথা তো আগের দুই মাওলানার চেয়েও খারাপ।

সিদ্দিক খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, আল্লাহপাক মানুষ সৃষ্টির আগে মানুষের আত্মা সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তিনি সব আত্মাকে একত্র করে বললেন, বলো তোমাদের রব কে? আত্মারা সবাই একসঙ্গে বলল, আপনি আমাদের রব। এই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাস করলাম, আল্লাহপাকের সঙ্গে আপনার যে দেখা হয়েছিল এই ঘটনা ইয়াদ আছে কি-না? সামান্য রহস্য করে বললাম। অপরাধ নিবেন না।

হাদিস উদ্দিন নতুন ইমাম সাহেবের জ্ঞানবুদ্ধিতে এবং বিনয়ে মোহিত হয়ে গেল। সে ঠিক করল, তেমন কোনো কাজকর্ম না থাকলে মাঝেমধ্যে নামাজে আসবে। জীবনযাপন করতে গেলে দু'একটা ছোটখাটো দোষত্রুটি হয়ে যায়। নামাজের মাধ্যমে সে সব কাটান দিতে হয়।

শ্রীনাথ মূর্তি চুরির বিষয়ে কথা বলার জন্যে ধনু শেখের কাছে গিয়েছে। মূর্তি কে নিয়েছে শ্রীনাথ জানে। ধনু শেখের মতো ক্ষমতাবান মানুষ ছাড়া তা উদ্ধার করা যাবে না।

ধনু শেখ তামাক টানতে টানতে বললেন, মূর্তি কে চুরি করেছে তুমি জানো?

শ্রীনাথ গলা নামিয়ে বলল, অবশ্যই জানি। লাবুসের ইশারায় চুরিটা হয়েছে। চুরি করেছে ল্যাংড়া হাদিস উদ্দিন।

ধনু শেখ বললেন, গলা নামায়া কথা বলতেছ কেন? আশেপাশে তো কেউ নাই।

শ্রীনাথ বলল, আপনি ব্যবস্থা না নিলে জিনিস উদ্ধার হবে না।

ধনু শেখ বললেন, শুনেছি রাধাকৃষ্ণ বিরাট দেবদেবী। তারা নিজেরা নিজেদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারে না? ধনু শেখের সাহায্য লাগে?

শ্রীনাথ বলল, দেবদেবীরা তাদের ক্ষমতা সর্বসাধারণে দেখান না। নিজেদের কাজ অন্যকে দিয়ে করায়ে নেন। উদ্ধারের কাজটা যেমন আপনার মাধ্যমে হবে।

ধনু শেখ তামাক টানা বন্ধ করে হঠাৎ গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, শশাংক পালের ভূত দেখার গল্পটা তো তুমি শেষ কর নাই। গাছে বসে ছিল ভূত। তুমি ঝাঁকি দিয়া ফেললা। তারপরে কী হলো?

শ্রীনাথ বলল, ওই গল্প আরেকদিন শেষ করব। আপনি মূর্তির মীমাংসাটা করেন। হাদিস উদ্দিন বদমাইশটা নিয়েছে।

বুঝলা কীভাবে?

পায়ের ছাপ দেইখা বুঝতে পেরেছি। যে চুরি করতে এসেছে তার পায়ের ছাপ পড়েছে। একপায়ের ছাপ গভীর। আরেকটা পাতলা। খোঁড়া পায়ের ছাপ পাতলা।

ধনু শেখ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, পায়ের ছাপের কারণেই আমি চুরি করতে বাইর হই না। আমি যেখানেই যাব এক ঠ্যাং-এর ছাপ পড়বে। তোমার মতো বুদ্ধিমান লোক সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে চোর ধনু শেখ।

শ্রীনাথ দুঃখিত গলায় বলল, জনাব, আপনি পুরা বিষয়টা নিয়া হাসি তামাশা করতেছেন। এটা হাসি তামাশার কোনো বিষয় না। শুধু যে মূর্তি চুরি করেছে তা-না। হিন্দু জাতিরে বিরাট অপমানও করেছে।

কীভাবে অপমান করেছে?

দু'টা কাঁচকলা রেখে গেছে।

ধনু শেখ বললেন, কাঁচকলার মধ্যে অপমানের কী আছে? হিন্দু বিধবারে কলা দুইটা দেও, তারা বড়া বানায়ে খেয়ে ফেলবে।

বিষয়টা নিয়া যে কত বড় সমস্যা হবে আপনি তা বুঝতে পারতেছেন না। রঙ্গতামাশা করতেছেন। এটা রঙ্গতামাশার বিষয় না।

ধনু শেখ বললেন, এখন তুমি পথে আসছ। রঙ্গতামাশার বিষয় তো অবশ্যই না। মূর্তি চুরি নিয়া হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মুসলমান কাটাকাটি যে শুরু করেছে এটা শুনেছ? মুসলমান পিঁয়াজ খায়, গরু খায়, এইজন্যে কাটাকাটিতে সে আগায়া আছে। এই অঞ্চলে হিন্দু যদিও বেশি, কাটাকাটি শুরু হইলে দেখবা কী অবস্থা।

শ্রীনাথ উঠে পড়ল। এই লোকের সঙ্গে কথা বলতে আসাই তার ভুল হয়েছে। উন্মাদশ্রেণীর মানুষ। কী বলে না বলে সে নিজেও জানে না। ধনু শেখ বললেন, বেয়াদবের মতো হুট কইরা উঠে দাঁড়াইলা, তার কারণ কী?

শ্রীনাথ বলল, আমার কথা শেষ, আমি চইলা যাব। বুঝেছি আপনার এখানে কোনো ফয়সালা হবে না।

কে বলেছে ফয়সালা হবে না? অবশ্যই ফয়সালা হবে। আচ্ছা শ্রীনাথ, এই মূর্তি তোমরা পাইছ কই? হরিচরণের ঠাকুরঘরে এমন মূর্তি ছিল। আমি নিজে অনেকবার দেখেছি।

শ্রীনাথ হড়বড় করে বলল, আমাদেরটা দেখতে একই রকম, কিন্তু মূর্তি ভিন্ন।

ধনু শেখ বললেন, তা হতে পারে। মানুষও একই চেহারার প্রায়ই পাওয়া যায়। এম এস বাহাদুর নামে আমার একটা লঞ্চ ছিল। সেখানে পাচক বামুন যে ছিল তার চেহারা অবিকল তোমার মতো। বিরাট চোর ছিল। একদিন তারে একশবার কানে ধরে উঠবোস করতে বললাম। বিশবার উঠবোস করে সে ধপাস করে পড়ে গেল। মিনমিন করে বলল, কর্তা আর পারব না। শ্রীনাথ শোন, মনের ভুলে কোনদিন যে তোমারেও উঠবোস করাই তার নাই ঠিক। একই রকম চেহারার কারণে ভুল হইতে পারে। মানুষ মাত্রই ভুল করে। ভালো কথা, শ্রীনাথ, তোমরার দেবদেবীরা ভুল করেন না?

শ্রীনাথ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। ধনু শেখের কাছে আসা বিরাট ভুল হয়েছে। তার উচিত ছিল মন্দিরের কাছে থাকা। রাজমিস্ত্রিদের কাজ তদারক করা। মন্দির নির্মাণ বন্ধ হয় নি। কাজ পুরোদমে চলছে।

ধনু শেখ বললেন, বেশি চালাক হওয়া ঠিক না শ্রীনাথ। আমি বেশি চালাক হয়েছিলাম, আমার ঠ্যাং চলে গেছে। ইমাম করিম বেশি চালাক হয়েছিল, তার বউ চলে গেছে। তোমার কী যায় কে জানে।

শ্রীনাথ বলল, আমার যাওয়ার মতো কিছু নাই।

তাও ঠিক। এখন গল্পটা শেষ কর।

কী গল্প ?

শশাংক পালের গল্প। এত বড় জমিদার ভূত হইয়া গাছে বসা। কী লজ্জার কথা! তারপর তুমি কী করলা ? ঝাঁকি দিয়া ভূত পাড়লা ? ভূত ধুপ্‌পুস কইরা মাটিতে পড়ল ?

ইমাম করিম মাধাই খালের পাড়ে বসে আছে। সকাল থেকেই এই জায়গায় বসে ছিল। এখন মধ্যদুপুর। কাল রাতে সে স্বপ্নে দেখেছে, কলার ভেলায় করে শরিফা খাল বেয়ে আসছে। শরিফার পরনে সুন্দর শাড়ি। বোরকা হাতে পুঁটলি পাকিয়ে ধরা। মাথায় ঘোমটাও দেয় নাই। করিম বলেছে, ছিঃ ছিঃ শরিফা, এইসব কী ? বোরকা হাতে নিয়া বইসা আছ কেন ? কতজন তোমারে দেখবে!

শরিফা বলল, দেখুক।

করিম বলল, এটা কেমন কথা বললা ? সারাজীবন তোমারে পর্দা পুশিদার কথা বলেছি।

শরিফা বলল, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা। ভেলায় উঠেন দেখি।

করিম স্বপ্নের মধ্যেই ভেলায় উঠলেন। ভেলাটা তখন নৌকা হয়ে গেল। স্বপ্নে এই ব্যাপারগুলি এমনভাবে ঘটে যে মোটেই অস্বাভাবিক লাগে না। করিম বলল, আমরা যাই কই ?

শরিফা বলল, ভাটির দেশে যাই। ভাটির দেশে আমার স্বামী থাকে। তার সাথে ঘর করতে যাই।

তোমার স্বামী আবার কে ? আমি তোমার স্বামী।

উঁহু। আপনে আমার কেউ না।

করিম বলল, তোমারে একটা কথা বলব ?

শরিফা বলল, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা।

করিম মাধাই খালের পাড়ে বসে আছে, একটু পরপর বিড়বিড় করে বলছে, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা। করিম বুঝতে পারছে তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একই কথা অসংখ্যবার বলা মাথা খারাপের প্রথম লক্ষণ।

মাথা খারাপ মানুষদের জন্যে অনেক সুবিধা আছে। তাদের জন্যে নামাজ রোজা মাফ। তারা খুন করলেও খুনের বিচার হবে না। একটা খুন করলে না, দশটা খুন করলেও না।

করিম ঠিক করে রেখেছে, পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলে সে কয়েকটা খুন করবে। পুরোপুরি পাগল সে এখনো হয় নাই। পুরোপুরি পাগল হলে গায়ে কাপড় রাখতে পারত না। পাগলের শীত-গ্রীষ্ম বোধ থাকে না। তার এখনো আছে। গা থেকে কম্বল খুলে দেখেছে শীত লাগে। পানিতে নামলে শীত লাগে। শীতের কারণে সে গোসল বন্ধ করে দিয়েছে।

করিম উঠে দাঁড়াল। ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। কিছু খাওয়া দরকার। সে লাবুসের বাড়ির দিকে রওনা দিল। যাদের সে খুন করবে সেই তালিকায় লাবুসের নাম আছে, তারপরেও সে যায়। হাদিস উদ্দিন তাকে দেখলেই বলে— ইমাম সাব, কিছু খাবেন ? হাত ধুইয়া আসেন, খানা দেই।

হাত ধুইতে পারব না, তুমি খানা দাও। হাত ধুইতে গেলে শীত লাগবে।

ময়লা হাতে খাইবেন ?

মাথায় হাত মুইছা খাব। অসুবিধা নাই। পাগলের জন্যে সব মাপ।

করিম লাবুসের বাড়ির কাছাকাছি এসে মত বদলাল। ক্ষুধাটা চলে গেছে। যেহেতু ক্ষুধা নাই ওই বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। সে জুম্মাঘরের দিকে রওনা হলো। নতুন ইমাম এসেছে, তার সঙ্গে এখনো পরিচয় হয় নাই। পরিচয় থাকা উচিত। তাছাড়া ইমাম নতুন মানুষ। তাকে পরামর্শ দেওয়াও করিমের কর্তব্য। তাকে অঞ্চলের হাবভাব বুঝিয়ে দিতে হবে। নতুন মানুষ বিপদে যেন না পড়ে। একেক অঞ্চলের ভাব একেক রকম। রঙিলা নটিবাড়ির বিষয়টাও ইমাম সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ভুলেও যেন সেদিকে না যায়। যাওয়া দূরের কথা, ওইদিকে তাকালেও বিরাট পাপ হবে। হাবিয়া দোজখের আগুনে পুড়ে মরতে হবে। নতুন ইমাম সাহেবের জ্ঞান বুদ্ধি, হাদিস কোরানের ওপর দখল কেমন এগুলোও দেখতে হবে। আজান দিয়া নামাজ পড়াতে পারলেই ইমাম হওয়া যায় না।

ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে উঠতে গিয়ে করিম ভুরু কুঁচকে তাকাল। মনিশংকরের ছেলে শিবশংকর আসছে। করিম দ্রুত চিন্তা করল, খুন করার তালিকায় এই ছেলে আছে কি-না।

না, এই ছেলের নাম নেই। করিম হাসিমুখে এগিয়ে গেল। খুনের তালিকায় যাদের নাম নেই, তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। করিম বলল, বাবা, কেমন আছ ?

শিবশংকর বলল, বেশি ভালো না কাকু। আমার রোজ জ্বর আসছে।

ম্যালেরিয়া হয়েছে। কুইনাইন খাওয়া দরকার।

কুইনাইন খাচ্ছি।

বিসমিল্লাহ বলে খাও না তো ? বিসমিল্লাহ্ বলে খেলে কাজ হবে না। ওষুধপত্র খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা নিষেধ। তখন বলতে হয় আল্লাহু শাফি। আল্লাহু কাফি।

কাকু, আমি হিন্দু।

সেটা তো জানি। জানব না কেন ? পুরাপুরি পাগল তো হই নাই। যেদিন হব সেদিন হিন্দু-মুসলমান ভেদ থাকবে না। তখন আমার কাছে হিন্দুও যা, মুসলমানও তা।

শিবশংকর দুঃখিত চোখে তাকিয়ে আছে। করিম বলল, বাবা এখন যাই। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। যদিও আমার কথা হলো ব্যাঙের মাথা। শরিফা এরকম বলে। শরিফাকে চিনেছ তো ? আমার স্ত্রী। সম্পর্কে তোমার চাচি হয়। এখন সে আছে রঙিলা নটিবাড়িতে। ঠিক করেছি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। টাকা-পয়সার জোগাড় হচ্ছে না বলে যেতে পারছি না। তাড়াহুড়াও কিছু নাই। তোমার চাচি তো আর পালায়া যাচ্ছে না। রঙিলাবাড়িতে একবার কেউ ঢুকলে পালাতে পারে না। বাকিজীবন ওইখানে কাটাতে হয়।

নয়া ইমাম মোহম্মদ সিদ্দিকের জ্ঞান-বুদ্ধিতে করিম সন্তুষ্ট হলো। সব প্রশ্নের জবাব নতুন ইমাম ঠিকঠাক দিলেন। করিম এতটা আশা করে নি।

করিম বলল, ইমাম সাহেব, বলেন দেখি হাবুতি সনটা কী ? বাংলা সন, হিজরি সনের কথা সবাই জানে। হাবুতি সনের কথা জানে জ্ঞানীজন। চট করে বলেন হাবুতি সন কী ?

মোহম্মদ সিদ্দিক বললেন, হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেশত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের দিন থেকে হাবুতি সন শুরু।

করিম বললেন, হয়েছে। মাশাল্লাহ। এখন বলেন নবীদের মধ্যে সবচে' দীর্ঘ আয়ু কে পেয়েছেন, স্বল্প আয়ু কে পেয়েছেন ?

সবচে' দীর্ঘ আয়ু পেয়েছেন দুই নবী। হযরত নুহ (আঃ) এবং হযরত আয়ুব (আঃ), দুইজনই ১৪০০ বছর বেঁচেছেন। আর অল্প আয়ু পেয়েছেন

দুইজন। হযরত ঈসা (আঃ), উনি বেঁচেছেন মাত্র ৩৩ বৎসর। আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদও (দঃ) অল্প আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি বেঁচেছেন মাত্র ৬৩ বৎসর।

মাশাল্লাহ্। শেষ প্রশ্ন, এটা না পারলেও ক্ষতি নাই। হযরত আদমের বংশধরদের তালিকা বলেন। নবীবংশ বললেই হবে।

মোহম্মদ সিদ্দিক চোখ বন্ধ করে তালিকা বলা শুরু করলেন— *

(১) হযরত আদম (আঃ)
(২) হযরত শীশ (আঃ)
(৩) হযরত ইয়াসিন (আঃ)
(৪) হযরত কাইনান (আঃ)
(৫) হযরত মাহ্লীল (আঃ)
(৬) হযরত ইয়ারত (আঃ)
(৭) হযরত ইদরিস (আঃ)
(৮) হযরত আখিমুখ (আঃ)
(৯) হযরত শালিখ (আঃ)
(১০) হযরত লামক (আঃ)
(১১) হযরত নুহ (আঃ)
(১২) হযরত সাম (আঃ)
(১৩) হযরত আরফাক শাম (আঃ)

করিম বললেন, আর বলতে হবে না। মাশাল্লাহ্। আপনার জ্ঞানে আমি মুগ্ধ। আসেন কোলাকুলি করি।

মোহম্মদ সিদ্দিক বললেন, আপনার সঙ্গে আমি কোলাকুলি করব না। আপনার শরীর এবং কাপড় নোংরা। আপনি কতদিন গোসল করেন না কে জানে।

শীতের কারণে গোসল করতে পারতেছি না। তাছাড়া সাবানও নাই। সাবান ছাড়া গোসল করে ফয়দা কী ?

সিদ্দিক বললেন, আমি গরম পানি আর সাবানের ব্যবস্থা করলে গোসল করবেন ? গোসল করা উচিত। আমাদের নবী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

গরম পানি কোথায় পাবেন ?

---

* এই তালিকার সঙ্গে লুক লিখিত সুসমাচারের অদ্ভুত মিল আছে। শুধু কিছু নামের বানান ভিন্ন। —লেখক

আমি ব্যবস্থা করব।

গোসলের পর পরব কী?

আমি লুঙ্গি, পাঞ্জাবির ব্যবস্থা করব।

করিম বেশকিছু সময় চিন্তা করে বললেন, গোসল করতে রাজি আছি।

মোহম্মদ সিদ্দিক গরম পানির সন্ধানে গেলেন। গরম পানি, সাবান, পরিষ্কার ধোয়া কাপড় নিয়ে ফিরে এসে দেখেন— করিম নেই।

সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রথমে গুড়িগুড়ি কুয়াশার মতো পড়ছিল। যতই রাত বাড়তে লাগল বৃষ্টিও বাড়তে লাগল। একসময় শিল পড়তে শুরু করল। শীতের দিনে এমন শিলাবৃষ্টি অনেক দিন এই অঞ্চলে হয় নি। ধনু শেখ আগ্রহ নিয়ে শিলপড়া দেখছেন। পা ভালো থাকলে ছোটবেলার মতো শিল কুড়াতেন। মাটির গোল সরায় শিল জমা করতেন। কিছুক্ষণ পর সরা ভাঙলে পাওয়া যেত বরফের গোল বল। ধনু শেখ ডাকলেন, সদরুল।

সদরুল দৌড়ে এলো।

ধনু শেখ বললেন, আমি আবছামতো দেখেছি করিম কদম গাছের নিচে দাঁড়ায়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজতেছে। মাথার মধ্যে শিল পড়তেছে।

তাড়ায়া দিয়া আসি? যদি বলেন বাড়ি দিয়া ঠ্যাং ভাঙ্গব। বড় ত্যক্ত করতেছে।

ধনু শেখ বললেন, না। তারে ধইরা নিয়া আস। সাবান ডইল্যা গরম পানি দিয়া গোসল দেও। শুকনা কাপড় দেও। আইজ তারে সঙ্গে নিয়া খানা খাব। তারে দেইখা হঠাৎ মায়া লাগল।

সদরুল বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল।

ধনু শেখ বললেন, এইভাবে তাকায়া আছ কেন? আমার কথা বুঝতে পার নাই?

বুঝেছি।

তাহলে দৌড় দেও।

সদরুল কদম গাছের দিকে ছুটে গেল।

করিম জলচৌকিতে ঝিম ধরে বসে আছে। সদরুল তার গায়ে সাবান ডলছে। অন্য একজন লোটায় করে মাথায় পানি ঢালছে। করিম লজ্জায় মরে যাচ্ছে। খালি গায়ে তাকে গোসল দেয়া হচ্ছে— এই কারণে লজ্জা না। আতর নামের

মেয়েটা দূর থেকে তাকে দেখছে এটাই লজ্জা। খুন করার তালিকায় এই মেয়েটা আছে কি-না করিম মনে করতে পারছে না। মনে হয় আছে। মেয়েটাকে সে একটা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিটা সে শরিফাকে দেয় নি। যদি দিত অবস্থা ভিন্ন হতো। এই অপরাধ গুরুতর। এই অপরাধের জন্যে অবশ্যই তাকে খুন করা যায়। তবে এ মেয়েছেলে এবং বয়স অল্প। অল্পবয়েসি মেয়েছেলের কারণে তাকে কি ক্ষমা করা যায়? করিম চিন্তা করে কূল পাচ্ছে না।

আতর আজ তার বাবার কিছু অপরাধ ক্ষমা করেছে। বাবা যে মমতা ইমাম করিমকে দেখিয়েছে সেই মমতার হয়তো অন্য অর্থ আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মমতাটাই চোখে পড়ছে। অন্যকিছু না। আতর ছাতি মাথায় দিয়ে শিল কুড়াতে শুরু করল।

করিম মুগ্ধ হয়ে আতরের শিল কুড়ানো দেখছে। শরিফাও শিল কুড়াত। গ্লাসে জমা করে রাখত। শরিফার একটা কাজ আতর করছে, এইজন্যে করিম আতরকে ক্ষমা করে দিল। এবং কোমল গলায় বলল, আম্মাজি, ভালো আছেন?

আতর বলল, এখন থেকে আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন। পথেঘাটে ঘুরবেন না।

করিম বলল, কেন?

আতর বলল, আপনি আমাকে আম্মাজি ডেকেছেন এইজন্যে।

করিমের চোখে পানি এসে গেছে। তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে বলে চোখের পানি আলাদা করা যাচ্ছে না।

শীতে ধনু শেখের শরীর জমে যাচ্ছে। বিলাতি পানিতে শীত কমবে। একা একা এই পানি খেয়ে মজা নাই। রঙিলা বাড়িতে যাওয়া যায়। ঝড়বৃষ্টিতে পথ কাদা হয়ে আছে। পাল্কি বরদাররা পা পিছলে পাল্কি নিয়ে পড়লে অবস্থা কাহিল হবে। ধনু শেখ কী করবেন মনস্থির করতে পারছেন না। রঙিলা বাড়িতে গেলে শরিফার সঙ্গে দেখা হবে। এর আলাদা আনন্দ। নতুন জায়গায় মেয়েটা কেমন আছে স্বচক্ষে দেখা। তার ঘটনা কী জানা। ধনু শেখ ডাকলেন, সদরুল।

সদরুল ছুটে এলো।

শীত কেমন নামল বলো দেখি?

ভালো নামছে।

বুড়াবুড়ি যা আছে এই শীতে শেষ হবে কি-না বলো? শীত হলো বুড়া মরার কাল। ঠিক বলেছি না?

অবশ্যই ঠিক বলেছেন।

আমি নিজেও তো বুড়ার দলে। শীতে আমারও মরণের কথা।

আপনে কী যে কন!

ধনু শেখ বললেন, আমার শীত কমানোর ব্যবস্থা কর। শীত না কমলে আমি শেষ।

সদরুল মাথা চুলকাচ্ছে। শীত কীভাবে কমাবে বুঝতে পারছে না। সে ইতস্তত করে বলল, আগুন করব?

ধনু শেখ বললেন, এটা মন্দ না। শীতের আসল ওষুধ আগুন। বড় করে আগুন কর, কয়েকটা হিন্দু বাড়ি জ্বালায়া দাও।

সদরুল বলল, কথাটা বুঝলাম না।

ধনু শেখ বললেন, কথা না বুঝার কী আছে? সব জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলতেছে। এইখানে কিছুই নাই। হিন্দুস্থান পাকিস্তান ভাগাভাগি যখন হবে, তখন দেখা যাবে বান্ধবপুর পড়েছে হিন্দুস্থানে। সেটা ভালো হবে?

জে না।

হিন্দু কিছু কমাইতে হবে। ভোটাভুটিরও ব্যাপার আছে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন কিছু হিন্দু কমে, কিছু দেশ ছাইড়া পালায়।

আইজ আগুন দেওয়া সমস্যা। বৃষ্টিতে সব ভিজা।

ধনু শেখ হতাশ গলায় বললেন, তোমরার বুদ্ধি গরু-ছাগলের বুদ্ধি। পেট্রল ঘরে রাখা আছে না? পানির সাথে মিশলে পেট্রল ভালো জ্বলে। বুঝেছ?

জি।

ঠান্ডা আর ঝড়বৃষ্টির কারণে লোকজন সব থাকবে ঘরে। আগুনের কারিগররে কেউ দেখবে না। কথা ঠিক বলেছি?

জি বলেছেন।

এককড়ির দোকানটা অবশ্যই জ্বালাইবা।

জি আচ্ছা।

জুম্মাঘরে আগুন দিতে ভুলবা না কিন্তু।

কথাটা বুঝলাম না।

ধনু শেখ ঠান্ডা গলায় বললেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট আসবে। পুলিশ সুপার আসবে। তারা স্বচক্ষে দেখবে মুসলমানের পবিত্র ধর্মস্থান হিন্দুরা কীভাবে জ্বালায়ে দিয়েছে। এখন বুঝেছ?

বুঝেছি। আপনার বুদ্ধির কোনো সীমা নাই।

বুদ্ধি অনেকেরই আছে। সবে বুদ্ধি ব্যবহার করে না। আমি করি। পাল্কি ঠিক করতে বলো। রঙিলা বাড়িতে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শীত কমানোর ব্যবস্থা।

আগুনের ব্যবস্থা কি এখনই করব?

অবশ্যই। আগুন দেখতে দেখতে যাব।

প্রায় একই সঙ্গে কয়েকটা জায়গায় আগুন জ্বলল। এককড়ির দু'টা দোকান। ভরদ্বাজের বাড়ি। মনিশংকরের বাংলাঘর এবং জুম্মাঘর। বান্ধবপুর অঞ্চল জুড়ে হৈচৈ ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। বাচ্চাদের কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে। অনেক হিন্দু বাড়িতে শঙ্খ বাজানো শুরু হয়েছে। ভয়াবহ দুর্যোগে শঙ্খ বাজানোর নিয়ম।

ধনু শেখ পাল্কি করে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন শ্রীনাথ দৌড়ে যাচ্ছে। তিনি ডাকলেন, শ্রীনাথ, যাও কই?

শ্রীনাথ থমকে দাঁড়াল। জবাব দিল না। ধনু শেখ বললেন, যেখানেই যাও ধীরেসুস্থে যাও। রাস্তা পিছল। পিছল রাস্তায় সাবধানে হাঁটতে হয়। বুদ্ধিমান মানুষ সাবধানে হাঁটে। তোমারে বুদ্ধিমান জানতাম।

শ্রীনাথ কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। ধনু শেখ বললেন, শশাংক পালের ভূতের বিষয়টা শুনলাম না। ঝাঁকি দিয়া ভূতটারে তুমি যখন নিচে ফেললা তখন কী হইল? আচ্ছা থাক, পরে শুনব। মনে হয় আইজ তুমি সামান্য ব্যস্ত।

ধনু শেখের পাল্কি এগুচ্ছে। শ্রীনাথ কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। আগুন বাড়ছে। বাতাসের কারণে দ্রুত ছড়াচ্ছে।

মালেকাইন ধনু শেখের যত্নের চূড়ান্ত করছেন। বিলাতি পানি আনা হয়েছে। হুক্কায় আম্বুরী তামাক পুড়ছে। পিতলের বড় মালসায় কাঠকয়লার আগুন করে ধনু শেখের পাশে রাখা হয়েছে। হাত গরম করার ব্যবস্থা। ধনু শেখ বললেন, একটা পা না থাকার কারণে আমার এখানে আসা-যাওয়ার বড়ই অসুবিধা। আসতে ইচ্ছা করলেও আসতে পারি না।

মালেকাইন বললেন, আহা আহা!

ধনু শেখ বললেন, আমার এই অসুবিধা আপনি সহজেই দূর করতে পারেন।

মালেকাইন বললেন, অবশ্যই। আমার চার বেহারার পাল্কি আছে। আপনি খবর দিলেই পাল্কি যাবে। আদবের সাথে আপনাকে নিয়ে আসবে।

ধনু শেখ বললেন, পাল্কি আমারও আছে।

মালেকাইন বললেন, তাও ঠিক।

ধনু শেখ তামাকে লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমার সমস্যা দূর করার সহজ উপায় রঙিলা বাড়ির যাকে আমার পছন্দ তারে পাল্কি দিয়া আমার কাছে পৌছায়ে দেয়া।

মালেকাইন বললেন, সেটা সম্ভব না। এই বাড়ির কিছু নিয়ম আছে। অনেক দিনের পুরনো নিয়ম। বাড়ির মেয়ে কোনোখানে পাঠানো যাবে না। এরা থাকবে আলাদা। কোনোখানে যাবে না।

দিনের সাথে নিয়ম পাল্টায়। ইংরেজ আমলের নিয়ম আর স্বরাজ আমলের নিয়ম এক না।

মালেকাইন বললেন, স্বরাজ এখনো হয় নাই। যখন হবে তখন দেখব। তবে রঙিলা বাড়ির নিয়ম তখনো বহাল থাকবে।

ধনু শেখ বললেন, আপনার প্রয়োজন টাকা। নিয়মের আপনার প্রয়োজন নাই। আমি যখন কাউকে নিজের বাড়িতে নিয়া রাখব ডাবল টাকা দিব।

তিনগুণ টাকাতেও হবে না।

ধনু শেখ বললেন, না হলে কী আর করা। আমি নিজেও নিয়ম মানা মানুষ। নিয়মের বাইরে যাই না। বান্ধবপুরের বিভিন্ন জায়গায় আগুন লেগেছে। এই খবর কি পেয়েছেন?

পেয়েছি।

আগুন নিয়ম মানে না। সে তার ইচ্ছায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। আপনি সাবধানে থাকবেন যেন রঙিলা বাড়িতে আগুন না ধরে। রঙিলা বাড়ি পুইড়া ছাই হয়ে গেলে আপনার আমার সবেরই অসুবিধা।

মালেকাইন ধনু শেখের গ্লাসে বিলাতি পানি ঢালতে ঢালতে চিন্তিত গলায় বললেন, আপনি কাকে নিজের বাড়িতে নিতে চান?

ধনু শেখ বললেন, শরিফাকে।

আজই নিতে চান?

হুঁ।

রাখবেন কত দিন?

জানি না।

মালেকাইন বললেন, ঠিক আছে নিয়া যান।

ধনু শেখ বললেন, আপনার অনেক মেহেরবাণী।

শরিফা আলাদা পাল্কিতে ধনু শেখের বাড়িতে যাচ্ছে। তাকে চিন্তিত বা দুঃখিত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে ক্লান্ত। যেন অনেক দিন শান্তিমতো ঘুমাচ্ছে না। সে পাল্কিতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বান্ধবপুরের আগুনে পাঁচজন মানুষ মারা গেল। এদের মধ্যে মুসলমান একজন। জুম্মাঘরের নতুন ইমাম মোহম্মদ সিদ্দিক। আগুন লাগার পর সে দরজা খুলে বের হতে পারে নি। দরজা খুঁজে পায় নি। মসজিদের ভেতর ছোটাছুটি করেছে এবং চিৎকার করেছে— ইবলিশ শয়তান। ইবলিশ। ইবলিশ। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ধারণা ছিল— ইবলিশ শয়তান কিছু একটা করছে। ইবলিশের মায়া। আসলে আগুন-টাগুন কিছুই লাগে নি।

গৌরাঙ্গ এককড়ির দোকানেই ঘুমাত। আগুন লাগার পর সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। দোকানের ক্যাশবাক্স উদ্ধারের জন্যে সে আবার দৌড় দিয়ে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে। তখনি ঘরের চাল তার ওপর পড়ে। ক্যাশবাক্সে ছিল ছয় টাকা সাত আনা।

বাকি তিনজন শিশু। ভরদ্বাজের তিন মেয়ে— সুশিলা, সরজুবালা এবং দুর্গা। উদ্ধারের পর দেখা যায় তিনবোন জড়াজড়ি করে আছে।

বান্ধবপুরে বুনকা বুনকা ধোঁয়া উড়ছে। আগুন জ্বলছে। কিছু জায়গায় এখনো আগুন নেভানোর চেষ্টা হচ্ছে। ধনু শেখ আগ্রহ নিয়ে আগুনের খেলা দেখছেন।

আরো একজন আগুনের খেলা দেখছেন তাঁর গোপন বাংকারে বসে। তাঁর নাম হিটলার। হিটলারের সামনে বৃদ্ধ এক জিপসি। সে দেয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। জিপসির নাম ইয়ান'র। তাঁর চেহারা সাধু সন্তের মতো। লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল। ঘন নীল চোখ।

ইয়ান'র একের পর এক কাঠি জ্বালাচ্ছে। কাঠির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে। দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে। তার সামনে বিশ্বের অতি ক্ষমতাধর একজন বসে আছে। এই ঘটনা তাকে তেমন আলোড়িত করছে বলে মনে হচ্ছে না।

হিটলার দেয়াশলাইয়ের কাঠির আগুনে জার্মান বাহিনীর ভবিষ্যৎ দেখতে চাচ্ছেন। ভবিষ্যৎ দেখা খেলা তাঁর পছন্দের। টেরট কার্ড দিয়ে ভবিষ্যৎ বলার কিছু পদ্ধতি তিনি নিজেও জানেন। কার্ড দেখে যুদ্ধে জার্মানির ভবিষ্যৎ বলার খেলা মাঝেমধ্যে তিনি তাঁর বান্ধবী ইভা ব্রাউনের সঙ্গে খেলেন।

হিটলার বললেন, কী দেখলে ?

জিপসি শিতল গলায় বলল, বরফ পড়ছে।

শীতকালে বরফ পড়বে। শীতকালে আকাশ থেকে কমলা বৃষ্টি হবে না। ভালো করে দেখে বলো, রাশিয়াতে আমার বাহিনীর অবস্থা কী ?

বরফ পড়ছে। জার্মানবাহিনী বরফের কাছে পরাজিত।

হিটলার বললেন, বরফ শুধু জার্মানবাহিনীর ওপর পড়ছে না। রুশদের ওপরও পড়ছে।

জার্মানবাহিনী বরফের হাতে পরাজিত। রুশবাহিনী না, রুশরা বরফের সঙ্গে পরিচিত।

তোমার দেশ কোথায় ?

আমি জিপসি। আমার কোনো দেশ নেই।

জন্মেছ কোথায় ?

মস্কোর কাছে, ভলগা নদীর তীরে।

জার্মানবাহিনী রুশদের কঠিন শিক্ষা দিয়েছে, এই গল্প তুমি জানো। জার্মানদের প্রতি ক্রোধের কারণে জার্মানবাহিনী সম্পর্কে এধরনের কথা বলছো।

আমি জিপসি, কারো প্রতি আমার কোনো ক্রোধ নেই।

হিটলার উঠে দাঁড়ালেন। জিপসি তখনো বসে। এখনো তার হাতে দেয়াশলাইয়ের কাঠি। হিটলার নির্দেশ দিলেন ইহুদিদের সঙ্গে জিপসিদেরও যেন নির্মূল করা হয়। আধুনিক জার্মানি হবে ইহুদি এবং জিপসিমুক্ত।

লেনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ। জার্মানরা এই শহরকে একটা মৃত শহরে পরিণত করেছে। চব্বিশ ঘণ্টাই কামানের গোলাবর্ষণ হচ্ছে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী রেলস্টেশন তিখভিন জার্মানদের দখলে। বোমা এবং কামানের আঘাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি মোটামুটি ধ্বংস। শহরে খাদ্য নেই বললেই হয়। কলকারখানার শ্রমিকরা গ্রিজ, কারখানার তেল খাচ্ছে। কাঠের গুড়ি দিয়ে রুটি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। ক্ষুধার্ত মানুষজন কুকুর-বিড়াল সিদ্ধ করে খাচ্ছে। নরমাংস খওয়ার ঘটনাও ঘটছে।

অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। বসতবাড়িতে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে না। সামান্য বিদ্যুৎ যা তৈরি হচ্ছে চলে যাচ্ছে কলকারখানাতে। শীতে জমে যাওয়া মানুষজন ঘরের কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র পুড়িয়ে চেষ্টা করছে শরীর উষ্ণ রাখতে। শহরে শিশুখাদ্য শেষ। কর্তৃপক্ষ প্রতিটি শিশুর জন্যে সপ্তাহে ছয়গ্রাম চিনি বরাদ্দ করেছেন। সেই চিনির জন্যে দীর্ঘ লাইন।

জার্মানরা শহরটিতে কোনো খাদ্য আসতে দিচ্ছে না। সব পথ বন্ধ। একটা পথ অবশ্যি খোলা আছে। লাগোদা হ্রদের ওপর দিয়ে ট্রাকে করে খাদ্য নিয়ে আসা। ট্রাক আসার জন্যে হ্রদের পানি জমে কম করে হলেও দু'শ মিলিমিটার পুরো হতে হবে। তার জন্যে আরো তুষারপাত প্রয়োজন। বন্দি লেনিনগ্রাদবাসী শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রার্থনা করছে আরো দুর্দান্ত শীতের। তুষারপাতের। যেন লাগোদা হ্রদ জমে লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়।

২৬ নভেম্বর (১৯৪২) আটটা ট্রাক লেনিনগ্রাদ থেকে বের হয় এবং লাগোদা হ্রদ পার হয়ে খাদ্য নিয়ে শহরে ফিরে আসে। খাদ্যের পরিমাণ ৩৩ টন।

একই সঙ্গে জাবেরি নামের শহরের সঙ্গে লেনিনগ্রাদের যোগাযোগের জন্যে রাস্তা বানানো হয়। জাবেরি থেকে খাদ্য আনার ব্যবস্থা। মাত্র ২৭ দিনে তৈরি হয় দুশ মাইল রাস্তা। এই সড়কই বিখ্যাত 'রোড টু লাইফ'। ডিসেম্বরের ছয় তারিখ তিনশ' ট্রাক খাদ্য নিয়ে লেনিনগ্রাদের দিকে যাত্রা করে।

রুশরা জার্মানদের হাত থেকে দখল করে নেয় রেলস্টেশন তিখভিন। রুশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানির ওপর।

জার্মানদের পরাজয়ের স্বাদগ্রহণের পালা শুরু হয়।

জুলেখা কলিকাতা বেতার ভবনের একটা ঘরে অনেকক্ষণ হলো বসে আছে। ঘরটির বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা— মহিলাদের বিশ্রাম কক্ষ। তিন-চারজন পুরুষ মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তারা আসছে যাচ্ছে।

ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতা। হারমোনিয়াম তবলা আছে। হারমোনিয়ামের পাশেই বিরাট এক পিকদান। কেউ কেউ পানের পিক ফেলার জন্যেই ঘরে ঢুকছেন। পিক ফেলে চলে যাচ্ছেন।

জুলেখা এসেছে, আজ তাকে একটি গানের সুর দেখিয়ে দেয়া হবে। সে গলায় গান তুলবে। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ইসলামি গান। ইসলামি গানের এখন খুব কদর হয়েছে। 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গানটির রেকর্ড আছে সব মুসলমানের বাড়িতে। আব্বাসউদ্দিনের সুরেলা গলা এইক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

জুলেখা যে গান গাইবে তার কথা—

ভালোবাসা পায় না যে জন
রসুল তারে ভালোবাসে।
উম্মতেরে ছেড়ে কভু
বেহেশতে যায় না সে॥
যে জন বেড়ায় পিয়াস লয়ে
দ্বারে দ্বারে নিরাশ হয়ে
সবুরেরি মেওয়া নিয়ে
নবীজি তাঁর সামনে আসে॥
যে খেটে খায় হালাল রুজি
তারি দুনিয়াদারি
মোর নবীজি কমলিওয়ালা
সহায় যে হন তারি
সংসারে যে নয় উদাসীন
খোদার কাজে যে রহে লীন

রসুল তারে বক্ষে বাঁধেন
রহ্‌মতেরি বাহুর পাশে। *

জুলেখাকে গানের কথা দেয়া হয়েছে। সুর বলা হয় নি। কাজী নজরুল ইসলাম তাকে সুর দেখিয়ে দেবেন এবং গলায় গান তুলে দেবেন। এই আলাভোলা মানুষটার সঙ্গে জুলেখার পরিচয় আছে। তিনি যখন রেকর্ড কোম্পানিতে চাকরি করতেন তখনি পরিচয়।

কাজী নজরুল রেকর্ড কোম্পানির কাজ ছেড়ে রেডিওতে যোগ দিয়েছেন। রেডিওকে বলা হচ্ছে 'আকাশবাণী'। রবীন্দ্রনাথের দেয়া নাম। আকাশবাণীতে যোগ দেয়ার পর থেকে কবি নজরুল অন্যমনস্ক। কথাবার্তা এলোমেলো। হঠাৎ হঠাৎ বিচিত্র সব কথা বলেন। কাজে কোনো মন নেই। বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে তিনি হঠাৎ বললেন, দুদিন আগে যেমন করে যে ভাষায় বলতে পারতাম, সে ভাষা আমি ভুলে গেছি। যদি আর বাঁশি না বাজে আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।

কবি নজরুল তার অতি ঘনিষ্ঠদের অদ্ভুত অদ্ভুত কথাও বলেছেন। যেমন আল্লাহর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। অনেক গূঢ় বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। মা কালীর সঙ্গেও কথা হয়েছে। মা কালীর কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও সুরেলা।

জুলেখা কয়েকবার রেডিও অফিসে খোঁজ নিয়েছে। কাজীদা আসেন নি। সম্ভবত আজ আর গান তোলা হবে না। জুলেখা চলে যাবার জন্যে মন ঠিক করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজী নজরুল ঢুকলেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। গলায় গেরুয়া চাদর। কবি সরাসরি হারমোনিয়ামের সামনে বসে জুলেখাকে ডাকলেন।

জুলিয়া, ভালো আছ?

জুলেখা কবির সামনে বসল। কবি তাকে জুলিয়া ডাকেন। জুলেখা নামটা না-কি তাঁর মাথায় থাকে না। পাতলা হয়ে জুলিয়া হয়ে যায়।

জুলিয়া, তুমি এই গান গাইবে বেণুকা রাগিণীতে। বেণুকা আর দোলনচাঁপা এই দু'টা রাগিণী আমার তৈরি, তোমাকে বলেছি না?

জুলেখাকে এই বিষয়ে কাজী নজরুল কখনো কিছু বলেন নি, তবু জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার প্রধান চেষ্টা সময় নষ্ট না করে গানটা গলায় তুলে নেয়া। একবার দেখিয়ে দিলেই সে পারবে। গান দেখিয়ে দেবার সময় কি কবির হবে? তিনি ছটফট করছেন।

---

* সূত্র : *নজরুল গীতি অখণ্ড*, আব্দুল আজিজ আল আমান। হরফ প্রকাশনী। কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা।

জুলিয়া, আমি যে হাত দেখতে পারি তুমি জানো ?

না।

এসো তোমার হাত দেখে দেই। গান পরে হবে। কবি জুলেখার হাত টেনে নিলেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে হাতের রেখা দেখতে দেখতে বললেন, তোমার হাতের রেখা ভালো। বৃহস্পতিতে ত্রিশুল চিহ্ন আছে। বৃহস্পতিতে ত্রিশুল থাকা অত্যন্ত শুভ। গানবাজনায় নাম করবে। অবশ্যি নাম তো এখনই করেছ। পারিবারিক জীবন শুভ। স্বামীভাগ্যে তুমি ভাগ্যবতী।

জুলেখা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। কবি নিঃশ্বাসের অর্থ ধরতে পারলেন না।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে অনেক কাটাকুটি। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। প্রায়ই নানান অসুখবিসুখ হবে। হয় না ?

জুলেখার অসুখবিসুখ তেমন হয় না। তারপরেও হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। আজ মনে হয় গান তোলা হবে না। সময় কেটে যাবে হাত দেখাদেখিতে।

কবি বললেন, তুমি কি আমার ঐ গানটা শুনেছ ? 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল'

জি শুনেছি।

গান লেখার ইতিহাসটা শোন। জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ আব্বাসউদ্দিন বলল, এক লক্ষ টাকা যদি লটারিতে পাওয়া যায়, তাহলে প্রিয়ার জন্যে কে কী উপহার কিনবে ? একেকজন একেক কথা বলছে, আমি করলাম কী হারমোনিয়াম টেনে গান ধরলাম— 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানি দেব খোঁপায় তারার ফুল।' হা হা হা। একটা পয়সা খরচ হলো না। প্রিয়া তার উপহার পেয়ে গেল। হা হা হা।

জুলেখা তাকিয়ে আছে। তার মন বলছে মানুষটা ভালো নেই।

কবি হঠাৎ গলা অস্বাভাবিক নিচু করে বললেন, কাউকে যদি না বলো তাহলে তোমাকে অতি গোপন একটা কথা বলব।

কাউকে বলব না।

তোমার চেহারার সঙ্গে নার্গিসের চেহারার মিল আছে। সেও তোমার মতো রূপবতী।

নার্গিস কে ?

আমার প্রথম স্ত্রী। কুমিল্লার মেয়ে। বিয়ের রাতেই আমি তাকে ফেলে চলে আসি।

কেন ?

সেটা তো তোমাকে বলব না। শৈলজানন্দ আমার অতি প্রিয়জন। তাকেও বলি নি।

কবি গলার স্বর নিচু করে বললেন, তবে আল্লাহর সঙ্গে আমার কী কথাবার্তা হয়েছে সেটা বলব। বাতেনী কথা, অর্থাৎ অতি গূঢ় রহস্যের কথা। তিনি আমাকে ডেকেছেন 'চিরকবি' নামে। যে কারণে আমি যখন অটোগ্রাফ দেই তখন লিখি— চিরকবি নজরুল। দেখি তোমার গানের খাতা। চিরকবি নজরুল লিখে দেই।

জুলেখা গানের খাতা এগিয়ে দিল। কাজী নজরুল লিখলেন—

জুলিয়া
আমারে যেও না ভুলিয়া।
চিরকবি কাজী নজরুল ইসলাম।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই কবি চিরদিনের জন্যে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কবি তাঁর একটি গানে লিখেছিলেন— 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।' তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশেই তাঁর কবর।

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই॥
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই।
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজির উম্মত
ঐ মসজিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত।
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই।
কত দরবেশ ফকির রে ভাই মসজিদের আঙিনাতে
আল্লাহর নামে জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে॥
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে
আল্লাহর নাম জপিতে চাই। *

* হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড। গায়ক মোঃ কাশেম। রেকর্ড নাম্বার N 17476

বার্লিন আর্মি হেড কোয়ার্টারের বিশেষ এক বাঙ্কারে হিটলার নৈশভোজ শুরু করেছেন। নৈশভোজে কিছুটা আড়ম্বর আছে। কারণ আজ অনেকদিন পর হিটলারের বান্ধবী ইভা ব্রাউন উপস্থিত আছেন।

পুরনো রেড ওয়াইনের বোতল খোলা হয়েছে। হিটলার এক চুমুক রেড ওয়াইন খেয়ে মাথা নাড়লেন। তাঁর পছন্দ হয়েছে। দু'রকমের স্যুপ দেয়া হয়েছে। বেবী কর্ন-এর একটি প্রিপারেশন আছে। আলুভাজা আছে। মাখন মাখানো মাশরুম আছে। শূকরের মাংসের সসেজ এবং লাল করে পোড়ানো খরগোসের মাংস আছে। মাংসের বাটিগুলির ঢাকনা খোলা হয় নি। হিটলার নিরামিষ খাবার পছন্দ করেন, তবে কিছুদিন আগে জেনারেলদের এক সম্মেলনে এক টুকরা খরগোসের মাংস মুখে দিয়েছিলেন বলে বিশেষ আয়োজনের দিনে তাঁর টেবিলে মাংস রাখা হয়। মাছের কোনো আইটেম নেই। ইভা ব্রাউন মাছের গন্ধ পছন্দ করেন না।

একটু দূরে গ্রামোফোনে মোৎসার্ট বাজছে। ডাইনিং টেবিলে মোমবাতির আলো। পরিবেশ চমৎকার। হিটলারকে প্রসন্ন দেখাচ্ছে। যুদ্ধের ভালো কোনো খবর পেলে তিনি প্রসন্ন বোধ করেন। ভালো খবর পাওয়ার তেমন কারণ নেই। ভয়াবহ দুঃসংবাদ একের পর এক আসছে। তারপরেও যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটে। ইভা ব্রাউনের ধারণা তেমন কোনো ঘটনা ঘটেছে।

ইভা ব্রাউন ওয়াইন গ্লাস তুলে টোস্ট করলেন— জার্মানির মৃত্যুঞ্জয়ী বীরসৈনিকদের। হিটলারও গ্লাস তুললেন। গ্লাসে গ্লাসে শব্দ হলো। সেই শব্দও সঙ্গীতের মতোই। হিটলার ইশারা করলেন, গ্রামোফোন যেন বন্ধ করা হয়। তিনি ডিনার নীরবেই করেন, তবে মাঝে মাঝে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে। আজ সে রকম একটা দিন।

হিটলার আলুভাজা মুখে দিতে দিতে বললেন, জার্মান ফিল্ড মার্শালদের বিশেষত্ব কী তুমি জানো ?

ইভা ব্রাউন বললেন, তারা ধীমান বীর। মহান যোদ্ধা। সাহসী।

ঠিকই আছে, তবে তাদের প্রধান বিশেষত্ব হলো তারা কখনোই জীবিত অবস্থায় শত্রুর কাছে ধরা পড়ে না। আত্মসমর্পণ করে না। মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করবে, কিন্তু ধরা দেবে না।

ইভা ব্রাউন বললেন, ফিল্ড মার্শালদের এই বিষয়টি জানতাম না।

হিটলার অহংকারের সঙ্গে বললেন, এখন পর্যন্ত কোনো জার্মান ফিল্ড মার্শালকে কেউ জীবিত অবস্থায় বন্দি করতে পারে নি।

ইভা ব্রাউন রেড ওয়াইনের গ্লাস আবারো উঁচু করে বললেন, মহান ফিল্ড মার্শালদের উদ্দেশে।

হিটলার বললেন, তুমি জার্মান ফিল্ড মার্শাল বলো নি।

ইভা ব্রাউন বললেন, ভুল হয়েছে। সরি। মহান জার্মান ফিল্ড মার্শালদের উদ্দেশে।

হিটলার গম্ভীর গলায় বললেন, এ ধরনের ভুল আমার পছন্দ না।

সময় ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাস। তারিখ দুই। হিটলার তখনো জানেন না তাঁর ফিল্ড মার্শালদের একজন, ফিল্ড মার্শাল পাউলাস, স্টেলিনগ্রাদে সোভিয়েতদের কাছে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছে ৯১ হাজার জার্মান সৈন্য। তারা বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। শীতে এবং ক্ষুধায় কাতর।

ফিল্ড মার্শাল পাউলাসকে সোভিয়েত মার্শাল জর্জি ঝুকভের তাঁবুতে নেয়া হলো। তাঁবুতে পেতলের কড়াইয়ে আগুন জ্বলছিল। ঝুকভ হাতের দস্তানা খুলে আগুনের সামনে হাত মেলে রেখেছেন। ফিল্ড মার্শাল পাউলাসের সঙ্গে তিনি হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন, আগুনের আরো কাছে এসে দাঁড়ান, শরীর গরম হোক।

পাউলাস কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

ঝুকভ বললেন, গরম এক মগ সামরিক কফি কি দেব? কফি শীত কাটাতে সাহায্য করে। আপনি ক্ষুধার্ত?

পাউলাস হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নৈশভোজ সারব। আপনি ভাগ্যবান। আপনার জন্যে আমরা দু'বোতল জার্মান রেড ওয়াইন জোগাড় করতে পেরেছি। আমাদের যেমন ভদকা, আপনাদের তেমন রেড ওয়াইন। আমার খুব শখ বার্লিনে বসে আপনাদের রেড ওয়াইন খেয়ে দেখব। যেখানকার জিনিস সেখানে বসেই খাওয়া উচিত।

'মার্শাল ঝুকভের তাড়া খাইয়া জার্মানবাহিনী বার্লিনের উদ্দেশে ছুটিতেছে...'

এককড়ির দোকানে খবর পড়া হচ্ছে। আজ দু'টা পত্রিকা পড়া হবে। *কলিকাতা সমাচার* এবং *ঢাকা প্রকাশ*। যুদ্ধের খবর এক পত্রিকায় পড়ে মজা পাওয়া যায় না। শ্রোতারা আরো জানতে চায়। যুদ্ধের ফলাফল কী ? এখনো পরিষ্কার না। *ঢাকা প্রকাশ* লিখেছে— তুরুপের তাস এখনো হিটলারের হাতে। তুরুপের তাসটা কী তাও বোঝা যাচ্ছে না।

খবর পাঠক মাথা দুলিয়ে বলল, হিটলারের বিচি তো মাথায় উঠছে। এই বিচি আর নামব না। খবর পাঠকের নাম দেবু। সে গৌরাঙ্গের ভঙ্গিতে খবর পড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেরকম হচ্ছে না। পাখি উড়ে গেলে তার পালক পড়ে থাকে। গৌরাঙ্গ মারা গেছে কিন্তু তার খবর পাঠ রেখে গেছে।

এককড়ি বললেন, অসভ্য অশ্লীল কথা বলবা না।

এক শ্রোতা বলল, ঘটনা সত্য, বলতে অসুবিধা কী ?

এককড়ি বললেন, তুমি জানো ঘটনা সত্য ? যুদ্ধ তুমি করতেছ ? পুরাটাই হিটলারের কৌশল।

কী কৌশল ?

এমন ভাব করতেছে যে পরাজিত। রওনা দিয়েছে বার্লিনের দিকে। পিছনে পিছনে আসতেছে রুশরা। ফাঁদে পা দিয়েছে। জার্মান বিমান যখন ঝাঁপ দিয়া পড়ব তখন বুঝব।

ঘটনা এইরকম আপনেরে বলেছে কে ? হিটলার সাব তো আপনের সাথে পরামর্শ করে নাই।

হিটলারকে যে চিনে সে জানে ঘটনা এইরকম। হিটলার সাগু খাওয়া জিনিস না। অন্য জিনিস।

এইটা অবশ্য ঠিক।

হিটলার তো একলা না, তার সাথে আছে মুসৌলিনি। আরেক ধাইন্যা মরিচ। আছে জাপানিরা। জাপানিরা কী এখনো বুঝ নাই ? কলিকাতা খালি কইরা সব পালাইছে কোন সুখে ? জাপানিরা যখন বোমা ফেলতে শুরু করব আমরার বান্ধবপুর বাদ থাকব এরকম চিন্তা করবা না।

দর্শকরা আগ্রহ নিয়ে নড়েচড়ে বসল। দেবু বলল, একটা বিষয় কেউ বুঝতেছে না। মহাবিপদ আমরার সামনে।

এক শ্রোতা বলল, বুঝায়া বলো বিপদটা কী ?

জাপানিরা বার্মা দিয়া ঢুকবে চিটাগাং। সেখান থেকে ময়মনসিংহ-ঢাকা। ময়মনসিংহ-ঢাকা জয় হয়ে গেলে তারা রওনা দিবে কলিকাতা। বান্ধবপুরের উপর দিয়া যেতে হবে। এরা যেদিকে যায় ছারখার করে দিয়ে যায়। যুবক সব মেরে ফেলে। অল্পবয়স্ক মেয়ে সব নিজের দেশে চালান করে দেয়।

কেন ?

দেবু বিরক্ত হয়ে বলল, একেকটা প্রশ্ন এমন করেন! মেয়ে ধইরা নিয়া যাবে কেন বুঝেন না ? মা ডাকার জন্য নিবে না।

এককড়ি বললেন, বাজে আলাপ বন্ধ। কাগজ পড়। দেশের মেয়ে নিয়া যাওয়া সহজ না। নেতাজি স্বয়ং আছেন। নেতাজিও সাগু খাওয়া লোক না।

খবর পাঠ চলতে থাকে।

ভয়াবহ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এই চিন্তার মধ্যে কি কোনো আনন্দ আছে ? হয়তো আছে। খবর শুনতে আসা মানুষদের আনন্দিত মনে হয়। মানুষ বড়ই বিচিত্র জীব।

ধনু শেখও খবর শুনছেন। তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছে আতর। ধনু শেখ খাটে হেলান দিয়ে বসেছেন। পায়ের ওপর কম্বল চাপা দেয়া। হাতে তামাকের নল। চোখে চশমা। এমনিতে তিনি চশমা পরেন না। যখন খবর শুনতে বসেন তখন আয়োজন করে চশমা চোখে দেন। ধনু শেখের বাড়িতে যে কাগজ আসে তার নাম *যুদ্ধ সংবাদ*। সেখানে যুদ্ধের খবর ছাড়া আর কোনো খবর থাকে না। এই ভালো। যুদ্ধের খবর ছাড়া আর সব খবরই এখন গুরুত্বহীন।

খবর পড়া শেষ হয়েছে। আতর চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ধনু শেখ বললেন, একটু বসো। কথা আছে।

আতর বসল।

অনেক দিন ধরে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাস করব বলে ভেবেছি। জিজ্ঞাস করা হয় নাই।

জিজ্ঞাস করেন।

শরিফারে বাড়ি থেকে পালাবার ব্যবস্থা কি তুমি একাই করেছ ? না-কি আরো কেউ তোমার সঙ্গে ছিল ?

আমি একাই করেছি।

যে কাজটা করেছ তাতে শরিফার লাভ হয়েছে, না ক্ষতি হয়েছে ? ভালোমতো চিন্তা কইরা উত্তর দাও।

ক্ষতি হয়েছে।

অল্প ক্ষতি, না বড় ক্ষতি ?

বড় ক্ষতি।

এতে কী প্রমাণিত হয়েছে বলো ?

আতর চুপ করে আছে। সে বুঝতে পারছে না তার বাবা কী উত্তর শুনতে চাচ্ছেন। তিনি যে উত্তর শুনতে চাচ্ছেন সেই উত্তর ছাড়া অন্য কোনো উত্তরেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন না।

ধনু শেখ হুক্কার নলে লম্বা টান দিয়ে বললেন, এতে প্রমাণিত হয়েছে— 'নারী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'। ভবিষ্যতে আর কখনো নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবা না।

আচ্ছা।

এখন বলো আমারে তুমি কি অপছন্দ কর ?

করি।

অল্প অপছন্দ কর, না বেশি ?

বেশি।

ঘিন্না কর ?

হুঁ।

যারে ঘিন্না কর তারে সব সময় চোখের সামনে দেখা তো ভালো কথা না। কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার বিবাহ দিব। এক ছেলের পিতার সঙ্গে আগে কথা হয়েছিল। তাকে পত্র দিয়েছিলাম ছেলে এবং ছেলের পিতা যেন তোমাকে দেখে যায়। পত্রের উত্তর এসেছে। দুই-একদিনের মধ্যে তারা আসবে। সন্ধ্যাকালে 'কন্যা' দেখানো হবে। যদি পছন্দ হয় তাহলে বিবাহের দিন এবং কাবিন ধার্য হবে। এই বিষয়ে কিছু বলতে চাও।

না।

তোমার পাড়াবেড়ানি অভ্যাস আছে আমি জানি। আগামীকাল থাইকা যেন ঘরের বাইরে পা না যায়।

আচ্ছা।

যার সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা হয়েছে তার বিষয়ে কিছু জানতে চাও ?

না।

ধনু শেখ বললেন, জানতে না চাইলেও আমার জানানো কর্তব্য। ছেলের পারিবারিক অবস্থা ভালো না, তবে ছেলে উচ্চশিক্ষিত। এম.এ পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ হয় নাই। আবার দিবে। বুঝেছ ?

হুঁ।

গোটা বান্ধবপুরে এম. এ পরীক্ষা দেওয়া কেউ নাই, এটা খেয়াল রাখবা। ছেলের গাত্রবর্ণ কালো। তবে পুরুষমানুষের কালো গাত্রবর্ণ শুভ। ছেলের নাম শাহনেয়াজ। এখন সামনে থেকে বিদায় হও।

আমগাছের চারপাশে শিবশংকর ঘুরছে। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে অসুস্থ। গত রাতে তার জ্বর এসেছে। এখন জ্বর নেই, তবে মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। মাথা ফাঁকা লাগছে। জ্বর আসার আগে এরকম লাগে।

শিবশংকর ঠিক করেছে শরীর যখন ঠিক থাকবে, মন ভালো থাকবে, তখন সে clockwise ঘুরবে। আবার শরীর যখন খারাপ থাকবে, মনও ভালো থাকবে না, তখন ঘুরবে Anti clockwise. এখন সে এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে।

আতর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মাথায় ওড়না। ওড়নার রঙ গাঢ় হলুদ। তার পরনের শাড়ির রঙ নীল। সে শাড়ি দিয়ে মাথায় ঘোমটা দেয় নি। ওড়না দিয়ে দিয়েছে। আতর আজ একা আসে নি। হামিদাকে নিয়ে এসেছে। হামিদা যথারীতি বোরকা পরা। সে আতরের মাথায় ছাতা ধরে রেখেছে। হামিদার কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। আতর, হামিদাকে দাঁড়া করিয়ে এগিয়ে গেল। শিবশংকর বলল, আমি তোমার জন্য সুন্দর একটা নাম খুঁজে বের করেছি।

আতর নামটা কি সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর। কিন্তু তারচে'ও সুন্দর। নামটা বলব?

না। এখন পর্যন্ত আতর নামটাই আমার পছন্দ। যেদিন পছন্দ হবে না আপনার কাছ থেকে নতুন নাম নেব।

তোমার সঙ্গে বোরকা পরা উনি কে?

আমার পাহারাদার। আপনি কি আমার একটা কাজ করে দেবেন?

অবশ্যই। কী কাজ?

একটা চিঠি লিখে দিবেন? আমি একজনকে একটা চিঠি পাঠাব। জরুরি চিঠি। আজই পাঠাতে হবে।

তুমি তো লিখতে পার।

আমি চাই না যাকে চিঠি লিখব সে আমার হাতের লেখা দেখে আমাকে চিনে ফেলুক।

কাগজ-কলম তো আনি নাই।

কাগজ-কলম আমার সঙ্গে আছে। দিব?

দাও। আমার হাতের লেখা কিন্তু ভালো না। তবে বানান ভুল হবে না।

আতর হামিদার কাছ থেকে কাগজ এবং কলম এনে দিল। শিবশংকর চিঠি লিখতে বসেছে। আতর পাশে দাঁড়িয়ে।

শিবশংকর বলল, সম্বোধন কী লিখব?

আতর বলল, সম্বোধন লাগবে না। লিখেন—

> আমার খুব ইচ্ছা আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। এটা কি সম্ভব? যদি সম্ভব মনে করেন তবে বাড়ির সামনে একটা খুঁটি পুঁতবেন। খুঁটি দেখে বুঝব।
>
> আপনার চিরদিনের দাসী আতর

শিবশংকর বলল, দাসী লিখব কেন?

আতর বলল, আমার দাসী লিখতে ইচ্ছা করতেছে। দাসীর চেয়েও নিচে যদি কিছু থাকত তাই লিখতে বলতাম।

শিবশংকর বলল, যাকে তুমি এই চিঠি লিখছ সে যে কী খুশি হবে। কয়েকটা খুঁটি পুঁতবে।

আতর বলল, আমাকে বিয়ে করলে খুশি হবে কেন?

কারণ তুমি ভালো মেয়ে। দেখতেও সুন্দর। সবাই সুন্দর পছন্দ করে।

আপনি করেন?

না।

আপনি কী পছন্দ করেন?

বুদ্ধি।

আতর বলল, আচ্ছা যাই।

শিবশংকর বলল, চিঠিটা নিয়ে যাও। আতর বলল, চিঠিটা আপনার জন্যে। আতর ছোট ছোট পা ফেলে যাচ্ছে। সে একবারও পেছনে তাকাল না।

শিবশংকর চিঠি হাতে নিয়ে বসে আছে। তার মুখ ছাইবর্ণ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। যে জ্বর আসব আসব করছিল সে জ্বর এসে গেছে। চোখ জ্বালাপোড়া করছে। রোদের দিকে তাকাতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে যে-ই তাকে দেখছে সে-ই বুঝে ফেলছে ঘটনা কী। শিবশংকর চিঠিটাকে গুটি পাকিয়ে বলের মতো করেছে। সেই বল হাতের মুঠিতে লুকানো। চিঠিটা সে খুবই গোপন কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। এমন কোনো গোপন জায়গা যেন কেউ কোনোদিন খুঁজে না পায়। সে চিঠি নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হবে। গহীন জঙ্গলে ঢুকে পড়বে। বড় কোনো

গাছ খুঁজে বের করবে। বড় বড় গাছের কাণ্ডে কাঠবিড়ালি গর্ত তৈরি করে, চিঠিটা রাখতে হবে এমন কোনো গর্তে। কাঠবিড়ালির তৈরি করা গর্তে কখনো বৃষ্টির পানি ঢোকে না।

গোপীনাথ বল্লভ শিবশংকরের খোঁজে এসেছেন। তাঁর ছাত্রের শরীর ভালো না। এই অসুস্থ শরীরেও সে যেন কোথায় কোথায় ঘোরে। তিনি খবর পেয়েছেন শিবশংকর মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঢোকে। জঙ্গলে বুনো শূকরের উপদ্রব হয়েছে। দাঁতাল শূকর নমশুদ্র পাড়ার একজনকে দাঁত বসিয়ে জখম করেছে। গোপীনাথ বল্লভ বললেন, তুমি এখানে?

হুঁ।

কী কর?

কিছু করি না। একটু আগে হাঁটছিলাম, এখন বসে আছি।

তোমার জ্বর কি বেড়েছে? চোখমুখ লাল। চল বাড়িতে চল।

না।

এখানে বসে থাকবে?

এখানে বসেও থাকব না। আমি জঙ্গলে ঢুকব। জঙ্গলে আমার কিছু কাজ আছে। কাজ শেষ করে বাড়িতে যাব।

জঙ্গলে কী কাজ?

সেটা আপনাকে বলব না।

গোপীনাথ শিবশংকরের হাত ধরলেন। শিবশংকরের মনে হলো, তার হাতের চিঠি কেড়ে নিতে যাচ্ছে। সে এক ঝটকায় হাত সরাল। কঠিন গলায় বলল, আমার কাছে আসবেন না।

তোমার কাছে আসব না কেন?

আপনাকে নিষেধ করেছি এই জন্যে। এখন থেকে আমি আপনার কোনো কথা শুনব না। আপনি একজন মূর্খ। স্বাস্থ্যবিদ্যার কিছুই জানেন না। আয়ুর্বেদ চিকিৎসারও কিছু জানেন না।

তোমার হয়েছে কী?

শিবশংকর উঠে দাঁড়াল। গোপীনাথ চিন্তিত মুখে বললেন, যাও কই?

জঙ্গলে যাই। আপনি আমার পেছনে পেছনে আসবেন না। যদি আসেন আমি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করব।

আমার তো মনে হয় তোমাকে ভূত-পেত্নিতে ধরেছে।

শিবশংকর হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল। তার হাতের মুঠায় চিঠি। পেছনে পেছনে দৌড়ালেন গোপীনাথ। তবে তিনি শিবশংকরের নাগাল পেলেন না। সে গহীন জঙ্গলে ঢুকে গেল।

দুপুরের পর অনেক ঝামেলা করে তাকে উদ্ধার করা হলো। সে অনেক উঁচুতে একটা কড়ই গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে জ্বরের ঘোরে কাঁপছিল। বান্ধবপুরে ছড়িয়ে পড়ল মনিশংকরের ছেলে শিবশংকরকে ভূতে ধরেছে। ভূত তাকে কড়ই গাছের মাথায় নিয়ে তুলেছিল। ভূত নামানের জন্যে ভূতের ওঝা আনতে লোক ছুটল।

ধনু শেখের বাড়িতে কনে দেখার লোকজন উপস্থিত। দু'একদিনের মধ্যে তাদের আসার কথা, তারা আজই চলে এসেছে। আজ দিনটা না-কি বিশেষ শুভ। বর শাহনেয়াজ এসেছে। তার বাবা, বড় চাচা এবং এক মামা এসেছেন। তাদেরকে সমাদর করে বসানো হয়েছে। মুরুব্বিরা অপেক্ষা করছেন 'কন্যাসুন্দর আলো'র জন্য। এই আলোয় কুরূপা মেয়েকেও অপরূপ মনে হয়।

শাহনেয়াজ হালকা পাতলা গড়নের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের যুবক। লাজুক স্বভাবের। সহজে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। বেশির ভাগ সময়ই তার দৃষ্টি জানালার দিকে। জানালা দিয়ে বড় গাঙের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আতর যখন হামিদার হাত ধরে ঘরে ঢুকল তখনো শাহনেয়াজ জানালা দিয়ে তাকিয়ে।

আতরকে বেশ কিছু পরীক্ষা দিতে হলো। যেমন, গামলায় দু'পা ডুবিয়ে মেঝের ওপর হেঁটে যাওয়া পরীক্ষা। মেঝেতে পায়ের পাতার ছাপ কী রকম পড়ছে তা দেখাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। মেঝেতে ছাপ যত কম পড়বে তত ভালো। এরপর শুরু হলো সুতা পরীক্ষা। পায়ের কোনো আঙুল জোড়া কিনা তা সুতা ঢুকিয়ে দেখা।

ছাপ পরীক্ষার পর ধর্মজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা। যেমন, বেতরের নামাজের নিয়ত কী ? অজুর নিয়ত কী ?

ধর্ম পরীক্ষার পর সাধারণ বুদ্ধি পরীক্ষা। যেমন, একসের বেগুন ডুবাতে কত সের পানি লাগবে ?

সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার সময় শাহনেয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, আর কত ! বেগুন পানিতে ডুবানোর দরকার কী ?

প্রশ্নকর্তা শাহনেয়াজের চাচা। তিনি বললেন, দরকার আছে। তুমি যা বুঝ না তা নিয়া কথা বলবে না। মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা বলতে হয় আদবের সঙ্গে। তোমার মধ্যে আদবের অভাব দেখলাম। যাই হোক, মা আতর এখন বলো কোন জিনিস বিহনে খাদ্য প্রস্তুত হবে না ?

আতর বলল, আগুন।

হয় নাই। শশা লবণের ছিটা দিয়া খাওয়া যায়। আগুন লাগে না।

আতর বলল, লবণ ?

না, লবণ না। চিন্তা-ভাবনা করে বলো। যা মনে আসে তাই বলবা না।

শাহনেয়াজ বলল, চাচা, আপনিও চিন্তা-ভাবনা করে প্রশ্ন করেন। এইসব কী প্রশ্ন ?

শাহনেয়াজের বড় চাচা উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন গলায় বললেন, তোমার এই বেয়াদবি তো আমি নিব না। সবার সামনে অপমান করেছ। নিজেকে তুমি কী ভাবো ? তাকে বসানোর চেষ্টা করা হলো। সব চেষ্টাই বিফলে গেল। তিনি এই মুহূর্তেই নৌকা নিয়ে গ্রামে ফিরবেন। বিরাট হট্টগোল শুরু হলো। এই হট্টগোলের মধ্যে শাহনেয়াজ আতরকে স্পষ্ট গলায় বলল, মেয়ে দেখার নামে আমরা যে অপমান তোমাকে করেছি তার জন্যে কিছু মনে করো না।

ধনু শেখ শাহনেয়াজের বড় চাচাকে ফেরাবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর লোকজন গিয়ে পায়ে ধরে তাকে ফেরত আনল। গ্রামের মানুষজনের কাছে পায়ে ধরা অনেক বড় জিনিস।

বড় চাচার মাধ্যমেই জানা গেল যে, কন্যাকে সবারই অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। সুলক্ষণা কন্যা। এখন সবচে' ভালো হয় মাওলানা ডাকিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিলে। পছন্দ হবার পর বিয়ে ফেলে রাখতে হয় না। কন্যার ওপর জিনের নজর পড়ে। বিয়ে পড়ানো হয়ে গেলে জিন নজর দিতে পারে না। বিবাহিত মেয়েদের বিষয়ে জিনের কোনো আগ্রহ নাই।

শিবশংকরের ভূত নামানোর ওঝা চলে এসেছে। উঠানে আগুন করা হয়েছে। আগুনের সামনে জলচৌকিতে বসানো হয়েছে শিবশংকরকে। তার চোখ রক্তবর্ণ। মুখ দিয়ে বাচ্চাদের মতো লালা পড়ছে। আগুনে হলুদ পুড়তে দেয়া হয়েছে। ওঝা মন্ত্রপাঠ করছেন—

কালীঘাটে কালী মা
হায় আলি হায় ফাতেমা
পুবে গুনাই ঘট
রাখিলাম জঙ্গল পট
বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদস্ক শূলপানি। ইত্যাদি.....

মন্ত্রপড়া শেষ করে শুকনা মরিচপোড়া শিবশংকরের নাকের কাছে ধরা হলো। ওঝা কঠিন গলায় বললেন, তুই কে ? তোর নাম কী ? তুই থাকস কই ? না বললে বান মাইরা কী করব তার নাই ঠিক। বল কই থাকস ?

শিবশংকর গোঙাতে গোঙাতে বলল, গাছে থাকি।

তুই নারী না পুরুষ, এইটা বল। নারী ?

হুঁ।

ওঝা তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, যা ভেবেছিলাম তাই। পেতত্নিতে ধরেছে। জঙ্গলায় তিন চাইরটা পেতত্নি থাকে— সব কয়টা দুষ্টের সেরা। এই তোর নাম বল। নাম না বললে মরিচপুড়া নাকের ভিতর ঢুকায়ে দিব।

শিবশংকর বিড়বিড় করে নাম বলল।

পরিষ্কার করে বল। সবাই যেন শুনে, এইভাবে বল। তোর নাম কী ?

হরিদাসী।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কারণ অল্প কিছুদিন আগেই হরিদাসী মারা গেছে। তাকে শশ্মানে পুড়িয়ে তার ছাই পাঠানো হয়েছে গঙ্গায় ফেলার জন্যে। তার যে গতি হয় নাই, সে প্রেতযোনী প্রাপ্ত হয়েছে, এটা বান্ধবপুরের লোকজন জানত না।

আতর তার স্বামীর সঙ্গে বিশাল রেলিং দেয়া খাটের এক কোণে জড়সড় হয়ে আছে। মেঝেতে আতরের দাসী হামিদা বসে আছে। প্রথম বাসরের এই নিয়ম। স্বামী যেন স্ত্রীর খুব কাছে যেতে না পারে তার জন্যে পাহারার ব্যবস্থা। সারারাত সে এখানেই থাকবে।

শাহনেয়াজ নিচু গলায় বলল, আমি যে কবিতা লেখি এটা বোধহয় তুমি জানো না। আমার তিনটা কবিতা *সওগাত*-এ ছাপা হয়েছে। *সওগাত* পত্রিকার নাম শুনেছ ?

আতর না-সূচক মাথা নাড়ল।

বাংলা পড়তে পার ?

আতর হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শরৎ বাবুর উপন্যাস পড়েছ ?

আতর না-সূচক মাথা নাড়ল।

'আনোয়ারা' পড়েছ ?

আতর আবারো না-সূচক মাথা নাড়ল। শাহনেয়াজ বলল, এখন থেকে গল্প-উপন্যাস পড়বে। আমি জোগাড় করে দিব। সাহিত্যবোধ তৈরি না হলে আমার কবিতা বুঝতে পারবে না। এখন তোমাকে বিদ্যাসুন্দর পড়ে শোনাব। মন দিয়ে শোন, বুঝতে পার কি-না দেখ। বিদ্যার রূপ বর্ণনা পড়ব। বিদ্যা ছিল তোমার মতোই রূপবতী। তার রূপের বর্ণনা এবং তোমার রূপের বর্ণনা একই। বুঝেছ?

আতর আবার না-সূচক মাথা নাড়ল, তবে তার ধারণা সে মানুষটাকে বুঝতে পারছে। পাগলা ধরনের মানুষ। পাগলা না হলে বইখাতা নিয়ে কেউ স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে আসে না।

শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিতিবে যেই
পতি হবে সেই যে তাহার।
রাজাপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কী হবে ইহার ॥

শাহনেয়াজ মুগ্ধ হয়ে পড়ছে। আতর তাকিয়ে আছে। আতরের হঠাৎ মনে হলো তার জীবনটা মনে হয় সুখেই কাটবে। আজ ভোরেই সে শিবশংকরকে একটা চিঠি দিয়েছে, এই ভেবে এখন খারাপ লাগছে।

বই থেকে চোখ তুলে শাহনেয়াজ বলল, আতর।

জি।

কী পড়ছি বুঝতে পারছ তো?

পারছি।

লোচন অর্থ কী বলো? ওই যে লাইনটা—

বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল?

আতর বলল, লোচন অর্থ আমি জানি না।

লোচন হলো চক্ষু। লাইন দু'টার অর্থ হলো, বিধি যাকে চোখ দিয়েছেন সে যদি সেই চোখে না দেখে তাহলে চোখ দিয়ে লাভ কী? বুঝেছ?

জি।

বুঝতে না পারলে বলবে, আমি বুঝিয়ে দেব। হাসে কে? কে যেন হাসল।

হামিদা হাসে। আপনার কথা শুনে মজা পেয়ে হাসে।

শাহনেয়াজ বই থেকে চোখ তুলে মেঝেতে বসে থাকা হামিদার দিকে তাকাল। হামিদা মাথা নিচু করে প্রায় পুঁটলির মতো হয়ে গেল। শাহনেয়াজ বলল, প্রতিশব্দ বলে একটা বিষয় আছে। একই জিনিসের দু'টা তিনটা করে নাম। প্রতিশব্দ শিখতে হবে। কবিতা লেখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। বুঝেছ?

আতর বলল, কথাটা কারে বললেন?

শাহনেয়াজ বলল, তোমাকে বলেছি।

হামিদার দিকে তাকায়া বলেছেন তো, এই জন্যে ভাবলাম তাকে বলেছেন।

তোমাকেই বলেছি। এখন তুমি বলো দেখি 'দুপুর'-এর প্রতিশব্দ কী?

জানি না।

হুট করে জানি না বলবা না। চিন্তা-ভাবনা করবা। চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। আচ্ছা দেখি আমি কয়টা বলতে পারি।

শাহনেয়াজ চোখে থেকে চশমা খুলল। চোখ বন্ধ করে গড়গড় করে প্রতিশব্দ বলতে থাকল।

দুপুর
মধ্যাহ্ন
দ্বিপ্রহর
মাঝবেলা
দিবামধ্য
মধ্যদিন
যোহর

আতরের হাসি আসছে। সে হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে। শাহনেয়াজ বলল, এখন আসো রাতের প্রতিশব্দ কী জানো বলতে থাক। আতর অনেক ভেবেচিন্তে বলল, নিশা।

শাহনেয়াজ বলল, হয়েছে। আরো বলো।

আর পারব না। আপনি বলেন।

শাহনেয়াজ গড়গড় করে প্রতিশব্দ বলে যাচ্ছে—

রাত
রাতি
নিশীথ

রজনী
যামিনী
বিভাবরী
তামসী
ক্ষণদা
নক্ত
অসুরা
যামবতী

আতর খিলখিল করে হেসে ফেলল। শাহনেয়াজ বন্ধ চোখ খুলে বিরক্ত হয়ে বলল, হাসো কেন ?

আতর বলল, আপনার যা মনে আসতেছে আপনে বলতেছেন।

কী বললা তুমি ? আমি ডিকশনারি মুখস্থ করা লোক। ডিকশনারি মুখস্থ করতে গিয়ে প্রথমবার এম এ সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষায় ফেল করেছি।

ও আচ্ছা।

তোমাদের বাড়িতে কি ডিকশনারি আছে ?

না।

ডিকশনারি থাকলে তোমার কাছে পরীক্ষা দিতাম।

আতর বলল, পরীক্ষা দিতে হবে না। রাত অনেক হয়েছে, ঘুমাবেন না ?

শাহনেয়াজ বলল, রাতে আমি ঘুমাই না। যারা কবি-সাহিত্যিক তাদের জন্যে রাতের ঘুম হারাম। কবি-সাহিত্যিকরা রাতে চিন্তা-ভাবনা করেন। দিনে ভাব আসে না। ভাব আসে রাতে।

আপনি ঘুমান কখন ?

দিনে। বলতে গেলে সারাদিনই ঘুমাই। আতর, একটা কলম এনে দাও তো। দেখি কিছু লেখা যায় কি-না। তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখে রাখি। কবিতার নামটা মাথায় চলে আসছে— 'মানস প্রিয়া'। মানস প্রিয়া অর্থ কী বুঝেছ ? যে প্রিয়া মনে বাস করে।

আমি তো মনে বাস করি না। আমি বান্ধবপুরে বাস করি।

শাহনেয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, বান্ধবপুর কবির মনের বাইরের কোনো জায়গা না। এখন তুমি বলো মনের কী কী প্রতিশব্দ জানো।

আমি কেনোটাই জানি না। আপনি বলেন।

শাহনেয়াজ আগ্রহ নিয়ে প্রতিশব্দ বলছে। প্রতিশব্দ বলার সময় সে চোখ বন্ধ করে থাকে। কাজেই হামিদা ঘোমটা তুলে আতরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মন
চিত্ত
অন্তর
মানস
হৃদি
মর্ম
হিয়া
আঁত
দিল
পরান
অন্তকরণ
চিত্তপট
মনোমন্দির

শাহনেয়াজ চোখ মেলে বলল, আরো তিন চারটা আছে, এখন মনে পড়ছে না। এসব হচ্ছে চর্চার ব্যাপার। অভ্যাসের ব্যাপার। অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস। যাও কাগজ-কলম নিয়ে আস। না-কি তোমাদের বাড়িতে কাগজ-কলমের ব্যবহার নাই?

হামিদা কাগজ-কলম আনতে গেল। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে সে ফিরছে না। শাহনেয়াজ বলল, ব্যাপার কী?

আতর বলল, হামিদা ফিরবে না।

কেন?

তার বুদ্ধি বেশি এইজন্যে ফিরবে না।

এখানে বুদ্ধি বেশির কি আছে?

আতর বলল, সে ফিরবে না যাতে আপনি আমারে নিয়া ভাব ভালোবাসা করতে পারেন। খাট থেকে নামেন। দরজা বন্ধ করেন। বাতি নিভান।

কবি শাহনেয়াজ খাট থেকে নামতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আতর তাকে টেনে তুলল। আতরই দরজা বন্ধ করল, বাতি নেভাল।

শাহনেয়াজ বলল, তোমার নাম আতর না হয়ে 'হিয়া' হলে ভালো হতো।

কেন?

অনেক মিল পাওয়া যেত। আতরের সঙ্গে মিলে আতর কাতর পাথর। আর কিছু না। হিয়ার সঙ্গে অনেক কিছু মিলে যেমন—

হিয়া
প্রিয়া
নিয়া
দিয়া

আতর বলল, চুপ করেন তো।

শাহনেয়াজ বলল, বাতিটা একটু জ্বালাও। আমি অন্ধকারে থাকতে পারি না। ভয় লাগে।

কিসের ভয়?

ভূতের। আমাদের বাড়িতে তিন-চারটা ভূত আছে। এর মধ্যে একটা খুবই দুষ্ট। তোমাদের এই বাড়িতে কি ভূত আছে?

আতর হেসে ফেলল। শাহনেয়াজ বলল, রাতে হাসবা না। ভূত প্রেত রাতে হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়। চুম্বক যেমন লোহা টানে— মেয়েদের হাসি তেমন ভূত টানে। কই বাতি জ্বালাতে বললাম না?

আতর বাতি জ্বালালো। *

---

* 'মধ্যাহ্ন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছিলাম, মনিশংকরের পুত্র শিবশংকর পরিণত বয়সে মারা যান। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার এবং পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার। একটি ব্যাপার বলা হয় নি— তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁর Ph.D গবেষণাপত্র *An Introduction to Tantric Buddhism* তিনি উৎসর্গ করেছিলেন একজন মুসলমান কিশোরীকে। তার নাম আতর।

বড়গাঙ থেকে এক-দেড়শ' হাত দূরে নমশূদ্র পাড়া। বাঁশের খুঁটির ওপর ছনের ছাউনি। শুকানো কলাপাতা এবং চটের বেড়া। কৈবর্তরা থাকে উত্তরে। এদের বাড়িঘরের অবস্থা আরো শোচনীয়। বাড়িঘর নৌকার ছইয়ের মতো। এদের জীবিকা মূলত মাছধরা। শুকাতে দেয়া ছেঁড়া জাল দেখলেই এটা বোঝা যায়। কয়েক ঘর চামার এবং ঢুলি বাজারের কাছাকাছি থাকে। তাদের কারো ঘরেই চাল নেই। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করে এদের অভ্যাস আছে। খাদ্য সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব মেয়েরা পালন করে। জঙ্গল খুঁড়ে বনআলু নিয়ে আসে। কচুশাক সিদ্ধ খাদ্য হিসেবে অনেকদিন থেকেই চালু। কচুশাকের অভাব হয় নি। নমশুদ্রেরা আগে শামুক ঝিনুক খেত না। হাঁসের খাবার মানুষ কেন খাবে ? ইদানীং খাচ্ছে।

কৈবর্ত নরেশ পড়েছে বিপদে। তার মেয়ে লক্ষ্মী ভাত খাবে। সে না-কি স্বপ্নে দেখেছে, সোনার থালায় করে শিং মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। স্বপ্ন দেখার পর থেকেই তার মুখে ভাত ছাড়া অন্য কথা নেই। লক্ষ্মীর বয়স আট। নরেশের ন্যাওটা। সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে আছে। বাবা যেখানে যাবে সে সঙ্গে যাবে। লক্ষ্মী গত পাঁচদিন ধরেই ভাত খেতে চাচ্ছে। তার না-কি শুধু একবার ভাত খেলেই হবে। আর ভাত চাইবে না। সোনার থালা লাগবে না। কলাপাতায় দিলেই হবে। নরেশ বলেছে, তোরে বুধবারে ভাত খাওয়ামু যা।

নরেশের স্ত্রী বলেছে, বুধবারে ভাত কই পাইবেন ?

নরেশ বলেছে, সেটা আমার বিষয়।

আজ বুধবার। নরেশ মেয়েকে বলেছে, চল দেখি।

লক্ষ্মী বাবার হাত ধরে যাচ্ছে। তার চোখমুখ উজ্জ্বল। কতদিন সে ভাত খায় না। আজ ভাত খাবে ভাবতেই শরীর ঝিমঝিম করছে। মুখ লালায় ভর্তি হয়ে আসছে। লক্ষ্মী বলল, ভাত কী দিয়া খামু বাপজান ? শিং মাছ দিয়া ?

নরেশ বলল, ভাত এমন জিনিস যে ভাতের উপরে লবণ ছিটা দিয়া খাইলেও অমৃত। একটা কাঁচামরিচ যদি থাকে তাইলে তো কথাই নাই। এক নলা ভাত মুখে দিয়া কাঁচামরিচে কামুড়।

লক্ষ্মী বলল, দেশের ভাত কই গেছে বাপজান ?

নরেশ বলল, যুদ্ধের কারণে দেশে ভাত নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেই ভাত পাইবি। তখন কত ভাত খাইবি খা।

তখন আমি পুরা এক পাতিল ভাত খামু।

আচ্ছা যা খাবি।

যুদ্ধ শেষ হইব কবে ?

সময় ঘনায়া আসৃছে।

বাপজান, আমারে ঘাড়ে তোল।

নরেশ মেয়েকে ঘাড়ে উঠিয়ে নিল। লক্ষ্মীর মুখে হাসি। বাবার কাঁধে চড়তে তার এত ভালো লাগে। ইস্ সে যদি সারাজীবন বাবার ঘাড়ে বসে থাকতে পারত!

নরেশ মেয়েকে এককড়ির দোকানঘরের সামনে ঘাড় থেকে নামাল। এককড়ির এই দোকানঘরটা নতুন। আগের দু'টা ঘর আগুনে পুড়ে যাবার পর এই ঘর বানানো হয়েছে। এককড়ি ক্যাশবাক্সের সামনে বসে ছিলেন। নরেশ দোকানে ঢুকল না। ঢোকার নিয়ম নেই। যেহেতু কৈবর্তরা জল চল জাত না। তারা ঘরে ঢোকা মানে ঘরে রাখা সমস্ত পানি নষ্ট হওয়া।

কর্তা, একটা কথা ছিল।

এককড়ি বিরক্ত মুখে তাকালেন।

নরেশ হাতজোড় করে বলল, এক ছটাক চাউল দেন। মেয়েটা ভাত খাইতে চায়।

এককড়ি বললেন, দেশে কি চাউল আছে যে তোরে দিব ? আমি নিজে একবেলা রুটি খাই। গলা দিয়া রুটি নামে না। তারপরেও খাই।

মেয়েটারে বলেছিলাম বুধবার ভাত খাইতে দিব। একটা সপ্তাহ মেয়েটা অপেক্ষা করেছে। কর্তা, আমার বড়ই আদরের সন্তান।

এককড়ি বললেন, পুলাপান অবুঝ হইলে তারারে বুঝ দিতে হয়। তারে বুঝায়া বল যে দেশে চাউল নাই। আদর দিয়া নষ্ট করিস না। আদরে হয় বাঁদর।

নরেশ বলল, কর্তা, একটু ব্যবস্থা করেন।

আইজ তরে এক ছটাক চাউল দিলাম, কাইল আসব পঞ্চাশজন। তখন উপায় ? আমি কি কুবীর ? আমার কুবীরের ভাণ্ডার নাই। দোকানপাট গেছে আগুনে পুইড়া। মন্দির বানায়েছি। ট্যাকা গেছে জলের মতো।

নরেশ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, দোকানের কাউরে গিন্নিমার কাছে পাঠান। উনারে বললেই ভাত আসব। মেয়েটা দোকানের সামনে বইসা খাইব। নুনের ছিটা দিয়া চাইরটা ভাত।

এককড়ি জবাব দিলেন না। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খেরো খাতার হিসাব দেখতে লাগলেন। এককড়ি নিশ্চিত নরেশ ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করে চলে যাবে। এদের পেছনে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না।

লক্ষ্মী ফিসফিস করে বলল, ভাত কি দিব বাপজান?

নরেশ জোরগলায় বলল, অবশ্যই দিব। কর্তার ম্যালা কাজ আমি করছি। সাহায্য কোনোদিন চাই নাই। আইজ প্রথম চাইলাম। চল ছায়াতে বসি, আইজ রইদও পড়ছে কড়া।

পিতা-কন্যা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসা। এখান থেকে এককড়ির নতুন মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের চূড়া উঁচু হয়ে উঠে গেছে। চূড়ায় পিতলের ত্রিশূল। রোদে ঝকমক করছে। নরেশ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। বাবার দেখাদেখি লক্ষ্মীও করল। সব দেবদেবীকে তুষ্ট রাখা দরকার। দেবদেবীদের যে-কোনো একজন বিরূপ হলে মহাবিপদ।

ভাত মনে হয় আসবে। নরেশ দেখল এককড়ি তার দোকানের এক কর্মচারীকে নিচুগলায় কী যেন বললেন। সে দোকান থেকে বের হয়ে এককড়ির বাড়ির দিকে যাচ্ছে। নরেশ হৃষ্টচিত্তে বিড়ি ধরাল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাত আসতাছে। ভাতের জন্যে লোক গেছে।

লক্ষ্মী বলল, কলাপাতা কাইট্যা আনবা না?

নরেশ বলল, আগে ভাতটা আসুক। কলাপাতা কাটতে কতক্ষণ?

যে কর্মচারী দোকান থেকে বের হয়েছিল সে ফিরল দেড় ঘণ্টা পর। তার হাতে ভাতের গামলা নেই। হিসাবের কিছু খাতাপত্র।

নরেশ মেয়েকে নিয়ে উঠে পড়ল। তার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। ভয়ঙ্কর কিছু করতে ইচ্ছা করছে। ভয়ঙ্করটা কী বুঝতে পারছে না। সে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, চল বাড়িত যাই। ভাতের চিন্তা বাদ।

লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে বলল, আচ্ছা।

জগতে কাকতালীয় কিছু ব্যাপার সবসময় ঘটে। বিশ্বাসীরা এইসব ঘটনায় অলৌকিকত্ব আরোপ করতে পছন্দ করেন। একটা কাকতালীয় ঘটনা নরেশের জীবনে ঘটল। তার সঙ্গে দেখা হলো লাবুসের। লাবুস ছাতা মাথায় দিয়ে হনহন করে আসছিল।

নরেশকে দেখে ছাতা বন্ধ করে বলল, মেয়েটাকে নিয়ে চল আমার ঘরে। ভাত খাবে।

নরেশ ভাবল সে ভুল শুনছে। ভাতের চিন্তায় অস্থির হয়েছে বলেই ভাতের কথা শুনছে। নরেশ বলল, কর্তা কী কইলেন ?

লাবুস বলল, ভাত খেতে বলেছি। মুসলমানের ঘরে খেতে সমস্যা আছে ?

নরেশ কিছু বলার আগেই লক্ষ্মী বলল, সমস্যা নাই।

লাবুস বলল, মা, বাপের ঘাড় থেকে নামো। আমার হাত ধর। গল্প করতে করতে যাই।

ঘটনা যতটা কাকতালীয় মনে হচ্ছে ততটা না। এর মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব নেই। এককড়ির দোকানের সামনে এক নমশুদ্র ভাত খাবে বলে বসে আছে, এই খবর লাবুসকে দিয়েছে হাদিস উদ্দিন। সে বাজারে এসেছিল মশুর ডাল কিনতে। তখনি ঘটনা দেখেছে।

লাবুস বলল, ভাত কি দিয়েছে ?

হাদিস উদ্দিন বলল, জানি না। বাপ বেটিতে খুঁটি গাইড়া য্যামনে বসছে ভাত না দিয়া উপায় আছে ? লাবুস সঙ্গে সঙ্গেই ছাতা নিয়ে বের হয়েছে।

পিতা এবং কন্যা দু'জনকেই খাবার দেয়া হয়েছে। অ্যালমুনিয়ামের গামলাভর্তি ভাত। ভাতের উপর গাওয়া ঘি। একপাশে ডিমের সালুন। আলাদা বাটিতে ডাল। ঘিয়ের গন্ধে জায়গাটা ম ম করছে। নরেশ খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে বসে আছে। লাবুস বলল, নরেশ, তুমি খাবে না ?

নরেশ বলল, না কর্তা।

খাবার তো আছে। খাবে না কেন ?

লক্ষ্মীর মা পনেরোদিন ধইরা ভাত খায় না। তারে থুইয়া আমি খাব না।

লাবুস কিছু বলল না। লক্ষ্মী ডানহাতে ভাত খাচ্ছে, বামহাতে ডিমটা ধরে আছে। যেন কেউ হঠাৎ এসে ডিমটা নিয়ে যাবে। ডিম রক্ষা করা দরকার। নরেশ মেয়ের পিঠে হাত রেখে বলল, আস্তে আস্তে খাও গো মা।

সব আমি একলা খামু বাপজান ?

পারলে খাইবা। পারবা ?

হুঁ।

লাবুস বলল, নমশুদ্রপাড়ার সবারই কি তোমার মতো অবস্থা ?

জে কর্তা। ভাতের কষ্ট বিরাট কষ্ট।

লক্ষ্মী খাওয়া শেষ করেছে। সে সামান্যই খেতে পেরেছে। ডিমটা খায় নি। এখনো হাতে ধরা। সে জেদ ধরেছে গামলার সব ভাত বাড়িতে নিয়ে যাবে। নরেশ কঠিন গলায় বলেছে, না।

বিদায় নেবার সময় নরেশ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। লক্ষ্মী তার বাবার কাঁদার কারণ কিছুই বুঝতে পারছে না। সে তার ছোট ছোট হাতে বাবাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

সন্ধ্যাবেলা লাবুস হাদিসকে ডেকে পাঠাল। হাদিস যথারীতি জ্বলন্ত কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে হুক্কা এনে লাবুসের সামনে রাখল। সে নিশ্চিত কোনো এক বিশেষ দিনে ছোটকর্তা হুক্কায় টান দেবেন। কিছুই বলা যায় না সেই বিশেষ দিনটা আজই হতে পারে।

হাদিস উদ্দিন! আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি ব্যবস্থা কর।

অবশ্যই ব্যবস্থা করব। সিদ্ধান্তটা কী?

বড়গাঙের পাড়ে আমি একটা লঙ্গরখানা দিব।

কী দিবেন?

লঙ্গরখানা। সেখানে যারা খেতে পায় না তারা একবেলা ভরপেট খাবে।

ছোটকর্তা, পাগলের মতো এইসব কী বলতেছেন! কাঙালের গোষ্ঠী খাওয়ায়া আপনার লাভ কী?

হাদিস উদ্দিন, আমি তো ব্যবসায়ী না যে লাভ লোকসান দেখব।

মাগনার হোটেল চালু করবেন, দুনিয়ার কাঙাল ভিড় করব। কী জন্যে কাজটা করবেন?

লাবুস হাদিস উদ্দিনকে অবাক করে দিয়ে হুক্কার নল টেনে নিল। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে। আম্বুরী তামাকের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। লাবুস বলল, আমি যে হুক্কা খাচ্ছি তুমি দেখে আনন্দ পাচ্ছ না?

হাদিস উদ্দিন মুগ্ধ গলায় বলল, ছোটকর্তা, খুবই আনন্দ পাইতেছি। এই দেখেন আমার চউক্ষে পানি।

লাবুস বলল, ক্ষুধার্ত মানুষরা যখন আরাম করে খিচুড়ি খাবে, সেই দৃশ্য দেখে আমিও আনন্দ পাব। আনন্দে আমার চোখে পানি আসবে। এরচে' বড় কিছু আছে?

জে না। তামাক খায়া মজা পাইতেছেন?

পাচ্ছি।

আপনার জন্যে নেত্রকোনা থাইকা আরো ভালো তামাক আনায়ে দিব।

আচ্ছা।

একটা টান দিবেন বান্ধবপুর জুইড়া বাস ছাড়ব।

ভালো তো।

লাবুস হুক্কা টানছে। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে। হাদিস উদ্দিনের এই দৃশ্যটা দেখে এত ভালো লাগছে। যেন তার দীর্ঘদিনের সাধনা সফল হয়েছে। তার চোখে আবারো পানি এসে গেছে।

ধনু শেখ দুপুরের খাওয়া শেষ করেছেন। এখন একটা চমচম খেয়ে দুপুরের খাবারের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। পানদানিতে পান নিয়ে অপেক্ষা করছে সদরুল। পান মুখে দিয়ে তিনি বাংলাঘরে পাটি পেতে শুয়ে থাকবেন। সদরুল নরম হাতে পিঠে ইলিবিলি করে তাকে ঘুম পাড়াবে। এই সময় পাংখাবরদার সারাক্ষণ টানা পাখায় তাকে বাতাস দিবে। এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে পারবে না। থামা মানেই চাকরি শেষ। এর আগে দুইজনের এইভাবে চাকরি গেছে।

আতরের জন্যে ধনু শেখের মন মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। এই মন খারাপকে তিনি পাত্তা দেন না। মন ভালো করার নানান বুদ্ধি তাঁর কাছে আছে। তাছাড়া তাঁর মেয়ে ভালো আছে এবং সুখে আছে, এই খবর তিনি পেয়েছেন। মেয়েকে তিনি একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মেয়ে তার উত্তরে এক লাইন লিখেছে— 'আমি ভালো আছি।' এই যথেষ্ট। মেয়ে নিয়ে এত চিন্তার কিছু নাই। পৃথিবীতে চিন্তার অনেক বিষয় আছে।

গল্পগুজব করার জন্যে একজন কেউ থাকলে ভালো হতো। শরিফাকে তিনি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাকে কি আজ আবার আনাবেন ? শরিফার জবুথবু ভাব কেটে গেছে। রঙিলা বাড়ির শিক্ষা। সে এখন কথার পিঠে কথা বলা শিখেছে। গুনগুন করে গানও গায়। ধনু শেখ মোটামুটি বিস্মিত হয়ে বললেন, গান কবে শিখলা ?

শরিফা বলল, দিন তারিখের প্রয়োজন আছে ? গান শুনতে চাইলে বলেন, শুনায়া দিব।

গান ছাড়া আর কিছু শিখেছ ?

ভাব ভালোবাসা দিয়া অচেনা পুরুষের মন ভুলাইতে শিখেছি।

দেখি কেমন শিখেছ? আমারে দেখাও। আমার মন ভুলাও।

আপনেরে ভুলাইতে পারব না। আপনের মন নাই। আপনের আছে শরীর। তাও পুরাটা নাই। এক ঠ্যাং বাদ।

কটকটি ধরনের কথা। শুনতে খারাপ লাগে না। ধনু শেখ মাথা থেকে শরিফার বিষয় দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সারাক্ষণ এক 'নটিবেটি'র কথা ভাবলে দিন চলবে না।

পানের পিক ফেলতে ফেলতে ধনু শেখ বললেন, শুনলাম লাবুস বড়গাঙের পারে লঙ্গরখানা দিয়েছে?

সদরুল বলল, ঠিকই শুনছেন। বিরাট মচ্ছব বসছে। দুপুর থাইকা খিচুড়ি রান্ধা হয়। চাইরটার সময় খানা দেওয়া হয়। দুই লাইনে খাওয়া। পুরুষ একদিকে, মেয়েছেলে আর পুলাপান আরেকদিকে।

খাওয়ায় কী?

চাইলে ডাইলে খিচুড়ি। সঙ্গে সবজি থাকে। লাবুস সাব নিজেও সবের সাথে বইসা খান।

বলো কী?

উনি আগে থাইকাই শুনেছি একবেলা খান।

লঙ্গরখানায় লোক কেমন হয়?

দুনিয়ার মানুষ। আশেপাশে থাইকাও খবর পাইয়া আসতেছে। মিনি মাগনার খাওয়া।

হিন্দু-মুসলমান আলাদা?

না, একত্রেই খায়।

লাবুস এই লঙ্গরখানা কতদিন চালাইব?

অতি অল্পদিন। মানুষ যেভাবে আসতেছে রাজার রাজত্বও ফুরায়া যাবে।

ঘুম জড়ানো গলায় ধনু শেখ বললেন, এরে বলে পরের ধনে পোদ্দারি। একটা পয়সা লাবুসের নিজের রোজগার না। হরিচরণের পয়সা। উড়াইতাছে লাবুস।

সদরুল বলল, কথা সত্য।

ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, তুমি দশ বস্তা চাউল আইজ লঙ্গরখানায় পাঠায়া দিবা।

সদরুল ভুল শুনল কি-না বুঝতে পারল না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলালো না। ধনু শেখ চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। মনে হয় ঘুমে। সদরুলের কথা শুনে কাঁচাঘুম ভাঙলে বিরাট সমস্যা হবে।

ধনু শেখ শুধু একা যে সাহায্য পাঠালেন তা-না। বিশেষ এক জায়গা থেকে তিন হাজার টাকা চলে এলো। জায়গার নাম রঙিলা নটিবাড়ি। টাকা নিয়ে এসেছেন রঙিলা বাড়ির মালেকাইন নিজে। বোরকায় তার সারা শরীর ঢাকা। শুধু সুরমা পরা চোখ দেখা যায়।

মালেকাইন বললেন, পাপ মানুষের মধ্যে লেখা থাকে। টাকাতে পাপ লেখা থাকে না। আপনি কি আমাদের টাকা নিবেন?

লাবুস বলল, নিব।

শুনেছি এখানকার খিচুড়ি খুব ভালো হয়। আমার মেয়েগুলার খুব ইচ্ছা, একবার খিচুড়ি খায়।

আমি খিচুড়ি পাঠায়ে দিব।

মালেকাইন বললেন, আপনার অনেক মেহেরবানি। আমার মেয়েগুলি বলে দিয়েছে, তাদের সবার হয়ে যেন আমি আপনাকে প্রণাম করি।

লাবুস কিছু বলার আগেই মালেকাইন মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

লঙ্গরখানায় শ্রীনাথ খুব ঝামেলা করার চেষ্টা করছে। তার বক্তব্য, হিন্দু হয়ে যবনের খাদ্য খাওয়া মহাপাতক হওয়ার ব্যবস্থা। জাত শেষ।

নরেশ বলল, আমরা নমশুদ্র, আমরার আবার জাত কী?

শ্রীনাথ বলল, ইহকালের জাত না, পরকালের জাত।

পরকালেও জাত আছে জানতাম না তো।

এখন জানলা। রৌরব নরকে পুড়তে হবে খিয়াল রাখ।

নরেশ বলল, রৌরব নরকে আমরা একলা যাব না। আপনিও যাবেন। লাবুস সাহেবের বাড়িতে আপনি ম্যালা দিন ছিলেন। মুসলমানের খানা খেয়েছেন।

না জেনে কথা বলবা না। আমি স্বপাক খেয়েছি। নিজের রান্না নিজে রেঁধেছি।

এইখানেও তো একই ব্যবস্থা। নিজেদের রান্না আমরা নিজেরা রান্দি। ওই দেখেন। দেখছেন ? এখন বিদায় হন। আরেকবার যদি লঙ্গরখানায় আপনেরে দেখি তাইলে ঘটনা আছে।

কী ঘটনা ? কী করবা তুমি ?

নরেশ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, পাছা দিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি ঢুকায়া দিব।

শ্রীনাথ ঝাঁপিয়ে পড়ল নরেশের ওপর। কিল ঘুসি চড় থাপ্পড় চলতে থাকল। নরেশ চুপ করেই রইল। ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলা যায় না। নিচু জাতের কেউ ব্রাহ্মণের শরীরে হাত তোলা আর ভগবানের গায়ে হাত তোলা একই ব্যাপার। শ্রীনাথকে অনেক কষ্টে থামালেন মনিশংকর।

মনিশংকর ছেলেকে নিয়ে লঙ্গরখানা দেখতে এসেছিলেন। শিবশংকরকে নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। তার শরীর পুরোপুরি গেছে। মাথায়ও মনে হয় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। প্রায় দেখা যায় সে বাড়ির সামনে খুঁটি পুঁতে ঝিম ধরে বসে থাকে।

আজ তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে সুজিয়ে এনেছেন।

মনিশংকর লঙ্গরখানার কর্মকাণ্ড মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। শিবশংকর হঠাৎ শরীরের ক্লান্তি এবং অসুস্থতা ঝেড়ে ফেলল। তাকে দেখা গেল একটা কাগজ এবং পেনসিল নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘুরছে। মোট কতজন খাবে, তাদের মধ্যে কতজন শিশু, কতজন মহিলা, সব গুছিয়ে লিখছে। এই কাজটা সে কেন করছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে কাজটা করে সে যে আনন্দ পাচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে। মনিশংকর লাবুসকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গেলেন। তিনি তাকে গোপন কিছু কথা বলবেন।

মনিশংকর বললেন, আমি গত রাতে শেষপ্রহরে একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।

লাবুস তাকিয়ে আছে। স্বপ্ন নিয়ে তার সঙ্গে কী আলাপ তা সে বুঝতে পারছে না।

শিবশংকর বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি হরিচরণ বাবুকে। তিনি যেন ঘরে এসেছেন। আমি ঘুমাচ্ছিলাম। আমাকে জাগালেন। বিছানায় বসলেন। শিবশংকরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, ছেলের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তিনি বললেন, তাকে কাজে ব্যস্ত রাখ, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, কী কাজে ব্যস্ত রাখব ?

উনি বললেন, লঙ্গরখানার কাজ।

তখন ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি শিবশংকরকে নিয়ে এসেছি। তুমি তাকে কাজে লাগাও। সে খুব গোছানো ছেলে। যে কাজটা তাকে করতে দিবে সে গুছিয়ে করবে।

লাবুস হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মনিশংকর বললেন, তুমি যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছ তাতে জলের মতো টাকা যাওয়ার কথা। যাচ্ছে না ?

যাচ্ছে।

শিবশংকরের মা তার পিতৃধন হিসেবে কিছু টাকা পেয়েছিল। এই টাকাটা কলিকাতায় শিবশংকরের নামে জমা আছে। আমি টাকাটা আনিয়ে তোমাকে দিব। আমার অর্থ গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি নাই তো ?

জি-না। আপনি দুর্গা পূজা উপলক্ষে আমার মা'কে একটা লাল শাড়ি দিয়েছিলেন। মা কী যে খুশি হয়েছিলেন ! উনি শাড়িটা আমার গায়ে জড়ায়ে দিয়ে বলেছিলেন, কী সুন্দর শাড়ি, তুই একটু পরে দেখ।

তোমার মায়ের কোনো সন্ধান তোমার কাছে আছে ?

না।

মনিশংকর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, বাবা, একটা কথা মনে রাখবে। মায়ের গায়ে কোনো দোষ লাগে না। ছেলে কখনো মায়ের ত্রুটি দেখবে না। অন্যরা দেখলে দেখবে, সন্তান কখনো না। মনে থাকবে ?

থাকবে।

খাবার দেয়া শুরু হয়েছে। একটা খিচুড়ির গামলা শিবশংকরের হাতে। সে মহাউৎসাহে খিচুড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

লাবুস খেতে বসেছে। তার একপাশে মীরা, অন্যপাশে নরেশের মেয়ে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীর পাশে বসেছে ইমাম করিম। করিম বলল, এই মেয়ে, গতকাল দেখলাম বিসমিল্লাহ না বলে ভাত মুখে দিলা। আজকেও যদি ভুল হয় তাহলে কী যে করব তার নাই ঠিক।

লক্ষ্মী বলল, আমি তো হিন্দু।

হিন্দু হও আর যাই হও বিসমিল্লাহ বলবা।

যদি না বলি আপনে কী করবেন ?

করিম গম্ভীর গলায় বলল, আমি না খায়া উঠে যাব।

সত্যিই ?

অবশ্যই। আমি এককথার মানুষ।

লক্ষ্মী বলল, বিসমিল্লাহ্।

আঠারোজনের একটা নতুন দল এসেছে নিশাপুর থেকে। শিবশংকর তাদের কাছে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, পরিশ্রম করে এসেছেন, এক্ষুণি খেতে বসবেন না। হাত মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন। আগন্তুক দলের অতি বৃদ্ধ একজন বলল, বাবা, খাওয়া থাকব তো?

অবশ্যই থাকবে।

শুনেছি পাচক মুসলমান। মুসলমানের রান্না তো বাবা খাব না। আমি ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ পাচকের রান্নাও আছে। আপনার অসুবিধা হবে না।

যিনি খাওন দিচ্ছেন তাঁর জাত কী?

তাঁর মতো বড় ব্রাহ্মণ খুব কমই আছে।

বৃদ্ধের সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল, ঠাকুরে কিন্তু ভেজাল থাকে।

বৃদ্ধ বললেন, তা থাকে। তবে 'বিপদে নিয়ম নাস্তি'।

সবাই এই কথায় একমত হলো।

বৃদ্ধ বলল, তাইলে আর অসুবিধা কিছু দেখি না।

প্রায় দুইশ' মানুষ একসঙ্গে খাচ্ছে। লাবুস কিছুক্ষণের জন্যে খাওয়া বন্ধ করে চারদিক দেখল। একই সময়ে গভীর আনন্দ এবং গভীর বেদনায় তার হৃদয় পূর্ণ হলো। শুধু মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টি আবেগ ধারণ করা সম্ভব।

সনটা বলি। ১৯৪৩, জুন মাস। ভারতবর্ষ মানুষের তৈরি করা দুর্ভিক্ষে কাতর। গান্ধিজি আগা খান প্রাসাদে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে বন্দি। বাপুজিকে ছাড়াই চলছে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই হবে। ইংরেজ সরকার নির্বিকারে কংগ্রেস কর্মী গ্রেফতার করে জেলে ঢোকাচ্ছে।

কোলকাতার পথে পথে থালা হাতে নিরন্ন মানুষ। তাদের কাছে ভারত ছাড় আন্দোলন, স্বরাজ, স্বাধীনতা, সব অর্থহীন। তারা ভাত চায়, আর কিছু না। ভাত ভিক্ষা চাইতেও এখন তাদের সংকোচ। তারা ক্ষীণ গলায় বলে, একটু ফ্যান দিবেন মা-জননী?

এক মা তার কংকালসার শিশুকন্যা নিয়ে ডাস্টবিন ঘাঁটছেন। খাদ্য অনুসন্ধান। একটা নাদুসনুদুস কুকুর আগ্রহ নিয়ে এই দৃশ্য দেখছে। তাদের খাবারে ভাগ বসাতে আসা মানুষ দেখে সে অভ্যস্ত না। ডাস্টবিনে একটা কাক বসে আছে। সেও বিস্মিত হয়ে দৃশ্যটি দেখছে।

কোলকাতার পথেঘাটের অতি সাধারণ একটি দৃশ্য। এই সাধারণ দৃশ্যই এক তরুণ যুবক হাঁটু গেড়ে বসে আঁকছে। তরুণের ভরসা হাতে তৈরি কাগজ, পেন্সিল এবং কাঠকয়লা। তার কাঁধের ঝুলিতে চায়নিজ ইংকের কৌটা এবং তুলিও আছে। যুবকের হাতের টান স্পষ্ট এবং ঋজু। সে মুহূর্তের মধ্যেই দৃশ্যটা কাগজে নিয়ে এলো। যুবকের পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ বললেন, বাহ্ !

যুবক বলল, ছবি আপনার পছন্দ হয়েছে ?

বৃদ্ধ বলল, জি জনাব মাশাল্লাহ্।

বৃদ্ধকে আমরা চিনি। তিনি কোরানে হাফেজ মাওলানা ইদরিস। তার শরীর এখন কিছুটা সেরেছে। মাঝে মধ্যে তিনি কোলকাতা শহর দেখতে বের হন। বেশিদূর যান না, যমুনার বাড়ির আশেপাশেই থাকেন। এই শহর তাঁর পরিচিত না।

ইদরিস যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, জনাব, আপনার নাম ?

তরুণ বলল, আমার নাম জয়নুল আবেদিন।

মুসলমান ?

জি।

ইদরিস দুঃখিত গলায় বললেন, তাহলে তো জনাব বিরাট পাপ হয়েছে। যাদের জীবন আছে তাদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ।

জয়নুল আবেদিন কপালের ঘাম মুছলেন। আজ তীব্র গরম পড়েছে। ইদরিস বললেন, মহিলা এঁকেছেন তার জন্যে পাপ হবে। তার কোলের শিশুটার জন্যে পাপ হবে। কুকুর এবং কাক আঁকার জন্যে পাপ হবে। এদের জীবন আছে।

জয়নুল আবেদিন বললেন, সবচে' কম পাপ মনে হয় কাকটা আঁকার জন্য হবে। সবচে' ছোট প্রাণ।

আল্লাহপাকের কাছে প্রাণের কোনো ছোট বড় নাই। তার কাছে সব প্রাণ মূল্যবান।

আপনি মাওলানা ?

জি জনাব। আমি কোরানে হাফেজ। আমার নাম ইদরিস। একটা কাজে বগুড়া যাওয়া ধরেছিলাম। জমিদার শশাংক পালের কাজ। আল্লাহপাক আমাকে কলিকাতা নিয়ে এসেছেন। উনার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

জয়নুল বললেন, আপনি হাফেজ মানুষ। মনে হচ্ছে বিরাট মাওলানা। আপনার দাড়ি নাই কেন ?

মাওলানা ইদরিস লজ্জায় পড়ে গেলেন। লজ্জা এবং দুঃখ মেশানো গলায় বললেন, দাড়ি ছিল। শিয়ালদা ইস্টিশনে অসুখ হলো, তখন চুল দাড়ি সব পড়ে গেল। মনে হয় আমার কোনো পাপের শাস্তি।

আপনি পাপের শাস্তি ভয় পান। সারা দুপুর আমার ছবি আঁকা দেখেছেন, আপনার পাপ হয় নাই?

এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানা নাই। প্রাণীর ছবি অংকন করা পাপ। অংকন দেখা পাপ কি-না জানি না।

আগ্রহ করে ছবি আঁকা দেখলেন, এর কারণ কী?

চক্ষের নিমিষে এমন সুন্দর ছবি আঁকলেন। মন ভরে গেছে। মাশাল্লাহ।

এই ছবির কোনটা আপনার ভালো লেগেছে?

কাকটা।

জয়নুল বিস্মিত হয়ে বললেন, কাক! কেন?

ইদরিস বললেন, কাকটা দেখে মন হয় এক্ষণ উড়াল দিবে।

বাহ, ভালো বলেছেন তো!

ইদরিস ইতস্তত করে বললেন, জনাব, আরেকটা কাক কি আঁকবেন?

অবশ্যই। এই ছবিতেই আরেকটা কাক দিয়ে দেই। একটা উড়াল দেয়ার জন্যে তৈরি, আরেকটা তাকিয়ে আছে ডাস্টবিনের দিকে।

দেখতে দেখতে আরেকটা কাক তৈরি হলো। মাওলানা ইদরিস বললেন, সুবাহানাল্লাহ্। জনাব, কাক কীভাবে আঁকেন?

আপনি কি কাক আঁকা শিখতে চান?

জি জনাব।

জয়নুল বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

আমার একটা মেয়ে আছে, নাম মীরা। তারে কাক এঁকে দেখাব। সে খুশি হবে। পুলাপানরা এইসব জিনিস দেখলে খুশি হয়।

সত্যি সত্যি কাক আঁকা শিখতে চান?

জি জনাব। যদি আপনার তকলিফ না হয়।

জয়নুল ছবির খাতা বের করলেন। কাঠকয়লা বের করলেন। তিনি ছাত্রকে বসালেন তার পাশে।

মাওলানা সাহেব, কাকটা দেখতে পাচ্ছেন না?

জি জনাব।

এক কাজ করি, কাকের ঠোঁটটা এঁকে ফেলি। ঠোঁট তীক্ষ্ণ। একটু বাঁকা না?

জি।

দেখুন তো হয়েছে?

জি।

ঠোঁট হয়ে গেছে, এখন ঠোঁটের মাপে শরীর। ঠোঁট বড় শরীর ছোট হলে তো হবে না। এখন মনে মনে মাপটা ঠিক করে ফেলি। মাপ ঠিক করে লেজটা আঁকি। এখান থেকে শুরু করি লেজ। হবে না?

মাওলানা বললেন, না লেজটা বড় হয়ে যাবে।

ঠিক ধরেছেন। তার মানে আমি কী বলছি বুঝতে পারছেন। লেজটা একটু ছোট করে দিলাম। এখন আঁকব পাখা। কাকের পাখার রঙ কী?

কালো।

পুরোপুরি কালো না। দাঁড়কাক হয় কুচকুচে কালো। যেন চাইনিজ ইংক। এই কাকগুলোর কালোর সঙ্গে সামান্য সাদা আছে। আমি কালো দিয়েই আঁকব, তারপর ঘাড়ের কাছে রঙটা বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষে পাতলা করে দিব।

কাক আঁকা শেষ হয়েছে। জয়নুল পাতাটা ছিঁড়ে মাওলানার হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে যান।

ইদরিস বললেন, জনাব শুকরিয়া।

জয়নুল বললেন, পান খাবেন? আমি এখন জর্দা দিয়ে একটা পান খাব। পান সিগারেট খাবার বিরাট বদঅভ্যাস হয়েছে।

ইদরিস বলল, আগে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। একদিন মনে হলো, কী সর্বনাশ, আমাদের নবীজি তো পান খান না। তাঁর দেশে তো পান সুপারি নাই।

আপনি নবীভক্ত মানুষ?

জি।

আপনার মতো আরেকজন নবীভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনিও কোরানে হাফেজ। বিরাট কবি ছিলেন। শিরাজ নগরে ছিল তাঁর বাড়ি। আমার পছন্দের কবি। তাঁর কবিতার বইয়ের নাম 'দিওয়ান-ই-হাফিজ'। কবি হাফিজের নাম শুনেছেন?

জি-না। আমি বিরাট মূর্খ।

আমরা সবাই মূর্খ। বলেই জয়নুল ব্যাগ থেকে পানের কৌটা বের করে পান মুখে দিলেন। আয়োজন করে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, এখন আপনার পরীক্ষা।

কী পরীক্ষা ?

আপনি হচ্ছেন আমার জীবনের প্রথম ছাত্র। কাক আঁকা শিখিয়েছি। ছাত্র কাক আঁকতে পারল কি-না দেখব না ? ওই কাকটা দেখে দেখে একটা কাক আঁকুন। এই নিন কাগজ। এই যে কয়লা। কয়লাটা শক্ত করে ধরবেন। কয়লাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। কয়লা আপনাকে কামড়াবে না।

মাওলানা কোনোরকম অস্বস্তি ছাড়াই আঁকতে বসলেন।

আমি যদি পা দু'টা আগে আঁকি অসুবিধা আছে ?

না। পা যেহেতু কাকের মাঝখানে, পা দিয়ে শুরু করাই ভালো হবে। Proportion ঠিক করা সহজ হবে।

কী বললেন বুঝলাম না।

আপনাকে বুঝতে হবে না। আপনি ছবি আঁকুন।

মাওলানা কাক এঁকে শেষ করলেন। লজ্জিত চোখে তাকালেন তার তরুণ শিক্ষকের দিকে। জয়নুল বললেন, আপনার কি ধারণা হয়েছে ?

মাওলানা ক্ষীণ গলায় বললেন, হয়েছে।

জয়নুল বললেন, আমি আপনাকে দিলাম দশে আট। আমি ভালো শিক্ষক। ছাত্রকে ভালো নাম্বার দেই। কাকটার নিচে দশে আট লিখে জয়নুল নিজের নাম সই করলেন। করে বললেন, এই কাকটা আমি রেখে দেব। পরীক্ষার খাতা টিচারের কাছে থাকে এই নিয়ম। *

ইদরিস বাসায় ফিরলেন আনন্দ নিয়ে। তাঁর শরীর পুরোপুরি সারে নি। রাত করে জ্বর আসছে। শরীর কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর জ্বর। জ্বরের সময় তাঁর মনে হয় পৃথিবীর অতি শীতলতম স্থানে কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে। যে শীত দোজখের আগুনের চেয়েও ভয়াবহ। এটা কি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ? মৃত্যুর আগে আগে মানুষ কি শীতের জগতে প্রবেশ করে ? মৃত্যু কি চরম শৈত্য ? জ্বরের ঘোরে তিনি লম্বা সাদা টুপি পরা কিছু মানুষজন দেখেন। তাদের মাথার টুপি যেমন লম্বা তারাও লম্বা। তাদের সবার গায়ে ভারী কম্বল। সেই কম্বলের রঙও সাদা। তিনি যেমন শীতে কষ্ট পাচ্ছেন তারাও পাচ্ছে। লোকগুলি নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। ইদরিস তাদের কথা শুনতে পারেন না, তবে তারা যখন মুখ নাড়ে তখন তাদের মুখ দিয়ে সাদা কুয়াশার মতো বের হয়।

* ১৯৬০ কিংবা '৬৫-র দিকে জয়নুল আবেদিনের এই কাক এক ভক্ত অনেক টাকা দিয়ে মাদ্রিদে কিনে নিল। জয়নুলের নাম সই আছে। যে বিখ্যাত কাক বেচারা কিনল তা জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছিল না। (সূত্র : অসমর্থিত)

মাওলানা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলেন না। তাঁর লজ্জা লাগে। জ্বর বিকারে মানুষ অনেক কিছু দেখে, তা নিয়ে আলাপ করার কিছু নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে গোপালনগর স্কুলের একজন শিক্ষকের সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়। শিক্ষকের নাম বিভূতিভূষণ। ব্রাহ্মণ। পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শিক্ষক হঠাৎ হঠাৎ যমুনাদের বাড়িতে আসেন। তারাশংকর বাবুর সঙ্গে নানান বিষয়ে কথা বলেন। একসময় ভূতের গল্প শুরু করেন। তখন তারাশংকর বিরক্ত গলায় বলেন, আপনার মতো লেখক যদি ভূতপ্রেত নিয়ে থাকেন তাহলে কি হয়? সাহিত্য জীবননির্ভর। ভূতনির্ভর না।

বিভূতিভূষণ আলাভুলা ধরনের মানুষ। খাওয়াদাওয়ার গল্প করতে খুব পছন্দ করেন। একদিন ইদরিসকে বললেন, শিং মাছের ডিমের পাতুরি কখনো খেয়েছেন?

ইদরিস বললেন, জি-না জনাব।

একদিন খেয়ে দেখবেন। অসাধারণ। কীভাবে রাঁধবেন বলে দেই? খুব সহজ।

জি বলুন।

শিং মাছের ডিমের সঙ্গে সামান্য মসলা দেবেন। কাঁচামরিচ লাগবে। পিঁয়াজ দেবেন না। কলাপাতা দিয়ে ডিম মুড়ে ভাতের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। মনে থাকবে?

জি জনাব থাকবে।

কচ্ছপের ডিমের একটা রন্ধন প্রণালি আমার কাছে আছে। আপনাকে দেব?

জি-না জনাব। আমি মুসলমান। কচ্ছপ খাই না।

আপনি মুসলমান আমি জানি। আমাদের এলাকার অনেক মুসলমান কচ্ছপ খান বলেই বলেছি। কিছু মনে করবেন না।

কিছুই মনে করি নাই।

বিভূতিভূষণ বললেন, আপনাদের যেমন এক ঈশ্বরবাদ, আমাদেরও কিন্তু এক অর্থে তাই। বেদান্ত গ্রন্থে আছে 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' এর অর্থ— ব্রহ্মা এক, তিনি ব্যতীত আর উপাস্য কেউ নেই।

মাওলানা জ্বরের সময় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা এই জ্ঞানী মানুষকে বলেছেন। বিভূতিভূষণ বলেছেন, মৃত্যুর আগে আগে সমস্ত মানুষকেই তার মৃত্যুসংবাদ দেয়া হয়। কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না।

ইদরিস বললেন, এটা কি মৃত্যুসংবাদ?

বিভূতিভূষণ বললেন, হতে পারে। তবে আপনি ভয় পাবেন না। মৃত্যুর পরের জগৎ অতি আনন্দময়। সেই আনন্দ যে কী তা আমাদের ধারণা করা সম্ভব না।

শুধুই আনন্দ ? দুঃখ নাই ?

আমার মনে হয় নাই। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের কষ্ট দেবেন তা আমি মনে করি না। মৃত্যুর পর তিনি আমাদের তাঁর জগৎ, তাঁর সৃষ্টিরহস্য দেখার সুযোগ করে দেবেন। পরকাল নিয়ে আমার একটা লেখা আছে। নাম 'দেবযান'। আপনি কি পড়তে চান ?

ইদরিস বললেন, জি-না জনাব। গল্পকাহিনী আমার ভালো লাগে না। কাছাছুল আম্বিয়ার কাহিনী ভালো লাগে। অন্যকিছু ভালো লাগে না।

যমুনার কাছে 'দেবযান' বইটা আছে। যদি পড়তে ইচ্ছা করে পড়বেন।

জি আচ্ছা জনাব। তবে পড়তে ইচ্ছা করবে না।

বিভূতিভূষণ হেসে ফেললেন। *

---

* এই মহান ঔপন্যাসিক বান্ধবপুর এসেছিলেন। যথাসময়ে সেই গল্প করব। সেপ্টেম্বরের এক তারিখ ১৯৫১ সনে তিনি মারা যান। মৃত্যুর তিনদিন আগে তাঁর ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন সন্ধ্যাকাল। তিনি বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ দেখলেন একদল শ্মশানযাত্রী শব নিয়ে যাচ্ছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে তাকালেন এবং অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, যে শব নিয়ে যাচ্ছে সে আর কেউ না। তিনি নিজে। বিভূতিভূষণ এই দৃশ্য দেখেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তৃতীয়দিনের দিন মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মাওলানা ইদরিস গ্রামে ফিরছেন। তাঁর মন বিষণ্ন। বাড়ি ফেরার আনন্দ পাচ্ছেন না। যে কাজে বের হয়েছিলেন তা শেষ করতে পারেন নি। শশাংক পালের মেয়ে ললিতার খোঁজ বের করতে পারেন নি। যমুনা তাঁকে বগুড়া যেতে দেয় নি, তবে নিজে লোক পাঠিয়েছিল। সেই লোক বিফল হয়ে ফিরেছে।

ইদরিস লঞ্চঘাটায় নেমে হাঁটতে শুরু করেছেন। বৃষ্টি পড়ছে বলেই তাকে কেউ সেভাবে লক্ষ করছে না। তিনি তাতে খুব স্বস্তি বোধ করছেন। সারাজীবন পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি পরেছেন। আজ তাঁর পরনে হাফ হাতা, সাইড পকেটওয়ালা নীল রঙের সার্ট। কালো প্যান্ট। যমুনা তাকে একজোড়া চামড়ার কাবলি স্যান্ডেল কিনে দিয়েছে। কাদার মধ্যে বারবার স্যান্ডেল আটকে যাচ্ছে।

ইদরিসের মাথায় কংগ্রেসি টুপি। যমুনার স্বামী সুরেন এই টুপি তাকে পরিয়ে দিয়েছে। টুপির রঙ কটকটে হলুদ। একজন আগ্রহ করে নিজে মাথায় পরিয়ে দিয়েছে বলে খুলতেও পারছেন না। মাথার টুপি হবে সাদা কিংবা কালো। ইদরিসের হাতে গান্ধিজির লাঠির মতো একটা লাঠি। লাঠিতে ভর দিয়ে খানিকটা কুঁজো হয়ে তিনি লাবুসের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। অনেক পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি।

মীরা পুকুরঘাটে খেলছিল। পুকুরঘাটে আসা তার নিষেধ। আজ বাড়িতে কেউ নেই বলে সে চলে এসেছে। কয়লা দিয়ে ঘর কেটে এক্কাদোক্কা খেলছে। এই খেলাটা একটু অন্যরকম। চাড়া ফেলার সময় সুর করে ছড়া পড়তে হয়—

আমি সতী ভাগ্যবতী
আমি যাব স্বামীর বাড়ি
আমার স্বামীর নাই ঘর
আমারে নিয়া রওনা কর।

'আমারে নিয়া রওনা কর' বলেই চোখ বন্ধ করে উল্টোদিক ফিরে চাড়া ফেলতে হয়। মীরা তাই করল। তার অনুমানে ভুল হলো। চাড়া গিয়ে পড়ল

পুকুরে। চাড়াটা পানিতে ভাসছে। মীরা একধাপ পানিতে নামলেই চাড়া হাতে পাবে। সে সাবধানে একধাপ নিচে নামল। পানিতে ঢেউ ওঠায় চাড়া সামান্য সরে গেছে। তাকে আরো একধাপ নামতে হবে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। চাড়াটা তার পছন্দের। মীরা যখন ঠিক করল সে আরো একধাপ নামবে তখনি মাওলানা ইদরিস কাদায় মাখামাখি হওয়া পা ধুতে পুকুরঘাটে এলেন। মীরা তার দিকে তাকিয়ে টনটনে পরিষ্কার গলায় বলল, বাবা, তোমার দাড়ি গেল কই ?

মেয়ে রাম বলছে না। টর টর করে পরিষ্কার কথা বলছে। ইদরিসকে হতভম্ব করে মীরা বলল, বাবা, তোমার হাতের লাঠি কি সাপমারা লাঠি ? বাড়িতে হাদিস চাচা একটা সাপ মেরেছে, এক হাজার হাত লম্বা।

মাওলানা মেয়ের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। শিয়ালদা রেলস্টেশনে যখন পড়ে ছিলেন তখন এই মেয়ের সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তিনি কল্পনাও করেন নি। একসময় আল্লাহ্‌পাককে ডেকে বলেওছিলেন, হে গাফুরুর রহিম! মেয়েটাকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম।

মীরা বলল, বাবা, কাঁদো কেন ?

ইদরিস জবাব না দিয়ে পুকুরঘাটে শোকরানা নামাজ পড়ার জন্যে অজু করতে বসলেন। আল্লাহ্‌পাকের কাছে সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। যদিও বান্দার কৃতজ্ঞতায় বা অকৃতজ্ঞতায় তাঁর কিছুই যায় আসে না।

মীরা হাঁটুপানিতে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখছে। মাঝে মাঝে চাড়াটার দিকে তাকাচ্ছে। চাড়াটা বাতাস পেয়ে এখন তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে মনে হয় আরেক ধাপ নিচে নামতে হবে না।

নামাজ শেষ করেই মাওলানা কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে কাগজ এবং কয়লা বের করলেন। বৃষ্টি থেমে গেছে। পুকুরঘাটেই এখন কাক আঁকা যাবে। মেয়েটাকে মুগ্ধ করতে হবে।

মীরা চোখ বড় বড় করে বাবার কাণ্ড দেখছে।

কী কর বাবা ?

তাকায়া থাক। দেখ কী করি।

চিঠি লেখ ?

হুঁ।

কারে চিঠি লেখ ?

ইদরিসের কাক আঁকা শেষ হয়েছে। তিনি কাগজটা মেয়ের সামনে ধরলেন। মীরা চিৎকার দিয়ে বলল, ও আল্লা, কাউয়া!

মাওলানা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত 'কাউয়া' আঁকলেন। মীরার আনন্দের সীমা রইল না। একসময় সে বলল, বাবা, কাউয়া ছাড়া তুমি আর কিছু আঁকা জানো না?

না। একটাই আঁকতে শিখেছি।

কে তোমারে শিখায়েছে? আল্লাহ্।

ঠিকই ধরেছ। উনিই শিখায়েছেন, তবে অন্যের মাধ্যমে।

মাধ্যম কী?

মাওলানা বিপদে পড়লেন। মাধ্যম মেয়েকে বুঝাবেন কীভাবে? এত কথা সে কীভাবে বলে এটাও রহস্য।

বাবা, আরো কাউয়া বানাও।

মাওলানা মেয়ের আনন্দ দেখে অভিভূত হলেন। তিনি মনে মনে বললেন, আল্লাহপাক, তুমি আনন্দ তৈরির কারিগর। আমার মেয়েটার মনে তুমি যে আনন্দ তৈরি করেছ তার জন্যে তোমার পাক দরবারে শুকরিয়া।

মাওলানা ইদরিসের মতো আরেকজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরেই হাতজোড় করে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মূর্তির সামনে বসে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বলছেন, ঠাকুর, আমার পুত্র এখন সর্ব রোগব্যাধি থেকে মুক্ত। ঠাকুর, এই কাজ হরিচরণের মাধ্যমে তোমারই করা। আমার আনন্দের সীমা নাই।

তিনি ঠাকুরকে ফুল নিবেদন করলেন। তারপর শিবশংকরকে ডেকে পাঠালেন।

বাবা, তোমার শরীর কেমন?

শরীর ভালো।

সব সময় খেয়াল রাখবে ঋষি হরিচরণ তোমার দিকে লক্ষ রাখছেন। উনার নির্দেশমতো কাজ করায় আজ তুমি নীরোগ।

শিবশংকর বলল, স্বপ্ন কোনো বিষয় না বাবা। মানুষ যা ভাবে তাই স্বপ্ন দেখে। সারাক্ষণ তোমার মাথায় ঋষি হরিচরণ থাকে বলে তুমি উনাকে স্বপ্নে দেখ।

মূর্খের মতো অন্যায় কথা বলেছ। ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাও।

শিবশংকর বলল, আমি ঠাকুরদেবতা মানি না বাবা। আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। আমি স্বামীজির মতো নাস্তিক।

বিবেকানন্দ নাস্তিক?

হুঁ। উনি বলেছেন, 'যে ঈশ্বর ক্ষুধায় পৃথিবীর মানুষকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি পরকালে আমাদের পরম সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

মনিশংকর হতভম্ব গলায় বললেন, স্বামীজি এই কথা বলেছেন ? ভগবান রামকৃষ্ণের একনম্বর ভক্ত এই কথা বলেছেন ?

শিবশংকর বলল, বইয়ে লেখা আছে। আমার কাছে বই আছে, দেখাব ?

না, দেখাতে হবে না। আমি আগামী দুইদিন তোমার মুখ দর্শন করব না।

পুত্রের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে মনিশংকর ঠিক করলেন, আগামী দুই দিন তিনি নিরম্বু উপবাস করবেন। ঠাকুরঘর থেকে বের হবেন না। একমনে জপ করবেন—

পুত্রকে ক্ষমা কর ঠাকুর।
অবোধকে ক্ষমা কর।
নির্বোধকে ক্ষমা কর।
মূর্খকে ক্ষমা কর।

এককড়ি তাঁর নিজস্ব ঠাকুরঘরে বসে আছেন। সম্পূর্ণ নিজের আলাদা ঠাকুর থাকার আনন্দ এখন বোধ করছেন। তাঁর নিজের ঠাকুর এখন তাকেই দেখবেন, অন্যকে না।

আজ এককড়ির মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত। শ্রীনাথের কারণে বিক্ষিপ্ত। সে না-কি নমশুদ্রদের সাথে মারামারি করে এসেছে। কাজটা ভুল হয়েছে। ছোটজাতকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে হয়। ছোটজাতকে কখনো খেপিয়ে তুলতে নেই। এরা থাকে দলবদ্ধ। সব একসঙ্গে হলে বিরাট ঝামেলা করতে পারে। তাঁর চালের গুদাম লুট করতে পারে। আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। কিছুদিন আগে বাজারের দোকানে আগুন লাগল। এই আগুনের পেছনে নমশুদ্রের দল থাকতে পারে। ছোটলোকরা ধনবানদের দেখতে পারে না।

বান্ধবপুরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা যেটা হয়েছে তার পেছনে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আছে, এটা তার মনে হয় না। ঠিকমতো তদন্ত হলে সব বের হতো। তদন্ত ঠিকমতো হচ্ছে না। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ ময়মনসিংহ সদর থেকে এসপি সাহেব আসেন নাই। ইংরেজ এসপি এসে একটু হম্বিতম্বি করলে থলের বিড়াল বের হয়ে যেত। এসেছে কে ? ঘোড়ায় চড়ে কেন্দুয়া থানার ওসি। ওসি মুসলমান। নাম হায়দার। এককড়ির উঠানে বসে ডাব খেতে খেতে বলেছেন, এককড়ি বাবু, মসজিদটা পুড়ায়ে দিয়ে ভালো করেন নাই।

হতভম্ব এককড়ি বললেন, মসজিদ পুড়ায়ে দিয়েছি, এটা কী বললেন ?

ওসি সাহেব বললেন, মসজিদের ইমাম সাহেব মারা গিয়েছেন, সেটা বড় কথা না। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় মানুষ মরবেই। কিন্তু মসজিদ— ধর্মস্থান পুড়ায়ে দেয়া বিরাট গর্হিত কাজ হয়েছে। হিসাবে ভুল করেছেন।

এককড়ি হতাশ গলায় বললেন, আমি কী ভুল করলাম! মসজিদ আমি জ্বালায়ে দিব কোন দুঃখে ?

দারোগা সাহেব গম্ভীর ভঙ্গিতে গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আমাদের কাছে খবর আছে। থানাওয়ালাদের খুশি করার ব্যবস্থা করেন, দেখি কী করা যায়। আপনি ব্যবসায়ী মানুষ হয়ে হিসাবে কীভাবে ভুল করলেন বুঝলাম না।

এককড়ি থানাওয়ালাদের খুশি করার জন্যে পাঁচশ' টাকা দিলেন।

দারোগা সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, এই টাকা তো এসপি সাহেবকেই পাঠায়ে দিতে হবে। লালমুখ ইংরেজ সাহেব। পাঁচশ' টাকা হাজার টাকা ছাড়া তাদের সামনেই যাওয়া যায় না।

এককড়ি আরো পাঁচশ' দিলেন।

ঘটনা এইখানেই শেষ হবে বলে এককড়ির মনে হচ্ছে না। থানাওয়ালারা তাঁতের মাকুর মতো আসা-যাওয়া করতেই থাকবে। প্রতিবারই তাদের খুশি করতে হবে।

এককড়ি হাতজোড় অবস্থায় চোখ বন্ধ করে আছেন। মন কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করছেন। রাধাকৃষ্ণকে একমনে কিছুক্ষণ ডাকতে হবে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ স্তব, তারপর শ্রীরাধিকা স্তব পাঠ করতে হবে। অবিনাশ ঠাকুর দু'টি স্তবই লিখে দিয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্তব মুখস্থ হয়েছে। শ্রীরাধিকারটা এখনো হয় নি। এককড়ি স্তব শুরু করলেন—

> রক্ষ রক্ষ হরে মাং চ নিমগ্নং কামসাগরে
> দুষ্কীর্ত্তিজল পূর্ণে চ দুষ্পারে বহু সংকটে
> ভক্তি বিস্মৃতি বীজে চ বিপৎ সোপানদুস্তরে
> অতীব নির্মল জ্ঞান চক্ষুঃ প্রচ্ছন্নকারিনে...

খুট করে শব্দ হলো। এককড়ির ধ্যান ভঙ্গ হলো। শ্রীনাথ দরজা খুলে ঢুকেছে। এককড়ি বললেন, ধ্যানে যখন থাকি হুটহাট শব্দ কর, এটা কেমন কথা!

শ্রীনাথ বলল, আপনি ধ্যানে আছেন বুঝব ক্যামনে ? দরজা বন্ধ। তারচে' বড় কথা, সামান্য শব্দে যে ধ্যান ভাঙে সেই ধ্যান কোনো ধ্যানের মধ্যেই পড়ে না।

এককড়ি বললেন, তুমি অতিরিক্ত মাতব্বর হয়ে গেছ শ্রীনাথ। তালেবরের মতো কথা বলা শুরু করেছ। শুনেছি তুমি নমশুদ্রর সাথে মারামারি করেছ।

শ্রীনাথ বলল, নরেশ আমারে অপমান করেছিল, আমি তারে দুই চারটা থাপ্পড় দিয়েছি। এটা কোনো বিষয় না। শ্রীরামচন্দ্র কী করেছিলেন শুনেন— শম্বুক নামের এক শুদ্র 'রাম রাম' বলে উঠল। শুদ্রের মুখে রামনাম নিষিদ্ধ। কাজেই শ্রীরাম চন্দ্র নিজের হাতে শম্বুককে হত্যা করলেন।

এককড়ি বললেন, তুমি কি রামচন্দ্র ? তুমি রামচন্দ্র না। তুমি শ্রীনাথ। বিরাট চোর।

চোর ?

অবশ্যই চোর। তুমি লাবুসের বাড়ি থেকে কৃষ্ণমূর্তি চুরি কর নাই ?

করেছি। আপনার জন্যে করেছি। নিজের জন্যে করি নাই।

এককড়ি বললেন, আমার মন বলতেছে— নানান দুষ্কর্ম তুমি ভবিষ্যতে করবা এবং পরে বলবা— কাজটা আপনার জন্যে করেছি। কাজেই তুমি বিদায়।

কী বললেন ?

বললাম, বিদায়। আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে নাই।

আমি যাব কই ? খাব কী ?

তুমি রামচন্দ্ররে ডাক। উনি ব্যবস্থা করে দিবেন। এখন সামনে থেকে যাও।

এককড়ি ধ্যানে মন দিলেন—

হে নাথ করুণাসিন্ধু
দীনবন্ধু কৃপাং করো
ত্বং মহেশ মহাজাতা
দুঃস্বপ্নং মাং ন দর্শয়॥

শ্রীনাথ ধনু শেখের কাছে গিয়েছে। ধনু শেখ লঞ্চের জন্যে নতুন টিকেট বাবু নেবেন। কাজটা যদি পাওয়া যায়।

ধনু শেখ বললেন, অবশ্যই তোমারে চাকরি দিব। লঞ্চের টিকেট বাবুর জন্যে চতুর লোক লাগে। তোমার মতো চতুর তো সচরাচর পাওয়া যায় না। গরু-ছাগল পাওয়া যায়। নির্বোধ পাওয়া যায়। চতুর পাওয়া যায় না।

শ্রীনাথ বিড়বিড় করে বলল, বিরাট কষ্টে আছি। বলতে পারেন না খায়া আছি।

এককড়ি বললেন, না খায়া কেন থাকবা ? লাবুসের লঙ্গরখানা আছে না ? সেখানে ভর্তি হয়ে যাও। একবেলা ভরপেট খিচুড়ি।

শ্রীনাথ বলল, সেটা সম্ভব না। একটা চাকরি দেন— আমি বাকি জীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

বলেছি তো চাকরি দিব। একটা শর্ত আছে। কঠিন কিছু না।

শ্রীনাথ বলল, যে শর্ত দেন সেটাই মানব।

ধনু শেখ বললেন, আমি ঠিক করেছি স্বজাতি ছাড়া চাকরি দিব না। মুসলমান হয়ে যাবে। জটিল কিছু না। তিনবার কলিমা পড়লেই হবে।

শ্রীনাথ হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছে। এখন মনে হচ্ছে, এই আধাপাগল মানুষটার কাছে আসাই ভুল হয়েছে।

ধনু শেখ পান মুখে দিতে দিতে বললেন, কলিমা পড়ার পর তোমার 'ধন' কাটা হবে। সামান্য রক্তপাত, তবে অনেকের 'ধন' জন্ম থেকে কাটা থাকে। তাদের কাটা লাগে না।

শ্রীনাথ বলল, এইগুলা কী বলতেছেন ?

ধনু শেখ বললেন, ধুতি খুলে তোমার ধনটা আমারে দেখাও। আমি দেখলেই বলতে পারব তোমার কাটা লাগবে কি-না।

শ্রীনাথ দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ধনু শেখ মনের আনন্দে অনেকক্ষণ হাসলেন। একটা বয়সের পর সহজে আনন্দ পাওয়া যায় না। আনন্দ খুঁজে খুঁজে নিতে হয়। জগতে আনন্দই সত্য। আর সব মিথ্যা।

তিনি গোপনে একটা আন্দোলন শুরু করেছেন। এই আন্দোলনের নাম 'বান্ধবপুর ছাড়'। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ছোটটা। কায়দা করে এই অঞ্চল থেকে হিন্দু দূর করা। দেশ ভাগাভাগি হবে বোঝাই যাচ্ছে। বান্ধবপুর হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল।

ধনু শেখের মনে হচ্ছে গান্ধিজি যেমন জেল থেকে ছাড়া পেয়েই নিজগ্রামে ফিরে গেছেন, ঠিক সেরকম আরেক গান্ধিও বান্ধবপুরে এসেছে। তার নাম মাওলানা ইদরিস। চুল দাড়ি ফেলে হাতে লাঠি নিয়ে উপস্থিত। হাঁটছেও কুজো হয়ে। দিনরাত নাকি কাকের ছবি আঁকছে। কলিকাতা থেকে এই বিদ্যা নিয়ে এসেছে।

সদরুল।

কর্তা বলেন।

ঝিমায়া বইসা আছ কেন ? কিছু কর।

কী করতে বলেন ?

সব আমাকে বলা লাগবে কেন ? বুদ্ধি খাটায়া কিছু বের কর।

সদরুল বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বের করতে পারছে না। ধনু শেখ কী চাচ্ছেন বুঝতে পারছে না। গুরুত্বপূর্ণ কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে হতো। সে কারো সঙ্গে আলাপও করতে পারছে না। একবার ভাবল লাবুসের সঙ্গে আলাপ করবে। লাবুস মানুষটা শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ তা-না। ভালোমানুষও। ভালোমানুষের চিন্তা হবে ভালোমানুষের মতো। সেই চিন্তা কি ধনু শেখের পছন্দ হবে ?

শিবশংকর লঙ্গরখানা নিয়ে কঠিন পরিশ্রম করছে। জঙ্গল থেকে রান্নার খড়ি আনার মতো কাজও করছে। লাবুস তাকে বাধা দিচ্ছে না। মনিশংকর বলে দিয়েছেন,

ছেলে যা করতে চায় তাই যেন তাকে করতে দেয়া হয়। আমার ছেলের কোনো একটা বড় সমস্যা হয়েছে। কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকলে যদি সেই সমস্যাটা কাটে।

বাড়ির সামনে খুঁটি পুঁতে রাখার বিষয়েও তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। ছেলে উত্তর দিয়েছে, সেই উত্তরের কোনোই অর্থ হয় না।

বাবা, খুঁটি কেন পুঁতে রাখ ? আমাকে বলতে যদি অসুবিধা না থাকে তাহলে বলো।

আমাকে একজন পুঁততে বলেছে।

সে তোমার পরিচিত ?

হুঁ।

হিন্দু না মুসলমান ?

বাবা, আমার ধর্মে বিশ্বাস নাই। আমি হিন্দু-মুসলমান আলাদা করি না।

যে তোমাকে খুঁটি পুঁততে বলেছে সে ছেলে না মেয়ে ?

মেয়ে।

তোমার পরিচিত কেউ ?

হ্যাঁ।

জীবিত না মৃত ?

বাবা সে মৃত।

এটা কি ভৌতিক কোনো ব্যাপার ?

জানি না।

মনিশংকর হরিদ্বার থেকে রক্ষাকবচ এনে ছেলেকে পরিয়েছিলেন। একদিন দেখেন সেই রক্ষাকবচ খুঁটির মাথায় লাগানো। মনিশংকর ছেলেকে ডেকে বললেন, কাজটা কেন করেছ ?

শিবশংকর বলল, কবচে আমার বিশ্বাস নাই।

কিসে তোমার বিশ্বাস ?

কিসে বিশ্বাস সেটা আমি জানি। কিন্তু আপনাকে বলব না।

কেন বলবে না ?

কারণ আপনি বুঝতে পারবেন না।

মনিশংকর ঠিক করেছেন ছেলেকে বান্ধবপুর থেকে কোলকাতা নিয়ে যাবেন। জাপানিরা বোমা ফেললে ফেলবে। কী আর করা। বোমার চেয়েও জরুরি ছেলের চিকিৎসা। ছেলেকে বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ করতে হবে। তিনি এই মুহূর্তে কাজটা করছেন না, কারণ খুঁটি পুঁতার সমস্যা ছাড়া ছেলে ভালো আছে। বিপুল

উৎসাহে লঙ্গরখানার কাজ করে যাচ্ছে। ইমাম করিমের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। কাজকর্মের ফাঁকে দু'জনে নানান কথা বলে।

করিম তার মনের অতি গোপন পরিকল্পনার কথাও শিবশংকরকে বলেছে। তার পরামর্শ চেয়েছে।

করিম ফিসফিস করে বলেছে, তিনজন মানুষকে খুন করা ফরজ হয়ে গেছে। বুঝেছ, ফরজ হয়ে গেছে।

শিবশংকর বলল, ফরজ কী ?

করিম বলল, ফরজ হলো অবশ্য কর্তব্য। তিনজনের মধ্যে একজন হলো ধনু শেখ।

বাকি দু'জনের নাম বলবেন না ?

না। দেখি তুমি অনুমান করে বার করতে পার কি না।

তারা কি পুরুষ ?

একজন পুরুষ। আরেকজন মহিলা।

তাদের বয়স কত ?

ইমাম বলল, থাক বেশি চিন্তার দরকার নাই। আমি নাম বলতেছি। গোপন রাখবা। পুরুষের নাম লাবুস।

লাবুস ?

হুঁ। আর মেয়েটার নাম আতর।

আতর ? সে তো খুব ভালো মেয়ে।

ইমাম অবাক হয়ে বলল, আতরের কারণে আমার স্ত্রী থাকে নটিবাড়িতে। ভালো কীভাবে হয় ?

আতরকে কীভাবে খুন করবেন ? সে তো বান্ধবপুরে থাকে না। বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে থাকে।

করিম বলল, শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা বের করেছি, সেখানে যাব।

মানুষ খুন করবেন, আপনার পাপ হবে না ?

হবে না। আমি পাগল তো— পাগলের পাপ নাই।

আপনার কথাবার্তা তো পাগলের মতো না।

করিম বলল, কথাবার্তা পাগলের মতো না। কিন্তু হাসি পাগলের মতো। এই দেখ আমি হাসব— পাগলের হাসি।

করিম শরীর দুলিয়ে বিকট শব্দে হাসতে লাগল।

শিবশংকর বলল, পাগলের কি ধর্ম আছে ?

করিম বলল, না। পাগলের ধর্ম নাই। তার কাছে আল্লাহ্ ভগবান সব এক।

কিন্তু আপনি তো নামাজ পড়েন। পাঁচ বেলাই পড়েন। তার অর্থ আপনি পুরোপুরি পাগল হন নাই। কিছু বাকি আছে।

কথা খারাপ বলো নাই।

এখন খুন করলে বিরাট পাপ হবে।

তাও ঠিক।

শিবশংকর বলল, পুরাপুরি পাগল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করেন।

করিম বলল, এছাড়া উপায় কী?

শিবশংকর বলল, আতরের ঠিকানাটা আমাকে দিবেন?

তুমি ঠিকানা দিয়া কী করবা?

একটা চিঠি লিখব।

আচ্ছা ঠিকানা দিব, কোনো সমস্যা নাই। ঠিকানা তোমার কাছে থাকাই ভালো। আমি হারায়ে ফেলতে পারি।

শিবশংকর আতরকে চিঠি লিখেছে। চিঠিটা লিখেছে সংকেতে। তার ধারণা আতর সংকেত ধরতে পারবে। শিবশংকরের চিঠি—

A ১০০১২—দণ্ড—৩২০১—দণ্ড
৮৮৮৯—Pok—৫৫২—০১—N
MAGO TREE. ২১১—০০০
৬১১৯৩৭২ অ—আ—শ

আতর তার শ্বশুরবাড়িতে সুখেই আছে। তাদের বাড়িটা টিনের। বেশ বড় বাড়ি। বাড়ির পেছনে পুকুর। এই পুকুর মেয়েদের। মেয়েরাই শুধু সেখানে স্নান করবে, ধোয়া পাকলার কাজ করবে। পুরুষদের সেখানে যাওয়া নিষেধ। পুকুরের পেছনে ঘন বাঁশঝাড়। বাড়ির সামনে বড় উঠান। উঠানে কয়েকটা আমগাছ। একটা আমগাছে দোলনা টানানো। এই দোলনা কবি শাহনেয়াজের জন্যে। মাঝে মাঝে কবি সাহেব দোলনায় দোল খেতে খেতে কবিতা লিখতে পছন্দ করেন। এতে না-কি ছন্দের হিসাব রাখতে সুবিধা হয়।

আতরের দিন শুরু হয় তার শ্বশুর আব্দুল গনির গজগজানি দিয়ে। তিনি পুত্রকে দীর্ঘক্ষণ গালাগালি না করে তাঁর দিন শুরু করতে পারেন না। শাহনেয়াজ বাবার গালাগালি কিছুই শোনে না। কারণ সূর্য ওঠার পর পরই সে ঘুমাতে যায়। তার ঘুম ভাঙে দুপুরে। ঘুম ভাঙার পরপর দুপুরের খাবার খেয়ে আবার ঘুম। এই ঘুমের নাম ভাত ঘুম। ভাত ঘুম ভাঙে বিকালে। শাহনেয়াজ তখন গোসল সারে, দাঁত মাজে, ইস্ত্রি করা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে তার দিন শুরু করে।

শাহনেয়াজের বাবা আব্দুল গনি তাঁর দিন শুরু করেছেন। পুত্রকে নিয়ে গজগজানি শুরু হয়েছে— বিদ্বান গাধা এখন ঘুমে। বিদ্যার খেতায় আগুন। এমন বিদ্যার প্রয়োজন নাই। মূর্খ ভালো। টেকা পয়সা খরচ কইরা যে পুলারে বিদ্বান বানায় সে গাধা। তার বাপ গাধা। তার দাদা গাধা। তার চৌদ্দগুষ্ঠি গাধা। তার মাতুল বংশ গাধা। ইত্যাদি।

আতরের শাশুড়ি মোসাম্মত আমিনা বেগম নামাজ কালাম নিয়ে থাকেন। তার হাতে এক হাজার গুটির তসবি। একজন দাসী সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকে এবং তসবির একটা মাথা ধরে থাকে। এই তসবি এক পীরসাহেব তাকে দিয়েছেন।

আমিনা বেগম অবসর সময় বাড়ির পেছনে পুকুরঘাটে বসে থাকেন। তিনি যেখানে সেখানে ভূত দেখেন। ভূতের গল্প বলায় তার আগ্রহ সীমাহীন। শ্রোতা হিসাবে আতরকে পেয়ে তিনি খুশি। তিনি তাঁর ছেলের বউকে ভূতবিষয়ক শিক্ষায় পুরোপুরি শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই দায়িত্ব তিনি আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে পালন করছেন।

বৌমা শোন। ভূত পেতনি আর জিন কিন্তু এক না। ভূত পেতনি এক কিসিম, জিন আরেক কিসিম। জিনরার দেশ আছে। রাজত্ব আছে। রাজা আছে। ভূত পেতনির এইসব কিছু নাই। বুঝলা ঘটনা ?

জি আম্মা বুঝলাম।

ভূত পেতনি আবার দুই কিসিমের। শুকনার ভূত। এরা গাছে থাকে, মানুষের বাড়িঘরে থাকে। আরেক কিসিম হইল পাইন্যা ভূত। এরা থাকে পানিতে—খালে, বিলে, হাওরে। বুঝলা ঘটনা ?

জি আম্মা বুঝলাম। এই বাড়িতে কি ভূত আছে ?

অবশ্যই আছে। ভূত ছাড়া কি বাড়ি হয় ? তিন চাইরটা আছে, এর মধ্যে একটা বড়ই বজ্জাত— নাম 'হাম্বর'।

ভূতদের নাম থাকে ?

অবশ্যই থাকে।

আম্মা, 'হাম্বর' ছেলে না মেয়ে ?

ছেলে। সন্ধ্যাবেলা বাঁশঝাড়ের কাছে হাম্বর বলে ডাক দিও, দেখবা ঘটনা।

কী ঘটনা ?

বাতাস নাই কিছু নাই দেখবা সমানে বাঁশগাছ দুলতাছে।

মোসাম্মত আমিনা বেগম শুধু যে ভূতের গল্প করেন তা না—প্রতি অমাবশ্যায় ভূতদের উদ্দেশে ভোগ দেন। আস্ত গজার মাছ ভেজে বাঁশগাছের নিচে রেখে আসেন। গজার মাছ ভাজা ভূতপ্রেতের অতি পছন্দের খাবার। জিনরা আবার মাছ খায় না। তাদের পছন্দ ছানার মিষ্টি।

একদিন আতর বলল, আম্মা, গজার মাছ ভাজা দেওয়া ঠিক না। মাছ ভাজার লোভে অন্য ভূতরা চলে আসবে। বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে ভূত পেতনিতে।

আমিনা বেগম পুত্রবধূর অজ্ঞতায় খুব মজা পেলেন। তিনি বললেন, এক সীমানার ভূত অন্য সীমানায় যায় না। তাছাড়া হাম্বর আছে। হাম্বর কাউরে ধারে কাছে আসতে দিবে না।

হাম্বরকে কোনোদিন দেখেছেন?

বৌমা, এদের চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না। তারপরেও কয়েকবার দেখেছি। খুবই খাটো। পায়ের পাতা অনেক বড়। মুখের কাটা ছোট। পুতি পুতি দাঁত। ইঁন্দুরের দাঁতের মতো।

আমাকে একদিন দেখাবেন?

আচ্ছা যাও চেষ্টা নিব। দেখতে পাবা কি-না জানি না। সবাই দেখে না।

আমিনা বেগম চেষ্টা নিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা আতরকে বাঁশঝাড়ের কাছে নিয়ে গেছেন— হাম্বরের সঙ্গে আতরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। উঁচু গলায় বলেছেন, ঐ হাম্বর। বদের বাচ্চা কইরে? বউমারে নিয়া আসছি। ভালো কইরা দেখ। এর সাথে বজ্জাতি ফাইজলামি করবি না। ভয় দেখাবি না। নজর দিবি না। অন্য কোনো বদের বাচ্চা যেন নজর না দেয় সেইটাও দেখবি। তুই যে আমার কথা শুনছস তার প্রমাণ দে। বাঁশঝারে ঝাঁকি দে বদের বাচ্চা।

বাঁশঝাড় সত্যি সত্যি দুলে উঠল। আতর ভয়ে তার শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরল। আমিনা বেগম বড়ই তৃপ্তি লাভ করলেন। কেউ ভূতের ভয়ে অস্থির হলে তিনি খুব আনন্দ পান। তাঁর মনে হলো— ভালো বৌ পেয়েছেন। মাশাল্লাহ!

অল্প কিছু দিনেই আতর বুঝে ফেলেছে তার স্বামী একজন ব্যর্থ মানুষ। সে যে ব্যর্থ তা নিজে জানে না। ব্যর্থ মানুষরা ক্ষতিকর হয়, এই লোকটা তা না। সে বাস করে প্রবল ঘোরে। এই ঘোর কোনোদিন কাটবে তাও মনে হয় না।

শাহনেয়াজের বর্তমান কর্মকাণ্ড দুই ভাগে ভাগ করা। কাব্যচর্চা এবং মূর্খ স্ত্রীকে শিক্ষিত করা। আতরকে প্রতিদিন গল্প-উপন্যাস পড়তে হচ্ছে। শুধু পড়াতেই শেষ না, মৌখিক পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

যে উপন্যাস পড়ে শেষ করেছ, তার নাম কী?

নৌকাডুবি।

কে লিখেছেন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নায়কের নাম কী?

রমেশ।

নায়িকার নাম কী ?

সুশীলা।

পার্শ্বচরিত্রের নাম কী ?

আতর বলল, পার্শ্বচরিত্র কী জিনিস ?

শাহনেয়াজ বলল, যে নায়ক নায়িকা না, তবে তাদের আশেপাশের কেউ।

জানি না।

উপন্যাসটা তোমাকে আবার পড়তে হবে। কাগজ-কলম নিয়ে বসবে। যখনই কোনো নাম আসবে নাম লিখে ফেলবে।

আতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আতরকে তার স্বামীর কিছু কবিতাও মুখস্থ করতে দেয়া হয়েছে। একটি কবিতার নাম 'চাতকের অশ্রু'।

চাতকের অশ্রু

নিশি পথের পেয়েছি নিমন্ত্রণ
শুনেছি ক্রন্দন।
ব্যথিত চাতক কাঁদে দুলে উঠে বন।
উড়ে যায় পক্ষীগণ।
বহে বায়ু উত্তরী, শন শন শন।
উচাটন হয়েছে তাহাদের মন।
হইতেছে দুঃখের শোণিত ক্ষরণ।

কবিতা মুখস্থ করা ছাড়াও আতরকে যে কাজটি করতে হচ্ছে তা হলো সেজেগুজে কবির সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকা। কারণ কবি প্রচুর প্রেমের কবিতা লেখেন। সেই সময় 'প্রেরণাদাত্রী' লাগে। বসে থাকার সময় হাসা যাবে না। নড়াচড়াও করা যাবে না। এতে কবির মনসংযোগে সমস্যা হয়।

আতর শিবশংকরের চিঠি পেয়েছে। চিঠির অর্থ, কে এই চিঠি পাঠিয়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারে নি। সে চিঠি তার স্বামীকে দেখিয়েছে। তার বিদ্বান স্বামী চিঠির অর্থ সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছে। গম্ভীর গলায় বলেছে, এটা তাবিজ। কেউ একজন চিঠির মাধ্যমে তোমাকে তাবিজ করেছে।

তাবিজ কেন করেছে ?

তোমার আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়।

তাবিজ পানিতে ডুবিয়ে দিলে তার গুণ নষ্ট হয়। আয়োজন করে সেই তাবিজ পানিতে ডুবানো হলো। শাহনেয়াজ ঘোষণা করল, যেহেতু কেউ একজন তার

স্ত্রীকে তাবিজ করার চেষ্টা করছে, কাজেই সে স্ত্রীকে ফেলে কোলকাতা যাবে না এবং এবছর এমএ পরীক্ষা দেবে না।

আব্দুল গনি বলেছেন, ঠিক আছে দিস না। আগেও দুইবার ফেইল করছস, এইবারও করবি। লাভ কী ? পাস করলেও বিপদ। আরো বড় গাধা হবি।

শাহনেয়াজ বলল, বড় গাধা কেন হব ?

আব্দুল গনি হতাশ গলায় বললেন, ভুল বলেছি। বড় গাধা হবি না। তুই বড় গাধা হইয়াই জন্ম নিছস।

বাবার অপমানসূচক কথায় কবি সাহেবের কোনো ভাবান্তর হলো না। হালকা ধরনের কথাবার্তা শুনলে তার হবে না। সে জগতের মহৎ বিষয় অনুন্ধানে ব্যস্ত। তাছাড়া গতকাল রাত তিনটা একুশ মিনিটে তার মাথায় কবিতার একটা লাইন এসেছে। লাইনটা জেঁকে বসেছে। পিন আটকে যাওয়া রেকর্ডের মতো বেজে যাচ্ছে। লাইনটার ব্যবস্থা করা দরকার। লাইনটা হচ্ছে—

'সরবোরে নীল কমলিনি কাঁদে।'

নীল কমল কাঁদলে ঠিক ছিল। কিন্তু কমলের স্ত্রীলিঙ্গ 'কমলিনি' কেন মাথায় এসেছে তা কবি বুঝতে পারছে না।

রাত অনেক হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার। অসংখ্য তারা উঠেছে। পুকুরঘাটে বসে লাবুস তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তার চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। কী বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! মানুষের বাস তার ক্ষুদ্র এক গ্রহে। না জানি অন্য গ্রহগুলিতে কী আছে। কী তাদের রহস্য।

হাসনাহেনা ফুল ফুটেছে। বাতাসে ফুলের সৌরভ ভেসে আসছে। তারস্বরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। লাবুসের মনে হলো ফুলের সৌরভ, ঝিঁঝির ডাক বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না। বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এরাও একটা অংশ। এবং মোটেই তুচ্ছ না।

লাবুস।

মাওলানা ইদরিস এসে লাবুসের পাশে বসলেন। লাবুস তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বাড়িতে পা দেয়ার পর বাড়িটা হেসে উঠেছে।

ইদরিস বললেন, বাবা, তোমার কথা বুঝলাম না।

লাবুস বলল, কোনো কোনো মানুষ আছে যারা যেখানেই যান সেই জায়গা আনন্দে হেসে ওঠে। আবার উল্টাটাও হয়। কিছু মানুষের উপস্থিতিতে জায়গা কাঁদে।

বাবা, তোমার কথা কিছুই বুঝতেছি না।

লাবুস বলল, বুঝার দরকার নাই। আপনি যে কাজে গিয়েছিলেন সেই কাজ তো হয় নাই।

ঠিকই ধরেছ, কাজটা হয় নাই। তোমার অনেকগুলি টাকা নষ্ট করেছি। আমি শরমিন্দা।

আপনি যে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পেরেছেন এতেই আমি খুশি।

ফিরেছি ঠিকই, কিন্তু মনটা খারাপ। শশাংক পালের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারি নাই।

পূরণ হবে। আপনি যাকে খুঁজছেন সে খবর পাবে এবং একদিন ভরসন্ধ্যায় এই বাড়িতে সে উপস্থিত হবে।

ইদরিস তাকিয়ে আছেন। লাবুসের কোনো কথারই আগামাথা তিনি ধরতে পারছেন না। লাবুস বলল, মাঝে মাঝে আমি চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।

ইদরিস বললেন, মানুষকে এই ক্ষমতা আল্লাহপাক দেন নাই বাবা।

লাবুস চুপ করে রইল। একটা কথা বলতে গিয়েও বলল না। সে যে কথাটা বলতে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে, আপনি যে মেয়ের সন্ধানে গিয়েছিলেন তার নাম আপনি আমাকে বলেন নাই। কিন্তু আমি তার নাম জানি। তার নাম ললিতা। মাওলানা ইদরিসকে চমকে দেয়ার কোনো অর্থ নাই।

কলিকাতা শহর কেমন দেখলেন?

ভালো না। দমবন্ধ লাগে। তবে কয়েকজন অতি ভালোমানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এদের মধ্যে একজন স্কুল শিক্ষক। গোপালনগর স্কুল। বিভূতি বাবু।

লেখক?

হ্যাঁ লেখক। অনেক বই লিখেছেন।

উনিও এখানে আসবেন। আপনি তাঁকে তিনবটের মাথা দেখাতে নিয়ে যাবেন।

মাওলানা ইদরিস অবাক হয়ে বললেন, বিভূতি বাবুকে আমি তিনবটের মাথার কথা বলেছি। উনি সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে পছন্দ করেন। উনি বলেছেন আসবেন। তাঁর শরীর সামান্য খারাপ। শরীর সারলেই আসবেন।

হঠাৎ লাবুস পরিষ্কার দেখতে পেল, লেখক মানুষটা পুকুরঘাটের শ্বেতপাথরে বসে আছেন। মুগ্ধ গলায় নিজের লেখা পড়ে যাচ্ছেন।

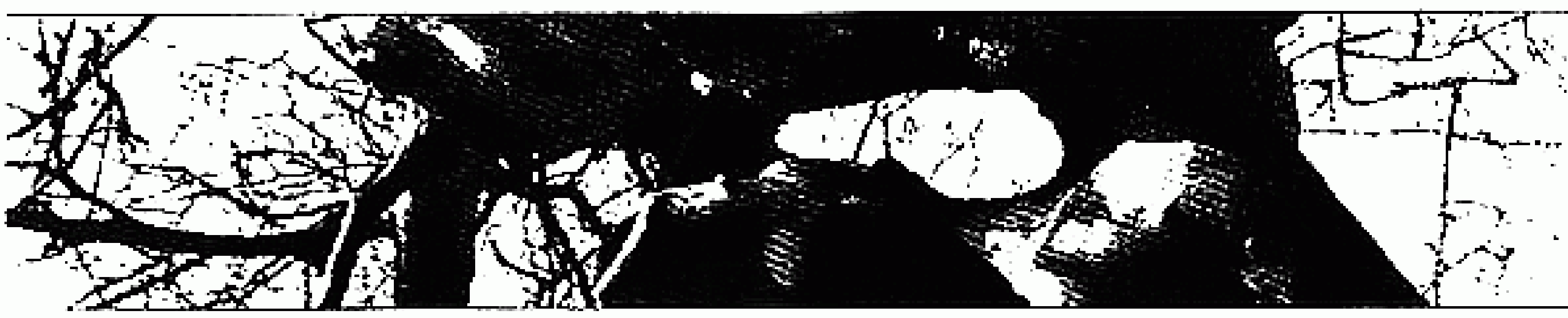

এককড়ির মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলে গলাছিলা বিকটদর্শন এক শকুন এসে বসেছে। সে আকাশের দিকে গলা লম্বা করছে, আবার গুটিয়ে আনছে। পাখা মেলে দিচ্ছে এবং বন্ধ করছে। তার চকচকে ক্রুদ্ধ লাল চোখ দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

মন্দিরচূড়ায় শকুন বসা বিরাট অলক্ষণ। মহাবিপদের অগ্রিম ইশারা। শকুন তাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঢিল ছোড়া হচ্ছে। গুলতিতে করে মার্বেল ছোড়া হচ্ছে। শকুন নির্বিকার। এইসব কর্মকাণ্ড সে মোটেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে না। কিছুক্ষণ খোল করতাল বাজানো হলো। শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে সে উড়ে গেল ঠিকই, আবার এসে বসল। এই দফায় দেখা গেল তার ঠোঁটে মাংস। কিসের মাংস কে জানে! মরা গরুর মাংস হলে সর্বনাশ। মন্দির অশুদ্ধ হয়ে যাবে। মন্দিরশুদ্ধি বিরাট আয়োজনের ব্যাপার।

এককড়ির উপদেশে বাঁশের আগায় খড় বেঁধে সেই খড়ে আগুন লাগিয়ে চেষ্টা শুরু হয়েছে। পশুপাখি আগুন ভয় পায়। এই শকুনটা যত হারামিই হোক আগুন দেখে অবশ্যই পালাবে। এককড়ি বললেন, আধঘণ্টা সময়, এর মধ্যে শকুন দূর করবা। প্রয়োজনে একজন কেউ মন্দিরের মাথায় উঠ। এতগুলি মানুষ একটা শকুন দূর করতে পার না, এটা কেমন কথা!

এককড়ি তার আড়তে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকল। মন অস্থির লাগছে। শকুন দূর না হওয়া পর্যন্ত অস্থিরতা কাটবে না। তাঁর ব্যক্তিগত মন্দিরে শকুন বসেছে, বিপদ যা হবার তার হবে। বিপদের কিছু সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। চালের দাম কমতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যে বোরো ফসল উঠবে। এইবার ফসল ভালো হয়েছে। ইংরেজ সরকার ঘোষণা দিয়েছে, যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই ভারতকে স্বাধীন করে দেয়া হবে। এটা আরেক যন্ত্রণা। ইংরেজ রাজার জাত। তারা যেভাবে রাজত্ব করেছে সেভাবে কে পারবে ? হিন্দু-মুসলমান কাটাকাটি করেই তো মরে যাবে।

এককড়ি শকুনের খবর নিল। শকুন এখনো যায় নাই। ঠিক হয়েছে একজন মন্দিরের চূড়ায় অলঙ্গা দিয়ে চেষ্টা করবে। অলঙ্গা সুপারিকাঠের বর্শা। বর্শাধারী

স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিচ্ছে। এককড়ি উঠে দাঁড়ালেন। ধনু শেখের সঙ্গে ব্যবসা বিষয়ে পরামর্শ করবেন। গুদামে রাখা চাল পার করতে ধনু শেখের সাহায্য লাগবে। একজন ব্যবসায়ী আরেকজনকে সাহায্য করে। এটাই নিয়ম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান থাকে না। এককড়ি ছোট্ট ভুল করে ফেলেছেন। সব চাল আগেই বিক্রি করে দেয়া উচিত ছিল। তবে সময় এখনো আছে।

ধনু শেখ যত্ন করে এককড়িকে বসিয়েছেন। পান-তামাক দেয়া হয়েছে। একজন গেছে মিষ্টি আনতে। মুসলমানের ঘরে দুগ্ধজাত খাদ্য ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করা যায় না। দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য সব অবস্থায় পবিত্র। ধনু শেখ বললেন, মসজিদটা ঠিক করে দিলা না? এক মাসের উপর হয়ে গেল জুম্মার নামাজ বন্ধ।

এককড়ি বিস্মিত হয়ে বলল, আমি কেন মসজিদ ঠিক করে দেব? এটা কেমন কথা?

ধনু শেখ তামাক টানতে টানতে বললেন, থানার দারোগা সাহেব তদন্তে পেয়েছেন— তুমি মসজিদ পোড়ানোর সাথে জড়িত। অনেকে সাক্ষী দিয়েছে। অনেকে আমার কাছে এসেও বলেছে। তোমার নিজের লোকই আমাকে বলে গেছে।

আমার নিজের লোক আপনাকে বলেছে? সে কে? তার নামটা বলেন।

শ্রীনাথ বলেছে। টিকেট বাবুর চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছিল। তখন বলল। আমি যদিও তার কথার একটা বর্ণ বিশ্বাস করি নাই।

এককড়ি হতভম্ব হয়ে গেল। কী ভয়ংকর কথা। ধনু শেখ বললেন, শ্রীনাথকে ডেকে জিজ্ঞাস কর। তবে সে কিছু স্বীকার পাবে বলে মনে হয় না। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এ ধরনের কথা যেন আর না বলে। মন্দ কথা লোকজন সহজে বিশ্বাস করে।

রাগে এককড়ির শরীর জ্বলে যাচ্ছে। শ্রীনাথের বিষয়ে এক্ষুনি ব্যবস্থা নিতে হবে। সে উঠে দাঁড়াল। ধনু শেখ বললেন, বসো, মিষ্টি আনতে গেছে। দুষ্ট লোকের কথায় এত অস্থির হলে চলে না। এককড়ি বসল। চাল বিক্রির বিষয়টা আলাপ করতে হবে। নৌকা করে এত চাল নেয়া যাবে না। ধনু শেখের লঞ্চের সাহায্য লাগবে।

এককড়ি বলল, আপনার কাছে একটা বিষয়ে সাহায্যের জন্যে এসেছি। সামান্য কিছু চাল কিনে রেখেছিলাম। বোরো ফসল উঠার আগে বিক্রি করে দিব। আপনার লঞ্চে করে চাল নিয়ে যাব কলিকাতা। কোনো সমস্যা আছে?

ধনু শেখ বললেন, কোনো সমস্যা নাই। তবে লোকজনের চোখের সামনে চালের বস্তা লঞ্চে তোলা ঠিক হবে না। নিশিরাতে তুলতে হবে।

অবশ্যই।

ধনু শেখ বললেন, চাল পচে যায় নাই তো ?

এককড়ি বিস্মিত হয়ে বলল, চাল পচবে কী জন্যে ?

লুকায়া রাখা চাল। আলো বাতাস পায় নাই। অনেকের এরকম হয়েছে। সিউরাম নামের এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর এক হাজার বস্তা চাল পচে গোবর হয়ে গেছে। সে এখন ন্যাংটা হয়ে পথে পথে ঘুরতেছে।

আপনাকে বলেছে কে ?

কাগজে পড়লাম। *ঢাকা প্রকাশে* ছাপা হয়েছে।

আমার চাল ঠিক আছে।

তুমি সাবধানী মানুষ। তোমার সমস্যা হবার কথা না। যাই হোক, চাল কখন পাচার করতে চাও বলো। আমার লঞ্চ তৈয়ার থাকবে।

'পাচার' বলতেছেন কেন ? আমি সৎভাবে চাল নিয়া যাব। বিক্রি করব। আমার মধ্যে দুইনম্বরি নাই।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। কথার কথা বলেছি।

এককড়ি বাড়ি ফিরেই গুদামের চাল পরীক্ষা করল। তাকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হলো। দু'টা গুদামের চাল টিনের। টিনের ফুটা দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকেছে। চাল পচে গেজে উঠেছে। তালাবন্ধ গুদাম কেউ খুলে নাই। এতবড় সর্বনাশ যে হয়ে গেছে তা বোঝা যায় নাই।

একজন এসে এককড়িকে জানাল যে, শকুন দূর হয়েছে। ত্রিশূলে আবার যেন এসে না বসে তার জন্যে বড়ই গাছের ডাল ভেঙে ত্রিশূলকে ঘিরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বড়ই কাটার জন্যে শকুন বসতে পারবে না।

বিপদ একা আসে না। সঙ্গী সাথী নিয়ে আসে। এককড়ি সন্ধ্যাবেলায় খবর পেল, কোলকাতায় তার দোকানটা লুট হয়েছে। এইখানেই শেষ না, তার নতুন খবরপাঠক দেবুকে টাকা ব্যাংকে জমা দিতে নেত্রকোনা পাঠানো হয়েছিল। সে টাকা জমা না দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এককড়ি সারারাত মন্দিরে বসে রইল। তার মধ্যে সে-রাতেই পাগলামির কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হলো। তার কাছে মনে হলো, ঠাকুর তাকে পছন্দ করেছেন এবং তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে তার নিম্নরূপ কথাবার্তা হলো—

ঠাকুর : কিরে মন বেশি খারাপ ?

এককড়ি : আমি ধনেপ্রাণে গেছি ঠাকুর।

ঠাকুর : ধনে গেছিস ঠিক আছে। প্রাণ তো আছে।

এককড়ি : ধন বিনা প্রাণ দিয়ে কী করব ঠাকুর ?

ঠাকুর : ধনের ব্যবস্থা করছি। আমি আছি না ? গুপ্তধনের ব্যবস্থা হবে। এক কলসি মোহর। হবে না ?

এককড়ি : হবে। কবে পাব ?

ঠাকুর : লাবুসের বাড়িতে যা। শিউলি গাছের আশেপাশে মাটিতে পোঁতা গুপ্তধন। খুঁড়ে বের কর।

এককড়ি : এখনি যাব ?

ঠাকুর : তোর ইচ্ছা। তবে এত তাড়াহুড়া কী ? আয় গল্প করি।

এককড়ি মাটি কাটার দু'জন কামলা এবং কোদাল নিয়ে ভোরবেলায় লাবুসের বাড়িতে উপস্থিত। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে একটা আলোচনা আছে।

লাবুস বলল, বলুন কী আলোচনা ?

এককড়ি বললেন, আমার যে মহাসর্বনাশ হয়েছে এই খবর কি পেয়েছ ?

কিছুটা শুনেছি।

আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে পাগল হয়ে গ্রামে বন্দরে ঘুরত। আমি বলেই এখনো ঠিক আছি। যাই হোক, মূল কথা এটা না। আমি একটা হাঁড়িতে কিছু সোনার মোহর ভরে তোমার ওই শিউলি গাছের গোড়ায় পুঁতে রেখেছিলাম।

ওইখানে কেন ?

গোপন করার জন্যেই অন্যের জায়গায় রেখেছি। হরিচরণ বাবু এই বিষয়ে জানতেন। আমার এখন মহাবিপদ। মোহরগুলি নিতে এসেছি। দু'টা মোহর তোমাকে আমি দিয়ে যাব।

লাবুস বলল, আমাকে কিছু দিতে হবে না। আপনার জিনিস আপনি নিয়ে যান।

ঠিক কোথায় পুঁতেছি এখন মনে নাই। অমাবশ্যার রাতে পুঁতেছি। দিক খেয়াল নাই। বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে।

করুন।

লাবুস, তুমি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তুমি না চাইলেও আমি তোমাকে দু'টা মোহর দিব। লঙ্গরখানার কাজে লাগবে।

লাবুস বলল, লঙ্গরখানা তো উঠায়ে দিয়েছি।

এককড়ি বললেন, দেশে আবার অভাব আসবে, তখন নতুন লঙ্গরখানা চালু করবা। অর্থের সব সময়ই প্রয়োজন। তাহলে খোঁড়া শুরু করি ?

করুন।

এককড়ি মহাউৎসাহে কাজ শুরু করলেন। রাতের দুশ্চিন্তার কিছুমাত্র এখন তাঁর চোখে-মুখে নাই। তাকে আনন্দিত এবং উৎফুল্ল লাগছে। তিনি পাটি বিছিয়ে বসেছেন। হাদিস উদ্দিন তার জন্যে বাজার থেকে ব্রাহ্মণের হুক্কা এনে দিয়েছে। এককড়ি হাদিস উদ্দিনের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, গুপ্তধন পাবার পরপরই হাদিস উদ্দিনকেও খুশি করবেন। তাকে সোনার মোহর দেয়ার কিছু নাই! টাকা-পয়সা কিছু দিয়ে দিবেন। তিনি হাদিস উদ্দিনকে গলা নিচু করে বলে দিয়েছেন, তুমি কামলা দু'জনের দিকে নজর রাখবা। কঠিন নজর। এরা যেন কিছু পাচার করতে না পারে।

ভাঙা হাঁড়ি, মাটির ঢাকনি জাতীয় জিনিস উঠে আসছে। আসল জিনিস এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। তবে অস্থির হবার কিছু নাই। ধৈর্য ধরতে হবে।

খোঁড়াখুঁড়ি দেখার জন্যে অনেকেই জড়ো হয়েছে। গুপ্তধন খোঁজা হচ্ছে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটায় এককড়ি খুবই বিরক্ত। তিনি ধমকাধমকিও করেছেন— লাভ হচ্ছে না।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি এবং খোঁড়াখুঁড়ির উত্তেজনায় দুপুরের দিকে এককড়ির ঝিমুনির মতো হলো। এই ঝিমুনির মধ্যেই তিনি ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখলেন। ঠাকুরকে লজ্জিত এবং দুঃখিত দেখাচ্ছিল।

এককড়ি! ছোট্ট ভুল হয়েছে রে।

কী ভুল?

জায়গা ভুল। গুপ্তধন পোঁতা আছে পুরনো কালীবাড়িতে, এখানে না।

কালীবাড়ির কোন জায়গায়?

যেখানে বলি দেয়া হয় ঠিক তার নিচে। হাঁড়িকাঠির নিচে। বেশি খুঁড়তে হবে না। ছয় সাত হাত।

মোহর কয়টা আছে জানেন?

না। তবে বাদশাহি মোহর।

কোন বাদশাহ? বাদশাহ জাহাঙ্গীর?

হুঁ। বাদশাহ জাহাঙ্গীর। আসল গিনি সোনার মোহর।

হাঁড়িটা কত বড় সেটা বলেন।

হাঁড়ি না। কলসি। মাঝারি সাইজের কলসি।

এককড়ি হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

মাটি কামলাদের নিয়ে বিদায় হবার আগে কানে কানে লাবুসকে বললেন, জিনিসটা কোথায় পুঁতেছিলাম ভুলে গেছি, এখন মনে পড়েছে। চলে যাচ্ছি, তবে তুমি নিশ্চিত থাক— তোমাকে একটা মোহর দিব। তোমার জায়গায় হলে দু'টাই দিতাম।

লাবুস বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা খারাপ। আপনি গোসল করে খাওয়াদাওয়া করুন। বিশ্রাম করুন।

জিনিসটা বাড়িতে নিয়া তারপর স্নান করে খাওয়াদাওয়া করব। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কার মোহর। এখন দর হবে তিনশ' টাকার উপর। হবে না?

জানি না, হতে পারে।

আচ্ছা আমি যাই। আমি কাজ শেষ করে কামলা দু'টাকে পাঠায়ে দিব। এরা গর্ত বন্ধ করে দিয়ে যাবে।

এককড়ি হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। নষ্ট করার মতো সময় তাঁর হাতে নাই। কালীবাড়ির হাঁড়িকাঠের নিচটা খুঁড়ে সাত-আট ফুট গর্ত করা হয়েছে। ভাঙা ইট এবং ভাঙা কলসি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় নি। সন্ধ্যাবেলা প্রবল জ্বর নিয়ে এককড়ি ফিরলেন। তাঁর দৃষ্টি এলোমেলো। চোখ রক্তবর্ণ। হাঁপানির টান উঠেছে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তারপরেও ফুসফুস ভরাতে পারছেন না।

জ্বর এসেছে মাওলানা ইদরিসেরও। বেশ ভালো জ্বর। তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। প্রায়ই জ্বরজ্বারি হচ্ছে। শরীর ভেঙে পড়েছে বলে তিনি অল্পতেই কাহিল হয়ে পড়েছেন। এই কাহিল অবস্থাতেও তাঁকে ছবি আঁকতে বসতে হয়েছে। মীরা মানছে না।

কাকের ছবি হলে কোনো সমস্যা ছিল না। দু'টা টান দিয়েই তিনি কাক আঁকতে পারেন। মীরা বলছে কাক আঁকলে হবে না, মীরাকে আঁকতে হবে। মানুষের ছবি আঁকা গুনাহর কাজ। আল্লাহপাক অপছন্দ করবেন। বাম কাঁধে বসে থাকা ফেরেশতা বদি লিখবে। কিন্তু তিনি মীরাকে মানাতে পারছেন না। সে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে বসে আছে।

মীরা শান্তভঙ্গিতে কোলে হাত রেখে বসে আছে। ইদরিস মীরার সামনে বসেছেন। ছবি আঁকার কাগজ মেঝেতে বিছানো। কাক আঁকা আর মানুষ আঁকা তো এক না। শুরু করবেন কোত্থেকে? চোখ থেকে শুরু করবেন। প্রথমে বাম চোখ। হিসাব করে ডান চোখ। তারপর ঠোঁট।

মাওলানা কয়লা হাতে নিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ্। বলেই মনটা খারাপ হলো, একটা নিষিদ্ধ কাজ তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করতে যাচ্ছেন! ভুলের উপর ভুল।

মীরা বলল, বাবা, শুরু কর।

ইদরিস তার কন্যার বাঁ চোখের মণির কালো অংশ এঁকে ফেললেন। এই চোখ চকচক করছে। চকচকে ভাবটা আনতে হবে। চোখের মণির কালো এখান থেকে একরকম লাগছে না। কোথাও বেশি কোথাও কম। চোখের মণি ঠিক করতে করতেই ডান চোখের মণির জায়গাটা একটা বিন্দু এঁকে ঠিক করলেন। তারপর ঠোঁটের জায়গাটা ঠিক করা হলো। এখন তাঁর মূল কাজ হচ্ছে, একটা চোখ আঁকতে আঁকতে মুখের অবয়বের জায়গাগুলি ঠিক করা।

মাওলানা আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন। তার সামনে এখন মীরা ছাড়া কিছু নেই। মীরা কয়েকবার ডাকল, বাবা! বাবা! মাওলানা জবাব দিলেন না।

ঠোঁট আঁকা হয়েছে। ঠোঁট হয়েছে হাসি হাসি। এটা তো ঠিক না, মীরার ঠোঁটে কান্নাভাব প্রবল। হাসিকে কান্নায় নিয়ে আসতে হলে কী করতে হয় তা তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি যে জানেন না এটাও ঠিক না। তাঁর মাথার ভেতরে কেউ একজন বসে আছে। সে জানে। সে অবশ্যই জানে।

আঁকা শেষ করে মাওলানা ছবিটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। আহারে, কী সুন্দর হয়েছে ছবিটা! একটা অবাক শিশু অভিমানে ঠোঁট বাঁকিয়ে বসে আছে। তার চোখে পানি নেই, কিন্তু চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে এক্ষুনি কাঁদবে।

মীরা বলল, বাবা, কাঁদছ কেন? ছবিটা তো সুন্দর।

এই জন্যেই কাঁদছি রে মা।

মাওলানা অজু করে নামাজ পড়তে বসলেন। 'তওবা ওস্তাগফেরুল্লাহ' বলে আল্লাহপাকের কাছে অন্যায় এই কাজের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। একটা অবোধ শিশুর মনতুষ্টির জন্যে এত বড় একটা অন্যায় কাজ তাকে করতে হয়েছে।

হাদিস উদ্দিন মীরার ছবি নিয়ে গেল লাবুসের কাছে। লাবুস হতভম্ব হয়ে বলল, একী!

হাদিস উদ্দিন বলল, মওলানা সাব এঁকেছেন।

লাবুস বলল, কী অবিশ্বাস্য কথা!

হাদিস উদ্দিন বলল, আমি ভাবছিলাম উনি কাউয়া ছাড়া কিছুই আঁকতে পারেন না। এখন দেখলেন অবস্থা!

লাবুস বলল, আমি এত সুন্দর এত জীবন্ত ছবি কোনোদিন দেখি নাই। দেখে কি মনে হয় জানো? ডাকলে মীরা উত্তর দিবে।

লাবুস সত্যি সত্যি ছবির দিকে তাকিয়ে ডাকল, মীরা। মীরা। এই পুষ্পরানি।

ধনু শেখ ডেকে পাঠিয়েছেন মাওলানা ইদরিসকে। তিনি জুম্মাঘর তৈরি করে দিয়েছেন। জুম্মাঘরের দায়িত্ব মাওলানাকে দিতে চাচ্ছেন। ইমাম করিমকে দায়িত্ব দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে এখন জুটেছে এককড়ির সঙ্গে। কোদাল নিয়ে সে এককড়ির সঙ্গে আছে। এককড়ি কোনো জায়গা দেখিয়ে দেয়া মাত্র কোদাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ধনু শেখ বললেন, মাওলানা, আপনার খবর কী?

জি জনাব। আমার খবর ভালো।

লোকে আপনাকে ডাকে কাউয়া মাওলানা। শুনলাম আপনার এখন একমাত্র কাজ কাউয়া আঁকা। ঘটনা কী?

ইদরিস জবাব দিলেন না। ধনু শেখ বললেন, কাউয়া কেন আঁকেন?

জনাব, মেয়েটারে খুশি করার জন্যে আঁকি।

কাউয়া একটা বদপাখি। ময়লা খায়। দেখতে অসুন্দর। তার ডাক অসুন্দর— কা কা কা। তারে আঁকার দরকার কী? দুনিয়াতে সুন্দর পাখির কি অভাব আছে? ময়ুর আছে, টিয়া আছে, কাকাতুয়া আছে। আছে কিনা বলেন?

জি জনাব আছে।

হাঁস মুরগিও তো সুন্দর। এদের মাংসও খাওয়া যায়। হাঁস মুরগিও তো আঁকতে পারেন।

ইদরিস চুপ করে আছেন। ধনু শেখের নির্দেশে সদরুল মাওলানার সামনে কাজল এবং পেনসিল রাখল। ধনু শেখ বললেন, দেখি একটা কাউয়া আঁকেন। সবাই আপনার কাউয়া আঁকা দেখেছে, আমি দেখি নাই। তাড়াতাড়ি আঁকেন। আমার হাতে সময় নাই।

মাওলানা আঁকলেন। ধনু শেখ বললেন, খারাপ না। দেখি এখন একটা মুরগি আঁকেন।

মাওলানা আঁকলেন।

মুরগির সাথে কয়েকটা বাচ্চা দিয়ে দেন। মায়ের পিছনে পিছনে বাচ্চা ঘুরছে।

মাওলানা আদেশ পালন করলেন।

ধনু শেখ বললেন, কার ভেতরে কী গুণ থাকে কেউ জানে না। আপনার ভিতরে যে এই গুণ ছিল কে ভেবেছে। যাই হোক, জুম্মাঘরের ইমামতি শুরু করেন। আইজ থাইকা শুরু। আছর ওয়াক্তে আজান দিয়া শুরু করেন।

মাওলানা বললেন, আমি বিরাট পাপী মানুষ। একজন পাপী মানুষ মসজিদের ইমাম হইতে পারে না। আমি প্রতিদিন পাপ করি। অবস্থা এমন হয়েছে যে পাপ ছাড়া থাকতে পারি না। আজকেও পাপ করেছি।

কী পাপ করেছেন?

ছবি এঁকেছি।

এটা কি পাপ?

জি জনাব পাপ।

তওবা করেন। তওবা করলেই তো পাপ শেষ। পাপ করবেন, তারপর আল্লাহ্‌পাকের কাছে তওবা করে পাপমুক্ত হবেন, আবার পাপ করবেন।

মাওলানা বললেন, এটা আল্লাহ্‌পাককে ফাঁকি দেওয়া। এই কাজ আমি করব না।

মসজিদের ইমামতি তাহলে করবেন না?

জি-না জনাব।

আপনি তো বেয়াদবও আছেন। আমার মুখের উপর 'না' বলা বিরাট বেয়াদবি।

আল্লাহ্‌পাকের কোনো হুকুমে না বলা বেয়াদবি এবং মহাগুনাহ্‌র কাজ। আপনাকে না বলা বেয়াদবি না। তারপরেও 'না' বলায় যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন আমি ক্ষমা চাই। মানুষের মনে কষ্ট দেয়া নিষেধ আছে।

ধনু শেখ বললেন, আপনি আমার সামনে থেকে যান। কাউয়াদের কাছে যান। তাদেরকে নিয়া কা কা করেন।

ইদরিস বের হয়ে এলেন। আসরের নামাজের পর বড়গাঙের পাড়ে বসলেন। হাতে কাগজ এবং পেনসিল। আজ তিনি গাছের ছবি আঁকবেন। গাছের ছবি আঁকাতে কোনো পাপ নেই। গাছ তো আর জীবজন্তু না। সন্ধ্যা নাগাদ ছবি শেষ হলো। প্রাণ, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যে ঝলমলে একটা লেবুগাছ। লেবু ফলে আছে। লেবু ফুল ফুটে আছে। ছবির দিকে তাকালে লেবু ফুলের গন্ধ নাকে লাগে।

মাওলানা বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। গাঙের পাড়েই মাগরেবের নামাজ শেষ করেছেন। নামাজে পুরোপুরি মন দিতে পারেন নি। দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল

আকাশের দিকে। সন্ধ্যার আকাশের কী সুন্দর রঙ। পেনসিল দিয়ে এই রঙ আনা যাবে না। রঙ তিনি পাবেন কোথায়? কাঁচাহলুদের রস থেকে হলুদ রঙ পাওয়া যাবে। সেগুন গাছের কচিপাতা বাটা থেকে লাল রঙ। নীল পাবেন কোথায়? সাদা কাপড়ে যে 'নীল' দেয়া হয় সেই নীল কি ব্যবহার করা যায়? আকাশে আছে সাদা মেঘের স্তূপ। সাদা রঙ হিসেবে চকখড়ি কেমন হবে?

মাওলানা সাহেব, আদাব

ইদরিস চমকে তাকালেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিলেন বলেই হঠাৎ মনে হয়েছে আকাশ থেকে কেউ একজন বলেছে, আদাব।

আদব বলেছেন এককড়ি। তিনি উবু হয়ে সড়কে বসে আছেন। সড়কের পাশেই গর্ত করা হচ্ছে। গর্ত করছে ইমাম করিম। ঠাকুর স্বপ্নে এককড়িকে দেখা দিয়ে বলছেন, ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বরাবর গর্ত করে যেতে। রাস্তার পাশেই আছে। ঠিক কোথায় তা বলা যাচ্ছে না।

ইদরিস বললেন, ভালো আছেন?

এককড়ি বললেন, সামান্য পেরেশানির মধ্যে আছি। তবে আজ পেরেশানির অবসান হবে। কলসি পাওয়া যাবে। আজ দিন শুভ। শুক্লা পঞ্চমী।

ইমাম করিম ঝপাঝপ কোদালের কোপ্ দিচ্ছে। তার সারা গা দিয়ে ঘাম পড়ছে।

টং করে শব্দ হলো। এককড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন, আস্তে আস্তে। কলসি যেন না ভাঙে।

কলসি না। ইটের টুকরায় কোদালের কোপ পড়েছে। এককড়ি তাতে হতাশ হলেন না। হতাশ নামের মানবিক বিষয়টি পাগলদের মধ্যে অনুপস্থিত। তারা বাস করে সম্পূর্ণ হতাশামুক্ত জগতে।

ইমাম করিম বলল, মাওলানা ঘরে যান। আমাদের কাজের অসুবিধা হইতেছে। দাঁড়ায়া দেখার কিছু নাই। জিনিস যখন পাব সবেই জানবেন। আমাদের মধ্যে লুকাছাপা কিছু নাই।

মাওলানা বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাঁর মন বিষণ্ন। তিনি খবর পেয়েছেন করিমের পাগলামি অনেক বেড়েছে। এখন সে রেগে গেলেই কোদাল নিয়ে তাড়া করে। দূরের কোনো শহর বন্দরে ছেড়ে দিয়ে আসা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সবার ধারণা করিমের মাথার যে অবস্থা দূরে ছেড়ে দিয়ে এলে সে পথ চিনে আসতে পারবে না।

অঞ্চলে একজন পাগল থাকা ভালো। এতে অঞ্চলের 'বরকত' হয়। কিন্তু বিপদজনক পাগল থাকা ভালো না। এরা কখন কী করবে তার ঠিক নেই। ইমাম করিম বিপদজনক পাগলের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কে বিপদজনক পাগল কে না তা ঠিক করে অঞ্চলের শিশুরা। তারা যখন কোনো পাগল দেখামাত্র বিপুল উৎসাহে তার দিকে ঢিল ছুড়তে শুরু করে তখন ধরেই নিতে হবে সে বিপদজনক পাগল।

বান্ধবপুরের শিশুরা ইমাম করিমকে দেখামাত্র ঢিল ছুড়ছে। এককড়িকে কিছু বলছে না।

সন্ধ্যার পরও খোঁড়াখুঁড়ি চলতে লাগল। এককড়ি আরো দু'জন কামলা নিয়ে এসেছে। রাতচুক্তি কামলা। সারারাত কাজ করবে। সূর্য ওঠার পর মজুরি নিয়ে বিদায় হবে। একটা হ্যাজাক লাইট জোগাড় করা হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। কেমন উৎসব উৎসব ভাব।

রঙিলা বাড়ি থেকে পালকি যাচ্ছে ধনু শেখের বাড়িতে। চার বেহারার পালকি। সঙ্গে একজন চরণদার। পালকিতে শরিফা। অনেকদিন পর আজ তার ডাক পড়েছে।

পালকি হ্যাজাক বাতির কাছে আসতেই শরিফা বলল, থামেন।

পালকি থামল।

শরিফা চরণদারকে বলল, ইমাম করিম সাহেবরে একটু কাছে আসতে বলেন। আমি তারে দুইটা কথা বলতে চাই।

এককড়ি বললেন, পালকিতে কে যায়?

চরণদার বলল, রঙিলা বাড়ির কইন্যা যায়।

খাড়াইলা কেন? কাজের মধ্যে ঝামেলা। চইল্যা যাও।

চরণদার বলল, সামান্য কাজ আছে। কাজ শেষ হলে চলে যাব।

সে করিমের কাছে গেল। করিম কোনো আপত্তি ছাড়াই পালকির পাশে এসে দাঁড়াল।

শরিফা বলল, ভালো আছেন?

করিম বলল, ভালো আছি।

শরিফা বলল, আপনি আমারে দেখতে পাইতেছেন না। আমি দেখতেছি। আপনার শরীর ভালো না। লোকে বলে আপনার না-কি মাথাও নষ্ট হয়েছে।

হুঁ।

আপনি কি আমাকে চিনেছেন ?

হুঁ।

বলেন, আমি কে ?

তুমি শরিফা।

এখন আমি শরিফা না। আমি রঙিলা বাড়ির নটি। আমার নাম—ফুলকুমারী। নাম সুন্দর না ?

হুঁ।

এককড়ি ধমক দিল, কাজকাম ফালায়া কী শুরু করলা ?

করিম কোদাল হাতে নেমে গেল। শরিফার পালকিও চলতে শুরু করল। বেহারারা হুম হাম শব্দ করছে। তারা নিঃশব্দ হলে শরিফার কান্নার শব্দ শুনতে পেত।

ধনু শেখের শরীর খারাপ করেছে। মাথায় যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব। শরীরে চুলকানিও হয়েছে। কিছুক্ষণ চুলকালেই জায়গাটা ফুলে লাল হয়ে যাচ্ছে। সতীশ কবিরাজ সন্ধ্যাবেলা এসে দেখে গেছে। তার কথামতো চুন এবং নিমপাতা বাটা লাগানো হচ্ছে। বমিভাব কাটানোর জন্যে গন্ধভাদালির বড়া খেয়েছেন। এতে বমিভাব আরো বেড়েছে। বমি হয়ে গেলে শরীর ভালো লাগবে— এই ভেবে গলায় আঙুল দিয়ে বমির চেষ্টাও করেছেন। বমি হয় নি। মনে হচ্ছে একগাদা খাবার গলার কাছে আটকে আছে।

শরীরের এই অবস্থায় কোনো কিছুই ভালো লাগে না। শরিফাকে তিনি বললেন, যাও চলে যাও। ভাগো।

শরিফা বলল, কোথায় যাব ?

যেখান থেকে আসছ সেখানে যাবে। আমার শরীর ভালো না।

শরীরে কী হয়েছে ?

চুলকানি হয়েছে।

শরিফা আগ্রহ নিয়ে বলল, দেখি ?

ধনু শেখ বললেন, কী দেখবা ? তুমি কি ডাক্তার কবিরাজ ?

শরিফা বলল, আপনার কুষ্ঠরোগ হয়েছে কি-না এইটা দেখব। আপনার কুষ্ঠরোগ হওনের কথা।

ধনু শেখ থমথমে গলায় বললেন, কী বললা ?

শরিফা স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি অন্তর থেকে অনেকবার বলেছি আপনার যেন কুষ্ঠ হয়। অন্তর থেকে যে যা চায় তাই হয়।

ধনু শেখ বললেন, তুমি তো অন্তর থেকে তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিলে। যেতে পেরেছ ?

শরিফা বলল, অন্তর থেকে তখন চাই নাই। এখন চাই।

তোমার ধারণা ইমাম করিম তোমার মতো এক নটিকে বিবাহ করে সংসার শুরু করবে ?

হুঁ।

ধনু শেখ বললেন, সে ইচ্ছা করলেও তো পারবে না। আমি তোমারে এখনো তালাক দেই নাই।

শরিফা বলল, আমি এখনো আপনার স্ত্রী ?

অবশ্যই।

তাহলে আমি আর রঙিলাবাড়িতে যাব না। এইখানেই থাকব। আপনার লোকজনদের বলেন গরম পানি করতে, আমি সিনান করব।

ধনু শেখ বললেন, তুমি এক্ষণ বিদায় হবা।

শরিফা বলল, অবশ্যই না। আমি আপনার স্ত্রী।

বলতে বলতে শরিফা শব্দ করে হাসল। ধনু শেখ বললেন, হাসো কেন ?

শরিফা বলল, আমি আপনার স্ত্রী। থাকি রঙিলাবাড়িতে। একদিন মনে করেন আপনার মেয়েজামাই আমোদ ফুর্তি করতে রঙিলাবাড়িতে উপস্থিত। তার আবার মনে ধরল আমারে... হি হি হি।

ধনু শেখ বললেন, চুপ কর মাগি!

শরিফা বলল, ভালো বুদ্ধি দেই শুনেন। আমারে তালাক দিয়া নিজের ইজ্জত রক্ষা করেন।

ধনু শেখ বললেন, তালাক তালাক তালাক। এখন তুই বিদায় হ।

শরিফা বলল, আজ আর যাব না।

তোরে লাথায়া বিদায় করব।

শরিফা বলল, এইটা পারবেন না। একটা মোটে ঠ্যাং। এক ঠ্যাং-এ লাথালাথি করা যায় না। আচ্ছা শুনেন, আপনার পায়ের পাতা কি চুলকায় ? কুষ্ঠরোগের আরেক লক্ষণ পায়ের পাতা চুলকানি।

রাত অনেক হয়েছে। তারপরেও ঘুম থেকে তুলে সতীশ কবিরাজকে আনা হয়েছে ধনু শেখের কাছে।

ধনু শেখ বললেন, ঠিকমতো বলো। আমার কি কুষ্ঠ হয়েছে?

সতীশ কবিরাজ বললেন, কুষ্ঠ কেন হবে?

ধনু শেখ বললেন, কেন হবে, কেন হবে না এই বিবেচনা পরে। আগে দেখ হয়েছে কি-না।

না।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, না দেইখাই বললা— না। আগে দেখ।

সতীশ কবিরাজ বললেন, কুষ্ঠ যে জায়গায় হবে সেই জায়গা অসাড় হয়ে যাবে। সুঁচ ফুটালে ব্যথা লাগবে না।

সুঁচ ফুটায়া দেখ।

তার প্রয়োজন নাই।

ধনু শেখ বিরক্ত মুখে বললেন, প্রয়োজন আছে কি নাই সেই বাহাস পরে করবা, আগে সুঁচ ফুটাও।

সতীশ কবিরাজ সুঁচ ফুটালেন। ধনু শেখ ব্যথায় বিকট চিৎকার দিলেন। সতীশ কবিরাজ বললেন, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান। আপনার যকৃত দুষ্ট হয়েছে। যকৃত দুষ্ট হলে চুলকানি হয়। সকালে ওষুধ দিব। অনুপান দিয়ে দিব। নিয়মিত খাবেন। ওষুধ যে কদিন খাবেন সেই কদিন মদ্যপান করবেন না।

আজ তো খেতে পারব? ওষুধ তো শুরু হয় নাই।

সতীশ কবিরাজ বললেন, নিয়ম রক্ষার জন্যে সামান্য চলতে পারে। তবে না খাওয়াই উত্তম।

ধনু শেখ বললেন, উত্তমের আমি গুষ্ঠি কিলাই।

প্রচুর মদ্যপান করে তিনি ঘুমুতে গেলেন। বিকট স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভাঙল। স্বপ্নে তিনি একজন কুষ্ঠরোগী। ভিক্ষা করছেন কোলকাতা রেলস্টেশনে। তাঁর শরীরের মাংস গলে গলে পড়ছে। মাছি চারদিকে ভনভন করছে। তাঁর গা থেকে খসে পড়া মাংস একটা মোটা তাজা কুকুর খপ খপ করে খাচ্ছে। কুকুরটা এবার সরাসরি গা থেকে মাংস ছিঁড়ে নিতে এগিয়ে এলো। ভয়ঙ্কর দাঁত নিয়ে সে এগিয়ে আসছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে তিনি চিৎকার করছেন। সবাই তার চিৎকার শুনছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না। বরং তারা মজা পাচ্ছে।

ধনু শেখের চিৎকার শুনে শরিফা ঘরে ঢুকল। সে রঙিলাবাড়িতে ফিরে যায় নি। পাশের কামরায় পাটি পেতে শুয়েছিল। শরিফা বলল, আপনার কী হয়েছে? বোবায় ধরেছে?

ধনু শেখ বললেন, বোবায় ধরে নাই। কুত্তায় ধরেছে।

শরিফা বলল, মেয়েরে খবর দিয়া নিয়া আসেন। যে অসুখ আপনি বাঁধায়েছেন আপনার ভালো সেবা দরকার।

চুপ। সতীশ কবিরাজ দেখে গেছে। সে বলেছে কিছু হয় নাই।

কলিকাতা শহরে যান। বড় ডাক্তার দেখান।

চুপ বললাম। চুপ।

আমি পাশের ঘরেই আছি। আবার যদি কুত্তায় ধরে ডাক দিয়েন।

ধনু শেখ ঘুমুতে গেলেন না। ভোর হওয়া পর্যন্ত জেগে বসে রইলেন। নিজে আরো একবার সুঁচের পরীক্ষাটা করলেন। সুঁচ ফুটালেন এবং প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন। না, অবশ্যই তার কুষ্ঠরোগ হয় নি। তারপরেও কোলকাতার বড় ডাক্তারকে দেখাতে তো অসুবিধা নাই। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, দু'একদিনের মধ্যে কোলকাতা যাবেন। প্রয়োজনে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের কাছে যাবেন।

ডাক্তারের নাম কার্তিক বসু। ক্যাম্বেল হাসপাতালের চর্মরোগের অধ্যাপক। তিনি ধনু শেখকে যত্ন করে দেখলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, এলার্জিঘটিত ব্যাধি।

ধনু শেখ বললেন, কুষ্ঠ না তো? আমার তো মনে হচ্ছে কুষ্ঠ।

কার্তিক বসু বললেন, আপনার মনে হলে তো হবে না। আমার মনে হতে হবে।

সুঁচ ফুটানোর পরীক্ষা করবেন না?

সুঁচ ফুটানোর কী পরীক্ষা?

সুঁচ ফুটালে ব্যথা পাই কি না।

আপনি আগে যে ডাক্তারকে দেখিয়েছেন তার কাছেই যান। আমার যা বলার বলে দিয়েছি।

ধনু শেখ বললেন, এলার্জি হয়েছে বলেছেন, ঠিক আছে মানলাম। এলার্জির চিকিৎসা করুন।

এলার্জির কোনো চিকিৎসা নেই।

তার মানে কী? এটা কী বললেন?

পৃথিবীর অনেক ব্যাধি আছে যার চিকিৎসা নেই। অবাক হবার কিছু নেই।

ধনু শেখ বললেন, আমি আপনার সব কথাই মানলাম। বুঝলাম যে আমার কুষ্ঠ হয় নাই। তারপরেও আমি যদি কুষ্ঠরোগের ওষুধ খাই তাতে অসুবিধা আছে? আমাকে কুষ্ঠরোগের ওষুধ দিন।

কার্তিক বসু উঠে পড়লেন। এই রোগীর পেছনে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না।

ধনু শেখের চুলকানি অসুখ খুবই বাড়ল। বরফ ঘষলে কম থাকে। বরফ ঘষা বন্ধ করলেই অসহ্য চুলকানি। তিনি একজন লোক রেখেছিলেন, যার একমাত্র কাজ চিরুনি দিয়ে তার গায়ে আঁচড়ানো। মাঝে মাঝে বরফ ঘষা।

তাঁর রাতের ঘুম একেবারেই কমে গেল। চোখে ঘুম আসামাত্রই বিকট দুঃস্বপ্ন। এর মধ্যে একটা দুঃস্বপ্ন ভয়ঙ্কর। যেন তার একটা পায়ে দড়ি বেঁধে লঞ্চঘাটের কাছে লম্বা বকুল গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর গা থেকে মাংস গলে গলে পড়ছে। বিকট দুর্গন্ধ। লঞ্চ থেকে যাত্রীরা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নামছে এবং সবাই তার গায়ে থুথু দিচ্ছে।

ধনু শেখ স্বপ্নটা যখন দেখছেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের দিকে। হিটলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইটালির সর্বেসর্বা বেনিতো মুসোলিনীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে এবং তার বান্ধবীকে গুলি করে হত্যার পর পায়ে দড়ি বেঁধে লরেটো স্কয়ারে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে ইটালির মানুষ এদের গায়ে থুথু দিতে পারে। *

---

* অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি— ১৯৩০ সনের দিকে ইউরোপ ভ্রমণের সময় বেনিতো মুসোলিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়। মুসোলিনীর লেখা উপন্যাস 'দ্য কার্ডিনালস মিসট্রেস' (ইংরেজি অনুবাদ) পড়েও খুশি হন। মুসোলিনীর আতিথেয়তা এবং ভদ্রতায় রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। মুসোলিনী বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সাহায্যও করেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, মুসোলিনী একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক এবং তাঁর অতি পছন্দের। বড় মানুষদের ভুলগুলিও সাধারণত বড় হয়ে থাকে।

১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাস। রুশ সৈন্যরা এগিয়ে আসছে বার্লিনের দিকে। তাদের দলপতি মার্শাল জর্জি ঝুকভ। তাঁর প্রধান দুই সহকারীর একজন জেনারেল আইভান কোনেভ। অন্যজন জেনারেল ভাসিল চুইকভ। তাদের সৈন্যসংখ্যা ২৫ লাখ। ট্রাকের ওপর বসানো কাতুশা রকেটের সংখ্যা ৩ হাজার ২৫৫, ট্যাংকের সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি। দূরপাল্লার কামান আছে ৪১ হাজার। ঝুকভের বাহিনীকে সাহায্যকারী বিমানের সংখ্যা ৭ হাজার। চলে এসেছে বার্লিনের কাছাকাছি। এরা যে-কোনো সময় বার্লিনে ঢুকে পড়বে। তাদের দূরপাল্লার কামানের আওয়াজ বার্লিনবাসী সারাক্ষণ শুনছে। হিটলার নিজেও শুনছেন। তিনি সেই শব্দ শুনতে শুনতে বললেন, যে-কোনো মূল্যে বার্লিন রক্ষা করতে হবে। রুশরা বার্লিনে ঢুকে পড়লে একদিক দিয়ে ভালো হবে, ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা এটা পছন্দ করবে না। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করবে।

রাজধানীর কমান্ডান্ট মেজর জেনারেল হেলমুট রেম্যান। তিনি হিটলারের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছিলেন। হিটলার বললেন, আমার বিমানবাহিনী কোথায়?

হেলমুট বললেন, বিমান আকাশে উড়তে পারছে না। জ্বালানি নেই।

হিটলার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, জ্বালানি নেই কেন? জেনারেল গথার্ড হেইনরিচকে টেলিফোনে ধর। সে বলুক বিমানবাহিনীর জন্যে জ্বালানি কেন নেই।

জেনারেল হেইনরিচকে টেলিফোনে ধরা গেল না। জেনারেল উইলহেম মোনকিকে পাওয়া গেল।

জেনারেল মোনকি বললেন, আপনি যাতে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে পারেন তার জন্যে আমি বিশেষ ব্যবস্থায় দু'টি বিমান প্রস্তুত রেখেছি।

হতভম্ব হিটলার বললেন, আমি পালিয়ে যাব?

জার্মান জাতিকে রক্ষার জন্যে আপনার বেঁচে থাকা জরুরি।

হিটলার কঠিন গলায় বললেন, আমাকে পালিয়ে যেতে হবে? আমাকে রক্ষা করার জন্যে আমার জেনারেলরা কোথায়?

জেনারেলের বক্তব্য শোনা গেল না, কারণ কাতুশা রকেট, যার আরেক নাম স্টালিন অরগান্স, বৃষ্টির মতো বার্লিনে আসতে শুরু করেছে।

২০ এপ্রিল হিটলারের জন্মদিন। হিটলার তাঁর বান্ধবীকে পাশে নিয়ে বাঙ্কারে বসে ছিলেন। জন্মদিন উপলক্ষে শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল আলফ্রেড জোডল। তিনি শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, জার্মান জাতি তার শ্রেষ্ঠত্ব আবারো প্রমাণ করবে। অবশ্যই আমরা বার্লিন রক্ষা করব। হিটলার শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিয়মমাফিক গ্লাস ছুড়ে ফেললেন এবং বললেন, আজ কি অন্যদিনের চেয়ে বেশি গোলাবর্ষণ হচ্ছে?

ইভা ব্রাউন বললেন, যুদ্ধের আলাপ কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ থাকুক। আসুন আমরা আনন্দময় কোনোকিছু নিয়ে আলাপ করি।

কেউ কোনো জবাব দিল না। হিটলার ইভা ব্রাউনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আমি তোমাকে বিয়ে করব।

ইভা ব্রাউন বললেন, হঠাৎ বিয়ের কথা আসছে কেন?

হিটলার বললেন, আমার ধারণা আমরা পরাজিত হতে যাচ্ছি। যদি সত্যি তাই ঘটে আমি আত্মসমর্পণ করব না। নিজেকে হত্যা করব। আমার মৃত্যুর পর ইতিহাসে লেখা হবে আমার একজন রক্ষিতা ছিল, তা আমি চাই না।

হিটলার দ্বিতীয় দফায় শ্যাম্পেন নিলেন। টোস্ট করলেন তার বান্ধবীর সঙ্গে। নরম গলায় বললেন, আমার সুখ এবং দুঃখের চিরসঙ্গী ইভা ব্রাউন।

হিটলার এবং ইভা ব্রাউন মাটির অনেক গভীরে বাঙ্কারে অবস্থান নিয়েছেন। আমাদের বান্ধবপুরের একজন (হাদিস উদ্দিন) বাঙ্কারের মতোই একটি জায়গায় বেশির ভাগ সময় কাটাচ্ছে। হরিচরণের মাটির নিচের গুপ্তঘর। যে ঘরে যাবার একটাই পথ, সিন্দুকের ভেতর দিয়ে। হাদিস উদ্দিনের গুপ্তঘরে সময় কাটানোর পেছনে কারণ আছে। সে নানান জিনিসপত্র গুপ্তঘরে রাখছে। এর মধ্যে রেশমি রুমালে মোড়া একান্নটা স্বর্ণমুদ্রাও আছে। হাদিস উদ্দিন যতবারই গুপ্তঘরে যায় স্বর্ণমুদ্রা গুনে দেখে। দুভাবে গুনে। প্রথমে এক থেকে একান্ন, তারপর শুরু হয় উল্টোদিকে গুনা। ৫১-৫০-৪৯-৪৮...

গুপ্তঘর সে ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে। সেখানে পাটি বিছানো আছে। বালিশ আছে। কলসিভর্তি পানি আছে। মোমবাতি, দেয়াশলাই আছে। একটা টর্চও আছে। হাদিস উদ্দিন পাটিতে শুয়ে গুনগুন করে মাঝে মধ্যে গান গায়। গান তার নিজের রচনা। সুরও তার নিজের। বদ্ধঘরের কারণে গানের শব্দ দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসে। হাদিস উদ্দিনের বড় ভালো লাগে।

ভরদুপুর। গুপ্তঘর অন্ধকার। পাটিতে শুয়ে হাদিস উদ্দিন নিচুগলায় গান করছে—

ও আমার সোনার মোহররে
মোহররে মোহররে মোহররে
তোর মনে দুঃখ ? দুঃখ ? দুঃখ ?
আমার মনে সুখ।
ও আমার সোনার মোহররে
মোহররে মোহররে মোহররে...

হাদিস উদ্দিন 'মোহররে' বলে টান দিচ্ছে, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে সেই শব্দ অনেকবার করে ফিরে আসছে। হাদিস উদ্দিনের মনে হচ্ছে ঘরভর্তি মানুষ একসঙ্গে 'মোহররে' বলে গান করছে।

এই সময় হঠাৎ করে বাচ্চামেয়ের হাসির শব্দের মতো শব্দ হলো। রিনরিনে গলায় কে যেন হাসল। হাদিস উদ্দিন শোয়া থেকে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার, তবে সিন্দুকের খোলা ডালা দিয়ে কিছু আলো আসছে। গুপ্তঘরের ভেতরটা আবছা আবছা চোখে আসে। হাদিস উদ্দিনের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। এটা সে কী দেখছে ? ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করে দশ বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে বসে আছে। নিজের মনে খেলছে। এমন কি হতে পারে কোনো বিচিত্র উপায়ে মীরা নেমে এসেছে ? না, তা কখনোই না। মেয়েটা মীরার চেয়ে অনেক বড়।

হাদিস উদ্দিন বিড়বিড় করে বলল, আল্লাহ্পাক রক্ষা কর। তুমি গরিব বান্দাকে রক্ষা কর। ইয়া রহমানু ইয়া রহিমু ইয়া মালিকু। হাদিস উদ্দিন চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করেই মনে হলো বিরাট বোকামি হয়েছে। তার মৃত্যু হবে চোখবন্ধ অবস্থায়। সে যে মারা গেছে এই খবরটাও কেউ পাবে না। কে আসবে গুপ্তঘরে খোঁজ নিতে ? হাদিস উদ্দিন চোখ মেলল। মেয়েটা এখনো আছে, তবে সে দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। হাদিস উদ্দিন মেয়েটাকে মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। গোল মুখ, কোঁকড়া চুল। খাড়া নাক। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

হাদিস উদ্দিন বলল, এই। এই।

মেয়েটা ফিরেও তাকাল না। হাতে কী নিয়ে যেন খেলছে। সুতার মতো কিছু। মেয়েটার হাতে কয়েক গোছা করে চুড়িও আছে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে।

হাদিস উদ্দিন দেয়াশলাই হাতে নিল। কাঁপা কাঁপা হাতে দেয়াশলাই জ্বালাল। মোমবাতি ধরাল। এখন আর মেয়েটা নেই। তবে সুতাগুলি আছে। লাল নীল কিছু সুতা। হাদিস উদ্দিন গুপ্তঘর থেকে উঠে এলো। কানে ধরে প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে কখনো গুপ্তঘরে নামবে না। বিনা কারণে প্রাণ দিয়ে লাভ কী ?

আতরের শ্বশুরবাড়িতে ভূত হাম্বর খুব যন্ত্রণা করছে। গত অমাবশ্যায় তাকে দেয়া গজার মাছ সে খায় নি। বাঁশঝাড় উলটপালট করে এক কাণ্ড করেছে। তার সমস্যা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে পুকুরে ঢিল মারছে। টিনের চালে ঢিল মারছে। ছোটখাটো ঢিল না। চষাক্ষেত থেকে তুলে আনা মাটির বড় বড় চাঙড়। গভীর রাতে ছোট বাচ্চাদের মতো ওয়াও ওয়াও কান্নার শব্দ করছে।

আমিনা বেগম বললেন, ঘটনা বুঝেছি।

আতর ভীত গলায় বলল, কী বুঝেছেন?

তোমার সন্তান হবে। এই কারণে হাম্বরের মিজাজ খারাপ। এখন তুমি আমাকে বলো, সন্তান কি হবে?

আতর মাথা নিচু করে থাকল, কিছু বলল না।

আমিনা বেগম বিরক্ত হয়ে বললেন, এত বড় ঘটনা আমারে তুমি জানাবা না? শাহনেয়াজ জানে?

না।

আমিনা বেগম বললেন, হাম্বর যে ভাব ধরেছে তোমারে এখানে রাখা বিপদজনক। তোমারে বাপের বাড়ি পাঠায়া দিতেছি। সন্তানের চল্লিশ দিন না হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়িতে থাকবা। তারপর আসবা।

আতর বলল, আমি এইখানে থাকব। কোনোখানে যাব না।

বৌমা, তুমি তো কোনো বিবেচনার কথা বললা না।

আতর বলল, আমি এইখানেই থাকব। বাপের বাড়িতে যাব না। হাম্বর যদি আমারে মেরেও ফেলে আমি যাব না।

আমিনা বেগম বিরাট দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বাড়িবন্ধন নতুন করে দিলেন। হামিদাকে কঠিন নির্দেশ দিলেন— সব সময় আতরের হাত বা শাড়ির অংশ ধরে থাকতে হবে। আতর যখন গোসলখানায় যাবে বা বাথরুমে যাবে তখনো এই অবস্থা। রাতে তার ঘুমানোর ব্যবস্থা হয়েছে আমিনা বেগমের সঙ্গে। তিনি ছেলের বৌকে নিয়ে খাটে শুচ্ছেন। মেঝেতে ঘুমাচ্ছে দু'জন দাসী। ঘরের চারকোনায় সারারাত চারটা হারিকেন জ্বলে। খাটের নিচে মাটির সরায় থাকে কয়লার আগুন।

নতুন জীবনযাপন আতরের ভালো লাগছে। কী অদ্ভুত অনুভূতি! তার শরীরের ভেতর একজন কেউ বড় হচ্ছে। একদিন সে পৃথিবীর আলো দেখবে। আতরকে ডাকবে 'মা'। হামাগুড়ি দিয়ে একা একা বারান্দা থেকে উঠানে নেমে যাবে। উঠানে শুকাতে দেয়া ধান মুখে দিয়ে কাঁদবে। আতর তাকে কোলে নিয়ে বলবে, 'আমার বাবা গরু। আমার বাবা ধান খাওয়া গরু।'

আতরের পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে জানার জন্যে আমিনা বেগম গণক আনিয়েছেন। শ্রীপুরের বিখ্যাত গণক কাশেম মিয়া। এই গণকের গনা অভ্রান্ত। তিনি কাঁঠাল পাতা দিয়ে গনা গুনেন। একটা কাঁঠাল পাতায় খেজুর কাঁটা দিয়ে ছেলে লিখে কাঁসার বদনায় রাখা হয়। তুলারাশির দুইজন তর্জনী দিয়ে বদনার কানা শূন্যে তুলে ধরেন। কাশেম মিয়া মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে যদি বদনা আপনা আপনি ঘুরতে থাকে তাহলে ছেলে। আর বদনা যদি স্থির থাকে তাহলে মেয়ে। তিনবার পরীক্ষা হলো। তিনবারই পাওয়া গেল মেয়ে। আমিনা বেগম হতাশ গলায় বললেন, হায় হায়, কী সর্বনাশ!

আতরের শ্বশুর আব্দুল গনি সাহেবের মনটাও খুব খারাপ হয়েছে। তারপরেও তিনি মনের দুঃখ চাপতে চাপতে বলেছেন, সংসারে প্রথম সন্তান কন্যা হওয়া ভাগ্যের কথা। রসুলে করিম নিজে বলেছেন।

গণক কাশেম মিয়ার ভাগ্য খারাপ। গণনায় মেয়ে পাওয়া গেলে বখশিশ তেমন পাওয়া যায় না। দুঃসংবাদ দেবার পর আবার বখশিশ কী? মেয়ে আসা মানে তো দুঃসংবাদই।

শুধু কবি শাহনেয়াজকে 'মেয়ে আসছে' সংবাদে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হলো। ছেলেদের সুন্দর নাম নাই বললেই হয়। সেই তুলনায় মেয়েদের কত বাহারি নাম আছে! মেয়ের নাম দিয়ে অন্তমিল দেবার শব্দও অনেক থাকে। কবি শাহনেয়াজ দুইনম্বরি এক হাতিমার্কা খাতায় মেয়েদের নাম লেখা শুরু করেছে।

আঁখি

নাম সুন্দর। তবে চন্দ্রবিন্দু খারাপ লাগছে। চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়ে 'নয়না' রাখা যেতে পারে। নয়ন থেকে নয়না। আবার নয়নতারাও খারাপ না। ডাবল অর্থ। চোখের মণি এবং নয়নতারা ফুল। এক থেকে দশের ভেতর নম্বর দেয়া হলে যা দাঁড়ায়।

আঁখি ৫
নয়না ৬
নয়নতারা ৭

ধবলিমা

কন্যার গাত্রবর্ণ যদি ধবল হয় তাহলে এই নাম সুন্দর। ধবলিমার বদলে সিতিমা দেয়া যেতে পারে। সিতিমা'র অর্থ

ধবল। দ্বৈত অর্থবাহক আরেকটি নাম আছে। সফেদা। একই সঙ্গে শুভ্র এবং ফল। এক থেকে দশের ভেতরে নম্বর নিম্নরূপ

ধবলিমা ৭
সিতিমা ৫
সফেদা ৬

[কবি শাহনেয়াজের সত্যি সত্যি একটা কন্যাসন্তান হয়। কবি নামের খাতা নিয়ে কন্যার সামনে উপস্থিত হবার পর আব্দুল গনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন, নামের খাতা নিয়া দূর হ। আমি এর নাম দিলাম তোজল্লী খানম। শাহনেয়াজকে মাথা নিচু করে তাই মেনে নিতে হয়।]

আব্দুল গনি তাঁর বাড়ি হাম্বরমুক্ত রাখার জন্যে একজন পাশ করা ভালো মাওলানা লজিং মাস্টার হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাওলানা চব্বিশ ঘণ্টা এই বাড়িতেই থাকবেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত আজান দিয়ে নামাজ পড়বেন। ভূতপ্রেতরা না-কি আজানের শব্দকে অত্যন্ত ভয় পায়। মাওলানা পাওয়া যাচ্ছে না।

ধনু শেখের নতুন করে বানিয়ে দেয়া জামে মসজিদে আজ অনেকদিন পর আছরের আজান হলো। আজান দিলেন নতুন ইমাম নিয়ামত হোসেন। নিয়ামত হোসেন ধনু শেখের লঞ্চ কোম্পানির টিকেট মাস্টার। তার পড়াশোনা মাদ্রাসা লাইনে। উলা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পাশ করতে পারেন নি। টিকেট মাস্টারের দায়িত্বের অতিরিক্ত মসজিদের ইমামতির দায়িত্বও তিনি পালন করবেন। নিয়ামত হোসেন মহিষের মতো বলশালী একজন মানুষ। হুঙ্কার দিয়ে কথা বলেন। তবে ক্বারী হিসাবে ভালো।

প্রথম দিনেই নামাজের শেষে বেহেশতের বর্ণনা দিয়ে তিনি সবার চিত্ত চাঞ্চল্য তৈরি করলেন।

> ফল ফ্রুট খেতে চান ? বেহেশতের ফল ফ্রুটের কেরামত শুনবেন ? তাহলে শুনেন, বেহেশতের বেদানার একটা দানা মুখে দিবেন, সত্তুর বছর লাগবে তার রস খেয়ে শেষ করতে...।

ইমাম করিম প্রথম দিনের নামাজে সামিল হতে এসেছিল। তাকে মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয় নি। তার গা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। সারা শরীর নোংরায় মাখামাখি। লুঙ্গি বারবার খুলে পড়ে যাচ্ছে।

ইমাম করিম হুঙ্কার দিয়ে বলেছে, নামাজ পড়তে দেয় না কোন বান্দির পুত! আমি কিন্তু মসজিদ জ্বালায়ে দিব। খুন খারাবি করব। আমি পাগল মানুষ। খুন খারাবি করলে আমার কিছু হবে না।

ইমাম করিমকে দূরের কোনো গঞ্জে ফেলে আসা হবে— এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তার পাগলামি যেভাবে বাড়ছে তাতে এর কোনো বিকল্প নাই। বান্ধবপুরের বেশ কিছু মানুষকে সে হয় মেরেছে নয় তাড়া করে পুকুরে ফেলেছে। একদিন বের হয়েছিল রামদা নিয়ে। এমন বিপদজনক পাগল গ্রামে রাখা ঠিক না।

আগামী হাটবারে ইমাম করিমকে লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হবে। কোনো এক লঞ্চঘাটে নামিয়ে দেয়া হবে এরকম ঠিক হয়েছে। ইমাম করিম ব্যাপারটা জানে। তার যে খুব আপত্তি তাও না। সে মোটামুটি আনুষ্ঠানিকভাবে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে। একদিন গেল লাবুসের কাছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি বয়সে আমার ছোট। যদি বয়সে ছোট না হইতা আমি পায়ে ধরে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতাম। বিরাট অপরাধ করেছি। তোমারে খুন করার জন্যে লোক ঠিক করেছিলাম। ওই হারামজাদা কাজটা করে নাই। হারামজাদা যদি কাজটা করত আমার এই দশা হয় না। আমি স্ত্রী নিয়া সুখে থাকতাম। কেন সুখে থাকতাম বুঝায়ে বলব ?

লাবুস বলল, বলুন।

ইমাম করিম বলল, একশ' টাকার মামলা। তোমারে খুন করলে একশ' টাকা ওই হারামজাদা নিত। আমার স্ত্রীর হাতে টাকা পড়ত না। ঝগড়া ফ্যাসাদের কারণে তালাক হইত না। বুঝেছ ?

লাবুস চুপ করে রইল। করিম বলল, তুমি কি আমাকে ক্ষমা দিয়েছ ?

লাবুস বলল, জি দিয়েছি।

এরা বুধবারে আমাকে লঞ্চে করে নিয়ে যাবে। কোনোখানে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আধা ন্যাংটা তো যেতে পারি না। বলো যেতে পারি কি-না ?

এইভাবে যাওয়া ঠিক হবে না।

আমাকে নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি কিনে দেওয়া কি তোমার পক্ষে সম্ভব ?

সম্ভব।

সুন্দর একটা ফেজ টুপি কিনে দিও।

আচ্ছা দেব।

একজোড়া কাবলি স্যান্ডেল।

আপনি যা চাচ্ছেন সবই দিব।

তুমি লোক অত্যন্ত ভালো। আগে বুঝতে পারি নাই। না বুঝে ভুল করেছি।

লাবুস বলল, আমরা সবাই ভুল করি। না বুঝে করি, বুঝে করি।

ইমাম বলল, ভুলের জন্যে তওবা করলে আমি ক্ষমা পাব। কিন্তু তওবা করব না।

লাবুস বলল, কেন তওবা করবেন না?

ইমাম বলল, আমি ভুলের শাস্তি পেতে চাই।

অনেক শাস্তি তো পেয়েছেন। আর কত?

ইমাম বলল, আরো অনেক বাকি আছে। আচ্ছা লাবুস, আমার আরেকটা আবদার আছে। বলব?

বলুন।

আমি যাব বুধবারে। লঞ্চ ছাড়বে তিনটায়। দুপুরে তোমার এখানে ভাত খাওয়া কি সম্ভব? খাওয়াদাওয়া করে লঞ্চে উঠলাম। পরে খাওয়া আর জুটে কি-না কে জানে। খাওয়াবা ভাত?

লাবুস বলল, অবশ্যই খাবেন।

করিম বলল, পাবদা মাছের সালুন দিয়া ভাত খাওয়ার ইচ্ছা। শরিফা একবার রেঁধেছিল। স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। ভাটি অঞ্চলের পাবদা মাছ।

লাবুস বলল, ভাটি অঞ্চলের বড় পাবদা মাছ আমি জোগাড় করব।

করিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, লাবুস, তোমার অনেক মেহেরবানি।

রঙিলা বাড়িতে শরিফা একটি চিঠি পেয়েছে। চিঠি নিয়ে এসেছে লাবুসের লোক। চিঠিতে লেখা—

> মা,
>
> আমি আপনার এক সন্তান লাবুস। আমার খুবই ইচ্ছা বুধবার দুপুরে আপনার হাতে রান্না পাবদা মাছ খাই। এটা কি সম্ভব যে আপনি আমার বাড়িতে এসে রান্না করবেন?
>
> ইতি
>
> আপনার পুত্র
>
> লাবুস।

বুধবার দুপুরে ইমাম করিম একা খেতে বসেছেন। মাওলানা ইদরিস কী কারণে যেন রোজা রেখেছেন। লাবুস একবেলা খায়। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা এক মহিলা করিমের পাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন। করিমের গায়ে নতুন পায়জামা-

পাঞ্জাবি। মাথায় ফেজ টুপি। করিম নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে। একবার শুধু বলল, রান্না ভালো হয়েছে। আল্লাহ্‌পাকের দরবারে সুখাদ্যের জন্যে শুকরিয়া। বোরকা পরা মহিলা কিছুই বললেন না।

লঞ্চঘাটে করিমকে বিদায় দিতে অনেকেই এসেছে। পালকিতে করে বোরকাপরা সেই মহিলাও এসেছেন। যে দু'জন করিমকে নিয়ে যাবে, অচেনা ঘাটে ছেড়ে দিয়ে আসবে, করিম তাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনাদের যেতে হবে না। আমি দূরের কোনো ঘাটে নেমে যাব। ফিরে আসব না। আপনাদের অনেক ত্যক্ত করেছি। আর করব না। আমি সবার কাছে ক্ষমা চাই।

করিমের সঙ্গের চরনদার দু'জন নেমে গেল। লঞ্চ ছাড়ার ঠিক আগে আগে পালকি থেকে বোরকাপরা মহিলা নেমে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে উঠে গেল এবং দাঁড়াল ইমাম করিমের পাশে।

ইমাম করিম বললেন, ভালো আছ শরিফা?

শরিফা জবাব দিল না। সে মুখ থেকে বোরকার ঢাকনা তুলে দিয়েছে। শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে বান্ধবপুরের রঙিলা বাড়ি। আর কোনোদিন সে এখানে ফিরবে না।

অনেক রাতে আতরকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। তার কাছে দু'জন মেহমান এসেছে। মেহমান দু'জনকে কেউ চিনতে পারছে না। একজন মাওলানা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। আতর মেহমানদের দেখে হতভম্ব। ইমাম করিম এবং শরিফা।

আতর বলল, নতুন মা। তুমি?

শরিফা বলল, মাগো, আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই। আজ রাতটা কি তুমি আমাদের থাকতে দিবা?

আতর কিছু না বলে ছুটে গেল তার স্বামীর কাছে। হড়বড় করে বলল, আমার এক দুঃখী মা এসেছেন। আপনি তাকে সমাদর করে এই বাড়িতে তুলবেন— এটা আমার অনুরোধ। শাহনেয়াজ সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো। শরিফাকে কদমবুসি করে বলল, মাগো! আমি আপনার এক অধম পুত্র। মা, অতি আশ্চর্য যোগাযোগ। এই মুহূর্তে পয়ারছন্দে একটা কবিতা লিখছিলাম। কবিতার নাম 'মাগো'। আপনি আপনার অধম কবিপুত্রের বাড়িতে বাকিজীবন থাকবেন এটা আমার আবদার।

[অপদার্থ কবি শাহনেয়াজ শরিফাকে বাকিজীবন অতি আদরে নিজের বাড়িতে রেখেছে। প্রতিবার খাবার সময় নিজে উপস্থিত থেকেছে। অতি আদরে অতি যত্নে নিজে খাবার তুলে দিয়েছে। হঠাৎ করে এই মহিলার প্রতি শাহনেয়াজের এত ভক্তির কারণ স্পষ্ট না। জগৎ রহস্যময়। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে।]

ইমাম করিম আতরের বাড়িতে সংসার শুরু করলেন। তাঁর প্রধান কাজ হলো, আজান দিয়ে ভূত হাম্বরকে দূরে রাখা। তাঁর মাথা কখনোই পুরোপুরি সারে না। প্রায়ই দেখা যায় তিনি বাড়িকে ঘিরে অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে চক্কর দিচ্ছেন। আতরের শ্বশুরবাড়ির সবার ধারণা, ভূত হাম্বরের কারণে ভালোমানুষ ইমাম সাহেবের এই সমস্যা হচ্ছে। হাম্বর কোনো সহজ জিনিস না। তবে ইমাম করিমও সহজ পাত্র না। বলা যায়, সমানে সমান। ইমামের আসার পর হাম্বরের উপদ্রব কিছু কমেছে। টিনের চালে তার হাঁটাহাঁটি বন্ধ হয়েছে বলেই মনে হয়।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ঘাটশিলা থেকে বান্ধবপুর উপস্থিত হলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল বান্ধবপুরের তিনবটের মাথা পানির সময় দেখতে হয়। পানিতে অঞ্চল ডুবে যায়, বটের মাথা বের হয়ে থাকে। পাখিদের মেলা বসে। সবই হরিয়াল পাখি।

লঞ্চঘাটে নেমে বিভূতি বাবু ভালো ঝামেলায় পড়লেন। যার কাছে তিনি যাবেন কেউ তাকে চেনে না। নামও আগে কখনো শোনে নি। যাকে জিজ্ঞাস করেন সে-ই বলে ইন্নাস নামে কেউ এই অঞ্চলে থাকে না। মাওলানা ইদরিস নাম তিনি ভুলে গেছেন।

ইন্নাস করেন কী?

কী করেন জানি না। কলিকাতা গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। তিনি যমুনার আত্মীয়। যমুনা রায়।

মুসলমান ইন্নাস, হিন্দুর আত্মীয়? এইসব কী বলেন? উনার চেহারা কেমন?

বিভূতি বাবু চেহারার যথাসাধ্য বর্ণনা দিলেন। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তবে তিনবটের মাথা নামের একটা জায়গা আছে। দূরদেশ থেকে একজন শুধুমাত্র তিনবটের মাথা দেখতে এসেছে— এটাও কারো হিসাবে মিলছে না।

আপনি আসছেন তিনবটের মাথা দেখতে?

হুঁ।

আর কিছু না? শুধু বটগাছ দেখবেন?

এর বাইরেও দেখার মতো কিছু থাকলে দেখব। শুনেছি বড় জঙ্গল আছে। বনজঙ্গল দেখতে আমার ভালো লাগে।

বর্ষাকালে বনজঙ্গল কী দেখবেন? সাপে কাটব। জোঁকে ধরবে।

বনের ভেতর দিয়ে শুনেছি একটা বড় খাল গিয়েছে। নৌকা নিয়ে খালের ভেতর ঘুরব। খাল আছে না?

আছে। খাল আছে। নৌকাও আছে।

তাহলে সমস্যা কী ?

সমস্যা কিছু নাই।

বিভূতিভূষণ বললেন, ইন্নাস সাহেবের খোঁজটা শুধু যদি বের করতে পারি।

এই নামে কেউ আমাদের অঞ্চলে নাই। কোনোদিন ছিলও না। আপনারে কেউ ধোঁকা দিয়েছে।

উনি ধোঁকা দেয়ার মানুষ না। সুফি মানুষ। দরবেশ।

আমাদের অঞ্চলে কোনো পীর দরবেশও নাই। সবই সাধারণ।

বিভূতি বাবু কী করবেন বুঝতে পারলেন না। লঞ্চে কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। ক্ষুর্ধাত অবস্থায় নেমেছেন। সেই ক্ষুধা চরমে পৌঁছেছে। বান্ধবপুরে ভাতের হোটেল আছে, তবে হোটেলগুলি খোলে দুই হাটের দিনে। আজ হাটবার না। মুদির দোকান থেকে চিড়া এবং পাটালি গুড় কিনে খেলেন। লঞ্চে করে ফেরত যাবেন সেই উপায় নেই। ফিরতি লঞ্চ পরদিন দুপুরে। তাছাড়া এতদূর এসে তিনবটের মাথা না দেখে ফেরত যাবার অর্থ হয় না। রাত কাটাবার জন্যে একটা আশ্রয় দরকার। ধর্মশালা জাতীয় কিছু আছে কি-না খোঁজ করতে হবে। থাকার কথা না। বান্ধবপুর সম্পন্ন অঞ্চল না। অনেক খুঁজে পেতে একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল, সেখানে গুড়ের লাল চা ভাঁড়ে করে বিক্রি করে।

চায়ের দোকানির পরামর্শে বিভূতি বাবু ধনু শেখের বাংলাঘরে উপস্থিত হলেন। ধনু শেখকে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। ধনু শেখ বিরক্ত হয়ে বললেন, নাম ঠিকানা ছাড়া চলে আসছেন ? আপনি তো বিরাট 'বুরবাক'। করেন কী ?

শিক্ষকতা করি। স্কুল মাস্টার।

বুরবাকের মতো বুদ্ধি শিক্ষকদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

রাতটা কাটাবার মতো একটা জায়গা পাওয়া গেলে বাধিত হতাম।

ধনু শেখ বললেন, রঙিলা বাড়িতে চলে যান। আরামে থাকবেন, সেবা পাবেন। সেবার প্রয়োজন সকলের। আমার এখানে রাখতে পারতাম, তা সম্ভব না। আমার কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। কুষ্ঠ রোগীর বাড়িতে থাকা ঠিক না। এখন বিদায় হন।

বিভূতি বাবু শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা করলেন। রাত কাটাবেন নৌকায়। নৌকার মাঝি চাল ফুটিয়ে ভাত রেঁধে দিবে। নদীর ওপর ডাল দিয়ে ভাত খেতে ভালো লাগবে।

এই নৌকা নিয়ে তিনি বিকালের মধ্যেই খালে ঢুকলেন। খাল দিয়ে নৌকা যাবে, তিনি বনভূমির সৌন্দর্য দেখবেন। তার মতে বঙ্গদেশের প্রতিটি বনভূমির চরিত্র এক হলেও প্রতিটির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য ধরতে পারার মধ্যে

আনন্দ আছে। নৌকার মাঝির নাম হাশেম। হাশেম তার আরোহীর কর্মকাণ্ডে অবাক হচ্ছে। কোনো কাজ ছাড়া একটা লোক খালে খালে ঘুরছে। বনজঙ্গল দেখার কী আছে? লোকটার হাতে খাতা-কলম। সে মাঝে-মাঝে নৌকা থামাতে বলে। নৌকা থামলেই গুট গুট করে কী যেন লেখে।

ঔপন্যাসিক লিখছিলেন—

> বাতাবি লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনী ফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কী একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলি কাঁটা গাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। ...

আপনার নাম কি বিভূতিভূষণ?

বিভূতি বাবু চমকে তাকালেন। খালের পাড়ে অতি রূপবান এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর মনে এক ধরনের ভ্রান্তি উপস্থিত হলো। মনে হলো বনের দেবতা হঠাৎ দেখা দিয়েছেন। হঠাৎ করে একজন কেউ 'আপনার নাম কি বিভূতিভূষণ' বলে জঙ্গলে উদয় হওয়ার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে।

আজ্ঞে আমি বিভূতিভূষণ।

আমার নাম লাবুস, আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

বিভূতি বাবু অবাক হয়ে বললেন, আপনি কীভাবে জানেন যে আমি খালের ভেতর নৌকা করে যাচ্ছি?

লাবুস বলল, আমি আপনাকে পেয়েছি এটাই বড় কথা। কীভাবে পেয়েছি এটা বড় কথা না।

লাবুস নৌকায় উঠে এলো। বিভূতিভূষণ বললেন, আপনি কি আমার কোনো রচনা পড়েছেন?

লাবুস বলল, না। এখানে আমরা বইপত্র পাই না। হরিচরণ বাবু *প্রবাসী* পত্রিকা রাখতেন। সেখানে আপনার উপন্যাসের ছোট্ট একটা অংশ পড়েছি।

নাম মনে আছে?

না। শুনেছি আপনি সুখাদ্য পছন্দ করেন। রাতে কী খেতে চান?

যা খেতে চাইব তাই খাওয়াবেন?

অবশ্যই।

বনমোরগের ঝোল খাওয়াতে পারবেন?

না।

মহাশোল মাছ। দোপেয়াজির মতো রান্না।

এটাও পারব না। মহাশোল পাহাড়ি মাছ, এখানে পাওয়া যায় না।

বকফুলের বড়া খাওয়াতে পারবেন ?

পারব। আমার বাড়িতেই বকফুল গাছ। প্রচুর ফুল ফুটেছে।

সজনের গাছ আছে ?

আছে।

সজনের ঝোল করতে বলবেন। আমার পছন্দের জিনিস।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিভূতি বাবু খাতা-কলম নিয়ে নৌকার ছইয়ের ভেতরে চলে গেছেন। লাবুস বাইরে আছে। বৃষ্টিতে ভিজছে। তাকে দেখাচ্ছে মূর্তির মতো। তার দৃষ্টি খালের পানির স্রোতের দিকে। একঝাঁক বক হঠাৎ তার মাথার ওপর দিয়ে কক কক শব্দ করে উড়ে গেল। অন্য যে-কেউ চমকে বকগুলির দিকে তাকাতো। লাবুস তাকালো না।

লাবুসের বাড়িতে যে আদর এবং যত্ন লেখকের জন্যে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতের খাবারের বিপুল আয়োজন। যেখানে তিনি খেতে বসেছেন তার কাছেই তোলা উনুন আনা হয়েছে। সেখানে তেল ফুটছে। বেসনে ডুবিয়ে বকফুল ভেজে লেখকের পাতে দেয়া হচ্ছে। বাটির পর বাটি আসছে। বিভূতি বাবু বললেন, আমার মতো অভাজনের জন্যে এত আয়োজন!

মাওলানা ইদরিস বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্যে। তিনি আপনার রিজিকের এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

বিভূতি বাবু বললেন, রেঁধেছে কে ?

হাদিস উদ্দিন বলল, আমি রান্না করেছি জনাব।

বিভূতি বাবু বললেন, তোমার দু'টা হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা দরকার। আমার একটা উপন্যাসের নাম 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। সেই হোটেলের পাচক বামুন হাজারির চেয়েও তোমার রান্না ভালো।

হাদিস উদ্দিনের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। সে তার জীবনে রান্নার এরকম প্রশংসা শোনে নি। ছোটকর্তা লাবুস এমন মানুষ যাকে লবণ ছাড়া তরকারি রেঁধে দিলেও হাসিমুখে খেয়ে উঠবে, কিছু বলবে না। মাওলানা ইদরিসেরও একই অবস্থা, বেগুনপোড়া চটকে দিলে তাই মুখে নিয়ে বলবে— শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

শ্রাবণ মাসের ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। বিভূতি বাবু পান মুখে দিয়ে বিছানায় শুতে গিয়েছেন। হাদিস উদ্দিন হুক্কা নিয়ে গেছে। তিনি হুক্কায় টান দিচ্ছেন। হাদিস উদ্দিন বলল, জনাব! আপনার পায়ে একটু তেল দিয়ে দেই ? পরিশ্রম করে এসেছেন। আরাম পাবেন।

বিভূতি বাবু বললেন, দাও। সেবা যখন নিচ্ছি ভালোমতোই নেই।

সকালে আপনাকে ছিটা পিঠা খাওয়াব। হাঁসের মাংস আর ছিটা পিঠা।

আচ্ছা।

হাঁসের মাংস দিয়ে ছিটা পিঠা খাওয়ার পরে আপনি বলবেন, হাদিস উদ্দিনের শুধু হাত না, তার পাও দু'টাও সোনা দিয়া বান্ধায়া দাও। আচ্ছা জনাব, হাজারি বলে বাবুর্চির কথা বললেন, তার দেশের বাড়ি কই ?

ওটা কল্পনার এক চরিত্র। এরকম কেউ নেই।

বিভূতি বাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, একটা মেয়ে দেখলাম, কোঁকড়া চুল, গোল মুখ, মেয়েটা কে ? দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখছিল। আমি তাকাতেই চট করে সরে গেল

হাদিস উদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, চোখে ধান্ধা দেখছেন। এই রকম মেয়ে কেউ নাই।

আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম।

হাদিস উদ্দিন বলল, আমিও আপনার মতো ধান্ধা দেখি। ছোটকর্তারে নিয়া একটা ধান্ধা দেখি।

কী দেখ ?

পুসকুনির পাড়ে উনি যখন বইসা থাকেন তখন দেখি একজন না, মানুষ দুইজন।

একই মানুষ দু'জন ?

জে। পেট গরম থাকলে মানুষ ধান্ধা দেখে। মনে হয় আমার পেট গরম ছিল।

শেষরাতে বৃষ্টি থেমে গেল। মেঘ কেটে চাঁদ ভেসে উঠল। বৃষ্টিধোয়া অপূর্ব জোছনা। বিভূতি বাবুর ঘুম ভেঙেছে। তিনি জোছনা দেখার জন্যে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন, পুকুরের শ্বেতপাথরের ঘাটে দু'জন লাবুস বসে আছে। দু'জনই তাকিয়ে আছে দূরের বনভূমির দিকে।

একদিন থাকার জন্যে এসে তিনদিন থাকলেন। তিনবটের মাথা দেখে খুব আনন্দ পেলেন। কয়েকবার বললেন, আহারে, কী দৃশ্য ! এই বলেই ভগবতগীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করলেন—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
> অজো নিত্যঃ শ্বাশতোহায়ং পুরানো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

মাওলানা ইদরিসের ছবি আঁকা কর্মকাণ্ডেও বিস্মিত হলেন। কী অনায়াসে কী সুন্দর ছবিই না বৃদ্ধ মানুষটা আঁকছে! ছবি নিয়ে তাঁর লজ্জারও সীমা নেই। তাঁর ধারণা তিনি বিরাট পাপ করছেন। বিভূতি বাবু অনেক চেষ্টা করলেন অদ্ভুত এই মানুষটার ভুল ভাঙাতে। লাভ হলো না। ঘাটশিলায় ফিরে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখলেন লাবুসকে।

পো. অ. গোপালনগর
গ্রাম : বারাকপুর
যশোহর।

প্রীতিভাজনেষু

নমস্কার। অতিব আনন্দ নিয়ে আপনার অতিথি হয়েছিলাম। যদিও নিজেকে কখনো অতিথি মনে হয় নাই। তিনবটের মাথা দেখে তৃপ্তি পেয়েছি। মাঝে মাঝে অতি সাধারণ দৃশ্য অজ্ঞাত কারণে অসাধারণ মনে হয়। তিনবটের মাথা সেরকম একটি স্থান। কলকাকলিতে মুখরিত পাখির ঝাঁক এক বটগাছ থেকে আরেক বটগাছে উড়াউড়ি করছে, এই দৃশ্য এখনো চোখে ভাসছে।

আমি আপনাকে আমার একটি উপন্যাস পাঠালাম। নাম 'দৃষ্টি প্রদীপ'। উপন্যাসটি পড়লে আনন্দ পাবেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নাম জিতু। সে অদৃশ্য দৃশ্য দেখে। মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়। আমার কেন জানি মনে হয় আপনি জিতুর মতো একজন।

আরেকটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। আমার ধারণা আপনার বাড়িতে একটি বিদেহী শিশুকন্যার উপস্থিতি আছে। অতৃপ্ত আত্মারা প্রায়ই পৃথিবীর মায়ায় আটকে যায়। তাদের জন্যে বিষয়টি কষ্টের। আপনি কিশোরী মেয়েটির মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এই আশা করছি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি
শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতি বাবুর চিঠির তারিখ ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সন। ওই দিনে জাপানের হিরোশিমা শহরে একটা বোমা পড়ে। বোমাটির নাম 'লিটল বয়'। পৃথিবীতে প্রথম আণবিক

বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ষাট হাজার মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। কয়েক ঘণ্টা পর মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার।

যে বিমানটি আণবিক বোমা নিয়ে যাচ্ছিল তার নাম এনোলা গে। বৈমানিকের নাম পল টিবেটিস। পল টিবেটিসের মায়ের নামেই বিমানটির নাম রাখা হয়েছিল মাত্র একদিন আগে, ৫ আগস্ট ১৯৪৫।

বোমা বিস্ফোরিত হবার পর পল টিবেটিস পেছনে ফিরে দেখলেন, ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর এক ব্যাঙের ছাতা আকাশের দিকে উঠছে। তিনি হতভম্ব গলায় বললেন, হায় ঈশ্বর, আমরা এটা কী করেছি!

আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর পর বহু দূরের একজন মানুষ, বান্ধবপুরের লাবুস অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনোরকম কারণ ছাড়াই তার শরীর ঝলসে যায়। মাথার চুল পড়ে যায়। সে গোঙানির মতো শব্দ করতে থাকে।

মনে হচ্ছিল সেও আণবিক বোমায় ঝলসে যাওয়া মানুষদের একজন। সতীশ কবিরাজ তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, বিনা কারণে শরীর পুড়ে গেছে। এটা কী বলেন ?

লাবুস ক্ষীণ গলায় বলল, আগুনের একটা ঝলকানি দেখেছি, আর কিছু না।

সতীশ কবিরাজ বললেন, আগুন কই যে আগুনের ঝলকানি দেখবেন ?

মাওলানা ইদরিসের ধারণা হয়, তার পাপে লাবুসের এই সমস্যা হয়েছে। তিনি একই বাড়িতে থেকে ছবির পর ছবি আঁকছেন, এরকম তো হবেই।

এক সন্ধ্যাবেলা তিনি তাঁর সব ছবি ছিঁড়ে ফেলে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

স্থান বোম্বে (মুম্বাই) শহর। জায়গার নাম মালাবার হিল। রাজপ্রাসাদের মতো এক বাড়ি। আরব সাগরের তীরে আড়াই একর জমিতে অপূর্ব এই প্রাসাদের ডিজাইন করেছেন ব্রিটিশ স্থপতি ক্লদ ব্যাটনি। প্রাসাদটির মালিক মুসলিম লীগের সভাপতি মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্। এই প্রাসাদে আজ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসেছেন। তাঁর নাম মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধি। গান্ধিজির মুখ বিষণ্ন। মুসলিম লীগের ডাকে ডাইরেক্ট অ্যাকশান কর্মসূচি পালিত হয়েছে (১৬ জুলাই ১৯৪৬), দাঙ্গা শুরু হয়েছে। কোলকাতার দাঙ্গায় সাত হাজার মুসলমান এবং তিন হাজার হিন্দু নিহত হয়েছে। দাঙ্গা পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে।

তাঁরা দু'জন প্রাসাদের লবিতে বসেছেন। এখান থেকে আরব সাগরের ঢেউ দেখা যায়। গান্ধিজি সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদেরকে কিছুক্ষণ আগে লেবু চা দেয়া হয়েছে। দু'জনের কেউ সেই চা স্পর্শ করেন নি। মোহম্মদ আলি জিন্নাহর হাতে সিগারেট। তিনি একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে দামি অ্যাসট্রে আছে, তারপরেও তিনি সিগারেটের ছাই ফেলছেন এইমাত্র আনা চায়ের কাপে। তাকে খুবই অস্থির লাগছে। লবিতে তাঁর কন্যা দিনা এসেছিল গান্ধিজিকে সালাম জানাতে। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মেয়ের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলেছেন, এখন বিরক্ত করবে না। দিনা অপ্রস্তুত হয়ে দ্রুত চলে গেছে।

দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে ইংরেজিতে। গান্ধিজি স্বভাবসুলভ নরম স্বরে কথা বলছেন। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলছেন।

গান্ধিজির মুখ হাসিহাসি, কিন্তু জিন্নাহর মুখে হাসি নেই। তাদের কথাবার্তা নিম্নরূপ।

গান্ধিজি : আপনি কি চান যে আমাদের মাতৃভূমি ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাক?

জিন্নাহ : আমি যে এটা কখনো চাই নি এবং এখনো চাচ্ছি না তা আপনি জানেন। রাজনীতিবিদদের একটি অস্ত্র 'মিথ্যা'। আমি এই অস্ত্র ব্যবহার করি না।

গান্ধিজি : ডাইরেক্ট অ্যাকশান কি আমাদের সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে না ?

জিন্নাহ : হ্যাঁ যাচ্ছে। তার জন্যে দায়ী কংগ্রেস। আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলাম (লক্ষ্নৌ চুক্তি) সেই চুক্তি থেকে কংগ্রেস কি সরে যায় নি ?

গান্ধিজি : (চুপ করে আছেন। দৃষ্টি সাগরের ঢেউয়ের দিকে)

জিন্নাহ : কংগ্রেস এখন কী করছে ? মুসলিম লীগকে একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বীকার না করে খেলাফত আন্দোলনকে স্বীকার করছে।

গান্ধিজি : মাতৃভূমি ভাঙার দুঃখ আমি নিতে পারব না। আমি এবং আপনি কি এটা বন্ধ করতে পারি না ?

জিন্নাহ : না, পারেন না। পণ্ডিত নেহেরু কিন্তু এই ভাগাভাগি চাচ্ছেন।

গান্ধিজি : আপনি ভুল করছেন। ভারত বিভক্তি কারোই কাম্য নয়। নেহেরুর তো কখনোই না। *

---

* ভুল গান্ধিজি করেছিলেন। নেহেরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসকে রাজি করান যেন ভারত দু'টি দেশে ভাগ হয়। ভারতের নতুন ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা শুরু করেন। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় মৃত্যুর দিনরাত্রি।

বান্ধবপুর লঞ্চঘাটে এমএল আড়িয়াল খাঁ লঞ্চ ভিড়েছে। ছয়জন যাত্রী ডেকে চাদর বিছিয়ে তাস খেলতে খেলতে আসছিল। তাদের তাসখেলা শেষ হয় নি। লঞ্চ ভিড়ার অনেকক্ষণ পরেও তারা খেলা নিয়ে মত্ত রইল। যাত্রীদের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে, এদের তাড়া নেই। এদের সঙ্গে মালামালও নেই। লঞ্চের কেবিন বয় বলল, আপনারা নামবেন না? তাদের একজন উদাস গলায় বলল, নামতেও পারি, আবার নাও নামতে পারি।

তেমন কোনো হাসির কথা না। কিন্তু সবাই হাসছে।

কেবিন বয় বলল, যাবেন কই?

যাব দোজখে।

আবার হাসির শব্দ। এবারের হাসি আরো উচ্চকিত। তবে তার মধ্যে আনন্দ নেই।

ছয়জনের এই দলটি ভাড়া করে এনেছেন ধনু শেখ। এরা দাঙ্গাহাঙ্গামায় অত্যন্ত দক্ষ। তাদের সঙ্গে ধনু শেখের একটাই কথা— মালাউন কমায়ে চলে যাবে। লুটের মাল সবই তোমাদের। স্থানীয় সাহায্য যা করার তিনি করবেন। শোনা যাচ্ছে কোন জায়গা পাকিস্তানে পড়বে তা ঠিক হবে মুসলমানের সংখ্যা দিয়ে। ভোটাভুটি হবার সম্ভাবনা। বান্ধবপুরকে অবশ্যই পাকিস্তানে ঢুকাতে হবে। যে-কোনো ভালো কাজের সঙ্গে সামান্য মন্দ কাজ করতে হয়। স্বাধীন পাকিস্তান বিরাট ভালো কাজ। তার জন্যে কিছু রক্তপাত হতেই পারে। স্বাভাবিকভাবে একটা শিশুর জন্ম দিতে গিয়েও মায়েদের প্রচুর রক্ত দেখতে হয়। সেখানে নতুন দেশের জন্ম হচ্ছে। সহজ কথা তো না।

ধনু শেখ খবর দিয়ে শ্রীনাথকে এনেছেন। মূল্য উদ্দেশ্য গল্পগুজব করা। মানুষ হয়ে জন্মানোর এই এক সমস্যা। গল্প করার সঙ্গী লাগে। ধনু শেখের প্রায়ই মনে হয়, গরু হয়ে জন্মালে ভালো ছিল। ঘাস খেয়ে জীবনটা পার করে দিতে পারতেন। চিন্তা নাই, ভাবনা নাই। জগতের একমাত্র বিষয় সবুজ ঘাস। সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘাস খাওয়া। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেই ঘাস জাবর কাটা। জাবর কাটার সময় মশা বিরক্ত করলে লেজের বাড়ি দিয়ে মশা মারা।

শ্রীনাথ, আছ কেমন ?

আজ্ঞে ভালো আছি।

চারদিকে দাঙ্গা লেগে গেছে, শুনেছ বোধহয় ?

শুনেছি।

বান্ধবপুরে দাঙ্গা নাই, কিছু নাই, ব্যাপারটা কী বলো দেখি ?

শ্রীনাথ বলল, আপনার মতো বিশিষ্টজনরা থাকতে দাঙ্গা কেন হবে ?

ধনু শেখ বললেন, আমি বিশিষ্টজন তোমারে কে বলল ? আমি অবশিষ্টজন। দুই ঠ্যাং-এর মধ্যে একটা চলে গেছে, একটা আছে অবশিষ্ট। এখন বলো আমি অবশিষ্টজন না ?

শ্রীনাথ চুপ করে রইল। ধনু শেখ তাকে কী জন্যে ডাকিয়েছেন সে বুঝতে পারছে না। এই লোক বিনা উদ্দেশ্যে কিছু করবে না।

ধনু শেখ বললেন, শুনলাম তোমরা দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি করেছ। নমশুদ্র, চামার, ঢুলি সব দলে টেনেছ। রামদা সড়কির ব্যবস্থা করেছ। মুসলমান মারা শুরু করবা কবে ? পঞ্জিকা দেখে একটা শুভদিন বের কর। অশুভ দিনে মারামারি শুরু করলা, দেখা গেল ফল হয়েছে খারাপ। নিজেরাই শেষ।

শ্রীনাথ বলল, অনুমতি দেন যাই। আমার শরীরটা ভালো না।

শরীর তো আমারও ভালো না। পচন ধরেছে। শশাংক পালের শরীর যেমন পচে গিয়েছিল আমারও যাচ্ছে। আবার শুনলাম লাবুসের শরীরেও পচন ধরেছে। ভালো কথা মনে পড়েছে। শশাংক পালের ভূতের গল্পটা পুরা শুনা হয় নাই।

'আমি উঠলাম' বলে শ্রীনাথ উঠতে যাওয়ার আগেই ধনু শেখের লোকজন চলে এলো। ধনু শেখ বললেন, তোমরা চলে এসেছ ভালো করেছ। এর নাম শ্রীনাথ। আমার নিজের লোক। কাজকর্ম যা করবা এরে সাথে নিয়া করবা। সে প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ি চিনে। কোন কোন বাড়িতে ডবকা যুবতী আছে তাও জানে। কলিকাতার দাঙ্গায় বহুত মুসলমান মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে— শোধ নেয়ার প্রয়োজন আছে।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু এইটুকু বুঝছে তার মহাবিপদ।

মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন গলা নামিয়ে বলল, কাজ কি আজ রাতেই শুরু হবে ?

ধনু শেখ বললেন, আরে না। বিশ্রাম কর। খাওয়াদাওয়া কর। অবস্থা বিবেচনা কর। তবে শ্রীনাথ যেন পালায়া না যায়। তাকে প্রয়োজন আছে।

এরা শ্রীনাথকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে লঞ্চঘাটের দিকে। তারা হাঁটছে দ্রুত। শ্রীনাথ তাদের সঙ্গে তাল মিলাতে পারছে না। শ্রীনাথ বলল, আমাকে কোথায় নিয়ে যান ?

বসন্তের দাগওয়ালা লোকটি বলল, শ্বশুরবাড়ি নিয়া যাই। তোমার শ্বশুর সাব কী করব জানো ? তোমার বিচি ফালায়া তোমারে খাসি করব।

দলের সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তাদের মনে চাপা আনন্দ।

মনিশংকর লাবুসকে দেখতে এসেছেন। তিনি রোজই আসেন। অনেকক্ষণ বসে থাকেন। তাঁকে পুরাপুরি বিভ্রান্ত মনে হয়।

পুকুরঘাটে শীতলপাটি বিছানো। শীতলপাটির ওপর কলাপাতা। লাবুস কলাপাতার ওপর শুয়ে থাকে। তাকে সারাক্ষণ পাখা দিয়ে বাতাস করে হাদিস উদ্দিন। মাওলানা ইদরিস তাঁর মেয়েকে নিয়ে পাশেই থাকেন। তিনি নফল রোজা রাখছেন। এবং মনে মনে কোরান খতম দিচ্ছেন।

লাবুস বেশির ভাগ সময় থাকে ঘোরের মধ্যে। তখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখে। অপরিচিত নানানজনের সঙ্গে কথা বলে। যেসব ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে হুবহু সেই ঘটনাও ঘটতে দেখে। একদিন দেখল পুকুরঘাটে বসে বিভূতি বাবু মুগ্ধ গলায় নিজের বই পড়ে শুনাচ্ছেন। লাবুস এবং হাদিস উদ্দিন পাঠ শুনছে। কী পড়া হচ্ছে তাও লাবুসের মনে আসে। একটি শব্দও এদিক ওদিক হয় না।

> কুড়ুলে বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায় সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটার সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেছে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটরগাড়ি এদেশের লোক কখনো দেখে নি।

একদিন সে তার মা জুলেখাকে দেখল। দোতলা পাকাদালানের একটা বড় ঘরে জুলেখা সতরঞ্চির ওপর বসে। তাঁর সামনে হারমোনিয়াম। একপাশে রূপার পানদানিতে পান। ঘরের এক কোনায় জুলেখার কাছ থেকে বেশ দূরে তবলা এবং তানপুরা নিয়ে একজন বসেছে। একজন বংশীবাদক আছে, সে বসেছে জুলেখার

পাশে। জুলেখা গান করছে এবং বৃদ্ধ এক শেরওয়ানি পরা মানুষ গান শুনছেন। গানের কথা—

কেবা কার পর, কে কার আপন,
কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে
দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

হঠাৎ গান থেমে যায়। হৈচৈ-এর শব্দ শোনা যায়। একদল মানুষ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। ভাঙচুরের শব্দ। আর্তনাদ। কালো ধোঁয়া। লাবুসের সামনে সব অস্পষ্ট হয়ে যায়।

লাবুস প্রায়ই বাচ্চা একটা মেয়েকে তার চারপাশে ঘুরতে দেখে। মেয়েটার মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। গোল মুখ। চোখ বড় বড়। মেয়েটা সব সময় খেলছে। কখনো তার হাতে সুতা, কখনো কাপড়ের টুকরা। লাবুস তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। মেয়েটা খেলায় এতই মগ্ন থাকে যে বেশির ভাগ সময়ই লাবুসের প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

নাম কী গো তোমার ?

ভুলে গেছি।

মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। তার নাম ভুলে না।

আমি ভুলে গেছি।

তুমি এই বাড়িতে থাক ?

হুঁ। মাটির নিচে গুপ্তঘরে থাকি।

কতদিন ধরে থাক ?

অনেক দিন। অনেক অনেক দিন। কতদিন ভুলে গেছি। আমি সব ভুলে গেছি।

তোমার বাবা মা, এদের কথা মনে আছে ?

ভুলে গেছি। আমি আর কথা বলব না।

মেয়েটা উঠে চলে যায়। আবারো আসে। লাবুসের আশেপাশেই বসে খেলায় মগ্ন হয়ে যায়।

মনিশংকর বললেন, আজ শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে ?

লাবুস বলল, ভালো।

মনিশংকর হতাশ গলায় বললেন, এই কি ভালোর নমুনা ? তুমি তো মরতে বসেছ। চলো তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাই। বড় বড় ডাক্তাররা তোমাকে দেখুক। দেখে বলুক কী হয়েছে।

লাবুস বলল, আমার কী হয়েছে আমি জানি। কেউ তা বিশ্বাস করবে না। জগৎ বড়ই বিচিত্র।

জগৎ বিচিত্র হোক, যাই হোক, তোমার দরকার চিকিৎসা।

আমার সময় হয়ে গেছে। চিকিৎসায় কিছু হবে না।

তোমার সময় হয়ে গেছে, তুমি বুঝে ফেললা ? তুমি কি ভগবান ? আমি তোমাকে এইভাবে মরতে দেব না।

লাবুস বলল, আমি কাউকে যে কথা কোনোদিন বলি নাই আপনাকে বলতে চাই। মাওলানা সাহেবকে আর হাদিস উদ্দিনকে দূরে যেতে বলেন।

আমাকে বলতে চাও কেন ?

আপনি বিশ্বাসী মানুষ। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন।

মাওলানা এবং হাদিস উদ্দিন উঠে গেল। হাদিস উদ্দিনের খুব শখ ছিল ছোটকর্তার কথাগুলি শোনে। সে ছোটকর্তার বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানে, কাউকে তা বলতে পারছে না। এখন সময় হয়েছে বলার।

লাবুস বলল, আমি চোখের সামনে অনেক কিছু দেখি। ছোটবেলা থেকে দেখতাম। তখন ভাবতাম সবাই আমার মতো দেখে। অনেক পরে জানলাম, সবাই আমার মতো দেখে না।

কী দেখ ?

ভবিষ্যতের ঘটনা দেখি। আমার মা যে আমাদের ছেড়ে খারাপ জায়গায় চলে যাবে— এটা অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। আমি মৃত মানুষজনদের দেখি। তাদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে।

কী কথা বলে ?

অনেক কথা। বেশির ভাগ কথার অর্থ আমি বুঝি না। তখন আমার খুব কষ্ট হয়।

লাবুস হাঁপাতে লাগল। মনিশংকর বললেন, এখন আর কথা বলার প্রয়োজন নাই। বিশ্রাম কর।

আপনাকে অতি জরুরি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আমি স্পষ্ট দেখেছি, বান্ধবপুর জায়গাটা হিন্দুস্থানের মধ্যে পড়েছে। এখানের বহু মুসলমান মারা যাবে। তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মনিশংকর বললেন, জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের সময় বিকার উপস্থিত হয়। বিকারের ঘোরে মানুষ অনেক কিছু দেখে। তোমার জ্বর কমুক। শরীর স্বাভাবিক হোক। তখন তোমার কথা শুনব।

লাবুস বলল, আমার শরীর এখন জ্বলে যাচ্ছে। হাদিস উদ্দিনকে বলেন যেন শরীরে পানি ঢালে।

মনিশংকর নিজেই আজলা ভরে পানি লাবুসের শরীরে ঢালতে লাগলেন। লাবুস বিড়বিড় করে বলল, বান্ধবপুরের মহাবিপদ। অনেক মানুষ মারা যাবে। অনেক মানুষ মারা যাবে।

মনিশংকর বললেন, বাবা শান্ত হও।

মসজিদের নতুন ইমাম নিয়ামত হোসেন প্রবহমান পানিতে অজু করেন। বদ্ধপানিতে অজু করার চেয়ে প্রবহমান পানিতে অজুর সোয়াব বেশি। তিনি ঘাটে বসে অজু শেষ করে উঠতে যাবেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। ভাসতে ভাসতে কী যেন এগিয়ে আসছে। ফজরের ওয়াক্ত। আকাশ এখনো অন্ধকার। পরিষ্কার কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু নদীর পানি চকচক করছে। নিয়ামত হোসেন ভাসমান বস্তুটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। একসময় তিনি বিড়বিড় করে বললেন, গাফুরুর রহিম, এটা কী?

নদীর পানিতে চিৎ হয়ে ভাসছে শ্রীনাথ। নিয়ামত হোসেন কাউকে কিছু না বলে মসজিদে গেলেন। টিউবকলের পানিতে আবার অজু করলেন। ফজরের নামাজ আদায় করলেন। মসজিদে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় নামাজি কেউ নেই। ফজরের নামাজে কখনোই লোক হয় না। নামাজ শেষ করে তিনি ধনু শেখের বাড়িতে গেলেন। ঘুমন্ত ধনু শেখের ঘুম ভাঙালেন। নদীতে কী দেখে এসেছেন বললেন। বর্ণনার সময় নিয়ামত হোসেনের গলা কাঁপতে লাগল।

ধনু শেখ বললেন, এটা বলার জন্যে তুমি আমার ঘুম ভাঙায়েছ? শ্রীনাথের মৃত্যুর খবর ঘুম ভাঙায়ে আমাকে দিবার কী আছে? শ্রীনাথ কি আমার ভায়রা ভাই? মরছে গেছে ফুরাইছে। সবাই মারা যাবে। আমিও যাব তুমিও যাবে।

নিয়ামত হোসেন বললেন, কালরাতে শ্রীনাথ বাবুকে আমি দেখেছি।

কোথায় দেখেছ?

এশার নামাজ পড়ে ফিরতেছি, হঠাৎ দেখি হাত ধরে তাকে টেনে লঞ্চে নিয়ে তুলতেছে। আপনার লোকজন তুলতেছে।

আমার লোকজনটা কে?

লঞ্চে করে এরা এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করেছে।

ধনু শেখ বললেন, তুমি কি বলতে চাও আমি শ্রীনাথকে খুন করায়েছি?

নিয়ামত হোসেন বললেন, জি-না।

ধনু শেখ বললেন, তাহলে আমাকে এই ঘটনা বলার মানে কী?

গোস্তাকি হয়েছে।

নিয়ামত শোন, বেশি বেশি বুঝার চেষ্টা নিবা না এবং বেশি বেশি দেখবা না। কম দেখা ভালো। কম বুঝাও ভালো।

জি আচ্ছা।

হিন্দুরা সব মুসলমান মেরে শেষ করে ফেলতেছে, এইটা জানো?

জানি না।

দাঙ্গার খবর পড় নাই? কলিকাতায় কী হয়েছে? বিহারে কী হয়েছে? মুসলমান সব শেষ। আর এদিকে পা পিছলায়ে পানিতে পড়ে মালাউন একটা মারা গেছে, আর তুমি হয়ে গেছ বেচাইন। বুরবাক কোথাকার। যাও সামনে থেকে। একটা কথা মনে রাখবা, তুমি কিছুই দেখ নাই। বুঝেছ?

জি।

আগামীকাল জুম্মাবার না?

জি।

জুম্মার নামাজের পরে তুমি সুন্দর কইরা ওয়াজ করবা। তুমি বলবা সব মুসলমানের দায়িত্ব নিজেদের রক্ষা করা। পরিবার রক্ষা করা এবং পাকিস্তান হাসেলের জন্য কাজ করা। বলতে পারবা?

পারব।

তার জন্যে প্রয়োজনে রক্তপাত করতে হবে। শহীদ হতে হবে। বলতে পারবা না?

পারব।

মিনমিন কর বলতেছ কেন? জোর গলায় বলো। গলায় জোর নাই? তুমি কি মেন্দামারা মুসলমান? শরীর তো বানায়েছ মহিষের মতো। অনেক কথা বলে ফেলেছি, এখন সামনে থেকে যাও। তুমি আমার সকালের ঘুম নষ্ট করেছ। বুরবাক কোথাকার।

নিয়ামত হোসেন ঘর থেকে বের হলেন। এখন তার লঞ্চের টিকেট ঘরে যাবার কথা, তা না করে তিনি মসজিদে গেলেন। দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। কিছুক্ষণ কোরান পাঠের চেষ্টা করলেন। মন বসল না। তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে টিকেট ঘরে গেলেন।

টিকেট ঘর থেকে দেখা যায় অনেক লোকজন নদীর পাড়ে ভিড় করেছে। শ্রীনাথকে ডাঙ্গায় তোলা হচ্ছে। বল হরি, হরি বল ধ্বনি উঠছে। নিয়ামত হোসেন আবার টিকেট ঘর থেকে বের হলেন। তিনি গেলেন মনিশংকরের কাছে। মাথা নিচু করে ফিসফিস করে কথা বললেন। তাঁর বেশির ভাগ কথাই অস্পষ্ট।

মনিশংকর বললেন, কাল জুম্মার নামাজের পরে দাঙ্গা শুরু হবে। কী বলেন আপনি ?

নিয়ামত হোসেন বললেন, এই জন্যে বাইরে থেকে লোক আসছে।

লোক কে এনেছে ? ধনু শেখ ?

নিয়ামত হোসেন জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বড়ই ভয় লাগছে।

আজ জুম্মাবার।

ধনু শেখ আগে জুম্মার নামাজে আসতেন। ঠ্যাং কাটা যাবার পর আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বসে বসে নামাজ পড়ার মানে হয় না। সবাই যেন করে তাকায়। তবে আজ তিনি জুম্মার নামাজে এসেছেন। তাঁর লোকজন কেউ আসে নি। তারা লঞ্চে অপেক্ষা করছে। তাদেরকে বলা হয়েছে জুম্মার নামাজ শেষ হবার পর তিনি যখন বাড়ি ফিরবেন তখন আসল কাজ শুরু হবে।

আজ জুম্মার নামাজে ভালো জমায়েত হয়েছে। অনেক অপরিচিত মানুষও দেখা যাচ্ছে। মাওলানা ইদরিস এসেছেন। তিনি ইমাম নিয়ামত হোসেনের পাশেই বসেছেন।

নামাজ শেষে খুতবা পাঠের পর ইমাম নিয়ামত হোসেন বললেন, হাফেজ মাওলানা ইদরিস আপনাদের কিছু বলবেন।

মাওলানা ইদরিস উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, চারদিকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসতেছে। এই বিষয়ে সামান্য কিছু বলব। আমার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন। আল্লাহপাক সুরা হুজুরাত-এর তের নম্বর আয়াতে বলেছেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বড় সাবধানী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।" এর বেশি আমার আর কিছুই বলার নাই। মূল আয়াতটা আমি আপনাদের আরবিতে পাঠ করে শুনাব। তার আগে ছোট্ট একটা ঘোষণা আছে— আপনারা জানেন লাবুস খুবই অসুস্থ। তার জন্যে আমি দরুদে শেফা পাঠ শুরু করেছি। যেন আল্লাহপাক তার রোগযন্ত্রণার অবসান করেন। আপনারা তার জন্যে দোয়ায় সামিল হবেন। লাবুস তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করেছে। দানপত্রে আজই বাদ জুম্মা সে দস্তখত করবে। আপনারা সবাই সাক্ষী। তার দানপত্র মতে এই অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে

তার সবকিছু ব্যয় হবে। স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়। আপনারা সবাই বলেন, মারহাবা। অন্তর থেকে বলেন।

সবাই মারহাবা বলল। ধনু শেখও বললেন।

এরপর দোয়া পাঠ হলো এবং ইমাম নিয়ামত হোসেন আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন বান্ধবপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা না হয়।

ধনু শেখ বাড়ি ফিরছেন। হিসাবমতো তাঁর লোকজনের কর্মকাণ্ড শুরু হবার কথা। তা হচ্ছে না, কারণ লঞ্চঘাটে নমশুদ্রদের একটা বিশাল দল লাঠি, সড়কি, রামদা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের সঙ্গে আছেন মনিশংকর। তাঁর নির্দেশে এমএল আড়িয়াল খাঁ লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। লঞ্চের কেবিনে ধনু শেখের লোকজন বসা। তারা হতভম্ব।

মনিশংকর ধনু শেখের বাড়িতে এসেছেন। ঘরে ঢুকেছেন একা। তাঁর লোকজন সব বাইরে।

ধনু শেখ বললেন, আমার কাছে কী চান?

মনিশংকর বললেন, কিছু চাই না। খবর কি জানেন?

কী খবর?

দেশ ভাগাভাগির সব ঠিকঠাক হয়েছে। সীমানা নির্ধারণ হয়েছে। বান্ধবপুরে বড়গাঙ বরাবর সীমানা। আপনি পড়েছেন হিন্দুস্থানে।

ধনু শেখ তাকিয়ে আছেন।

আমার বাড়িতে ব্যাটারিতে রেডিও বাজে। খবর শুনে আপনাকে বললাম। যাই, নমস্কার।

হিন্দু বাড়িতে শাঁখ বাজছে। ঘণ্টা বাজছে। বড়ই আনন্দময় সময়।

রাত অনেক। আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে।

ফকফকা জোছনা।

লাবুস পুকুরপাড়ে পাটির ওপর শুয়ে আছে। সে একা, আর কেউ নেই। সবাইকে সে কিছুক্ষণ আগে সরিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে একা থাকতে ইচ্ছা করে। আজ যেমন করছে। লাবুসের শরীর খুবই খারাপ করেছে। জ্বলুনি অনেক বেড়েছে। তারপরেও জোছনা দেখতে ভালো লাগছে। এই সুন্দর চাঁদের আলো সে আর বেশিদিন দেখবে না। নিস্তব্ধ রাতে ঝিঁঝিপোকার ডাক শুনবে না। হঠাৎ লেবু ফুলের ঘ্রাণে শরীর মন অবশ হবে না। ভাবতেই কী অদ্ভুত লাগে। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ আজ তার মা'কে দেখতে ইচ্ছা হলো।

বাবা জহির!

লাবুস চমকে তাকালো। এটা কি কোনো ভ্রান্তি? মন চাইছে বলে সে মায়ের গলা শুনতে পাচ্ছে? সারা শরীর চাদরে ঢাকা একজন মহিলা পুসকুনির সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নামলেন।

বাবা, তোমার কী হয়েছে?

লাবুস জবাব দিল না। মহিলা বললেন, বাবা, তোমার কপালে একটু হাত রাখব?

লাবুস বলল, রাখ।

জুলেখা লাবুসের কপাল স্পর্শ করে ফুঁপিয়ে উঠল। বাবাগো, তোমার কী হয়েছে? আমার বাবার সোনার অঙ্গ কীভাবে জ্বলে গেছে?

লাবুস বলল, মা, যন্ত্রণায় অনেকদিন ঘুমাতে পারি না। একটু ঘুম পাড়ায়ে দাও।

ছোটবেলায় গুনগুন করতে করতে জুলেখা দুষ্ট জহিরকে ঘুম পাড়াত। আশ্চর্য, একটা সুরও মনে আসছে না।

মীরা বারান্দায় এসেছিল। সে পুকুরঘাটের দিকে তাকাল এবং দৌড়ে ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল। রিনরিনে গলায় বলল, তুমি কে?

জুলেখা তাকাল।

ছোট মীরা বলল, তুমি কি আমার আর লাবুসের মা?

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। তাঁর মাথায় সুর এসেছে— আমার দুষ্ট ঘুমায়রে। আমার ন্যাওলা ঘুমায়রে। আমার ভুটু ঘুমায়রে।

মওলানা ইদরিস ঘর থেকে বের হয়েছেন, হাদিস উদ্দিন বের হয়েছে।

পুকুরঘাট থেকে যে সুরধ্বনি বের হয়ে আসছে তার জন্ম এই পৃথিবীতে নয়, অন্য কোনোখানে।

[দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত পঁয়ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত...* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তাঁর বেশ কটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একটি উপন্যাস 'গৌরীপুর জংশন' সাতটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে এই উপন্যাসের ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি ও ফার্সি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।